ক্লিন্টন বি সিলি

অনন্য জীবনানন্দ

জীবনানন্দ দাশের
সাহিত্যিক জীবনী

অনন্য জীবনানন্দ

জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যিক জীবনী

উৎসর্গ

গুয়েন্ডলিন লেন-কে,
তিনি না বলেন বাংলা, না পড়েন বাংলা,
কিন্তু বাঙালি বা অবাঙালি যাঁদের সঙ্গেই আমি মিশেছি,
তাঁরা যত ভালো করে জীবনানন্দের কবিতা বোঝেন, তেমন করে
বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়ে ভালো করে বুঝতে পারেন তিনি।

সূচিপত্র

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা	৯
অনুবাদকের ভূমিকা	১১
ভূমিকা	১৩
শেকড়	১৭
কল্লোল যুগ	৪৯
বরিশাল ফেরা	৯৯
যুদ্ধকাল : প্রস্তাবনা ও ফলাফল	১৭৪
উপন্যাসের আরেকটি প্রয়াস	২৪১
রাজনীতির কবিতা	২৮১
মরণোত্তর জীবনানন্দ	৩২৮
নির্ঘণ্ট	৩৪৩

~ www.amarboi.com ~

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

আমার সৌভাগ্য, ১৯৯৩ সালে আমার ইংরেজিতে লেখা বই *আ পোয়েট অ্যাপার্ট*কে আনন্দ পাবলিশার্স তাদের বার্ষিক অশোককুমার সরকার স্মরণীয় আনন্দ পুরস্কার প্রদান করে। তার অব্যবহিত পরে সেটার অনুবাদ করার জন্য একটা প্রস্তাব উঠেছিল। এ নিয়ে আলোচনা হয়, সময় কেটে যায়, তবে শেষ পর্যন্ত অনুবাদের ব্যাপারে কিছু হয়ে ওঠেনি। গত বছর, আনন্দ পুরস্কার পাওয়ার দীর্ঘ ১৭ বছর পরে, সাজ্জাদ শরিফের কাছ থেকে একটা ই-মেইল পাই। তিনি আমাকে মনে করিয়ে দেন যে বছর খানেক আগে যখন আমি ঢাকায় ছিলাম, তখন *প্রথম আলো*র জন্য আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তিনি এবার ই-মেইলে লেখেন যে *প্রথম আলো* 'প্রথমা' নামে নতুন একটা পুস্তক প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করছে, এবং অনুরোধ করেন, যাতে আমার কোনো বাংলায় লেখা প্রবন্ধ-সংকলন 'প্রথমা' প্রকাশ করতে পারে। উত্তরে অনুরোধের জন্য তাঁর কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে জানাই যে বাংলায় আমি খুব কম লিখি। আমি মূলত ইংরেজিতে লিখি অথবা বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করি। উপরন্তু বাংলায় সামান্য যা কিছু লিখেছি, আগেই সব বেরিয়ে গেছে কোনো না কোনো পত্রিকায়। তবে 'প্রথমা'র কর্তারা আমার একটা বাংলা বই বের করতে চাইলে, তাঁরা *আ পোয়েট অ্যাপার্ট*-এর তরজমা করানোর ব্যবস্থা করে প্রকাশ করতে রাজি কি না, ফেরত ই-মেইলে এই প্রস্তাব পাঠাই। কিছুদিন বাদে উত্তর এল। 'প্রথমা' রাজি। আবার সাজ্জাদ শরিফকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

একজন অনুবাদককে নিযুক্ত করা হলো। ফারুক মঈনউদ্দীন কেবল দক্ষ অনুবাদক নন, তিনি নিজেই সাহিত্যিক; প্রধানত ছোটগল্প লেখেন। তা ছাড়া, সাজ্জাদ শরিফ আমার কাছে তাঁকে যেভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তিনি জীবনানন্দ দাশের নিখাদ ভক্ত। আমিও কিছু অনুবাদ-টনুবাদ করেছি, অবশ্য বাংলা থেকে ইংরেজিতে। সে অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, অনুবাদ কাজটা কঠিন, অত্যন্ত পরিশ্রমের। পুরো একটা বই অনুবাদ করতে গেলে প্রচুর সময় লাগে। ফারুক মঈনউদ্দীন এত তাড়াতাড়ি অনুবাদ করে ফেলেছেন দেখে আমি অবাক এবং সত্যিই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ আমার অনেক দিনের বন্ধু। তাঁর পুরান ঢাকার বাড়িতে আমি দাওয়াত খেয়েছি। তিনি আমাদের নিমন্ত্রণে মাননীয় অতিথি হিসেবে একটা 'বেঙ্গল স্টাডিজ' সম্মেলনে যোগ দিতে শিকাগোতে এসেছিলেন। আমরা দুজনেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধকাব্য* নিয়ে তরজমা-জাতীয় কাজ করেছি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তিনি গদ্যে কাহিনি রূপান্তর করেছেন, আমি পদ্যে ইংরেজি অনুবাদ করেছি। 'প্রথমা প্রকাশন'-এর বিশেষ অনুরোধে তিনি *অনন্য জীবনানন্দ*র খসড়া পড়ে কিছু সম্পাদনা করেছেন। সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত। এই সূত্রে বহু দিনের ও বহু দূরের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ়, আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে।

আ পোয়েট অ্যাপার্ট ইংরেজিতে যা, *অনন্য জীবনানন্দ* বাংলায় তা-ই—একটা অংশ ছাড়া। গ্রন্থপঞ্জি ইচ্ছে করে বাদ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে যাঁরা জীবনানন্দের ওপর কাজ করবেন, তাঁদের সুবিধার জন্য বেশ কিছু গবেষণামূলক বই বাংলায় বেরিয়ে গেছে। যাঁরা এসব মূল্যবান বই লিখেছেন, তাঁদের বইগুলোতে গবেষণামূলক গ্রন্থপঞ্জি বিপুল বলে মাত্র দুজন গবেষকের নাম এখানে উল্লেখ করি : প্রভাতকুমার দাস ও আবদুল মান্নান সৈয়দ। প্রভাতকুমার দাসের *জীবনানন্দ দাশ* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯), এটিতে আছে সবচেয়ে বড় তালিকা। আবদুল মান্নান সৈয়দের নানান বই ও প্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশিত বই ও পত্রপত্রিকার তালিকা পাওয়া যায়, এমনকি জীবনানন্দের কিছু কিছু মূল লেখাও, যেমন ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ইত্যাদি। দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে, আবদুল মান্নান সৈয়দ আর নেই, গত বছর মারা গেছেন। ঢাকায় গেলে সব সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। তাঁর একটা কবিতা *আ পোয়েট অ্যাপার্ট* বা *অনন্য জীবনানন্দ*র সপ্তম অধ্যায়ে দেখা যাবে। তাতে তিনি স্বর্গত জীবনানন্দকে অনুভব করেছিলেন :

> জীবনানন্দকে মাঝে-মাঝে দেখি রাস্তায়।
> ...
> গ্রীণ রোডের মাথায় দেখেছি একদিন,
> একদিন স্টেডিয়ামের দোতলায় বই-এর দোকানে
> ওঠার সময় সিঁড়িতে আমার পাশ দিয়ে দ্রুত নেমে গেলেন

ঢাকায় গেলে মনে হয় আমিও একইভাবে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু আবদুল মান্নান সৈয়দকে গ্রীণ রোডের মাথায় দেখতে পাব।

শেষে স্বীকার না করলে অন্যায় হবে—এ বইটি হতো না যদি তিনজন মানুষ আমাকে সমর্থন, সহায়তা ও সাহায্য না করতেন : আমার প্রধান শিক্ষক ও পরে সহকর্মী এডওয়ার্ড সি ডিমক, অল্প দিনের জন্য আমার শিক্ষক ও তারপর চিরদিনের জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধু জ্যোতির্ময় দত্ত এবং আমার ও অনেকের শ্রদ্ধাভাজন বুদ্ধদেব বসু। আজীবন আমি এই তিনজনের কাছে ঋণী।

ক্লিন্টন বি সিলি
স্টার্জেন বে, ওইস্‌কন্‌সিন, ইউএসএ
ফেব্রুয়ারি, ২০১১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকের ভূমিকা

প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কবি সাজ্জাদ শরিফ আমাকে জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে মার্কিন গবেষক ক্লিন্টন বি সিলির বিখ্যাত বই *আ পোয়েট অ্যাপার্ট* অনুবাদ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কাজটা দুরূহ ও চ্যালেঞ্জিং মনে হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিশ্রুতি না দিয়ে ভেবে দেখার জন্য সময় চেয়ে নিয়েছিলাম। কিছুদিন পর *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমানও আমাকে কাজটি হাতে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ক্লিন্টনের কাছ থেকে জানা যায়, কলকাতা ও বাংলাদেশের কেউ কেউ বইটি অনুবাদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিভিন্ন সময়। সেসব প্রস্তাব অবশ্য তত দিনে তামাদি হয়ে গেছে। বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য প্রয়োজনীয় ও মর্যাদাপূর্ণ এই কাজটা করার একটা অদম্য লোভ তো ছিলই, সঙ্গে সংশয়ও ছিল—দায়িত্বটা ঠিকভাবে পালন করতে পারব কি না। অনুবাদের চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ ছিল প্রায় চার শ পৃষ্ঠার বইটিতে শত শত উদ্ধৃতির মূল ভাষ্যের সহজপ্রাপ্তি সম্পর্কে সংশয়। উদ্ধৃতির সবগুলোই ক্লিন্টনের কাছে সংরক্ষিত আছে বলে তিনি শিকাগো থেকে ত্বরিত সেসবের পিডিএফ ফাইল পাঠিয়ে দিলে কাজটাতে হাত দেওয়ার ব্যাপারে আর কোনো সংশয় থাকে না। বইটির মূল প্রকাশকের কাছ থেকে অনুমতির বিষয়টি ক্লিন্টনই সুরাহা করেন।

গ্রন্থটির অনুবাদকর্মে আমার জন্য সবচেয়ে বড় শক্তি ছিলেন ক্লিন্টন নিজেই, কারণ অনূদিত ভাষাটির ওপর মূল গ্রন্থকারের যদি ভালো দখল থাকে, সেটা হয় সোনায় সোহাগা। এ বইটি অনুবাদের বেলায়ও ঘটেছে তা-ই। কোনো বাক্য বা শব্দ দুরূহ মনে হলে ক্লিন্টনের শরণাপন্ন হয়েছি, তিনি তাঁর নিজের অধ্যাপনা পেশার প্রতি সুবিচার করে সুশিক্ষকসুলভ ধৈর্যে সেসবের যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দীর্ঘ নোট লিখে অযথার্থভাবে অনূদিত শব্দ কিংবা বাক্য পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁর অপরিচিত কোনো বাংলা শব্দ পেলে জানতে চেয়েছেন সেগুলো সম্পর্কে। ক্লিন্টনের বেশ পরিশ্রম হলেও একটা বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে যে বইটিতে কোনো শব্দ বা বাক্যের ভুল বা অযথার্থ তরজমা নেই। এই নিশ্চিন্তির বড় কৃতিত্ব ক্লিন্টনের প্রাপ্য। বিভিন্ন প্রকাশনায় জীবনানন্দের কবিতার যতিচিহ্ন, এমনকি কিছু বানান ইত্যাদি সব সময় অভিন্ন নয় বলে তাঁর কবিতার উদ্ধৃতিগুলোতে হয়তো কোনো কোনো সংস্করণ থেকে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে পারে, তবে তাতে মূল কবিতার কোনো অর্থহানি ঘটেনি।

বইটিতে ব্যবহৃত মলয় রায়চৌধুরীর মূল কবিতাটি কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না, ক্লিন্টনের কাছেও নয়। কলকাতায় কবি গৌতম চৌধুরীর মাধ্যমে মলয় রায়চৌধুরীর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে যোগাযোগ করেও কবিতাটির কোনো হদিস মেলে না। নিউইয়র্কে বন্ধু সৈয়দ শহীদ থেকে শুরু করে জ্যোতির্ময় দত্ত সবাই কবিতাটির সন্ধানে সচেষ্ট হন। বন্ধু তুষার দাশ কবিতাটি খোঁজার জন্য বিশল্যকরণীর পরিবর্তে পুরো গন্ধমাদন বয়ে আনার মতো মলয় রায়চৌধুরীর প্রায় সব কবিতা পড়ে ফেলে, কিন্তু কোনো ফলোদয় হয় না। শেষ পর্যন্ত মলয় রায়চৌধুরী ইংরেজি ভাষ্য থেকে হারানো কবিতাটি পুনর্লিখন করে দেন।

শামশের আনোয়ারের কবিতাটি জোগাড় করে দেওয়ার জন্য গৌতম চৌধুরীর প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা। অনুবাদকর্মটির ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজখবর নিয়ে, বইটির নামকরণের ব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন জীবনানন্দ-গবেষক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা। অনুবাদকর্মে লিপ্ত থাকাকালীন আমার বিভিন্ন তৎপরতার প্রতি নজর রেখে আগ্রহ প্রকাশ করা ছাড়াও সে সময়ে গার্হস্থ্য কোনো কিছুর দিকে আমার নজর না দেওয়াকে ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখার জন্য আমার স্ত্রীর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করাটা আনুষ্ঠানিক বলে মনে হলেও ঔচিত্য বিচারে সঠিক। বইটিতে জীবনানন্দের বিভিন্ন আকারের মোট তিয়াত্তরটি সম্পূর্ণ কবিতা, প্রায় সমসংখ্যক কবিতাংশ এবং গল্প ও উপন্যাস থেকে দীর্ঘ সব উদ্ধৃতি টাইপ করে দেওয়ার জন্য আমেনা নাসের নিতুকে ধন্যবাদ জানাই। এ ছাড়া এখানে নামোল্লেখ নেই এমন অনেক বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী—যাঁরা কাজটির প্রতি আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়ে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে গেছেন—তাঁদের সবার প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানানো প্রয়োজন। যেমন এত দিন ব্যবহৃত মূল ল্যাপটপটি হাতছাড়া হয়ে গেলে বইটির কাজ শেষ করার জন্য আর একটি ল্যাপটপ ধার দিয়ে কাজটি নির্বিঘ্নে শেষ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অনুজপ্রতিম বন্ধু সৌরিন দত্তের কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

বইটির চূড়ান্ত সম্পাদনার কাজে সাজ্জাদ শরিফ তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ভাষাবোধ এবং একটা প্রমাদবিহীন প্রকাশনার ব্যাপারে যে মমত্বের প্রমাণ দেখিয়েছেন সে কথা উল্লেখ না করাটা অন্যায় হবে। বইটি যন্ত্রস্থ থাকার সময় আমার ক্রমাগত তাগাদা সহ্য করার জন্য অরুণ বসুকে ধন্যবাদ জানাই। পরে একই রকম তাগাদা সহ্য করতে হয়েছে অনুজপ্রতিম জাফর আহমদ রাশেদকে। বইটি প্রকাশনার চূড়ান্ত পর্বে তাঁর দায়িত্বশীল সহায়তার জন্যও তিনি ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থটি কম্পোজ না করলেও প্রথমার কম্পিউটার অপারেটর মো. ফারুক আহমেদ আমার সঙ্গে বহু ছুটির দিন ব্যয় করে সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন, তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই। সবশেষে, মর্যাদাপূর্ণ কাজটি করার জন্য আমাকে নির্বাচিত করায় প্রথমা কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমান ও সাজ্জাদ শরিফের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ফারুক মঈনউদ্দীন
বনানী, ঢাকা
জানুয়ারি, ২০১১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

'আপনাকে চুনিলালের সঙ্গে দেখা করতে হবে,' বেশ জোর দিয়েই আমার পরিচিত লোকটি বলেন, 'এই ভদ্রলোকই ট্রামের নিচে চাপা পড়ে থাকা জীবনানন্দকে উদ্ধার করেছিলেন।' আমি চুনিলালের সঙ্গে দেখা করি ১৯৭০ সালে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর বাংলার সবচেয়ে হৃদয়লালিত কবির মৃত্যুর ১৬ বছর পর। দক্ষিণ কলকাতায় রাসবিহারী এভিনিউতে তাঁর চায়ের দোকানে রোজকার মতো বসে ছিলেন চুনিলাল। বালিগঞ্জের মধ্যবিত্ত বাঙালি পাড়াটির মাঝ-বরাবর যে পূর্ব-পশ্চিমমুখী চওড়া সড়ক চলে গেছে, তার ওপর রয়েছে দুই জোড়া ট্রামলাইন। চুনিলালের দোকান থেকে দশ কদম এগোলেই রাসবিহারী আর ল্যান্সডাউনের মোড়। রাসবিহারী চৌরাস্তা মোড় থেকে অল্প দূরত্বে ল্যান্সডাউন রোডের (পরে এই রাস্তার নাম হয়েছে শরৎ বোস রোড) এক ভাড়াবাড়িতে থাকতেন জীবনানন্দ আর তাঁর পরিবার। সেখান থেকে পাঁচ ব্লক দক্ষিণে রবীন্দ্রসরোবর, তার বিস্তৃত পার্কে জীবনানন্দ প্রায়ই হাঁটতে যেতেন একাকী। ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় এ রকম সান্ধ্য ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। তখনই রাসবিহারী এভিনিউ পার হওয়ার সময় একটা চলন্ত ট্রামের সামনে পা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

চুনিলাল আমাকে জানান, হইচই শুনতে পেয়ে ঘটনা ঘটার মুহূর্তের মধ্যে সেখানে পৌঁছানোর পর তিনি দেখতে পান, কেউ একজন ট্রামের নিচে পড়ে আটকে আছেন। চুনিলাল—গাট্টাগোট্টা মানুষটি—ঝুঁকে পড়ে ট্রামের একপাশে দুই হাত লাগিয়ে পরিস্থিতির প্রয়োজনে অতিমানবীয় শক্তি প্রয়োগ করে ট্রামের একটা পাশ আলগা করে তুলে ধরেন, যাতে জীবনানন্দের শরীরটাকে টেনে বের করা যায়। ঘটনার আট দিন পর নিউমোনিয়া সংক্রমণের জটিলতায় মারা যান রবীন্দ্রনাথের পর বাংলার স্বীকৃত কবি জীবনানন্দ দাশ, যাঁর নামের প্রথমাংশের অর্থ 'জীবনের আনন্দ'।

চুনিলাল জীবনানন্দকে ভালো করে চিনতেন না। আসলে যাঁরা চিনতেন তাঁদের সংখ্যাও অল্প। কারণ, তিনি ছিলেন একান্ত একজন, যিনি প্রধানত থাকতেন কবিতার মধ্যেই। জীবনানন্দকে বাঙালি পাঠকবিশ্বে তুলে ধরেছিলেন যে শুভাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধদেব বসু তাঁর উপযুক্ত সমাধিফলকই লিখে গিয়েছিলেন, যখন তিনি তাঁকে 'আমাদের নির্জনতম কবি' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। হতে পারে সেই নির্জনতার কারণেই আজ অবধি বাংলা সাহিত্যের এই মহৎ ব্যক্তিত্বের একটি মাত্র জীবনী লেখা হয়েছে বাংলায়[1]—অন্য কোনো ভাষায় একটিও নয়।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে যদিও আমি 'পিস কোর'-এর স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দুই বছর জীবনানন্দের নিজ শহর বরিশালে কাজ করেছি, তাঁর সম্পর্কে আমি জানতে পারি আরও পরে, শিকাগোয়, তাঁর কবিতার মাধ্যমে। আইওয়ায় লেখক কর্মশালার সতীর্থ এবং একসময়ের শিকাগো ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং লেকচারার কবি জ্যোতির্ময় দত্ত আমাকে জীবনানন্দের শব্দ ও রূপকল্পের বিস্ময়কর ভুবনের সঙ্গে পরিচিত করান।

গত দুই দশকে আরও অনেকে আমাকে আরও ভালোভাবে বাংলা সাহিত্য বুঝতে সাহায্য করেছেন, যাতে আমি জীবনানন্দের জীবনকে একটা গ্রন্থে রূপ দিতে পারি। কলকাতায় জ্যোতির শ্বশুর বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সাহিত্য ও রাজনীতি থেকে শুরু করে চায়ের দাম পর্যন্ত—বিশেষ করে এবং সব সময় কবিতা নিয়ে আলোচনায় কাটানো সন্ধ্যাগুলো ছিল দুর্মূল্য। যদিও এই জীবনীগ্রন্থের মূল চরিত্রকে ব্যক্তিগতভাবে জানার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার সুযোগ হয়েছিল তাঁর বিধবা পত্নী লাবণ্য দাশ, দুই সন্তান—মেয়ে মঞ্জুশ্রী, ছেলে সমরানন্দ—এবং ভাই অশোকানন্দ ও বোন সুচরিতার সঙ্গে সাক্ষাতের। তাঁদের সবাই বিভিন্ন উপায়ে সর্বতোভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সাহায্যের হাত।

আরও যাঁদের নাম একক ও যৌথভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তাঁরা হচ্ছেন কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিকাগো ইউনিভার্সিটির রেগেনস্টাইন লাইব্রেরির মরিন এল পি প্যাটারসন, এলিস নিসকার্ন, জেমস নাই ও উইলিয়াম আলসপাফ। কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের, বিশেষ করে এই বিভাগের প্রাক্তন প্রধান নরেশ গুহ এবং ফ্যাকাল্টি সদস্য অমিয় দেব, সুবীর রায়চৌধুরী, স্বপন মজুমদার ও শুদ্ধশীল বসুর কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী। অনুবাদের অবশ্যম্ভাবী সমস্যাগুলো এবং অন্যান্য বিষয়ে সময়োচিত পরামর্শের জন্য কাজী আবদুল মান্নান, পবিত্র সরকার ও সৌম্য চক্রবর্তীর প্রতিও জানাতে চাই কৃতজ্ঞতা। এবং আরও বহু অদৃশ্যমান সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই শিকাগো ইউনিভার্সিটির বাংলার অধ্যাপক এডওয়ার্ড সি ডিমক্ জুনিয়র ও চার্চিল কলেজ, ক্যামব্রিজের জর্জ স্টাইনারকে।

যদিও বর্ণনাতীত বহু উপায়ে অসংখ্য ব্যক্তি আমাকে সহায়তা করেছেন, কিন্তু এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা তাঁদের কাছে থাকা অনেক তথ্য দেখিয়ে দিয়ে অথবা কিছু প্রকাশিত লেখার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার গবেষণার কাজটিকে করে তুলেছেন আরও রোমাঞ্চকর ও সম্পূর্ণ। এ বিষয়ে আমি নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানাই : অরুণ ভট্টাচার্য (বিশেষ করে *উত্তরসূরী*র সর্বশেষ জীবনানন্দ সংখ্যাটির অর্ধখণ্ডিত কপিটির জন্য), স্নেহাকর ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, কল্যাণকুমার বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (বিশেষ করে হাওড়া গার্লস কলেজ ম্যাগাজিনের তাঁর ব্যক্তিগত কপিটির জন্য), অম্লান দত্ত, সত্যপ্রসন্ন দত্ত, শক্তি দেব (বিশেষ করে *ময়ূখ*, জীবনানন্দ সংখ্যার তাঁর ব্যক্তিগত কপিটির জন্য), বিষ্ণু দে, অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (বরিশালের অধিবাসী), হরপ্রসাদ মিত্র, সুনীলকুমার নন্দী (বিশেষ করে *অনুক্ত*র পুরোনো সংখ্যাগুলোর জন্য), দেবব্রত রায়, সরলানন্দ সেন, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। 'ফরেন এরিয়া ফেলোশিপ প্রোগ্রাম'-এর জন্য আমার বিশেষ ধন্যবাদ, যেটির আর্থিক সহায়তার ফলে সম্ভব হয়েছে এই গবেষণা ও বইটির প্রকাশ।

এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত আমার বেশ কয়েকটি অনুবাদ আগে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নরূপে। 'বনলতা সেন', 'ক্যাম্পে', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'ভিখিরি',

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'নীলিমা', 'ক্ষেতে প্রান্তরে'—এসব কবিতার অনুবাদ ছাপা হয়েছে *দ্য লিটারারি রিভিউতে* (ম্যাডিসন, নিউ জার্সি); 'এই কি সিন্ধুর হাওয়া', 'শিকার', 'হাওয়ার রাত' ও 'আবছায়া' ছাপা হয়েছে *প্র্যাকটিসেস অব দ্য উইন্ড*-এ (কালামাজু, মিশিগান)।

পাঠকেরা লক্ষ করে থাকবেন, আমি জীবনানন্দ দাশকে 'জীবনানন্দ' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'রবীন্দ্রনাথ' বলে উল্লেখ করেছি, যা বাংলার প্রচলিত রীতি, এটা কোনো ধরনের অসম্মান নয়। এ ছাড়া যাঁরা জীবনানন্দের নামটি নিয়ে হোঁচট খেতে পারেন, তাঁরা বিশ্বাস করুন, এ বিষয়ে আপনি একা নন। বছরের পর বছর ধরে তাঁর নামটি ছাপার অক্ষরে সবচেয়ে বেশি ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, বিশেষ করে যখন ইংরেজিতে লেখা হয়েছে। নামটির (ইংরেজি) বানানে অনেকবার *এ এন* (an) বর্ণগুলো আছে।

তাঁর সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত কবিতাটিতে জীবনানন্দ লিখেছেন :

> সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
> সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
> পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
> তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;

অকৃত্রিম ও অমায়িক এই মানুষটির তিরোধানের তিন দশকেরও বেশি সময় পর যাঁরা বাংলা জানেন না, তাঁদের জন্য আজ নিশ্চয়ই সময় এসেছে তিনি যে কবিতা এঁকেছেন সেসব 'দেখা'। অন্যভাবে উল্লেখ করা না হয়ে থাকলে এই গ্রন্থের সব অনুবাদ আমার, যেমন সব অনিচ্ছাকৃত ভুল ব্যাখ্যাও নিশ্চিতভাবে আমার।

১. এ বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। তার আগে *জীবনানন্দ* নামে গোপালচন্দ্র রায়ের লেখা একটা জীবনীগ্রন্থ বেরিয়েছিল ১৯৭১ সালে। পরে জীবনানন্দ দাশের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে *জীবনানন্দ দাশ* নামে প্রভাতকুমার দাসের লেখা উৎকৃষ্ট একটা জীবনী প্রকাশিত হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ সালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শেকড়

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত থেকে

১

দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের মানচিত্র থেকে যে একটা অদ্ভুত আকৃতি লাফিয়ে ওঠার জন্য জেগে আছে, প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে অ্যান্টার্কটিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মূল এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত না হওয়া অবধি আরও উত্তরে এগিয়ে গেছে সেটা। তারপর আমরা এখন যেটাকে হিমালয় বলে জানি, তার নিচে যেন গুঁজে দিয়েছে নিজেকে।[১] আর আকৃতিটা, একটা বাড়ানো পা, যেখানে বার্মাকে স্পর্শ করেছে সেটা বাদ দিয়ে, বর্তমান ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশকে স্নেহের উষ্ণতায় জড়িয়ে ধরেছে যেন, অন্য পা-টা এগিয়ে গেছে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। গ্রেট ব্রিটেনের এমারেল্ড দ্বীপের চেয়ে খানিকটা বড়, কিন্তু তার চেয়ে চার গুণ বেশি জনসংখ্যা (১৯৮৬ সালের হিসাবে ১০ কোটি) নিয়ে শ্যামল বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘন জনসংখ্যাবহুল একটা দেশ। এই জনসংখ্যার (বর্তমানে প্রায় ৯০ শতাংশ মুসলমান, ১০ শতাংশের চেয়ে কম হিন্দু এবং এক শতাংশ করে বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান) শতকরা ৯০ ভাগ অশহুরে, রবীন্দ্রনাথ ভালোবেসে যাকে সোনার বাংলা বলেছেন, তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এখনো গ্রামেই বসবাস করে তারা। শান্ত সুন্দর জনপদ এই বাংলাদেশ লালন করে একটা খাঁটি কবি জাতির দেহ ও সত্তা, যদিও এই বাংলাদেশিদের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে মাত্র একজন শিক্ষিত।

বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশির অবস্থান কর্কটক্রান্তি রেখার নিচে। সংগতভাবে, আধা ক্রান্তীয় দেশটির বর্ষচক্র শুরু হয় গ্রীষ্মকাল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

(এপ্রিল থেকে জুন) দিয়ে। বাংলার বেশির ভাগ অংশে ভারতের স্কিদিয় রাজা শালিবাহনের সময় থেকে (খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) বছর গণনা হয় সৌরপঞ্জিকা দিয়ে, যা সর্বশ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট আকবরের (ষোড়শ শতাব্দী) সময় কিছুটা পরিবর্তন করা হয়—ফলে, যেমন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম সাড়ে তিন মাস (জানুয়ারি থেকে মধ্য এপ্রিল) ছিল বাংলা ১৩৯৫ সন এবং পরের সাড়ে আট মাস ছিল বাংলা ১৩৯৬ সন। বাংলা বছরের বারো মাস—বৈশাখ (মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য মে), জ্যৈষ্ঠ (মে-জুন), আষাঢ় (জুন-জুলাই), শ্রাবণ (জুলাই-আগস্ট), ভাদ্র (আগস্ট-সেপ্টেম্বর), আশ্বিন (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর), কার্তিক (অক্টোবর-নভেম্বর), অগ্রহায়ণ (নভেম্বর-ডিসেম্বর), পৌষ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি), মাঘ (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি), ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) ও চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল)—প্রাচীন ভারতীয় চান্দ্রপঞ্জিকা অনুসারে ছয়টি ঋতুতে বিভক্ত—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। উৎপীড়ক গরমের কারণে গ্রীষ্ম হচ্ছে সবচেয়ে অস্বস্তির কাল। মানুষের মেজাজ থাকে চড়া। তবে গ্রীষ্মে পাওয়া যায় সবার পছন্দের ফল, আম—অনানুষ্ঠানিকভাবে বাংলার জাতীয় ফল। গ্রীষ্মের শেষে ভারত মহাসাগর থেকে উঠে ভারত ও বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে ছুটে আসে বর্ষার অগ্রদূত—মেঘ। বর্ষা এলে দূর হয় অসহ্য গরম, ধানখেতগুলো আবার ভরে যায় বৃষ্টির জলে, কমে যায় মানুষের কষ্ট।

আবহমানকাল থেকেই বর্ষাকাল কবিদের প্রিয়, এ সময় স্বামী-স্ত্রী ও প্রেমিক-প্রেমিকাদের পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকার সময়। পঞ্চম শতকের সংস্কৃত কবি কালিদাসের শতাধিক পঙ্‌ক্তির অপূর্ব কবিতা *মেঘদূত*-এ বহুদূরে নির্বাসিত আধা স্বর্গীয় যক্ষ সমাগত মেঘের কাছে মিনতি করেন, যাতে তাঁর আবেগের বাণীগুলো তাঁর প্রেমিকার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। বাংলার নিজস্ব কবি রবীন্দ্রনাথ প্রিয় এই ঋতুর ওপর তাঁর কবিতা দিয়ে বহু মানুষের চিত্ত জয় করেছেন।

বর্ষা শেষ হলে মেঘমুক্ত আকাশ হয় অসীম নীল। আনন্দোৎসবের দুই ব্যতিক্রমী ঋতু বাংলার শরৎ ও হেমন্ত। এ সময় একটা ফসল তোলা হয়, বোনা হয় আরেকটা। হিন্দু সম্প্রদায় পালন করে তাদের সর্বজনীন উৎসব দুর্গাপূজা, দেবী দুর্গার পূজা হয় এ সময়, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয় উপহারসামগ্রী (মুসলমানদের হিজরি পঞ্জিকা সৌর বর্ষচক্র থেকে দুই সপ্তাহের মতো কম চান্দ্রবর্ষের ভিত্তিতে তৈরি বলে ইসলামি ছুটিছাটাগুলো বছরের কোনো নির্দিষ্ট ঋতুর সঙ্গে সম্পর্কিত হয় না)।

শরৎ ও বসন্ত দুই ঋতুরই আবার রয়েছে কিছু সমস্যা। কারণ, এ সময়ে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি হয় এবং প্রায়ই ভারতের পূর্ব উপকূল অথবা বাংলাদেশকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যায়। ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক এমন একটা ঝড় ১৯৭০-এর নভেম্বরে আঘাত হানে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর। দুর্যোগাক্রান্তদের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের দৃশ্যমান নিরুদ্বেগ মনোভাব পূর্ব ও পশ্চিম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের মধ্যকার উত্তেজনা বৃদ্ধিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়ে বাংলাদেশকে পৌঁছে দেয় স্বাধীনতা পর্যন্ত।[২] তখন থেকে আরও ঘূর্ণিঝড় দেশটিকে আঘাত হেনেছে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় উপকূলের মতো হ্যারিকেনের আঘাতে লন্ডভন্ড হয়েও জীবনযাত্রা আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। তবুও জীবন নাশের ক্ষতি কখনোই ভোলা যায় না।

শীতকালগুলো শান্ত-শীতল ও শুষ্ক। মৃদু হাওয়ায় দোলে নারকেল, তাল আর দীর্ঘ শীর্ণ সুপারিগাছের পাতা। এই সুপারি দিয়ে লোকজন পান খায়। এখানে-সেখানে বরজগুলো দেখা যায়, এগুলোর ভেতরে পান চাষ হয়। বাঁশগাছ পাওয়া যায় সব জায়গায়। মেলে এ রকম আরও হাজারো রকমের গাছ আর লতা। বছরের এ সময়টিতে চলাফেরা সহজতর হয়। বর্ষাকালে যেসব জায়গা পানির নিচে তলিয়ে থাকে, সেখানে তখন শক্ত মাটি, যার ওপর দিয়ে লোকজন পায়ে হেঁটে, সাইকেলে অথবা গরুর গাড়িতে চলাফেরা করতে পারে। ধানের নাড়ায় সেজে থাকে শূন্য মাঠ। হেমন্তে ফসল উঠে গেলে এ সময় ঘুরে বেড়ানোর ফুরসত মেলে।

ফেব্রুয়ারির শুরুতে আসে বসন্ত, উষ্ণ হতে থাকে দিন। রস ধরার জন্য ছোট ছোট কলসি ঝুলে থাকে খেজুরগাছের পাতার নিচের গায়ে। এই রস জ্বাল দিয়ে তৈরি হয় গুড়, অথবা রস গেঁজিয়ে তাড়িও বানাতে পারে কেউ। যেকোনো দিকে তাকালেই দেখা যায় ফুলের সমারোহ আর চারদিকেই পাখি। কাদামাটি আর চেরা বাঁশের দেয়ালের ওপর শণের চাল দেওয়া গাঁয়ের বসতবাড়ি অথবা টিনের চাল আর ঢেউটিনের বেড়া কিংবা আরও সচ্ছল মানুষের পাকা ঘরগুলো ঘিরে দেখা যায় সর্বত্র সুলভ কলাগাছের জটলা। প্রত্যেক পাড়া অথবা বাড়ির সঙ্গে থাকে নিজস্ব পুকুর, এগুলোর কোনো কোনোটির আবার নামকরণও করা হয় খননকারী দানশীল ব্যক্তির নামে। বাংলা নববর্ষের কাছাকাছি এ সময়টিতে এসব পুকুরের পানির স্তরও থাকে নিচু। এ সময় সংক্ষিপ্ত অথচ প্রচণ্ড ঝড় কখনো কখনো ঘূর্ণিঝড়ের গতিতে এসে গ্রীষ্মের তাপ শুরু হওয়ার আগেই শুষ্ক মাটিকে আর্দ্র করে দিয়ে যায়। তারপর নতুনভাবে শুরু হয় বর্ষচক্র।

কেবল দীপ্তিমান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নয়, তার বাইরেও বাংলাদেশের রয়েছে কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাসসমৃদ্ধ কয়েকটা নগরকেন্দ্র। উত্তরের বগুড়া আর পূর্বের কুমিল্লা শহরে আছে যথাক্রমে মহাস্থানগড় ও লালমাই-ময়নামতি। প্রথমোক্তটা সম্ভবত মৌর্য সম্রাটদের সময়কার পুণ্ড্রবর্ধন নগরের ধ্বংসাবশেষ, বুদ্ধ বোধকরি এসেছিলেন এখানে। লালমাই ময়নামতি ছিল ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দীর সমৃদ্ধ বৌদ্ধবিহার।[৩] ঢাকার খুব কাছে বিক্রমপুর ছিল মুসলমান যুগ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রথমে বৌদ্ধ এবং পরবর্তী সময়ে হিন্দুপ্রধান ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্র, এখানে এখনো পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় শেষ দিককার রাজকীয় প্রাসাদ ও মাঠ।[৪]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় কর্ণফুলী নদীর মুখে আছে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পর্তুগিজ জলদস্যুদের কর্মকাণ্ডের ঘাঁটি বন্দর নগর চট্টগ্রাম। এরা আরাকানিদের সঙ্গে মিলে নাবি বাংলার জলপথ উজিয়ে উত্তরে খোদ ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছে যেত, সঙ্গে নিয়ে যেত লুণ্ঠনসামগ্রী আর বাঙালিদের নিয়ে যেত ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করার জন্য।[৫] উত্তর-পূর্বে সিলেট শহর ঘিরে টিলাগুলোতে এখনো বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যায় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ব্রিটেনের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চা-বাগান।[৬]

দেশটির কেন্দ্রস্থলে আছে রাজধানী শহর ঢাকা, এখানে আছে মোগলদের উত্তর-ভারতীয় বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে চেঙ্গিস খান ও তৈমুর লঙের বংশধরদের সাময়িক উপস্থিতির সাক্ষ্য হিসেবে লালবাগ দুর্গ। এখানকার রাস্তা ও বিভিন্ন পাড়ার ফার্সি নাম, যেমন—তোপখানা, পিলখানা, মাহুতটুলী মনে করিয়ে দেয় এখানে একসময় রাজত্ব করত মুসলিমরাজ ও তাদের প্রতিনিধিরা। বুড়িগঙ্গা ও অন্যান্য স্বনামখ্যাত বিভিন্ন শাখানদীর তীর থেকে বিস্তৃত মসজিদের শহর বলে খ্যাত ঢাকার, বিশেষ করে এর পুরোনো অংশের, ব্যস্ত রাস্তা ও গলির মোড়ে রয়েছে ইসলামি উপাসনালয়।

ঢাকার আধুনিক অংশটাও গর্ব করার মতো, এখানে আছে মার্কিন স্থপতি লুই কানের নকশায় নির্মিত নতুন পার্লামেন্ট ভবন (বিনিময়ে আমেরিকাও বাংলাদেশি এক স্থাপত্য প্রতিভা ফজলুর রহমান খান ও তাঁর যুগান্তকারী প্রকৌশল-ধারণার কাছে ঋণী, যার একটা উদাহরণ হচ্ছে বিশ্বের উচ্চতম ভবন শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার*)। শহরের কেন্দ্রস্থলের ঘোড়দৌড়ের মাঠকে পরিণত করা হয়েছে শিশুদের বিভিন্ন রাইড ও বিনোদনের ব্যবস্থাসহ একটা পার্কে। রাস্তার উল্টোদিকে আছে ঢাকা ক্লাব, এখন সামাজিক ক্লাব হলেও একসময় এটি ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশের দুর্গ। বাঙালি মুসলমান নারীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য কার্যকর ও অক্লান্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন যে বেগম রোকেয়া[৭] (১৮৮০-১৯৩২), তাঁর নামে ছাত্রীনিবাস 'রোকেয়া হল' পেরিয়ে দেশের প্রাচীনতম ও সবচেয়ে নামকরা স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে পড়াতেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু—যাঁর নামে নামকরণ হয়েছিল বোস-আইনস্টাইন তত্ত্বের পরিসংখ্যান প্রমাণে গৃহীত মৌলিক পদার্থ 'বোসন'-এর। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-শিক্ষকেরা মিছিল বের করেছিলেন মাতৃভাষার সপক্ষে।

পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) নিয়ে গঠিত পাকিস্তানে ছিল দুটো রাষ্ট্রভাষা—বাংলা আর উর্দু, শেষোক্তটি মূলত চালু ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, যদিও সেখানেও খুব অল্পসংখ্যক লোক মাতৃভাষা হিসেবে

* এখন আর এটি বিশ্বের উচ্চতম ভবন নয়।—অনুবাদক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উর্দুতে কথা বলত। প্রাকৃতিক ও ভাষাগতভাবে বিভক্ত দুই জাতির মধ্যে যোগাযোগের অথবা 'সরকারি' ভাষা ছিল ইংরেজি। ১৯৫২ সালের জানুয়ারির শেষভাগে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় এসে উর্দুকে দেশের উভয় অংশের রাষ্ট্রভাষা করার সরকারি সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যক্ত করেন। এর প্রতিবাদ জানান বাংলাভাষী পাকিস্তানিরা। সরকারি আদেশ অমান্য করে আয়োজিত মিছিলে ঘটে সহিংসতা, বেশ কয়েকজন বাঙালি ছাত্র নিহত হন পুলিশের গুলিতে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তিরা শহীদের মর্যাদা পান আর একুশে ফেব্রুয়ারি পরিণত হয় স্মরণ করার মতো বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনে।[৮]

রাজকীয় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি আর সুন্দরীগাছের নামাঙ্কিত সুন্দরবনের উত্তর-পূর্ব পাড়ের কীর্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত বাকেরগঞ্জের জেলাসদর বরিশাল। এটা বাংলাদেশের একমাত্র জেলাসদর, যেখানে কোনো রেললাইন নেই।* কারণ ব্রিটিশ (এবং পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি) প্রকৌশলীরা এই নদী ও খাল অধ্যুষিত পলল ভূমিতে পর্যাপ্ত শক্ত জমি খুঁজে পাননি। বরিশালের ৫০ মাইল পাখি-ওড়া উত্তরে অবস্থিত ঢাকা। ১৫০ মাইলের মতো পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী কলকাতা। সোজা ৭৫ মাইল দক্ষিণে শুরু হয়েছে বঙ্গোপসাগর। বরিশালের চারপাশের গ্রামাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছে নিচু, রসালো অর্ধক্রান্তীয় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের পর পদ্মা নামধারী গঙ্গা আসাম থেকে দক্ষিণে নেমে আসা ব্রহ্মপুত্র-যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তারপর ঢাকার পর মেঘনার সঙ্গে একীভূত হয়ে এত বিশাল এক নদীতে পরিণত হয়েছে যে কোথাও কোথাও এর অন্য তীর দিগন্তের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। আরও দক্ষিণে গিয়ে মেঘনা বিলীয়মান হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। এই শক্তিশালী নদী থেকে এঁকেবেঁকে বের হয়েছে কীর্তনখোলা। এই বঙ্গীয় ব-দ্বীপ শহর বরিশালের স্কুলশিক্ষক ও ব্রাহ্ম যাজক সত্যানন্দ দাশ ও তাঁর স্ত্রী সাময়িক কবি ও পুরোপুরি গৃহিণী কুসুমকুমারী দাশের ঘরে বাংলা ১৩০৫ সনের ফাল্গুন মাসের ৬ তারিখে (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯) জন্মগ্রহণ করেন জীবনানন্দ দাশ।

২

জীবনানন্দের ঘনিষ্ঠ পূর্বপুরুষেরা বরিশালে এসেছিলেন প্রমত্তা নামে খ্যাত পদ্মার শাখানদী কীর্তিনাশার তীরের গ্রাম বিক্রমপুর থেকে। জীবনানন্দের বাবা তাঁর নিজ পিতার প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'বিক্রমপুরে [illegible] পরিবার নিতান্ত

* পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে জেলার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বরি[illegible]শ কয়েকটি জেলা এখন রেললাইনবিহীন।—অনুবাদক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অপরিচিত নয়' (সব ধরনের সরকারি ভাষা হিসেবে ফার্সির জায়গায় ইংরেজি প্রতিস্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মোগল ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারি ভাষা হিসেবে ফার্সি ভাষায় সমৃদ্ধ লোকজনকে মুন্সি উপাধি দেওয়া হতো)। সত্যানন্দ লিখছেন, 'ইঁহারা একসময়ে সম্পন্ন অবস্থায় ছিলেন, ইঁহাদের জমিদারী ছিল। বৃদ্ধ কর্ত্তাদিগের অনবধানতায় সে জমিদারী বিলুপ্ত হয়; দস্যু এবং কীর্ত্তিনাশার অত্যাচারেও অবস্থান্তর ঘটে। যাহা হউক, চন্দ্রনাথ মুন্সী বাখরগঞ্জের সেরেস্তাদারী কর্ম্ম করিয়া সেকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমার পিতামহ, শুনিয়াছি, কিছুকাল নেমকের দারোগা ছিলেন; আমার জ্যেঠামহাশয় বাটোয়ারার আমিন এবং দাদামহাশয় জজ আদালতের আমলা, পিতৃব্য টেক্স কলেক্টর ছিলেন। তিন পুরুষকাল এই মুন্সী পরিবার বিশ্বস্ততার সহিত সরকারী কর্ম্ম করিতেছেন।'[৯]

ঠাকুরমা প্রসন্নকুমারী দাশের কাছ থেকে জীবনানন্দ শক্তিমান কীর্তিনাশা সম্পর্কে গল্প শুনেছিলেন, কীর্তিনাশা শব্দের অর্থ হচ্ছে কীর্তি ধ্বংসকারী। জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দ লিখেছেন, 'ঠাকুমা রাত্রে ঘুমোবার আগে বা রোগশয্যার পাশে বসে অনেক সময়েই আমাদের গল্প শোনাতেন। কীর্তিনাশা নদীর গল্প শুনেছি তাঁর কাছে। বিক্রমপুরের মেয়ে ছিলেন ঠাকুমা। সেখানকার বৃষ্টির দিনের গল্প, পদ্মানদীর গল্প, আমাদের পূর্বপুরুষদের গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতাম তাঁর কাছে, রোগের কষ্ট ভুলে যেতাম।'[১০] সেসব গল্পের মধ্যে ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজা ও শিল্পরসিক রাজবল্লভের নাম, যাঁর একুশ চূড়াযুক্ত প্রাসাদকে বলা হতো 'একুশ রত্ন', যার উল্লেখ আছে জীবনানন্দের কবিতায়। ১৯৩০ সালে তাঁর ঠাকুরমার মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পর তাঁর লেখা একটা সনেটের শুরু এভাবে :

> তবু তাহা ভুল জানি—রাজবল্লভের কীর্তি ভাঙে কীর্তিনাশা;
> তবুও পদ্মার রূপ একুশরত্নের চেয়ে আরো ঢের গাঢ়—[১১]

দাশদের পৈতৃক গ্রামের একই দশা হয়েছিল। জীবনানন্দের বোন সুচরিতা লেখেন, সর্বানন্দ দাশগুপ্তের বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের পদ্মাতীরের গাঁওপাড়া গ্রামে। আজ আর সে গ্রাম নেই, এটা 'কীর্তিনাশা' পদ্মার সলিলসমাধিতে চলে গেছে। কীর্তিনাশায় তাঁর বিক্রমপুরের বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার বহু আগেই জীবনানন্দের ঠাকুরদা সর্বানন্দ দাশ দক্ষিণে ঠাঁইনাড়া হয়েছিলেন।

> সর্বানন্দ কার্যোপলক্ষে এই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বরিশালে এসেছিলেন। পরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এ ধর্ম গ্রহণের পর বৈদ্যত্বের[১২] চিহ্নস্বরূপ 'গুপ্ত' কথাটাকে অপ্রয়োজনীয় বোধ করেছিলেন তিনি; তারপর থেকে আমাদের পরিবার 'দাশ পরিবার' নামে পরিচিত। দেশের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক একরকম ঘুচেই গেল, বরিশালেই স্থায়ী বসবাস সুরু হোলো।[১৩]

হিন্দু ধর্মাচার সম্পর্কে ইউরোপীয় মিশনারিদের সমালোচনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে উনিশ শতকের বিশের দশকের শেষ দিকে কলকাতায় গঠিত হয় ব্রাহ্মসমাজ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

(নির্গুণ ব্রহ্মর নামের সঙ্গে সমাজ বা গোষ্ঠী জুড়ে দিয়ে বিশেষণমূলক এই নামকরণ)।[১৪] যদিও ব্রাহ্ম মতাদর্শের বেশির ভাগ আচার হিন্দু ধর্মগ্রন্থের সূত্র সমর্থন করে, তবুও অনেক আচার আবার খ্রিষ্টধর্মের অনুরূপ। তাত্ত্বিকভাবে জাতভেদ স্বীকার করে না ব্রাহ্মরা। এর ব্যাখ্যা মেলে সর্বানন্দের দাশগুপ্ত থেকে দাশে পরিণত হওয়ায়। সমসাময়িক হিন্দুত্ববাদের বহু দেব-দেবীর পরিবর্তে ব্রাহ্মরা বিশ্বাস করে উপনিষদের একক নিরাকার ঈশ্বরে। ব্রাহ্ম বিশ্বাসে মূর্তিপূজা অশুভ হিসেবে পরিগণিত—পরবর্তী সময়ে আমরা দেখতে পাব, এই কারণে হয়তো জীবনানন্দ তাঁর প্রথম চাকরিটা হারান। ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক—যদি এ দুই ধারণাকে বাংলায় অর্থবহভাবে আদৌ আলাদা করা যায়। উনিশ শতকে সামাজিকভাবে অগ্রসর বহু সংস্কারমুক্ত মানুষ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন; ব্রাহ্মরাও বিবেচিত হতেন আধুনিক ও উদার মনের মানুষ হিসেবে (উদাহরণ হিসেবে নারীশিক্ষার প্রতি ব্রাহ্মসমাজের সমর্থনের কথা উল্লেখ করা যায়)। তবে বিংশ শতাব্দীতে আবার ব্রাহ্মদের নীতিবাগীশ বলে ভাবা হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্ম নামটির বিকৃত রূপ 'বেম্ম' বলতে বোঝায় নৈতিক বিশুদ্ধতা। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে যখন ব্রাহ্মসমাজ কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং মফস্বল (অর্থাৎ প্রধান নগরগুলোর, বিশেষ করে কলকাতার বাইরে) শহরগুলোতে তাদের শাখা বিস্তার করেছে, সে সময় এমন মানুষজনের ব্রাহ্ম হওয়ার জন্য প্রয়োজন হতো, যাঁরা সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের প্রতি সহানুভূতিশীল। ঠিক এ সময়ই সর্বানন্দ দাশ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন।

ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্তনের ফলে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার চেয়ে কম বিচ্ছেদ ঘটে হিন্দুধর্মের সঙ্গে। বহুল প্রশংসিত আধুনিক বাংলা কবিতার জনকসহ কলকাতার বহু শিক্ষিত ও নামকরা বাঙালি ধর্মান্তরিত হন। ১৮৪৩ সালে নামকরণের পর বাবার প্রবল ও সহিংস বিরোধিতার মুখেও মধুসূদন দত্ত হয়ে যান মাইকেল মধুসূদন দত্ত। খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিতদের বিপরীতে ব্রাহ্মরা একরকম হিন্দুই ছিল, প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক উভয়ই যে রকম খ্রিষ্টান। হিন্দু সম্প্রদায়ের সবাই কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের পত্তনকে প্রসন্নচিত্তে দেখেননি। সত্যানন্দ তাঁর বাবার ব্রাহ্মবিশ্বাস গ্রহণের পক্ষে লেখেন :

> পিতা যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তখন দাদা আর আমি এই দুই পুত্ত্র; পরে আর পাঁচটি পুত্ত্র ও চার কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। হিন্দু সমাজের আত্মীয়গণের সান্ত্বনার জন্য পিতা দাদাকে হিন্দু-সমাজে রাখিয়া আসেন। আমাদের হিন্দু আত্মীয়গণের কথা কি বলিব, তাঁহারা কেহই তখন ধনশালী ছিলেন না; কিন্তু আমার বাল্যকালে তাঁহাদের যে স্নেহ মমতা দেখিয়াছি, তেমন জিনিষ একালে দুষ্প্রাপ্য। শারদীয় অবকাশের সময় আমাকে তাঁহারা বাড়ী লইয়া যাইতেন; এইরূপে আমার হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান লাভ হইয়াছিল; আমার অতি শৈশবকালেই পিতা ব্রাহ্ম হন, হিন্দু-সমাজের বহু বিষয়ই আমার জানিবার অবসর হয় নাই। দাদা হিন্দু-সমাজে বহুকাল ছিলেন, হিন্দু-সমাজের আত্মীয়গণের প্রতি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> জীবিতকালে তাঁহার একটা আকর্ষণ সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইত; তাঁহার জীবনের কোন কোন বিশেষত্বের কারণ—হিন্দু সমাজে দীর্ঘকাল বাস।[১৫]

১৮৬১ সালে বরিশালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন সর্বানন্দ।[১৬] নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রতীকীভাবে হিন্দুসমাজে রাখলেও তিনি তাঁর সন্তানদের ভালো ব্রাহ্ম হিসেবে গড়ে তোলেন। এমনকি তাঁর বড় ছেলে হরিচরণও শেষ পর্যন্ত এই ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সত্যানন্দ সমাজের একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন এবং সারা জীবন তা-ই ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল মনোভাবের পাশাপাশি শিক্ষার ব্যাপারে ছিল একটা সাধারণ ভাবনা। সর্বানন্দ হরিচরণকে তখনকার বরিশালের একমাত্র বিদ্যালয় স্থানীয় জেলা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন, তারপর পাঠান কলকাতার সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম ইনস্টিটিউশন, সিটি স্কুলে। পরবর্তী সময়ে হরিচরণ ও সত্যানন্দ দুজনই কলকাতার ব্রাহ্ম মহাবিদ্যালয় সিটি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে পড়ার সময় দুই ভাই কলেরায় তাঁদের বাবার মৃত্যুর (ডিসেম্বর ১৮৮৫) খবর পেয়ে শ্রাদ্ধের জন্য বাড়ি এসে আবার ফিরে যান কলকাতায়।

> আমরা যখন কলিকাতায় ফিরিয়া গেলাম, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা অল্পকাল বাকী, দুর্ভাগ্যের বিষয় সেবার আমরা দুই ভাইয়ের কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না। এইরূপে পিতার মহাপ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে যৌবনারম্ভেই আমাদের দুজনের বিশ্ববিদ্যালয়ের আশা-ভরসা ফুরাইয়া গেল। আমার পিতা সরকারের যোগ্য কর্ম্মচারী ছিলেন; একটা সাধারণ নিয়ম আছে—এরূপ কর্ম্মচারীর সন্তান বা আত্মীয় কেহ থাকিলে, সরকার তাহাদিগকে কোন কর্ম্ম দিয়া সংসার প্রতিপালনের সাহায্য করেন; কিন্তু আমরা দু-ভাই সে সাহায্য কোন দিনও পাই নাই। কাজেই যৌবনারম্ভেই জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দাদা পোষ্টাফিসে ঢুকিলেন, আমি হবিগঞ্জে শিক্ষকতা করিতে গেলাম। ইহার পর আমাদের সংসারের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে General Post Office-এর Accountant General Office-এ প্রবেশ করিয়াছিলাম। আমাকে তখন বলা হইয়াছিল, এ আফিসে টিকিয়া থাকিতে পারিলে ৩০০/৪০০ টাকা বেতন হইবে। কিন্তু, আমরা দুই ভ্রাতা সম্পদশালী হই, কোন দিনও ঈশ্বরের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না। কাজেই দু-চার দিন থাকিয়া আমি পরীক্ষা দিতে গেলাম। ইতিপূর্ব্বেই আমি ব্রজমোহন স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলাম, দাদাও পোষ্টাফিসের কার্য্য ছাড়িয়া স্কুল আসিলেন।[১৭]

বরিশালের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৮৮৪ সালে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যার প্রাতিষ্ঠানিক নাম ছিল ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন। সত্যানন্দ সে স্কুলে শিক্ষকতা করে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন, একই সঙ্গে পারতেন ব্রাহ্মসমাজের জন্য সক্রিয় ও নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করতে।

১৮৯৪ সালে ১৯ বছরের কুসুমকুমারী দাশের বিয়ে হয় সত্যানন্দের সঙ্গে। কুসুমকুমারীর পরিবার এসেছিল কাছের গ্রাম গৈলা থেকে, যেখানে জন্ম নিয়েছিলেন বৈদ্য জাতের বহু নামকরা মানুষ। তাঁর বাবা চন্দ্রনাথ দাশ ও কালীমোহন দাশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন, কালীমোহন শেষাবধি মন্ত্রীও হয়েছিলেন। মেয়ের মতো চন্দ্রনাথও এক রকম কবি ছিলেন।[১৮]

জীবনানন্দের মা বরিশালে পড়াশোনা করেছিলেন চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত।[১৯] তিনি যে প্রতিষ্ঠানে পড়তেন, সেটি একসময় বন্ধ হয়ে গেলে কলকাতার একটা স্কুলে ভর্তি হন তিনি। স্কুলটা কিছুটা ব্রাহ্ম মনোভাবের হলেও তখনকার জমানায় একজন মফস্বলি বালিকার জন্য যথেষ্ট আধুনিক ছিল। তাঁর পুত্র লিখেছেন :

> আমার মা শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী দাশ বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতায় বেথুন স্কুলে পড়তেন। খুব সম্ভব ফার্স্ট ক্লাস অবধি পড়েছিলেন, তার পরেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। তিনি অনায়াসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় খুব ভালোই করতে পারতেন, এ বিষয়ে সন্তানদের চেয়ে তাঁর বেশি শক্তি ছিল মনে হচ্ছে।[২০]

কুসুমকুমারীর কলকাতা স্কুলের অভিভাবক এবং তখনকার ব্রাহ্মদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ১৮৯৫ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে শিশুদের মাসিক পত্রিকা *মুকুল*। আরেকজন নামকরা ব্রাহ্ম ও দাশ পরিবারের বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রী পত্রিকাটির নামমাত্র সম্পাদক হিসেবে তাঁর নামটি ব্যবহার করতে দেন। ব্রাহ্মসমাজের রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল *মুকুল*। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীসহ বাঙালি সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই পত্রিকার লেখক ছিলেন।[২১] আরও দুজন লেখক ছিলেন কুসুমকুমারী ও সত্যানন্দ, শেষোক্তজন নেপোলিয়নের ওপর একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাসনির্ভর লেখা লিখেছিলেন।[২২]

প্রথম বছরে কুসুমকুমারীর কয়েকটা কবিতা ছাপা হয় *মুকুল*-এ। এগুলোর মধ্যে 'আদর্শ ছেলে' বাঙালি শিশুদের জন্য কাব্য-সংকলনের একটি প্রধান কবিতা হয়ে দাঁড়ায়।

আদর্শ ছেলে

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
'মানুষ হইতে হবে'—এই তার পণ।

বিপদ আসিলে কাছে, হও আগুয়ান,
নাই কি শরীরে তব রক্ত মাংস প্রাণ?
হাত পা সবারি আছে, মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয়?

সে ছেলে কে চায় বল—কথায় কথায়
আসে যার চোখে জল, মাথা ঘুরে যায়?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাদা প্রাণে, হাসি মুখে কর এই পণ—
'মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন'।

কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার
সবারি রয়েছে কাজ, এ বিশ্ব মাঝার,
হাতে প্রাণে খাট সবে, শক্তি কর দান
তোমরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ।[২৩]

১৯০০ সালে সত্যানন্দ ও তাঁর ভগ্নিপতি মনমোহন চক্রবর্তী বরিশালে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশ করেন মাসিক পত্রিকা *ব্রহ্মবাদী*। এতে 'শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম এবং নীতি বিষয়ে আলোচনা হইবে, রাজনীতি নহে।'[২৪] প্রথম কয়েক বছর সত্যানন্দ নিজেই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন, পরে এ দায়িত্ব পড়ে জীবনানন্দের পিসেমশাই মনমোহনের ওপর। শিক্ষা ইত্যাদির ওপর আলোচনা ছাড়াও *ব্রহ্মবাদীর* প্রত্যেক সংখ্যার প্রথম পাতায় নিয়মিত ছাপা হতো একটা কবিতা ও 'স্থানীয় খবর'। কেবল সত্যানন্দ ও তাঁর আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে প্রকাশিত খবরের পরিমাণই দাশ পরিবারকে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের কেন্দ্রীয় ও সক্রিয় অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে। পত্রিকাটির প্রথম দিককার কবিতাগুলোর বেশ কয়েকটা মনমোহন রচিত, তবে কিছু লিখেছেন জীবনানন্দের মা। (১৮১৮ সালে মাতৃভাষা বাংলার প্রথম কাগজ *বাংলা গেজেট* প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে সাময়িকী ও বই প্রকাশের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, প্রায়ই নিজেদের ও বন্ধুবান্ধবের লেখা নিয়ে প্রকাশ করা হতো অনিয়মিত কখনো বা স্বল্পজীবী লিটল ম্যাগাজিন)।[২৫]

১৯০১ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাংলা থেকে এলাহাবাদ বদলি হয়ে গেলে সেখান থেকে আরেকটা কাগজ তিনি বের করেন, এটি ছিল বাঙালিদের সবচেয়ে সম্মানজনক পত্রিকা *প্রবাসী*। এটিতেও কুসুমকুমারীর অল্প কয়েকটা কবিতা প্রকাশিত হয়। সবচেয়ে বেশি কবিতা, সব মিলিয়ে শ-খানেক ছাপা হয় *ব্রহ্মবাদী*তে। এমনকি একসময় তিনি শিশুতোষ কবিতার বইও বের করেন *কবিতা মুকুল* নামে। তারপর প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ থেকে গল্প নিয়ে বের করেন *পৌরাণিক আখ্যায়িকা*।[২৬]

মাকে জীবনানন্দ দেখেছেন ঘরের টুকিটাকি কাজের ফাঁকে, এমনকি কোনো কাজের মাঝখানেও, কবিতা লিখতে :

> পঁচিশ ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে আমাদের বরিশালের বাড়িতে পরিবারের লোকসংখ্যা অনেক ছিল। জেঠিমা ও মাকে সারাদিন গৃহস্থালীর কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। তখনকার দিনে পরিবারের অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। কিন্তু জেঠিমা ও মার অক্লান্ত কাজকর্মে এবং ওপরে ঠাকুরমার তদারকে কত বিরোধী অস্বভাবী অবস্থার ভিতর দিয়ে কিরকম সহিষ্ণু নিরলস ও সার্থকভাবে সংসারের কাজ সম্পন্ন হত সেকথা ভাবলে আজ আশ্চর্য হয়ে থাকতে হয়।...
>
> মা বেশি লেখবার সুযোগ পেলেন না। খুব বড় সংসারের ভেতরে এসে পড়েছিলেন যেখানে শিক্ষা ও শিক্ষিতদের আবহ ছিল বটে, কিন্তু দিনরাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> অবিশ্রান্ত কাজের ফাঁকে সময় করে লেখা—তখনকার দিনের সেই অসচ্ছল সংসারের একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত সম্ভব হয়ে উঠল না আর। কবিতা লেখার চেয়ে কাজ ও সেবার সর্ব্বাত্মকতার ভেতরে ডুবে গিয়ে তিনি ভালোই করেছেন হয়তো। তাঁর কাজকর্মের আশ্চর্য্য নিষ্ঠা দেখে সেইকথা মনে হলেও ভেতরের খবর বুঝতে পারিনি, কিন্তু তিনি আরো লিখলে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কিছু দিয়ে যেতে পারতেন মনে হয়।
>
> মার কবিতায় আশ্চর্য্য প্রসাদগুণ! অনেক সময়ে বেশ ভালো কবিতা বা গদ্য রচনা করছেন দেখতে পেতাম। সংসারের নানা কাজকর্মে খুবই ব্যস্ত আছেন এমন সময়ে ব্রহ্মবাদীর সম্পাদক আচার্য্য মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এসে বললেন এক্ষুনি *ব্রহ্মবাদীর* জন্য তোমার কবিতা চাই, প্রেসে পাঠাতে হয়। লোকে দাঁড়িয়ে আছে। শুনে মা খাতা কলম নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে একহাতে খুন্তি আর একহাতে কলম নাড়ছেন দেখা যেত, যেন চিঠি লিখছেন, বড়ো একটি ঠেকছে না কোথাও; আচার্য্য চক্রবর্ত্তীকে প্রায় তখনই কবিতা দিয়ে দিলেন।[২৭]

পুত্রের জীবন রক্ষার কৃতিত্বও জীবনানন্দের মায়ের। ভাই অশোকানন্দ ও বোন সুচরিতার জন্মের আগে জীবনানন্দ যখন খুব ছোট, তখন এক ধরনের যকৃতের রোগ হয়েছিল তাঁর।[২৮] অশোকানন্দ যে রকম জানান, তখনকার দিনে ডাক্তাররা রোগ সারানোর জন্য হাওয়া পরিবর্তনের উপদেশ দিতেন। সুচরিতা লিখেছেন :

> শৈশবে কঠিন পীড়ায় দাদাকে আক্রান্ত হতে হয়েছিল একবার—বাঁচবার আশা ছিল না। মা আর দাদামশায় তাঁকে নিয়ে ঘুরলেন কত স্বাস্থ্যনিবাসে, কত বিভিন্ন জলবায়ুর জনপদে—লখ্‌নউ, আগ্রা, দিল্লী। সেদিন আমাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল না; পুরোনো চিঠিপত্র থেকে জানতে পারি মা'র এই প্রচেষ্টাকে পরিবার-পরিজন সকলেই আত্মঘাতী বলে মনে করেছিলেন। তবু বিচলিত হন নি মা। পশ্চিমে দীর্ঘদিন কাটিয়ে সেই শিশুকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তিনি ফিরে এসেছিলেন।[২৯]

অশোকানন্দ উল্লেখ করেছেন, তাঁর ভাই কিছুটা মেজাজি ছিলেন, যা কখনো কখনো উসকে উঠত, এটার সঙ্গে বোধহয় তাঁর ছেলেবেলার অসুখটার সম্পর্ক ছিল।[৩০]

জীবনানন্দ প্রথম যখন নিয়মিত স্কুলে যাওয়া শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় নয় বছর। তবে তারও অনেক আগে থেকেই ঘরে পড়াশোনা শুরু হয়েছিল তাঁর। অশোকানন্দ তাঁর ভাই ও নিজের সম্পর্কে লিখেছেন, 'বাবা কমবয়সে ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করার বিরোধী ছিলেন। ছোটবেলায় আমরা মায়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছি।'[৩১] তারপর ১৯০৮ সালে নিজে যে স্কুলে পড়াতেন, সেই বিএম ইনস্টিটিউশনই নিজের বড় ছেলেকে ভর্তি করানোর উপযুক্ত মনে করেন সত্যানন্দ।[৩২]

বিএম ইনস্টিটিউশনের ভাগ্যে কিছুটা খারাপ সময়ের যোগ ছিল। ১৯২১ সালে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও সরকারের মধ্যে বিরোধ বাধলে প্রতিষ্ঠানটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দৃশ্যত স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক সত্যানন্দকে ইস্তফা দিতে হয়। এর আগে ১৯১৯ সালের বসন্তে পশ্চিম ভারতীয় পাঞ্জাব প্রদেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জেনারেল ডায়ার অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামে এক ঘেরা দেওয়া চত্বরে সমবেত ১০ থেকে ২০ হাজার লোকের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিলে কয়েক শ লোকের প্রাণহানি ঘটে, আহত হয় এক হাজারের ওপর। এই বর্বরতার প্রতিবাদে ১৯১৫ সালে রাজা পঞ্চম জর্জের জন্মদিন উপলক্ষে দেওয়া 'নাইট' খেতাব ফিরিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ, ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের কাছে এই ঘোষণাসংবলিত এক চিঠিতে তিনি লেখেন, 'I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who for their so-called insignificance are liable to suffer a degradation not fit for human beings'।[৩৩] ('আমি আমার পক্ষ থেকে সব ধরনের পার্থক্য ঝেড়ে ফেলে আমাদের সেই সব দেশবাসীর পক্ষে দাঁড়াতে চাই, যারা তাদের কথিত তুচ্ছতার কারণে মানুষের যোগ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়'।)

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বিনা জুরিতে বিচার করা ও বিনা বিচারে আটক রাখার নতুন আইনের কারণে হতাশ এবং অমৃতসরে গণহত্যা চালানোর পরও ডায়ারের প্রতি কেবল মৃদু তিরস্কারে আহত মহাত্মা গান্ধী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে (অবশ্য ১৯২০ সালে Sevres চুক্তির মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্কের ওপর কঠোর শর্ত আরোপ করায় শেষোক্তদের মোহভঙ্গ ঘটেছিল) অঙ্কুরিত জাতীয় ঐক্যের সম্ভাবনা দেখে আর কখনোই ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য ওকালতি করেননি।[৩৪] ১৯২০ সালে গান্ধী ও বাংলার জনপ্রিয় নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু)—যাঁর উচ্চপ্রশংসা করে জীবনানন্দ প্রথম দিকে ('দেশবন্ধুর প্রয়াণে' নামে) একটা কবিতা লিখেছিলেন—সব সরকারি স্কুল ও কলেজ থেকে বের হয়ে দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ 'জাতীয়' অনৌপনিবেশিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য নব উদ্যমে আহ্বান জানান।[৩৫]

দেড় দশক আগে অশ্বিনীকুমার জাতীয় শিক্ষার ওপর খোলাখুলিভাবে তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন।[৩৬] ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের (বাঙালিদের রাজনৈতিক শক্তি দুর্বল করার প্রচেষ্টা হিসেবে যা সব বাঙালি হিন্দু ও বহু মুসলমান কর্তৃক নিন্দিত) পরের বছর অশ্বিনীকুমার সংবর্ধনা কমিটির সভাপতি হিসেবে একমাত্র সর্বভারতীয় রাজনৈতিক শক্তি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাদেশিক সম্মেলনে (মুসলমান ব্যারিস্টার আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে) বক্তৃতা করেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিরা, এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একই সময়ে সংঘটিত এক সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে ১৯০৬ সালে বরিশালের এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। ভারতীয়দের আত্মবিশ্বাসী হতে এবং আমদানিকৃত ব্রিটিশ পণ্যের পরিবর্তে ভারতীয় পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য কয়েক বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল 'স্বদেশী' আন্দোলন। অশ্বিনীকুমারের ভাষণটা অন্য একজনকে দিয়ে দেওয়ানো হয়। কারণ তিনি প্রধান সরকারি কর্মকর্তা বাকেরগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত কাজে ব্যস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছিলেন। প্রথম দিন সকালে সভায় যাওয়ার পথে অশ্বিনীকুমারের কাছ থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদায় করা আগাম নিশ্চয়তা অমান্য করে বেশ কিছু অংশগ্রহণকারী পরাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম' গেয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের বাসায় মিছিল নিয়ে যাওয়া মনস্থ করেন। লাঠিধারী পুলিশ মিছিলকারীদের ওপর হামলা করে, কিছু রক্তপাতও হয়েছিল।[৩৭]

ইংরেজিতে লেখা স্বাগত ভাষণে অশ্বিনীকুমার 'বঙ্গভঙ্গের সেই অন্ধকার দিন'কে নিন্দা জানান, যেদিন ব্রিটিশ তরবারি 'তাদের মাকে নির্দয়ভাবে আচমকা আঘাত' করেছে।[৩৮] শিক্ষা বিষয়ে তিনি ঘোষণা করেন :

> আমাদের জীবনের আদর্শ ও মান পশ্চিমী জাতির মত নয়, যে আইন ও আচার প্রাচ্য চরিত্রকে চালিত করে তা পাশ্চাত্যের চেয়ে ভিন্ন, প্রাচ্যের মানসিক গঠন পাশ্চাত্যের চেয়ে আলাদা, বর্তমানের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এসব বিবেচনা করে বলে মনে হয় না। আমাদের সন্তানেরা কি ভারতীয় ভাবনা, ভারতীয় ইতিহাস, ভারতীয় রীতিনীতি সম্পর্কে শিক্ষা পাচ্ছে? আমাদের শিক্ষার ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের পক্ষে সময়ের পাতলা আবরণের নিচে পড়ে থাকা প্রাচীন কালের হিন্দু ঋষি এবং মুসলমান পয়গম্বরদের রেখে যাওয়া মূল্যবান সত্যের সঙ্গে গ্রথিত আমাদের জাতির আত্মাভ্যন্তরে ডুব দেওয়া রীতিমত অসম্ভব।[৩৯]

জাতীয় শিক্ষার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন :

> হাজার হাজার মানুষকে স্বদেশী মন্ত্র নিতে হবে যাতে আমাদের শিল্পোন্নয়নের পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গোঁড়ামি এবং আলস্যের দুর্গ চুরমার করে ফেলা যায়, যাতে বেশ কিছু মাঝারি আকারের শিল্প ও টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করা নিশ্চিত করা যায়, যার শীর্ষে থাকবে একটা আদর্শ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট...।[৪০]

১৯০৬ সালের আগে সাত বছরের বালক জীবনানন্দ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হননি।

ব্রহ্মবাদীর জানুয়ারি ১৯২১ সংখ্যা স্থানীয় ছাত্রদের এক আন্দোলনের উল্লেখ করে রিপোর্ট করে যে, বিএম ইনস্টিটিউশনের পুরোনো হোস্টেলে একটা জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানে প্রায় আড়াই শ ছাত্র জমায়েত হয়েছিল এবং অন্যান্য বহু ধরনের ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সময় ও শ্রম দেন।[৪১] একই বছরের ফেব্রুয়ারি, মার্চ সংখ্যা জানায়, বিএম ইনস্টিটিউশন বাদে অন্যান্য স্কুলের বহু ছাত্র স্কুল বয়কট করেছে কিংবা ছেড়ে দিচ্ছে, তবে আবার ফিরেও আসছে। চারজন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাকেন্দ্র ত্যাগ করে তাদের অসহযোগ প্রদর্শন করে।[৪২] তারপর এপ্রিল ১৯২১ সংখ্যায় খবর পরিবেশন করা হয়, অশ্বিনীকুমার বিএম ইনস্টিটিউশনকে জাতীয় বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেছেন।[৪৩] জাতীয় শিক্ষার দাবি নতুন করে সুস্পষ্টভাবে উত্থাপনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা, বিশেষ করে টেকনিক্যাল ও চিকিৎসাবিদ্যা। এ রকম একটি আইন অমান্যকারী কাণ্ডের ফলে প্রতিষ্ঠানটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যথেষ্ট ক্ষতিভোগ করে। শিক্ষকমণ্ডলীর একটা অংশ পদত্যাগ করে ও ছাত্র ভর্তি আকস্মিকভাবে কমে যায়।

১৯২১ সালে জাতীয় বিদ্যালয় যখন এক পুনর্গঠনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি উচ্চবিদ্যালয় মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সত্যানন্দ বিএম ইনস্টিটিউশন ছেড়ে যান।[৪৪] জাতীয় বিদ্যালয়ের বিপরীতে বরিশালের মডেল স্কুল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করেছিল।[৪৫] কোন আদর্শিক কারণে সত্যানন্দ বিএম স্কুল ত্যাগ করেছেন, তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তিনি বিএম ইনস্টিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষকের চেয়ে এক ধাপ ওপরে প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য আগ্রহী হয়ে থাকতে পারেন। তবে জীবনানন্দের একটা বক্তব্য নির্দেশ করে যে আগ্রহী হয়ে তিনি দীর্ঘদিন সেখানে শিক্ষকতা করেছেন। আদর্শই সেখান থেকে প্রকৃতপক্ষে পদত্যাঁগের প্রেরণা দিয়েছিল সত্যানন্দকে।

> বিদেশের আগে নিজের দেশের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক দুরবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও তিনি প্রচলিত nationalism ও স্বদেশপ্রীতির পার্থক্য অনুভব করতেন। তথাকথিত nationalismকে সন্দেহের চোখে দেখলেও দেশাত্মবোধ তাঁর কাছে গৌরবের জিনিষ ছিল। রাষ্ট্রিক আন্দোলনে তিনি নিবেদন বা ভিক্ষামানসিকতার পক্ষপাতী ছিলেন না; জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে একটা বিভেদ রয়ে গেছে, তা না ঘোচালে অল্প-স্বল্প বা রাষ্ট্রিক পরিবর্তনেও যে কোন দেশেরই স্থায়ী মঙ্গল হবে না, এ সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। তবে আধুনিক কালে সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রণালীর আমূল পরিবর্তনের যে একটা উদ্যম দেখা যাচ্ছে—প্রাচীন এমন কি উনিশ শতকের চিন্তাধারাকেও প্রায় সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করে দিয়ে, সে সম্বন্ধে তিনি অভিনিবিষ্ট থাকলেও তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, শুধু নিত্য নূতন মতামত এমন কি নির্মোহ চিন্তাপ্রসূত কর্মসূচির প্রয়োগেও পৃথিবীর মঙ্গল অসম্ভব—যে পর্যন্ত না মানুষের অন্তরের অঙ্গহানি ঘোচান যায়। জোর দিয়েছিলেন তিনি চরিত্র ও চেতনাশুদ্ধির উপর—সকল দেশের, সকল মানুষের। তাঁর বিশ্বাস ছিল এই যে, এ জিনিষ নির্মলভাবে সম্পন্ন না হলে আধুনিক বা আগামী কালেরও যে কোন আপাত-সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা দুদিনের জিনিষ হবে মাত্র; তার নিজের মধ্যে নিহিত ক্ষয়িষ্ণুতার বীজ তাকে আবার ধ্বংস করে ফেলবে। কিন্তু এসব বিষয়ে নিজের কাছে তাঁর নিজের ভাবনা চেতনা সুসঙ্গত মনে হলেও তিনি অপরের মতবাদে পরিবর্তনের প্রবহমান প্রাণশক্তির সাড়া পেলে তাকে শ্রদ্ধা করতেন।[৪৬]

তথাকথিত জাতীয়তাবাদকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা সত্যানন্দ কিন্তু বিএম ইনস্টিটিশন ছেড়ে যাওয়া একক ব্যক্তি ছিলেন না, সেই একই বছর প্রধান শিক্ষক জগদীশ মুখার্জিও তাঁর পদ ছেড়ে দেন।[৪৭] বরিশাল পরিস্থিতি জাতীয় শিক্ষা নিয়ে গবেষণার প্রতি সাধারণ ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার চেয়ে লক্ষণীয় রকম ভিন্ন কিছু ছিল না। একজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ লেখেন, 'যদিও অনেক কর্মকর্তা পদত্যাগ করেননি বা পদ ছেড়ে দেননি, স্কুল কলেজগুলোতে কিছু সময়ের জন্য ভাঙন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধরেছিল, তবে "জাতীয়" প্রতিষ্ঠানগুলোর হয় দৈন্যদশা।'[৪৮] শুধু অশ্বিনীকুমারের বলিষ্ঠ পরিচালনার কারণে জাতীয় বিদ্যালয় হিসেবে বিএম ইনস্টিটিউশন বাকি সবগুলোর চেয়ে আরও দীর্ঘদিন চালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু ১৯২৩ সালের শেষ দিকে এই দেশপ্রেমিক ও শিক্ষানুরাগী কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। নিজ স্বার্থেই জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম পরিত্যাগ করার জন্য বিএম ইনস্টিটিউশনকে বাধ্য হতে বছরাধিক সময় কেটে যায়। বিএম ইনস্টিটিউশনের ৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের স্মারক প্রকাশনা *জুবিলী* অনুসারে নতুন নিরীক্ষা চার বছর ধরে চলে। সাধারণ শ্রেণীতে ছাত্রের সংখ্যা কমতে কমতে ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে ৬৭-তে এসে দাঁড়ায়। জগদীশ বাবু ও বর্তমান উদ্যোক্তারা সযত্ন আলোচনা এবং শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিষ্ঠানটিকে পুনর্গঠিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আগের ধারায় ফিরিয়ে নিয়ে যান। আর্থিক কারণে বন্ধ করে দিতে হয় প্রযুক্তি শাখা। তবে মেডিকেল বিভাগ টিকে থাকে ভালোভাবে।[৪৯]

সত্যানন্দ আর কখনো বিএম ইনস্টিটিউশনের শিক্ষকমণ্ডলীতে যোগ দেননি, তবে কয়েক বছর পর মডেল স্কুল অন্য একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একীভূত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ চালিয়ে যান।[৫০] ১৯২৭ সালে তিনি স্থানীয় ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।[৫১] শ্রেণীকক্ষে তিনি যখন পড়াতেন না, তখনো শিক্ষা ও ধর্মোপদেশ দিতেন তিনি, লিখতেন ও শিক্ষা বিষয়ে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত দিতেন। *ব্রহ্মবাদী*তে তাঁর প্রবন্ধ 'শিক্ষাদানে মারিয়া মন্টেসরির পদ্ধতি'তে আমরা এমনটিই দেখতে পাই।[৫২]

বিএম ইনস্টিটিউশন জাতীয় বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার বহু আগেই জীবনানন্দ এখান থেকে তাঁর পড়াশোনা শেষ করেন। ১৯১৪ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসতে পারতেন। তবে নিয়ম ছিল, যে বছর তিনি পরীক্ষা দিতে চান, সে বছরের পয়লা মার্চ তাঁর বয়স ১৬ বছর হতে হবে। ফলে তাঁকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা (এভাবেই বলা হতো) দিয়ে পাস করার জন্য আরও এক বছর অপেক্ষা করতে হয়। জীবনানন্দ বিএম ইনস্টিটিউশনে পড়ার সময় হেড মাস্টার জগদীশ মুখার্জি এই তরুণ শিক্ষার্থীর মনে এক গভীর ছাপ ফেলেছিলেন। বহু বছর পর জীবনানন্দ লেখেন :

> ইয়ুনিভারসিটি থেকে পাশ করে বেরিয়েছি অনেক-দিন হতে চলল। কিন্তু কার কাছে শিক্ষা পেয়েছিলাম আমরা? আমি অন্ততঃ তিনজন মানুষের কাছে। একজন বাবা, একজন মা, আর একজন ব্রজমোহন স্কুলের হেডমাষ্টার আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বরিশাল স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে অনেক বড় বড় কলেজে পড়েছি, য়ুনিভারসিটিতে পড়েছি; কিন্তু আজ জীবনের মাঝামাঝি এসে প্রতিনিয়তই টের পাচ্ছি যে আমার জীবনের শিক্ষার ভিত্তি এঁদের হাতে গড়া।[৫৩]

ম্যাট্রিক পাসের পর একই আদ্যক্ষরের স্কুলটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিএম কলেজে পড়াশোনা করেন জীবনানন্দ। আইএ অর্থাৎ উচ্চমাধ্যমিক কলা পর্যায়ে তিনটি বিষয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

বাছাই করে নিতে পারে ছাত্ররা। জীবনানন্দের ছিল ইংরেজি, বাংলা ও এত কিছু থাকতে রসায়ন।[৫৪] ১৯১৭ সালে আইএ পাস করেন তিনি, তারপর কলকাতায় চলে যান। সেখানে ব্রাহ্মদের সিটি কলেজ নয়, বরং এখনকার মতো তখনো বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে ইংরেজিতে বিএ পড়ার সময় তিনি থাকতেন অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে। ইংল্যান্ডের এই চার্চ মিশনটির শাখা ছিল বরিশালে, যার কারণে কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় বরিশালের বহু ছাত্র এই বিশেষ হোস্টেলটিতে থাকত।[৫৫] এ ছাড়াও মিশনের প্রকাশনার জন্য সত্যানন্দ কিছু ধর্মীয় পুস্তক বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছিলেন, যেমন—বিভিন্ন সন্তদের জীবনী। আর বরিশালের মিশনারিদের বাংলা শিক্ষা দিতেন এই সদা-শিক্ষক।[৫৬]

১৯১৯ সালে জীবনানন্দ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। সব ছাত্র যে শ্রেণীর জন্য চেষ্টা করে, সেই ঈর্ষণীয় প্রথম শ্রেণী তিনি পাননি। প্রয়াত সর্বানন্দের পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীদের এমএ, বিএসসি ও বিএ পরীক্ষায় পাস করার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এক বিশেষ ব্রাহ্ম 'ধ্যানানুষ্ঠান' সংঘটিত হয়েছিল দাশ পরিবারের বাড়ি সর্বানন্দ ভবনে।[৫৭]

জীবনানন্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তিত ব্রিটিশ উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার অধীনে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে যান।[৫৮] একই সঙ্গে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজেও ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯১৯ থেকে ১৯২২ এই তিন বছরের রেজিস্টারে তাঁর নামও ছিল,[৫৯] কিন্তু আইন পরীক্ষায় কখনোই অবতীর্ণ হননি তিনি। ১৯২২ সালে আবারও দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়ে তিনি ইংরেজিতে এমএ পাস করেন।[৬০] পরীক্ষার অল্প কিছু দিন আগে এক সাময়িক অসুস্থতাকে তাঁর ভাইয়ের খারাপ ফলাফলের কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন সুচরিতা। জীবনানন্দ আরও এক বছর অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁর প্রথম শ্রেণী নিশ্চিত হয়। কিন্তু তাঁদের বাবা এক বছর সময় নষ্ট না করার উপদেশ দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং হতাশাজনকভাবে আবারও একটা দ্বিতীয় শ্রেণী লাভ করেন।[৬১] বহু পরে যখন তিনি কলকাতায় একটা শিক্ষকতা খুঁজছিলেন, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর এমএ তাঁকে তাড়া করে বেড়াতে শুরু করে।

কেউ অবাক হয়ে ভাবতে পারেন, তখনকার তাঁর সতীর্থ কবিদের মতো জীবনানন্দ কেন ইংরেজি সাহিত্য পড়াশোনা করলেন, বাংলায় নয় কেন? আসলে তাঁর কোনো বিকল্প ছিল না। মাতৃভাষায় এমএ ডিগ্রি নেওয়া সম্ভব হয় ১৯২০ সাল থেকে,[৬২] তত দিনে জীবনানন্দ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে আনুষ্ঠানিক পড়াশোনায় ব্রতী হয়ে পড়েছেন। ১৯১৯ সালে কলেজছাত্র জীবনানন্দ তাঁর নিজস্ব শহরের পরিবারচালিত পত্রিকা *ব্রহ্মবাদী*তে সকুণ্ঠভাবে একটা কবিতা প্রকাশ করেন, যেটি হতে পারে সাধারণ্যে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা। চার বছর আগে বরিশালে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

থাকতে তাঁর কিছু অপ্রকাশিত কাব্যপ্রয়াসের নমুনা তিনি পাঠিয়েছিলেন বাংলা কাব্যের চূড়ান্ত বিচারক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। তিনি কোন কোন কবিতা মূল্যায়নের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তা জানা যায়নি, তবে জ্যেষ্ঠ এই কবির জবাবটা সংরক্ষিত ছিল, যা এ রকম :

> কল্যাণীয়েষু,
>
> তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।—কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে।
>
> বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উলটো। ইতি
>
> ২২ অগ্রহায়ণ ১৩২২
> শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৬৩]

চার বছর পর জীবনানন্দের প্রথম কবিতা যখন সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়, তাঁর কুণ্ঠা বোঝা যায় কবির নাম থেকে, পুরো নামের পরিবর্তে সেখানে ছিল একটা আংশিক নাম 'শ্রী' (*ব্রহ্মবাদী*র সে বছরের বার্ষিক সূচিতে জীবনানন্দ দাশ বিএ হিসেবে কবিকে আরও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে)। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর কবিতাগুলো তাঁর মায়ের কবিতার বিপরীত বলে দাবি করতেন।

> সে সব কবিতার শাদা ঝর্ঝরে শব্দনিক্কণ ও আশ্চর্য্য অর্থসঙ্গতি বরাবরই আমাকে প্রলুব্ধ ক'রেছে; কিন্তু তবুও আমি প্রথম থেকেই অন্য পথ ধরে চলেছি।[৬৪]

কিন্তু তাঁর প্রথম রচনায় এই দাবির ব্যতিক্রম প্রমাণিত হয়। তাঁর এই পয়ার এবং দৃঢ়ব্যক্ত পদ্য যে কেবল তাঁর মায়ের শিল্পকর্মের অনুকরণ তা নয়, কবিতাটির বিষয়, নববর্ষের প্রতি সমিনতি আহ্বান তাঁর মায়ের কাব্যসংগ্রহে লক্ষণীয়ভাবে মূর্ত। জীবনানন্দের 'বর্ষ-আবাহন' *ব্রহ্মবাদী* বৈশাখ ১৩২৬ সংখ্যার প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল।

আগের তিন বছরের প্রথম দিককার কবিতাগুলো তাঁর মায়ের অবদান : বৈশাখ ১৩২৩ 'বর্ষ আশা'; বৈশাখ ১৩২৪ 'নববর্ষ', বৈশাখ ১৩২৫ 'নববর্ষ'। পরবর্তী বছর পুত্রের জন্য মুলতবি রেখে, কুসুমকুমারী ফিরে আসেন বৈশাখ ১৩২৭ সংখ্যায় 'বর্ষ কামনা' নিয়ে। জীবনানন্দের লেখাটা ছিল সংক্ষিপ্ত ও মিষ্টি।

বর্ষ-আবাহন

ওইযে পূর্ব্ব তোরণ-আগে,
দীপ্ত-নীলে, শুভ্র রাগে
প্রভাত রবি উঠল জেগে
　　দিব্য পরশ পেয়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাই গগনে মেঘের ছায়া
যেন স্বচ্ছ স্বর্গকায়া!
ভুবনভরা মুক্ত মায়া
মুগ্ধ-হৃদয় চেয়ে।

অতীত নিশি গেছে চলে,
চির-বিদায়-বার্ত্তা ব'লে,
কোন্-আঁধারের গভীর তলে
রেখে স্মৃতি-লেখা।

এস এস ওগো নবীন,
চলে গেছে জীর্ণ মলিন
আজকে তুমি মৃত্যুবিহীন
মুক্ত-সীমা-রেখা।

শ্রী...[৬৫]

জীবনানন্দের প্রথম প্রকাশিত কবিতাটিতে যথেষ্ট মাতৃপ্রভাব লক্ষ করা যায়। যদিও তিনি সেদিকে বেশি দিন আর এগোননি।

জীবনানন্দ নিজেকে তাঁর স্মৃতিকথায় ব্যক্ত করেছেন, তাঁর মা-বাবা দুজনেরই ইংরেজি ও ভারতীয় সাহিত্য ভালো পড়া ছিল।[৬৬] সাহিত্য পাঠ ও রচনা ছিল দাশপরিবারের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বরিশালের বিভিন্ন স্কুলে তাঁর বাবা যা করেছেন, সেই শিক্ষকতাও ছিল সঙ্গে, খুব বেশি কাঠামোভিত্তিক না হলেও ঘরে এবং ব্রাহ্মসমাজে মা-বাবা দুজনই ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদানের কাজটাও করেছেন। তাঁর শিক্ষক বাবা ও কবি মায়ের মতো জীবনানন্দ তাঁর বাকি জীবনটা শিক্ষকতা করে বা শিক্ষকতার চাকরি খুঁজে এবং গদ্য ও কবিতা দুটোই লেখালেখি করে কাটিয়েছেন।

৩

সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সংগত কারণে জীবনানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক অত্যন্ত গর্বিত সংস্কৃতির ভেতর। বাংলা কবিতার ইতিহাস (কবিতা ও সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সমার্থক ছিল, পরে সাহিত্যের খাতিরে গদ্য আবির্ভূত হয়) শুরু হয় সম্ভবত একাদশ খ্রিষ্টাব্দ থেকে, হতে পারে অষ্টম শতাব্দী থেকে। বাংলার নিদর্শনস্বরূপ আমাদের হাতে আছে গোটা পঞ্চাশেক গীতিকবিতার এক শিরোনামহীন সংকলন, *চর্যাপদ*, যাকে বাংলা কবিতার প্রাচীনতম নমুনা হিসেবে অনেকেই বিশ্বাস করেন। অবশ্য এগুলোতে বাংলা প্রায় অদৃশ্যমান (হিন্দি পণ্ডিতেরা দাবি করেন, ভাষাটা হিন্দির একটা কথ্য ভাষা মৈথিলির অনুরূপ। অসমীয়রা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, এটা প্রাচীন অসমীয়া; ওড়িশিরা মনে করে, এটা উড়িয়া)।[৬৭] গুপ্ত সংকেতগুলো উদ্ধার করতে পারে, এমন আগ্রহীদের কবিতাগুলো তান্ত্রিক বৌদ্ধবাদের আসল বিশ্বাস ও কর্মধারা শিক্ষা দেয়। ভাষাটা হতে পারে একাদশ শতাব্দীর। এ শতাব্দীর* প্রথম দিকে নেপালের রাজদরবারের লাইব্রেরিতে প্রখ্যাত বাঙালি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক পাওয়া এই পাণ্ডুলিপিটা সম্ভবত ষোড়শ শতকের কিংবা আরও আগের। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় সব পুঁথিই এ রকম : থাকলেও দু-একটা থাকতে পারে পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর আগের। গরম ও বর্ষাকালের আর্দ্র আবহাওয়া, উইপোকা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত তালপাতার পুঁথি আর পাণ্ডুলিপি লেখা অন্য সব কাগজ নষ্ট হয়ে যেত। মানুষের জানামতে, প্রাচীনতম কিছু পুঁথি ভারতের প্রাচীন সভ্যতায় সৃষ্টি হলেও সেসবের ভাষ্য একজনের স্মৃতি থেকে আরেকজনের কাছে হস্তান্তর করতে হয়েছে, অথবা লেখা থাকলে সেগুলোর একটা থেকে আরেকটা লিখে নিতে হয়েছে। কারণ পুরোনোগুলো নষ্ট হয়ে যেত।

মূলত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সবই, বিশেষ করে হিন্দু কবিদেরগুলো, কোনো না কোনোভাবে ধর্মীয়। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* সাহিত্যের একটা প্রাচীন (অনুমিত সময় চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত)[৬৮] ও উল্লেখযোগ্য কাজ, যা ভগবান বিষ্ণুর মূর্তরূপ রাখালবালক ও প্রেমিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রঙ্গকৌতুক ও কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাসংবলিত বিভাজনযোগ্য এক ধরনের গীতিকবিতার সংকলন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় চৈতন্য নামের একজনের জন্ম হয়, ইনি কৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত, যাঁকে তাঁর অনুসারীরা কৃষ্ণ এবং তাঁর প্রিয় গোয়ালিনী ও প্রেমিকা রাধার দেহধারী বলে মনে করেন। চৈতন্যকে ঘিরে বাঙালি বৈষ্ণববাদ এখন পর্যন্ত টিকে আছে। ভারতের বাইরেও—যেমন যুক্তরাষ্ট্রে—যেখানেই সাধারণ্যে শুনতে পাওয়া যায় 'হরে কৃষ্ণ' কীর্তন, সেখানেই এ ধর্মের দেখা মেলে।

মার্কিন ধর্মান্তরিতরা যা-ই করুন, চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈষ্ণব কবিরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কিছু ভক্তিমূলক গীত রচনা করেছেন। নিজের জন্মভূমি বাংলার প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ একটা সনেটে জীবনানন্দ সর্বখ্যাত ভক্ত কবি চণ্ডীদাসের[৬৯] (বড়ু চণ্ডীদাস নন) উল্লেখ করেছেন, যিনি কৃষ্ণ বা কানুর জন্য গেয়েছেন ভালোবাসার গান। ভাগ্যিস প্রেমটা একতরফা ছিল না।

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে
[illegible]

* বিংশ শতাব্দী।—অনুবাদক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সই কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলিল মোরে ॥
নহি স্বতন্তর গুরুজনে ডর
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু ॥
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখেতে দুখী।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
শুনিয়া জগৎ সুখী ॥[৭০]

বাংলার হিন্দুরা সর্বদেবতার পূজা দিলেও প্রাথমিকভাবে তারা কৃষ্ণ (বৈষ্ণবেরা) অথবা বিভিন্নরূপিণী দেবীমাতার ভক্ত। শাক্ত নামে পরিচিত শেষোক্তরা শক্তির ভক্ত, যা বিশ্বের আদি ও নারীশক্তির দেবীকে বোঝায়। বাঙালি শাক্তরা শেষে গীতিকবিতায় কণ্ঠ মেলায়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে নতুন ও চমৎকার এই ধারায় তাদের মধ্যে প্রথম ও সর্বাগ্রে ছিলেন রামপ্রসাদ সেন। এক হাজার আটটি নামের মধ্যে পরিচিতা শ্যামা বা কালী, দেবী মা কিংবা কেবলই দেবীর মনোযোগ ফেরানোর জন্য বা ভক্তের প্রতি মোক্ষ আশীর্বাদের জন্য এগুলো ছিল মাকে সান্ত্বনা দেওয়া এক অধৈর্য ও অবহেলিত সন্তানের কান্না। রামপ্রসাদ গেয়েছেন :

মা মা বলে আর ডাকব না।
ও মা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা ব'লে আর কোলে যাব না ॥
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছে চক্ষুকর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না ॥
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র,
মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু,
দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুন জটর-যন্ত্রণা ॥[৭১]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ 'এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা'র উল্লেখ করেছেন তাঁর নিজের কবিতায়।[৭২]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যযুগ জুড়ে শাক্ত কবিরা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ভক্তিগীতিসহ অন্য ধরনের রচনা নিয়ে প্রচুর কাব্য রচনা করেছেন: *মঙ্গলকাব্য*, দেবী চণ্ডীর ভজনা করে তেরো শ শতকের মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল*, যা ধর্মীয় ও সাহিত্যকর্ম হিসেবে মধ্যযুগের একটা মর্যাদাপূর্ণ রচনা। *মঙ্গলকাব্য* তার উপাখ্যানগুলোর মাধ্যমে দেবতাপূজার উপকারিতা এবং যারা দেবতাকে সম্মান দিতে অস্বীকার করে, তাদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করে। উদাহরণস্বরূপ সর্পদেবী মনসার সম্মানে বেশ কয়েকটা মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে ক্ষেতক দাসের *মনসামঙ্গল*। এর মূল গল্প কেন্দ্রীভূত মধুকর নামের ডিঙা নিয়ে নিজ শহর চম্পা থেকে আসা চাঁদ সওদাগর, তাঁর পুত্র লখিন্দর ও পুত্রবধূ বেহুলাকে নিয়ে। মনসাকে পূজা করতে অস্বীকার করায় চাঁদের ওপর সব ধরনের দুর্ভোগ নেমে আসে। প্রধান দুর্যোগ আসে তাঁর সপ্তম ছেলে লখিন্দরের বিয়ের রাতে—আগের ছয়টি পুত্র নিহত হয় দেবীর হাতে। মনসা তাঁর এক সাপকে পাঠান বরকে দংশন করার জন্য। বেহুলা তার স্বামীর মৃতদেহ হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে। তার বদলে মৃতদেহটা একটা ভেলায় চাপিয়ে যাত্রা শুরু করে ভাটির দিকে। সেখানে মনসার সহকারী নেতোর সঙ্গে পরিচয় হয় তার। সে তাকে দেবগৃহ অমরায় নিয়ে যায়। মনসা, ইন্দ্র ও তাঁর সভাসদদের সামনে চমৎকার নৃত্য প্রদর্শন করে বেহুলা, যার পুরস্কার হিসেবে বেঁচে ওঠে লখিন্দর।[৭৩]

জীবনানন্দ এই মধ্যযুগীয় গল্পের ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর সনেটগুলোর একটিতে। তাঁর মতে, যখন বেহুলা নাচছিল, তখন তার পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের শব্দের মতো সারা বাংলা কেঁদেছিল তার দুঃখে।

> বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
> খুঁজিতে যাই না আর: অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
> চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব'সে আছে
> ভোরের দোয়েলপাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
> জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের—অশথের ক'রে আছে চুপ;
> ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে।
> মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
> এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
>
> দেখেছিল: বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
> কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
> সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
> শ্যামার নরম গান শুনেছিল—একদিন অমরায় গিয়ে
> ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
> বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।[৭৪]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য কিন্তু হিন্দু কবি কিংবা হিন্দু বিষয়বস্তুর একচেটিয়া ক্ষেত্র ছিল না। মূলত বাংলাদেশি পণ্ডিতেরা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন, ইসলামি বিষয়বস্তুর চমৎকার বাংলা বর্ণনাই শুধু নয়, বরং মধ্যযুগের মুসলমান কবিরাই প্রথম ও দৃশ্যত একমাত্র কবি, যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ উপাখ্যান রচনা করেছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ইউসুফ ও জোলেখার প্রেমকাহিনি নিয়ে *ইউসুফ জোলেখা* লেখেন শাহ মোহাম্মদ সগির। দুই শতাব্দী পরে চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্বে তৎকালীন স্বাধীন রাজ্য আরাকান, বার্মার দুই মুসলমান বাঙালি কবি দৌলত কাজী ও আলাওল আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন। গুপ্ত প্রণয় ও সুন্দরী, গুণান্বিতা আর একেবারে খাঁটি ভারতীয় রমণীদের কাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে আলাওলের *পদ্মাবতী*।[৭৫]

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য ধীরে ধীরে মৌলিকভাবে বিবর্ধিত হতে থাকে। এই পরিবর্তনে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে নতুন শহর কলকাতার দুটো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৮০০ সালে ব্রিটিশরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভেন্টদের ব্রিটিশ ভারতের স্থানীয় ভাষাশিক্ষা দেওয়ার জন্য স্থাপন করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। এর জন্য কলেজটির প্রয়োজন পড়ে বাংলার নমুনা পাঠ্যবইয়ের। এ সময় কবিতা পাওয়া যাচ্ছিল সহজে, কিন্তু গদ্য নয়। বাংলা শেখানোর জন্য নিয়োজিত ব্যাপটিস্ট মিশনারি উইলিয়াম কেরি বাংলা কথোপকথনের নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলো দিয়ে *কথোপকথন* নামে পাঠ্যপুস্তক ধরনের একটা বই লেখেন। কেরি বাংলা সাহিত্যে নতুন ধরনের এক বাংলা গদ্যের কাজে হাত দেন, যার ফল হচ্ছে রামরাম বসুর *প্রতাপাদিত্য চরিৎ*। সিরিয়াস বাংলা গদ্যসাহিত্যের পদার্পণ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত হয়তো অপেক্ষা করত, কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আশ্রয়ে করা কাজগুলোর মাধ্যমে তার প্রথম আবির্ভাব ঘটে।[৭৬] (এ টি এম আনিসুজ্জামান যদিও জোর বিতর্ক করেন যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে কর্মরত বাঙালিদের দ্বারা বিভিন্ন কারখানার মধ্যে বিনিময় হওয়া ব্যবসাসংক্রান্ত চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রথম দিকের বাংলা গদ্যরীতি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চেয়ে অনেক অগ্রসর ছিল)।[৭৭]

ইস্ট ইন্ডিয়ার সম্পত্তিগুলো পরিচালনার জন্য নিয়োজিত গভর্নর জেনারেলের সদর দপ্তর কলকাতা উনবিংশ শতাব্দীতে যথেষ্ট নগরায়িত হয়ে ওঠে। এই শহর পরিচিত হতো 'প্রাসাদের নগরী', 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর' ও 'প্রাচ্যের প্যারিস' হিসেবেও।[৭৮] এখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন 'কর-ঠাকুর অ্যান্ড কোম্পানি'র অংশীদার মালিক ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠাকুরদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায়। ১৮১৬ সালে শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকদের একটা অংশ তাঁদের ছেলেরা যাতে যথার্থ আধুনিক শিক্ষালাভ করতে পারে, এমন একটা কলেজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে প্রতিষ্ঠা করেন হিন্দু কলেজ, যার উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় এবং এশীয় ভাষায় ও বিজ্ঞানে হিন্দু সন্তানদের শিক্ষা দান করা। এই ইংরেজি-মাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ১৮২৮ সালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাঠ্যসূচিতে যা ছিল, তাতে কেউ ধারণা করতে পারে, এটা হয়তো ইংল্যান্ড অথবা আমেরিকার কোনো উদারপন্থী আর্টস কলেজ, যেমন : অলিভার গোল্ডস্মিথের রোম ও ইংল্যান্ডের ইতিহাস, জন গে-র লোককথা, আলেকজান্ডার পোপ অনূদিত *ইলিয়াড* ও *ওডিসি*, ড্রাইডেনের *ওয়ার্কস অব ভার্জিল*, মিলটনের *প্যারাডাইস লস্ট* এবং শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি।[৭৯]

আগে যেমনটি বলা হয়েছে, দেশজুড়ে চালু মোগলদের কথ্য ভাষা ছিল ফার্সি, এই শাসকদের কাছ থেকেই কোম্পানির বেশির ভাগ সম্পদ দখল করা হয়েছিল। একটা বিদেশি ভাষাতেই ব্রিটিশ শাসকেরা তাদের শাসনাধীন অঞ্চলে বিচারকাজ পরিচালনা করত। অবশেষে ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ ভারতে আদালতের ভাষা হিসেবে ফার্সির স্থান দখল করে ইংরেজি। একই বছর শ্রদ্ধেয় লেখক ও পার্লামেন্ট সদস্য টমাস ব্যাবিংটন মেকলে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভারতের সুপ্রিম কাউন্সিলের কাজ করার জন্য লন্ডন থেকে কলকাতা আসেন। তিনি সেই বিখ্যাত—অথবা কারও কাছে কুখ্যাত—শিক্ষাপ্রস্তাব রাখেন, যাতে বলা হয় ব্রিটিশ শাসনাধীন সব স্কুলের মাধ্যম হবে ইংরেজি।

ব্রিটিশরা শ্বেতাঙ্গ মানুষের ভার গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে। মেকলের সামনে প্রশ্ন ছিল, নেটিভদের ভারতের কোনো একটা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া ঠিক হবে, নাকি ইংরেজিতে? মেকলে ছিলেন দৃঢ়ভাবে ইংরেজির পক্ষপাতী। তাঁর যুক্তি পুরোপুরিভাবে ভাষার পরিপ্রেক্ষিত থেকে নয়, অথবা এটা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার সুবিধা-অসুবিধার ভিত্তিতেও নয়, বরং তাঁর যুক্তি ছিল ইংরেজি সাহিত্যের সম্ভারবিচারে। তিনি লিখেছেন, 'আমি কখনোই তাঁদের মধ্যে (সেই সব ইংরেজ, যাঁরা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির পরিবর্তে ভারতীয় ভাষার পক্ষে ওকালতি করছেন) এমন একজনকেও পাইনি, যিনি অস্বীকার করতে পারবেন যে একটা ভালো ইউরোপীয় লাইব্রেরির একটামাত্র শেলফ পুরো ভারতের নেটিভ ও আরবীয় সাহিত্যের সমতুল্য।'[৮০]

এ রকম মনোভাব কিছুদিন কিছু ভারতীয়রও ছিল। ইংরেজি ভাষা এটাকে মর্যাদার সঙ্গে বহন করেছে। অতএব খুব অবাক হওয়ার কিছু নেই যে হিন্দু কলেজের তারকা ছাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) তাঁর কর্মোজ্জ্বল সাহিত্যজীবনে রওনা হয়েছেন ইংরেজিতে লিখতে লিখতে। ১৮৪০ সালের গোড়ার দিকে তাঁর এক সতীর্থ ছাত্রকে তিনি ইংরেজিতে চিঠি লিখেছিলেন, (অল্প কয়েকটা ছাড়া তাঁর সব চিঠি ছিল প্রাণবন্ত ও ঝকঝকে ইংরেজিতে) :

> হা ঈশ্বর—তোমাকে কী যে একটা খবর জানাতে ভুলে গেছি—গত মঙ্গলবার আমার কয়েকটা কবিতা পাঠিয়েছি ব্ল্যাকউডের (এডিনবার্গ ম্যাগাজিন) সম্পাদকের কাছে : ইচ্ছে ছিল ওগুলো তোমাকে উৎসর্গ করব, কিন্তু করা হয়নি, করেছি কবি উইলিয়াম ওয়র্ডসওয়ার্থকে। আমার উৎসর্গটা এ রকম : 'অত্র কবিতাগুলি শ্রদ্ধার সহিত নিবেদিত হইল কবি উইলিয়াম ওয়র্ডসওয়ার্থ মহাশয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> প্রতি তাঁর প্রতিভার একজন বিদেশী লেখক-ভক্তের দ্বারা।' উহ! কী যে এক কষ্টকর অবস্থা করেছি নিজের। একবার ভাবছি সম্পাদক কবিতাগুলি দয়া করে রাখবেন, আবার ভাবছি ফেরত দিয়ে দেবেন।[৮১]

এবং এডিনবার্গের সম্পাদক আপাতদৃষ্টিতে সেসব বাতিলই করেছিলেন। কারণ মধুসূদন আর কখনোই সেগুলোর কথা উল্লেখ করেননি।

প্রায় এক দশক ধরে সীমিত সাফল্যের সঙ্গে ইংরেজিতে লেখা ও প্রকাশনার পর মধুসূদনের মনে একটা পরিবর্তন আসে: তিনি তাঁর মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করতে চান, ইংরেজিতে নয়। স্বভাবসিদ্ধ মধুসূদনীয় উচ্ছ্বাসে তিনি তাঁর সেই একই কলেজবন্ধুকে তাঁর ভাষাশিক্ষার দৈনিক কার্যপরম্পরা সম্পর্কে লেখেন, যা ভোর ছয়টায় শুরু হয় হিব্রু দিয়ে, ইংরেজি দিয়ে শেষ হয় রাত ১০টায়, যার মধ্যে আছে ল্যাটিন, গ্রিক ও সংস্কৃত। আত্মপ্রত্যয় ও বাগাড়ম্বরের সঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কি আমার পিতৃপুরুষদের ভাষাকে সুসজ্জিত করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছি না?'[৮২] মধুসূদনের নিজের ভাষাতেই নির্দেশ করে যে বাংলা ভাষায় তাঁর ফিরে আসা বিদেশিভীতির কোনো সংকেত বহন করে না, বরং ঠিক তার উল্টোটা। *রামায়ণ* মহাকাব্যের ওপর ভিত্তি করে ১৮৬১ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মসাল) সালে প্রকাশিত তাঁর মহৎ সৃষ্টি *মেঘনাদবধকাব্য* সম্পর্কে উল্লেখ করে মধুসূদন মিলটনের ছন্দে দম্ভোক্তি করেন:

> তুমি চাহিতেছ তোমার সন্দেহবাদী বন্ধুকে পরিবর্তন করার জন্য আমি আমার পদ্য রচনার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করি। আমি নিশ্চিত, পদ্ধতির মধ্যে ব্যাখ্যা করিবার মতো বিশেষ কিছু নাই; আমাদের ভাষা ধ্বনিগত উচ্চারণ এবং পরিমাণের মতবাদের দিক দিয়া "স্বধর্মত্যাগী", অর্থাৎ ইহা নিজেদিগকে লইয়া ততটুকু ভাবনা করে যতটুকু আমি ভাবি আমাদের কুল-পুরোহিতের আশীর্বাদ লইয়া! তোমার বন্ধুরা যদি ইংরেজি জানে তাহাদিগকে প্যারাডাইস লস্ট পড়িতে বল, সেখানে দেখিতে পাইবে কীভাবে কাব্য রচিত হয়, যেই পদ্ধতিতে (এই) নগণ্য বাঙালি কবি লিখিয়া থাকেন।[৮৩]

বহুপাঠী ও ভাষাবিজ্ঞানের জাদুকর মধুসূদন মৌলিক কিছু সৃষ্টির জন্য তাঁর নিজস্ব ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপাদানসহ তাঁর ভারতীয় সাহিত্যিক উত্তরাধিকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। সে সময় গৌণ কবি ও কিছু উঠতি ঔপন্যাসিক তাঁদের ইংরেজি পঠন থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে সৃষ্টিশীল কিছু করার চেয়ে অনুকরণপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। হ্যারল্ড ব্লুম যে ব্যাপারটিকে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আখ্যায়িত করেছেন, বিংশ শতাব্দীতে সেই 'প্রভাবের উদ্বেগ', বাঙালি লেখকদের এক ধরনের ঝামেলায় ফেলে দেয়। কারণ তাঁদের কাউকে না-কাউকে পাশ্চাত্যের লেখকদের নকল করার দায়ে অভিযুক্ত করা হবে। তবে উনিশ শতকে এই উদ্বেগের ধরন একদিক দিয়ে ভিন্নতর ছিল। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) ১৮৭২ সালে চালু করেন তাঁর সাহিত্যপত্রিকা *বঙ্গদর্শন*। এটির প্রারম্ভিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্পাদকীয়তে যাঁরা বাংলায় সাহিত্য রচনা করে প্রকাশ করছেন, তাঁদের জন্য অনুতাপ করে তিনি লেখেন :

> ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখক মাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপি-কৌশল-শূন্য; নয় ত ইংরাজি-গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় ত অপাঠ্য, নয় ত কোন ইংরাজি-গ্রন্থের ছায়া মাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি?[৮৪]

শতাব্দীর শেষ ভাগে সাহিত্যের উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা ভাষা, তবুও উদ্বেগ থেকে যায়।

তত দিনে রাজনৈতিকভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ১৮৫৭ সালের সিপাঁহি বিদ্রোহের ঝড় সামলে নিয়েছে। ১৬০০ সালে যে কোম্পানির সনদ দিয়েছিলেন রানি এলিজাবেথ, ১৮৭৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সেই কোম্পানি ভেঙে দেওয়ার পক্ষে ভোট দেয়। আর এই রত্নশ্রেষ্ঠকে তাঁর রাজ্যের মুকুট পরিয়ে কয়েক বছর পর ভারত সম্রাজ্ঞীর উপাধি ধারণ করেন রানি ভিক্টোরিয়া। ১৯০৫ সালে ঝামেলাপূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিটকে বাহ্যত প্রতীয়মানভাবে আরও ভালোভাবে শাসন করার জন্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে (বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার সমন্বয়ে গঠিত) দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এতে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললে কলকাতাসহ পশ্চিম অংশ ঢাকা ও পূর্বাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ক্ষুব্ধ বাঙালিরা এ পদক্ষেপকে বাংলার রাজনৈতিক শক্তিকে দুর্বল করার প্রয়াস হিসেবে গণ্য করে। বরিশাল সম্মেলনে প্রদত্ত মৌখিক প্রতিবাদ ছাড়াও বেড়ে যায় ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সহিংস কর্মকাণ্ড। এ সময় রবীন্দ্রনাথ দুটো গান রচনা করেন, 'আমার সোনার বাংলা' ও 'জনগণমন'। পরবর্তী সময়ে দুটোই যথাক্রমে বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়।[৮৫] বঙ্গভঙ্গ চালু ছিল ১৯১২ সাল পর্যন্ত। তারপর ভুল বুঝতে পেরে ব্রিটিশরাজ দুই প্রদেশকে একীভূত করেন, কিন্তু একই সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তর করা হয় ঐতিহাসিকভাবে ক্ষমতাসীনদের কেন্দ্র উত্তর ভারতের দিল্লিতে।

১৯১২ সালের মধ্যে ৫০ বছরের রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তার করেন, যা তাঁর আগে বা পরে কেউ করতে পারেননি। সে বছর তিনি তৃতীয়বারের মতো পশ্চিমে সফর করার পরিকল্পনা করেন। তবে যাত্রা শুরু করার আগের দিন অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। চিকিৎসকেরা তাঁকে যাত্রা স্থগিত করার পরামর্শ দেন। রোগমুক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্রাম নিতে আসেন বর্তমান বাংলাদেশে পদ্মা নদীর তীরে তাঁদের পৈতৃক জমিদারি শিলাইদহে। আরোগ্যলাভের সময়টিতে তিনি তাঁর বেশ কিছু গীতিকবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। এক মাসের কিছু বেশি সময় পর ভ্রমণ করার মতো শক্তি সঞ্চয় করে মে মাসে যাত্রা করেন রবীন্দ্রনাথ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লন্ডনে পৌঁছে তিনি দেখা করেন চিত্রশিল্পী উইলিয়াম রদেনস্টাইনের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে দুই বছর আগে কলকাতায় সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁর।[৮৬] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনূদিত কবিতাগুলো দেখতে দিয়েছিলেন। মুগ্ধ রদেনস্টাইন কবিতাগুলো দেখান ডব্লিউ বি ইয়েটসকে, আর ইয়েটস সেগুলো দেখান এজরা পাউন্ডকে। তিনি সে সময় হ্যারিয়েট মনরোর শিকাগোভিত্তিক সদ্যোজাত এক কবিতা কাগজের ইউরোপ-সম্পাদক ছিলেন। কবিতাগুলো থেকে ছয়টি কবিতা *পোয়েট্রির* ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ করেন তিনি। এগুলোই ছিল প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা। তার এক মাস আগে রদেনস্টাইনের অনুরোধে লন্ডনের *ইন্ডিয়া সোসাইটি* রবীন্দ্রনাথের ১০৩টা কবিতা নিয়ে *গীতাঞ্জলির* একটা সীমিত সংস্করণ প্রকাশ করে, যার ভূমিকা লিখেছিলেন ইয়েটস। ১৯১৩ সালের হেমন্তে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পর তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার খবর পৌঁছায়। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে কলকাতাবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম, বাকি দুজন হচ্ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি ভি রমণ ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় ও মাদার তেরেসা ১৯৭৯ সালে শান্তির জন্য। যদিও পরবর্তী সময়ে পাউন্ড পুরোপুরি উল্টে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে মুহূর্তে আসন্ন যুদ্ধের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অন্যান্য ইউরোপীয়র মতো তিনি প্রাচ্যের এই শান্তির স্বপক্ষ মানুষটির জন্য শ্রদ্ধায় দাঁড়িয়ে পড়েন।[৮৭] পাউন্ড লিখেছিলেন, 'আমি মি. ঠাকুরকে যখন ছেড়ে আসি, আমার নিজেকে চামড়ার পোশাক পরা অবিকল এক বর্বরের মতো মনে হচ্ছিল। আমার হাতে ছিল এক ধরনের পাথরের যুদ্ধাস্ত্র, যাতে গাঁটওয়ালা কাঠের লাঠির সঙ্গে চামড়ার ফালি দিয়ে পাথর বাঁধা থাকে।'[৮৮]

কখনোই সমালোচকবিহীন না থাকলেও নিজ দেশ বাংলায় রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হতেন শ্রদ্ধেয় গুরু বা শিক্ষকের মতো, গুরুদেব হিসেবে। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শুরু থেকে তিনি বাঙালি শিক্ষিত সমাজের কর্তৃত্ব ধারণ করেন। এই একই দশকে বাঙালি তরুণ কবি ও লেখকদের একটা নতুন আন্দোলন গলার স্বর উঁচু করতে শুরু করে, এঁদের মধ্যে ছিলেন বেদনাদায়কভাবে লাজুক ও মুখচোরা এক ইংরেজির অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তথ্যসূত্র

১. আমি ভূপ্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিভাগে আমার সহকর্মী রবার্ট সি নিউটনকে ভারতের ভূতত্ত্বের ওপর তাঁর আকর্ষণীয় বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আরও তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, 'ফিলিপ পেট্রিয়েট ও জোসে আচাচি, 'ইন্ডিয়া ইউরেশিয়া কলিশন ক্রনোলজি হ্যাজ ইমপ্লিকেশন্স্ ফর ক্রাস্টাল শর্টেনিং অ্যান্ড ড্রাইভিং মেকানিজম অব প্লেটস', *নেচার* ৩১১ (১৮ অক্টোবর ১৯৮৪) : ৬১৫-২১।

২. যুদ্ধ, স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ওপর বাংলা ও ইংরেজিতে অসংখ্য তথ্যমূলক গ্রন্থ আছে। পাঠকেরা এগুলো পড়তে পারেন: রওনক জাহান, *পাকিস্তান: ফেইলিওর ইন ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন* (নিউ ইয়র্ক: কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২); জ্যোতি সেনগুপ্ত, *হিস্ট্রি অব ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ, ১৯৪৭-৭৩: সাম ইনভলভমেন্ট* (কলকাতা: নয়া প্রকাশ, ১৯৭৪); এ এম এ মুহিত, *বাংলাদেশ: ইমারজেন্স অব আ নেশন* (ঢাকা: বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৭৮); এবং চার্লস পিটার ওডোনেল, *বাংলাদেশ: বায়োগ্রাফি অব আ মুসলিম নেশন* (বোল্ডার, কলোরাডো ও লন্ডন: ওয়েস্টভিউ প্রেস, ১৯৮৪)। হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র*, ১৩ খণ্ড (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২)।

৩. নিজামউদ্দিন আহমেদ, *মহাস্থান: আ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট অন আরকিওলজি এক্সক্যাভেশন*, দ্বিতীয় সংস্করণ (করাচি: ডিপার্টমেন্ট অব আরকিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস; মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন অ্যান্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ; গভর্নমেন্ট অব পাকিস্তান, ১৯৭১); ব্যারি এম মরিসন, *লালমাই, আ কালচারাল সেন্টার অব আর্লি বেঙ্গল: অ্যান আরকিওলজিক্যাল রিপোর্ট অ্যান্ড হিস্ট্রিক্যাল অ্যানালাইসিস* (সিয়াটল ও লন্ডন: ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন প্রেস, ১৯৭৪)।

৪. আর সি মজুমদার সম্পাদিত: *হিন্দু পিরিয়ড*, প্রথম খণ্ড, *দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* (ঢাকা: দ্য ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, ১৯৪৩); হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়, সংকলন, *বিক্রমপুর*, দ্বিতীয় খণ্ড (নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা: বিক্রমপুর-প্রতিভা কার্যালয়, ১৯৩১)।

৫. যদুনাথ সরকার সম্পাদিত: *মুসলিম পিরিয়ড, ১২০০-১৭৫৭*, দ্বিতীয় খণ্ড, *দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* (ঢাকা: দ্য ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, ১৯৪৮); জে জে এ ক্যাম্পোস, *আ হিস্ট্রি অব পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল* (কলকাতা অ্যান্ড লন্ডন: বাটারওয়র্থ অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯১৯)।

৬. ব্রিটিশ ভারতের চা-শিল্পের ওপর তথ্যবহুল ও চমৎকার বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য, পার্সিভল গ্রিফিথস, *দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ইন্ডিয়ান টি ইন্ডাস্ট্রি* (লন্ডন: ওয়েডেনফিল্ড অ্যান্ড নিকোলাস ১৯৬৭)।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৭. দ্রষ্টব্য, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, *রোকেয়া রচনাবলী,* আবদুল কাদির সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩); আরও দ্রষ্টব্য, রওশন জাহান সম্পাদিত ও অনূদিত : *ইনসাইড সেক্লুশন : দ্য অবরোধবাসিনী অব রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন* (ঢাকা : উইমেন ফর উইমেন, ১৯৮১)।

৮. এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও যুক্তিতর্কের বিভিন্ন জটিল বিষয়ের জন্য দ্রষ্টব্য, রঙ্গলাল সেন, *আ স্টাডি অব পলিটিক্যাল এলিটস ইন বাংলাদেশ ১৯৪৭-১৯৭০* (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ : সাসেক্স ইউনিভার্সিটি, ১৯৭৭) ১২৪-৪৭। আরও দ্রষ্টব্য, বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০)।

৯. সত্যানন্দ দাশ, 'আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা', *ব্রহ্মবাদী,* ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৫, ৭৮-৭৯।

১০. অশোকানন্দ দাশ, 'বাল্যস্মৃতি', *ময়ূখ,* পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-৬২।

১১. জীবনানন্দ দাশ, *রূপসী বাংলা,* চতুর্থ সংস্করণ; (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ১৯৬৮), ৪৪।

১২. যুদিও হিন্দুদের মধ্যে জাত আছে চারটি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—যাকে প্রায়ই পর্তুগিজ শব্দ 'কাস্ট' দিয়ে বোঝানো হয়), মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভারতে জাত আছে অনেক এবং সেগুলো বর্ণ অনুযায়ী নয়। বাংলায় আছে দুটো বর্ণ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। তবে এখানে তিনটি উচ্চজাতের মর্যাদাক্রম হচ্ছে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ, ব্যবহারিক অর্থে শেষোক্ত দুটিও শূদ্র। আরও তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, রোনাল্ড বি ইন্ডেন, *মেরেজ অ্যান্ড র‍্যাংক ইন বেঙ্গলি কালচার : আ হিস্ট্রি অব কাস্ট অ্যান্ড ক্ল্যান ইন মিডল পিরিয়ড বেঙ্গল* (বার্কলে অ্যান্ড লস অ্যাঞ্জেলেস : দ্য ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৭৬)।

১৩. সুচরিতা দাশ, 'কাছের জীবনানন্দ', *ময়ূখ,* পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-৬২, ১৭২।

১৪. ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, ডেভিড কফ, *দ্য ব্রাহ্মসমাজ অ্যান্ড দ্য শেপিং অব দ্য মডার্ন ইন্ডিয়ান মাইন্ড* (প্রিন্সটন : প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৯)।

১৫. সত্যানন্দ দাশ, 'আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা', ৭৯।

১৬. বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, শিবনাথ শাস্ত্রী, *হিস্ট্রি অব দ্য ব্রাহ্মসমাজ* (কলকাতা : আর চ্যাটার্জি ১৯১২), ২ : ৩৫৮-৭৭। মন্মথমোহন দাশ, *বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (বরিশাল : মন্মথমোহন দাশ, ১৯২৭); স্থানীয় সমাজের ষষ্ঠবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এ পুস্তকটিতে অন্তর্ভুক্ত আছে সর্বানন্দ দাশের লেখা সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১৭. সত্যানন্দ দাশ, 'আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা', ৮০-৮১।

১৮. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বঙ্গের মহিলা কবি,* দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা : এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৫৩), ৩১৬-১৭।

১৯. কুসুমকুমারীর ওপর একটা চমৎকার লেখায় সুমিতা চক্রবর্তী কুসুমকুমারীর ছোট বোন হেমন্তকুমারীর লেখা তঁদের বাবার সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন কুসুমকুমারী সম্পর্কে : এস চক্রবর্তী, 'কুসুমকুমারী দাশ—সেই ছেলের মা', *দেশ,* ১১ আষাঢ় ১৩৮৯, ১১।

২০. জীবনানন্দ দাশ, 'আমার মা বাবা', *উত্তরসূরী,* পৌষ-ফাল্গুন ১৩৬১, ৭।

২১. শান্তা চট্টোপাধ্যায়, *রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা* (কলকাতা : প্রবাসী প্রেস), ৪৮।

২২. *মুকুল,* চৈত্র ১৩০২।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৩. *মুকুল,* পৌষ ১৩০২।

২৪. মনমোহন চক্রবর্তী, 'বরিশালে পঁয়তাল্লিশ বৎসর', *ব্রহ্মবাদী,* চৈত্র ১৩৪২, ২৭৩।

২৫. সে বছর প্রকাশিত তিনটি পত্রিকার কোনটি প্রথম হিসেবে স্বীকৃত, তা নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। দ্রষ্টব্য, স্মরজিত চক্রবর্তী, *দ্য বেঙ্গলি প্রেস (১৮১৮-১৯৬৮) : আ স্টাডি ইন দ্য গ্রোথ অব পাবলিক ওপিনিয়ন* (কলকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লি., ১৯৭৬), ১৬-১৯। আরও দ্রষ্টব্য, অশোককুমার কুণ্ডু, *পত্রিকা-পঞ্জি,* প্রথম খণ্ড (কলকাতা : বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি গবেষণা সংস্থা, ১৯৮২)।

২৬. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বঙ্গের মহিলা কবি,* ৩১৭-১৮।

২৭. জীবনানন্দ দাশ, 'আমার মা বাবা', ১১-১২। কিছুটা ভিন্ন ভাষ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, অশোকানন্দ দাশ, 'আমার দাদা জীবনানন্দ দাশ', *গার্লস কলেজ ম্যাগাজিন,* হাওড়া (১৯৫৫), ১২।

২৮. অশোকানন্দ দাশ, 'জীবনানন্দ দাশ', *পূর্বাশা,* ফাল্গুন ১৩৭১, ৯১।

২৯. সুচরিতা দাশ, 'কাছের জীবনানন্দ', ১৭৬।

৩০. অশোকানন্দ দাশ, 'জীবনানন্দ দাশ', ৯১।

৩১. অশোকানন্দ দাশ, 'বাল্যস্মৃতি', ১২৯।

৩২. ভর্তি রেজিস্টারে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত আছে 'জীবানন্দ' হিসেবে, এ রকম ভুল বানান এখানে প্রথম হলেও একমাত্র নয়।

৩৩. কৃষ্ণ কৃপালনী, *টেগোর : আ লাইফ* (কলকাতা : লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭১)-এ উদ্ধৃত, ১৫৭।

৩৪. *দ্য ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া,* ষষ্ঠ খণ্ড, এইচ এইচ ডডওয়েল সম্পাদিত এবং আর আর শেঠির বাড়তি অধ্যায়সহ (দিল্লি, জলন্ধর ও লক্ষ্ণৌ : এস চন্দ্র অ্যান্ড কোম্পানি ১৯৫৮), ৬১১; আর সি মজুমদার, এইচ সি রায়চৌধুরী ও কালীকিঙ্কর দত্ত, *অ্যান অ্যাডভান্সড্ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া,* তৃতীয় সংস্করণ (লন্ডন, মেলবোর্ন, টরন্টো : ম্যাকমিলান; নিউ ইয়র্ক : সেন্ট মার্টিনস প্রেস, ১৯৬৭), ৯৮১; এবং পার্সিভল স্পিয়ার, *আ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া,* দ্বিতীয় খণ্ড (বাল্টিমোর : পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৬৫), ১৯১-৯২।

৩৫. এ বিষয়ে আরও দ্রষ্টব্য, সৈয়দ নূরুল্লা ও জে পি নায়েক, *আ হিস্ট্রি অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া (ডিউরিং ব্রিটিশ পিরিয়ড)* দ্বিতীয় সংস্করণ (বম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ ও লন্ডন : ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৫১), ৫৬৭-৭২; পি সি বামফোর্ড, *হিস্ট্রিজ অব দ্য নন-কোঅপারেশন অ্যান্ড খিলাফত মুভমেন্টস* (দিল্লি : গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া প্রেস, ১৯২৫; দিল্লি : দীপ পাবলিকেশনস, ১৯৭৪), ১৭, ২২, ১০১-৮; এবং লিওনার্ড এ গর্ডন, 'সুভাষ বোস ইন ইন্ডিয়ান পলিটিকস, ১৯২১ টু ১৯২৮', *দ্য ওরাকল* (১৯৮৪) : ৩-৪।

৩৬. আন্দোলনের এই প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, হরিদাশ ও উমা মুখার্জি, *দ্য অরিজিনস অব দ্য ন্যাশনাল এডুকেশন মুভমেন্ট (১৯০৫-১৯১০)* (যাদবপুর, কলকাতা : যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, ১৯৫৭)।

৩৭. হীরালাল দাশগুপ্ত, *জননায়ক অশ্বিনীকুমার* (কলকাতা : দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি ১৯৬৯), ৫১-৫৯। সহিংসতার কারণে আলাদা সাহিত্য সম্মেলন আর আহ্বান করা হয়নি, এবং রবীন্দ্রনাথ আগেভাগেই শান্তিনিকেতন ফিরে গিয়েছিলেন। সেই সাহিত্য সম্মেলনের প্রণোদনা এসেছিল এই ভীতি থেকে যে দেশভাগ শুধু বাংলাকে বিভক্ত করে ফেলবে তা নয়, এর বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা না চালালে প্রদেশের বাংলাভাষীদের মধ্যেও বিভাজন সৃষ্টি হবে;

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৪৯) ২: ১৩৮-৩৯।

৩৮. *অশ্বিনীকুমার রচনাসম্ভার* (কলকাতা: অধ্যয়ন, ১৯৬৮), বক্তৃতামালা, ১৬।

৩৯. প্রাগুক্ত, ৮-৯।

৪০. প্রাগুক্ত, ১২।

৪১. স্থানীয় সংবাদ, *ব্রহ্মবাদী*, মাঘ ১৩২৭।

৪২. স্থানীয় সংবাদ, *ব্রহ্মবাদী*, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৭।

৪৩. স্থানীয় সংবাদ, *ব্রহ্মবাদী*, বৈশাখ ১৩২৮। চিত্তরঞ্জন দাশ সর্বত্র ছাত্রদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, বরিশালের ছাত্ররা 'জাতীয় শিক্ষা'র দাবিতে সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। হীরালাল দাশগুপ্ত, *জননায়ক অশ্বিনীকুমার*, ৯৪-৯৫।

৪৪. স্থানীয় সংবাদ, *ব্রহ্মবাদী*, বৈশাখ ১৩২৮; অশোকানন্দ দাশের সাক্ষাৎকার।

৪৫. স্থানীয় সংবাদ, *ব্রহ্মবাদী*, আষাঢ় ১৩২৮।

৪৬. অশোকানন্দ দাশের 'আমার দাদা জীবনানন্দ দাশ'-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৮-৯, এই অনুচ্ছেদের একাংশ জীবনানন্দ দাশের 'আমার মা বাবা'তে রয়েছে।

৪৭. জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত, সম্পাদকীয়, *ব্রজমোহন বিদ্যালয় পত্রিকা*, ১৯৬৮-৬৯।

৪৮. পার্সিভল স্পিয়ার, *আ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, ১৯১।

৪৯. *জুবিলী* (বরিশাল), ১৯৩৪, ১৯।

৫০. জয়ন্তকুমার দাশগুপ্তর সাক্ষাৎকার।

৫১. স্থানীয় সংবাদ, *ব্রহ্মবাদী*, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৩৪।

৫২. *সন্তানশিক্ষা নীতি ও ধর্ম* নামে সত্যানন্দ একটা গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন (ঢাকা: পূর্ব বঙ্গ ব্রাহ্ম সম্মেলন, ১৯১৭)।

৫৩. জীবনানন্দ দাশ, 'আমার মা বাবা', ১০।

৫৪. অশোকানন্দ দাশের সাক্ষাৎকার।

৫৫. অক্সফোর্ড মিশনের ফাদার ক্যারেলটন এবং বরিশালের লোক ও হোস্টেলের একজন সাবেক বাসিন্দা ড. ভূপেন মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার।

৫৬. অশোকানন্দ দাশের সাক্ষাৎকার।

৫৭. স্থানীয় সংবাদ, *ব্রহ্মবাদী*, শ্রাবণ, ১৩২৬।

৫৮. এ কর্মসূচি শুরু হয় ১৯১৭ সালে, যার দ্বারা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা তাদের কলেজের মাধ্যমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখাতে পারত; দ্রষ্টব্য, *দ্য প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন* (সেপ্টেম্বর ১৯১৭)।

৫৯. *ইউনিভার্সিটি ল কলেজ লিস্ট অব স্টুডেন্টস ফ্রম ১৯১৩-১৪ টু ১৯২০-২১*।

৬০. স্থানীয় সংবাদ, *ব্রহ্মবাদী*, শ্রাবণ, ১৩২৯।

৬১. সুচরিতা দাশের সাক্ষাৎকার।

৬২. *দ্য প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন* ৭, নং ১-এ (অক্টোবর ১৯২০) এ খবরটি বেরিয়েছিল: 'ইউনিভার্সিটি নোটস—এমএ ও এমএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে ৩০ আগস্ট ১৯২০ তারিখে। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৩৫...কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এবারই প্রথম মাতৃভাষায় এমএ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' ষোলোজন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরীক্ষার্থী ছিলেন মাতৃভাষায় ডিগ্রি নেওয়ার জন্য। সব কজনই নন-কলেজিয়েট (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বক্ষণিক ছাত্র নয়), প্রথম দুজন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক।

৬৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *শুদ্ধতম কবি*, দ্বিতীয় সংস্করণ (ঢাকা: নলেজ হোম, ১৯৭৭), উদ্ধৃত, ২৫০।

৬৪. ২ জুলাই ১৯৪৬-এ লেখা চিঠি, *ময়ূখ*, পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১-৬২, ২২৭।

৬৫. *ব্রহ্মবাদী*, বৈশাখ, ১৩২৬, ১।

৬৬. জীবনানন্দ দাশ, 'আমার মা বাবা', ৪-১৩।

৬৭. জয়কান্ত মিশ্র, *হিস্ট্রি অব মৈথিলি লিটারেচার* (নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৭৬), ২৬; বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া, *হিস্ট্রি অব আসামিজ লিটারেচার* (নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৬৪), ৭; এবং মায়াধর মানসিংহ, *হিস্ট্রি অব উড়িয়া লিটারেচার* (নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৬২), ২২।

৬৮. সুকুমার সেন, *হিস্ট্রি অব বেঙ্গলি লিটারেচার* (নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৬০), ৭০; এবং বড়ু চণ্ডীদাস, *সিংগিং দ্য গ্লোরি অব লর্ড কৃষ্ণ; দ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, এম এইচ ক্লেইম্যান অনূদিত (চিকো, ক্যালিফোর্নিয়া: স্কলারস প্রেস, ১৯৮৪), ১৮-২০।

৬৯. *রূপসী বাংলা*, ৩১।

৭০. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত: *বৈষ্ণব-পদাবলী* (কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬১), ৬৩৯। আরও অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য, এডওয়ার্ড সি ডিমক, জুনিয়র ও ডেনিস লেভারটভ, *ইন প্রেইজ অব কৃষ্ণ: সংস ফ্রম দ্য বেঙ্গলি* (গার্ডেন সিটি, নিউ ইয়র্ক: অ্যাংকর বুকস; ডাবলডে অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৬৭)।

৭১. লিওনার্ড নাথান ও ক্লিন্টন সিলি, অনূদিত: *গ্রেইস অ্যান্ড মার্সি ইন হার ওয়াইল্ড হেয়ার: সিলেক্টেড পোয়েমস টু দ্য মাদার গডেস* (বোল্ডার, কলোরাডো: গ্রেট ইস্টার্ন: সামভালা পাবলিকেশনস, ১৯৮২), ৩৫।

৭২. *রূপসী বাংলা*, ১৩।

৭৩. ইংরেজি অনুবাদ এডওয়ার্ড সি ডিমক জুনিয়র, *দ্য থিফ অব লাভ: বেঙ্গলি টেলস ফ্রম কোর্ট অ্যান্ড ভিলেজ* (শিকাগো ও লন্ডন: ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৬৩), ২০৯।

৭৪. *রূপসী বাংলা*, ১২।

৭৫. কাজী আবদুল মান্নান, *লিটারেরি হেরিটেজ অব বাংলাদেশ: মেডিভ্যাল পিরিয়ড* (নিউ ইয়র্ক: লার্নিং রিসোর্সেস ইন ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, ১৯৭৪), ৪-৮। কাজী আবদুল মান্নান ও ক্লিন্টন বি সিলি অনূদিত *ইউসুফ জুলেখা বাই এমডি সগির* (নিউ ইয়র্ক: লার্নিং রিসোর্সেস ইন ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, ১৯৭৪)। কাজী আবদুল মান্নান ও ক্লিন্টন বি সিলি অনূদিত *পদ্মাবতী বাই আলাওল* (নিউ ইয়র্ক: লার্নিং রিসোর্সেস ইন ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, ১৯৭৪)। শেষোক্ত দুটিতে আছে ভূমিকামূলক মন্তব্য ও প্রত্যেকটির মূল ভাষ্যের সংক্ষিপ্তসার।

৭৬. সুশীল কুমার দে, *বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দ্য নাইন্টিনথ সেঞ্চুরি ১৭৫৭-১৮৫৭*, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা: ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৬২), ১০৬।

৭৭. দ্রষ্টব্য, আনিসুজ্জামান, *পুরনো বাংলা গদ্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪)।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৭৮. দ্রষ্টব্য, যেমন মার্টিন এম বালৌ, *ডিউ ওয়েস্ট* কিংবা *রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন টেন মান্থস*, ১১তম সংস্করণ (বোস্টন: হটন মাফিন অ্যান্ড কোম্পানি, ১৮৯৫), ১৬৯; নীরদ সি চৌধুরী, *দ্য অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান* (নিউ ইয়র্ক: ম্যাকমিলান কোম্পানি, ১৯৫১), ২৫৫ ও দোমিনিক লাপিয়ের, *দ্য সিটি অব জয়* (গার্ডেন সিটি, নিউ ইয়র্ক: ডাবলডে অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৫), ৩২।

৭৯. সুশীলকুমার দে, *বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দ্য নাইন্টিনথ সেঞ্চুরি ১৭৫৭-১৮৫৭*, ৪৮০, ৪৮৮।

৮০. টমাস বেবিংটন মেকলে, 'মিনিট অন ইন্ডিয়ান এডুকেশন', *সিলেক্টেড রাইটিং* (শিকাগো ও লন্ডন: ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৭২), ২৪১।

৮১. চিঠি, ৭ অক্টোবর ১৮৪২, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত: *কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী* (কলকাতা: গ্রন্থ নিলয়, ১৯৬৩), ৭৭-৭৮।

৮২. প্রাগুক্ত, ১১৩; ১৮ আগস্ট ১৮৪৯-এ লেখা চিঠি।

৮৩. প্রাগুক্ত, ১৩৩-৩৪; ১ জুলাই ১৮৬০-এ লেখা চিঠি।

৮৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্গদর্শন* ১ (এপ্রিল ১৮৭২)।

৮৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক* ২: ১২৫, ৪৮৯।

৮৬. মেরি এম লাগো, *ইমপারফেক্ট এনকাউন্টার: লেটারস অব উইলিয়াম রদেনস্টাইন অ্যান্ড রবীন্দ্রনাথ টেগোর ১৯১১-১৯৪১* (ক্যামব্রিজ: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২)।

৮৭. দ্রষ্টব্য, নবনীতা সেন, 'দ্য ফরেন রিইনকারনেশন অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর', *জর্নাল অব এশিয়ান স্টাডিজ* ২৫, নং ২ (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬): ২৭৫-৮৬; এবং সুজিত মুখোপাধ্যায়, *প্যাসেজ টু আমেরিকা: দ্য রিসেপশন অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, ১৯২১-১৯৪১* (কলকাতা, পাটনা ও এলাহাবাদ: বুকল্যান্ড প্রাই, ১৯৬৪)।

৮৮. এজরা পাউন্ড, 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর', *ফোর্টনাইটলি রিভিউ* ৪৩ (জানুয়ারি-জুন ১৯১৩): ৫৭৫।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কল্লোল যুগ

> তাঁর ছন্দ ও শব্দযোজনা, উপমা ইত্যাদিকে চট করে ভালো কি মন্দ বলা যায় না—তবে 'অদ্ভুত' স্বচ্ছন্দে বলা যায়।
>
> —বুদ্ধদেব বসু, সম্পাদকীয় মন্তব্য : *প্রগতি*, আশ্বিন, ১৩৩৫

১

ব্রাহ্ম ধর্মতত্ত্ব ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের ভেতর তৃতীয় প্রজন্মের ব্রাহ্ম জীবনানন্দ বড় হয়েছিলেন বরিশালের মফস্বল শহরে। তবুও তিনি অথবা তাঁর সন্তানসন্ততির কেউই কখনো ব্রাহ্মসমাজের কর্মকাণ্ডে খুব সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেননি।[১] কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজে যোগও দেননি। জীবনানন্দ তাঁর বাবা সম্পর্কে—লেখেন, 'ধর্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠ হয়েও তিনি ব্যক্তি বা সমষ্টিগতভাবে ধর্মাচার সম্পর্কে বিশেষতঃ সচেতন মানুষের স্বাধীনতার অনুকূল ছিলেন। অবশ্য তিনি মাঝে মাঝে বেদনা পেতেন এই ভেবে যে তাঁর সন্তান-সন্ততিস্থানীয় মানুষেরাও তাঁর প্রিয় ধর্ম সম্পর্কে আর তেমন আগ্রহান্বিত নয়।'[২] তবে তাঁদের বাবা পড়াশোনা ও শিক্ষকতার প্রতি তাঁর ভালোবাসা তিন ছেলেমেয়ের মধ্যেই সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। সবচেয়ে ছোটটি, সুচরিতা, তমলুক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হয়েছিলেন। অশোকানন্দ সরকারি চাকরিতে ঢুকেছিলেন আবহাওয়াবিদ হিসেবে। আর তাঁর বাবা যে কলেজের ছাত্র ছিলেন কলকাতায়, সেই ব্রাহ্মদের সিটি কলেজে ১৯২২ সাল থেকে শুরু করে জীবনানন্দ ঢুকেছিলেন কলেজ শিক্ষকতার পেশায়।

সিটি কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্মচারীরা এক অর্থে ছিলেন বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের একটা বর্ধিতাংশ। শিক্ষকমণ্ডলীর অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্ম। তার ওপর, তাঁদের অনেকেই এসেছিলেন খোদ বরিশাল থেকে। প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্রসহ কারও কারও বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ফলে সিটি কলেজে জীবনানন্দ কাজ করেছেন কমবেশি বন্ধু-পরিচিতদের সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কলকাতার এই কলেজে শিক্ষকতার সময় তিনি সাগ্রহে লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর প্রথম শখ ছিল শোকগাথা লেখা (কোনোভাবে বা অন্যভাবে, আমরা দেখতে পাব জীবনানন্দের কবিতায় মৃত্যুর উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়)। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা (নিজ শহরে তাঁর পরিবার পরিচালিত *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকায় ছাপা নববর্ষের কবিতাটি বাদ দিলে) ছিল ১৯২৫ সালে তিরোহিত চিত্তরঞ্জন দাশের উচ্চপ্রশংসা-সংবলিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একাংশের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সন্দেহাতীতভাবে ছিলেন বাংলার সবচেয়ে প্রিয় ও প্রভাবশালী নেতা। তাঁর মৃত্যুর পর গান্ধীসহ কলকাতার রাস্তায় পাঁচ লাখ শোকার্ত মানুষ হুগলি নদীর ঘাটে সৎকারযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলায় সচরাচর যা হয়, সম্মানিত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সম্মান জানানো হয় বাঙালিদের পবিত্র মাধ্যম কবিতা দিয়ে। জীবনানন্দ তাঁর শোকাবহ উৎসর্গের নাম দিয়েছিলেন 'দেশবন্ধু প্রয়াণে', তারপর তাঁর প্রথম গ্রন্থে দেওয়ার জন্য শুধু 'দেশবন্ধু'।

> বাংলার অঙ্গনেতে বাজায়েছ নটেশের রঙ্গমল্লী গাঁথা
> অশান্ত সন্তান ওগো,—বিপ্লবিনী পদ্মা ছিল তব নদী-মাতা।
> কালবৈশাখীর দোলা অনিবার দুলাইত রক্তপুঞ্জ তব
> উত্তাল উর্মির তালে,—বক্ষে তব লক্ষ কোটি পন্নগ-উৎসব
> উদ্যত ফণার নৃত্যে আস্ফালিত ধূর্জটির কণ্ঠ-নাগ জিনি,
> ত্র্যম্বক-পিনাকে তব শঙ্কাকুল ছিল সদা শত্রু অক্ষৌহিণী।
> স্পর্শে তব পুরোহিত, ক্লেদে প্রাণ নিমেষেতে উঠিত সঞ্চারি,
> এসেছিলে বিষ্ণুচক্র মর্মন্তুদ,—ক্লৈব্যের সংহারী।
> ভেঙেছিলে বাঙালির সর্বনাশী সুষুপ্তির ঘোর,
> ভেঙেছিলে ধূলিশ্লিষ্ট শঙ্কিতের শৃঙ্খলের ডোর,
> ভেঙেছিলে বিলাসের সুরাভাণ্ড তীব্র দর্পে,—বৈরাগের রাগে,
> দাঁড়ালে সন্ন্যাসী যবে প্রাচীমঞ্চে—পৃথ্বী-পুরোভাগে।
> নবীন শাক্যের বেশে, কটাক্ষেতে কাম্য পরিহরি
> ভাসিয়া চলিলে তুমি ভারতের ভাব-গঙ্গোত্তরী
> আর্ত অস্পৃশ্যের তরে, পৃথিবীর পঙ্কমার লাগি;
> বাদলের মন্দ্র সম মন্ত্র তব দিকে দিকে তুলিলে বৈরাগী।[৩]

এবং ইত্যাদি। হিন্দু দেবতা শিব ও বিষ্ণু এবং তাঁদের মূর্তি সি আর দাশ ও তাঁর কর্মের রূপক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশবন্ধুকে তুলনা করা হতো তরুণ ভারতীয় রাজকুমার গৌতমের সঙ্গে, যিনি জ্ঞানপ্রাপ্তির পর পরিচিত হন বুদ্ধ নামে, অর্থাৎ বোধিপ্রাপ্ত একজন হিসেবে। আর জীবনানন্দ যে রকম বাংলার সদ্যপ্রয়াত রাজনৈতিক নেতার উদ্দেশ্যে প্রশংসা জ্ঞাপন করতে চেয়েছেন, তেমনিভাবে পরবর্তী সময়ে এই একই কবিতায় মহাভারতের বীর পাণ্ডব যোদ্ধা সব্যসাচী সে রকম কাব্যিক ভূমিকা পালন করেছেন।

> গাণ্ডীবের টঙ্কারেতে মুহুর্মুহু বলেছিলে,—'আছি, আমি আছি!
> কল্পশেষে ভারতের কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছি নব সব্যসাচী।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের সি আর দাশ-বন্দনা সমসাময়িক কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) 'বিদ্রোহী'র উচ্চকণ্ঠের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যদিও নজরুলের অহমিকা ছিল সীমাহীন :

> বল বীর
> বল উন্নত মম শির!
> শির নেহারি আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!
> ...
> আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর!
> আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব বিধাত্রীর!
> বল বীর,
> চির উন্নত মম শির।[৪]

এই কবিতা ও ব্যক্তিত্বের জন্য 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে খ্যাত নজরুল তরুণ বয়সে মিত্রবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। একসময় তিনি ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর নন-কমিশন্ড অফিসার হাবিলদার হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছিলেন—তবে আরব সাগরতীরে পাকিস্তানের বন্দর নগর করাচির বাইরে তাঁকে যুদ্ধের কাছাকাছি আর কোথাও যেতে হয়নি। 'বিদ্রোহী'সহ তাঁর আবেগাক্রান্ত কবিতাগ্রন্থ *অগ্নিবীণা* প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে এবং জ্বালাময়ী বক্তব্যের কারণে সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। তাঁর লেখা কবিতা এবং সম্পাদিত পত্রিকার কারণে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য দুবার ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কয়েদ করেছিল। জেলে থাকা অবস্থায় নজরুল একবার অনশন করেছিলেন। শোনা যায়, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে টেলিগ্রাম করে বলেছিলেন : 'অনশন ত্যাগ করো। আমাদের সাহিত্য তোমাকে চায়।'[৫] সি আর দাশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে সবচেয়ে সরব বাঙালি গীতিকার নজরুল জীবনানন্দের মতো এই নেতার উদ্দেশ্যে কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন।[৬] সমসাময়িক হলেও নজরুল ও জীবনানন্দের মধ্যে খুব বেশি মিল ছিল না। হিন্দু (ও ব্রাহ্ম) লেখকপ্রধান কাব্যজগতে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান কবির মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সঙ্গলিপ্সু, উদ্দাম ও আত্মপ্রত্যয়ী বিদ্রোহী কবি। জীবনানন্দ এ রকম বর্ণচ্ছটা প্রদর্শন করেননি। কিন্তু নজরুলের কবিতা ছিল সংক্রামক এবং সাময়িকভাবে তা জীবনানন্দকেও সংক্রমিত করেছিল।

অশোকানন্দ স্মরণ করেন, সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসেবে নয়, 'দেশবন্ধু প্রয়াণে' কিছু প্রশংসা কুড়িয়েছিল। একজন সমালোচক :

> বলেছিলেন যে এই কবিতা পড়ে তাঁর মনে হয়েছে যে, এটা একজন প্রবীণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ছদ্মনামে লিখেছেন। পরবর্তীকালে তিনি এ সব কবিতার বিশেষ মূল্য দেন নি। আমি ঘটনাটির উল্লেখ করছি এই জন্য যে, গোড়া থেকে প্রস্তুত হয়েই তিনি কাব্যক্ষেত্রে নেমেছিলেন—যাকে বলে কাঁচা হাতের পরিচয়, তা তিনি কোনও দিন দেন নি।[৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁর ভাইয়ের মন্তব্যের বিপরীতে এই অপক্ব হাতে লেখা কবিতাটি জীবনানন্দের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব সামান্য ধারণা দেয়।

পুত্রের কাব্যিক পরিপক্বতা অথবা তার অভাবের চেয়ে বিশেষ করে এই কবিতাটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাঁদের মা বরং আরও বেশি সমালোচনামুখর ছিলেন। জীবনানন্দ স্মৃতিচারণা করেন, 'চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তাঁর ওপর আমি একটি কবিতা লিখেছিলাম। মা নিজে কবি—পত্রপত্রিকার পাতায় আমার সেই প্রায় প্রত্যেক কবিতাটি সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানবার জন্য মাকে এক কপি [সাহিত্য] পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। মা আমাকে ফেরৎ ডাকে লিখলেন, চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে লিখেছ, ভালই করেছ, কিন্তু রামমোহনের ওপর লিখতে বলেছি তোমাকে, মহর্ষির ওপরেও।'[৮] তাঁর মা আশা করেছিলেন, তাঁর ছেলে তাঁদের ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের সম্মানিত করবেন, যেমন প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় আর রবীন্দ্রনাথের বাবা সমাজের উদ্বুদ্ধকারী নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কুসুমকুমারী যদি ভেবে থাকেন, তাঁর ছেলে সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগ দেবে, যার নেতাকে কবিতার মাধ্যমে তিনি প্রশংসা করেছিলেন, তাহলে তিনি ভুল করেছিলেন। জীবনানন্দ তখন এবং পরেও অরাজনৈতিক ছিলেন।

বহু কবিতায় প্রতিফলিত জীবনানন্দের অরাজনৈতিক ঝোঁক পরবর্তী সময়ে মার্ক্সীয় সমালোচকদের কিছু বিরূপ মন্তব্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে কিছুদিনের জন্য তাঁর মা ছিলেন তাঁর সবচেয়ে বড় সমালোচক। আর সম্ভবত কিছুটা মায়ের সমালোচনায় প্রভাবিত হয়ে জীবনানন্দ শিবাজির আধ্যাত্মিক গুরু হিন্দুধর্মীয় ব্যক্তিত্ব রামদাসের প্রশংসাপূর্ণ একটা কবিতা লিখেছিলেন। শিবাজি ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর মারাঠা জেনারেল, যার সৈন্যরা দাক্ষিণাত্য হিসেবে পরিচিত ভারতের কেন্দ্রে মোগল আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। জীবনানন্দের আরেকটা কবিতা ছিল রামকৃষ্ণের অতীন্দ্রিয়বাদের প্রচারক বাংলাদেশের বিবেকানন্দের স্তুতিমূলক। যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের একপর্যায়ে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত প্রথম ধর্মীয় বিশ্ব পার্লামেন্টে (১৮৯৩) বক্তৃতা দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ, যাঁর সংগঠন যুক্তরাষ্ট্রে এখনো সক্রিয় এবং সম্ভবত এই সংগঠন বহুশ্রুত সাংস্কৃতিক ধারণার আধ্যাত্মিক পূর্ব আর বস্তুবাদী পশ্চিমের জন্ম দিয়েছিল। নিউইয়র্কে তাঁর শ্রদ্ধেয় গুরু সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ পরামর্শ দেন :

> প্রাচ্য যখন যন্ত্র তৈরি করা শিখতে চায়, তাকে পশ্চিমের পদপ্রান্তে বসে তার কাছ থেকে শিখে নেওয়া উচিত। পাশ্চাত্য যখন নিরাকার চৈতন্য সম্পর্কে, ঈশ্বর সম্পর্কে, গূঢ় সত্তা সম্পর্কে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অর্থ এবং রহস্য সম্পর্কে জানতে চায় তাকে প্রাচ্যের পায়ের কাছে বসে তা শিখতে হবে।[৯]

দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশ বহু ধর্মপ্রসারের গৌরবস্থল। এখানে আবার ধর্মভিত্তিক দাঙ্গাও হয়, বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। খাইবার পাসের ভেতর দিয়ে এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম থেকে মুসলমান বাহিনী দক্ষিণ এশিয়ায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

বহুবার আক্রমণ চালিয়ে নাস্তিক মূর্তি ধ্বংস করে হিন্দু মন্দিরগুলো অপবিত্র করেছিল। হিন্দু বাহিনীও প্রতি-আক্রমণ করে। মোগলদের মাধ্যমে মুসলমান শাসনের অধীনস্থ হয় উত্তরের বেশির ভাগ অঞ্চল। তবে অধিকাংশ জনগোষ্ঠী হিন্দু থেকে যায়। বলা হয়, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার শত্রুতা বজায় রাখার সুবিধা বুঝতে পেরে ব্রিটিশরা ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি গ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সত্যি হোক বা না-ই হোক, ভারতীয় জীবনধারায় হিন্দু-মুসলমান শত্রুতা সত্য।

১৯২০-এর দশকে ভারতের বাইরের ঘটনাবলি দেশের ভেতর হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে ভারতীয়রা, বিশেষ করে মুসলমানরা, পরাজিত তুরস্ক ও তার খেলাফতের ভাগ্যের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা ছিল সারা মুসলিম বিশ্বের এক ধরনের নামমাত্র প্রধান। উদাহরণস্বরূপ, কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২২ সালে তুর্কি নেতাকে সমরনায়ক ও মানুষের নেতা অভিধায় উচ্চপ্রশংসা করে 'কামাল পাশা' নামে কবিতা লেখেন। সে বছর তুরস্কের গ্রিস বিজয়কে মুসলমান ও খেলাফতের বিজয় ধরে নিয়ে ভারতীয় মুসলমানরা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিল, আবার একই কামাল আতাতুর্ক যখন ১৯২৪ সালে খেলাফত উচ্ছেদ করেন, তখন মুসলমানদের নিরাপত্তাহীনতা ভারতের এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ হয়েছিল। একজন হিন্দু হলেও সি আর দাশ মুসলমানদের আস্থাভাজন হয়েছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যকার অসদ্ভাব দূর করার জন্য বহু কিছু করেছিলেন।[১০] ১৯২৬ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরের বছর কলকাতায় আর একবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। নজরুলের মতো জীবনানন্দও তাঁর বহু কবিতার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে কথা বলেন। ১৯২৬-এর জুন মাসে প্রকাশিত 'হিন্দু মুসলমান' নামের এক কবিতায় ব্রাহ্ম জীবনানন্দ 'আমরা হিন্দুরা' বলে মুসলমান ভাইদের বন্ধুত্বপূর্ণ আহ্বান জানিয়েছিলেন :

> মহামৈত্রীর বরদ-তীর্থে—পুণ্য ভারতপুরে
> পূজার ঘণ্টা মিশিছে হরষে নমাজের সুরে-সুরে!
> আহ্নিক হেথা শুরু হয়ে যায় আজান বেলার মাঝে,
> মুয়াজ্জেনদের উদাস ধ্বনিটি গগনে গগনে বাজে;
> জপে ঈদগাতে তসবী ফকির, পূজারী মন্ত্র পড়ে,
> সন্ধ্যা-উষায় বেদবাণী যায় মিশে কোরানের স্বরে;
> সন্ন্যাসী আর পীর
> মিলে গেছে হেথা,—মিশে গেছে হেথা মসজিদ, মন্দির।[১১]

এ সময়ের মধ্যে ১৯২৫ সালে 'দেশবন্ধু' দিয়ে শুরু করে বহু পত্রিকায় জীবনানন্দের কবিতা ছাপা হয়। 'দেশবন্ধু' ও 'হিন্দু মুসলমান' দুটোই ছাপা হয়েছিল *বঙ্গবাণী*তে, যেটিতে ১৯২৩-২৬ সালে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গল্পকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) *পথের দাবী* উপন্যাসটি (রাজদ্রোহের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত) ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল। জর্জ অরওয়েলের *বার্মিজ ডেজ়*-এর (১৯৩৪) মতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনামূলক উপন্যাসটি বার্মার পটভূমিতে লেখা। জীবনানন্দের কিছু কবিতা *প্রবাসী*তে ছাপা হয়, এটিতে কুসুমকুমারীর কবিতাও ছাপা হতো, তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাপা হতো বেশি। তবে এসব পত্রিকা ১৯২০-এর দশকে শুরু হওয়া সাহিত্য আন্দোলনের বাহন ছিল না।

একটা পত্রিকার নাম ছিল *কল্লোল,* যেটা নতুন ধারার সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। ১৯২৩ সালে কলকাতা থেকে *কল্লোল* প্রকাশিত হতে শুরু করে। আগের কয়েক বছর এটির দুই সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগকে ঘিরে বেশ কিছুসংখ্যক লেখক-শিল্পী জড়ো হয়ে গড়ে তুলেছিলেন *ফোর আর্টস ক্লাব*।[১২] ১৯২৩ থেকে এই দুই ব্যক্তি ছিলেন তখনকার বাঙালি তরুণ ও অগ্রসর লেখকদের মূল আকর্ষণ। গোকুলচন্দ্র নাগ ১৯২৫ সালে মারা যান, তবে দীনেশরঞ্জন দাশ ১৯৩০-এর দশকের প্রথম দিকে আর্থিক কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত পত্রিকাটি সম্পাদনা করে যান। তখন বহু পত্রিকার ভাগ্যে এমনই ঘটত, এখনো ঘটে।

কল্লোল-এ জীবনানন্দের প্রথম কবিতা *নীলিমা* যখন ছাপা হয়, তখন পত্রিকাটির তৃতীয় বর্ষ চলছিল।

নীলিমা

রৌদ্র ঝিল্‌মিল,
উষার আকাশ, মধ্যনিশীথের নীল,
অপার ঐশ্বর্যবেশে দেখা তুমি দাও বারেবারে
নিঃসহায় নগরীর কারাগার-প্রাচীরের পারে!
—উদ্বেলিছে হেথা গাঢ় ধূম্রের কুণ্ডলী,
উগ্র চুল্লি-বহ্নি হেথা অনিবার উঠিতেছে জ্বলি,
আরক্ত কঙ্করগুলি মরুভূর তপ্তশ্বাস মাখা,
—মরীচিকা-ঢাকা!
অগণন যাত্রিকের প্রাণ
খুঁজে মরে অনিবার,—পায় নাকো পথের সন্ধান;
চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল,—
হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধি-বিধানের এই কারাতল
তোমার ও-মায়াদণ্ডে ভেঙেছ মায়াবী।
জনতার কোলাহলে একা ব'সে ভাবি
কোন্ দূর জাদুপুর-রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী!
স্ফটিক আলোকে তব বিথারিয়া নীলাম্বরখানা
মৌন স্বপ্ন-ময়ূরের ডানা!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চোখে মোর মুছে যায় ব্যাধবিদ্ধা ধরণীর রুধির-লিপিকা
জ্বলে ওঠে অন্তহারা আকাশের গৌরী দীপশিখা!
বসুধার অশ্রু-পাংশু আতপ্ত সৈকত,
ছিন্নবাস, নগ্নশির ভিক্ষুদল, নিষ্করুণ এই রাজপথ,
লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার,
এই ধূলি,—ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার
ডুবে যায় নীলিমায়,—স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে,
—শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জে, শুক্লাকাশে, নক্ষত্রের রাতে;
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক,
তোমার চকিত স্পর্শে, হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক![১৩]

'নীলিমা' কবিতাটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ও কল্পনাশক্তির মিশ্রণে জীবনানন্দের পারঙ্গমতা প্রদর্শন করে। এখানে তিনি ভোরবেলায় একটা নগর ও আকাশকে দেখে অনুভব করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সূর্যোদয়ের মতো প্রাকৃতিক বিষয়ের ঘ্রাণ, আস্বাদ ও শ্রবণ লাভ করবেন। তাঁর কল্পনাপ্রবণ চোখ আরও এ-জাতীয় জিনিস দেখবে রেশমগুটির অন্ধকারে আবৃত কীটসদৃশ পৃথিবীর মতো, আকাশে তারা উঠলে ফেটে যাবে তা।

কবিতাটিতে ধানখেত আর তালগাছে ঘেরা ছোট শহরের মফস্বলের মানুষ জীবনানন্দের নগরের প্রতি বিরাগ স্পষ্ট। ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে তিনি থাকতেন 'নিঃসহায় নগরীর কারাগার প্রাচীরের পারে!' বাংলার রাজধানী ও সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগর কলকাতা যেসব কারণে উন্মত্ত জনতাকে প্রলুব্ধ করত, তার মধ্যে একটা বড় শহরের কর্মসংস্থানের সুযোগও আছে। সেখানে,

অগণন যাত্রিকের প্রাণ
খুঁজে মরে অনিবার,—পায় নাকো পথের সন্ধান;
চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল,—

. . . .
নিষ্করুণ এই রাজপথ,
লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার,

জীবনানন্দ শহরকে দেখান অনাকর্ষণীয় ধোঁয়ায় ঢাকা হিসেবে। যাঁরা কলকাতায় থেকেছেন, তাঁরা ঘরের রান্নার জন্য কাঠকয়লা আর পাথুরে কয়লার ধোঁয়া সম্পর্কে জানেন, যা প্রায়ই জ্বালানো হয় শুকনো গোবরের ঘুঁটে দিয়ে। সকালে একবার আর সন্ধ্যাবেলা, দিনে দুবার পানির বালতির আকারের এই চুলাগুলো জ্বালিয়ে রান্নাঘরকে অনিবার্য ধোঁয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাইরে বসানো হয়। "'—উদ্বেলিছে হেথা গাঢ় ধূম্রের কুণ্ডলী, উগ্র চুল্লি-বহ্নি হেথা অনিবার উঠিতেছে জ্বলি", একবার ভোরে আরেকবার রাতের বেলায় 'ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার' আকাশে মিলিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতির সেই দান আকাশকে নগরবাসীর কাছ থেকে স্থগিত করে রাখা হয়নি, নগরের কয়েদিদের জন্যও দেয় নিষ্কৃতি।

হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধি-বিধানের এই কারাতল
তোমার ও-মায়াদণ্ডে ভেঙেছ মায়াবী।

এর পরের পঙ্‌ক্তিগুলোতে ধরা আছে জীবনানন্দের সারকথা :

জনতার কোলাহলে একা বসে ভাবি
কোন্ দূর জাদুপুর-রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি'
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী!
স্ফটিক আলোকে তব বিথারিয়া নীলাম্বরখানা
মৌন স্বপ্ন-ময়ূরের ডানা!

জীবনের বেশির ভাগ সময় শারীরিকভাবে না হলেও আবেগের সঙ্গে একাকী বসে থেকেছেন তিনি, এবং চিন্তা করেছেন সবচেয়ে চমকপ্রদ উপায়ে।

১৯২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে *কল্লোল*-এ যখন 'নীলিমা' ছাপা হয়, তখন সঠিক কবিতাটি স্পষ্টতই সঠিক ক্ষেত্র পেয়েছিল, কারণ লেখাটা বহু তরুণ কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর স্মৃতিকথা *কল্লোল যুগ*-এ বলেন যে কবিতাটি পড়ে তিনি এতই চমৎকৃত হন যে তিনি তৎক্ষণাৎ অপরিচিত এই কবির সঙ্গে পরিচিত হতে চলে যান। সে সময় জীবনানন্দ হ্যারিসন রোডের (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) সামান্য পরে প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে থাকতেন, সেখান থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তাঁর কর্মক্ষেত্র সিটি কলেজ ছিল সহজ হাঁটা-দূরত্বে। ১৯৪৯ সালে *কল্লোল যুগ* বের হওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে জীবনানন্দ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লিখেছিলেন, 'তুমি Presidency Boarding এ প্রায়ই আসতে—বেড়াতে বেরুতাম তারপর—চৌরঙ্গীর দিকে প্রায়ই। অনেক কথা মনে পড়ছে—অনেক অনবলীন দিন মাস মুহূর্তের।'[১৪]

কয়েকজন তরুণ লেখক, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু স্মরণ করেন যে জীবনানন্দের প্রথম যে কবিতাটি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হচ্ছে 'নীলিমা'।[১৫] এই দুজনকে দুটো আলাদা পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তাঁদের সতীর্থ এই কবির সমর্থনে অনেক কিছু করতে হয়েছে। সে বছরেই প্রেমেন্দ্র মিত্র আরও দুজনের সঙ্গে কলকাতা থেকে নতুনধারার সাহিত্যের দ্বিতীয় প্রধান কাগজ *কালি কলম* প্রকাশ করেন, এই কাগজে জীবনানন্দের বহু কবিতা ছাপা হয়। তার এক বছর পর বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত ঢাকা থেকে বের করেন তরুণ লেখকদের তৃতীয় কণ্ঠস্বর *প্রগতি*। যদিও এই তিনটি কাগজ কোনোভাবেই ১৯২০-এর দশকের অগ্রসর লেখকদের সৃষ্টির একমাত্র প্রদর্শনী ছিল না, তবে এগুলো ছিল তাঁদের মূল মাধ্যম, যা 'কল্লোল যুগ' নামে পরিচিত আন্দোলনের ধারাটি রচনা করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের 'নীলিমা' যখন বের হয়, তখন মাত্র ১৭ বছরের বুদ্ধদেব ঢাকার একটা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। কিন্তু বুদ্ধদেবই সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে তাঁর চেয়ে ১০ বছরের বড় অপরিচিত কবি জীবনানন্দকে আবিষ্কার করে সামনের সারিতে নিয়ে আসেন। *কল্লোল* জীবনানন্দের কবিতা ছাপলেও অজিত দত্তের মতে কাগজটির লোকজন সত্যিকারভাবে জীবনানন্দের কবিতার মুগ্ধ পাঠক ছিলেন না। 'বিশেষত ওঁর বড় বড় কবিতাগুলি ছাপবার মতো অতটা স্থান দিতেও বোধহয় "কল্লোল" কর্তৃপক্ষের আপত্তি ছিল। কিন্তু "প্রগতি"তে ওঁর দীর্ঘ কবিতাগুলি আমরা খুশি হয়ে সমাদরে ছাপতাম।'[১৬] *প্রগতি* কেবল জীবনানন্দের কবিতা ছাপেনি, বুদ্ধদেব নিজে দায়িত্ব নিয়েছিলেন জীবনানন্দের ওপর দুটো সম্পাদকীয় লেখার, যা ছিল তাঁর ওপর লেখা প্রথম আলোচনা।

২

প্রগতি প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৯২৭ সাল থেকে। সে বছরের আগস্টে একটা দুর্দান্ত কাগজের পুনরাবির্ভাব ঘটে। *শনিবারের চিঠি* ও তার চালিকাশক্তি সজনীকান্ত দাস নান্দনিক শয়তানের ওকালতির ভূমিকা গ্রহণ করেন।[১৭] *শনিবারের চিঠি* ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকের সাহিত্যিকদের লেখার ব্যঙ্গাত্মক প্যারোডি লিখে তখনকার অগ্রসর ধারার সুনামহানির প্রচেষ্টায় খুব কম লেখককেই ছাড় দিয়েছে। একজন সাহিত্য-ইতিহাসবিদ লেখেন :

> নজরুলকে আক্রমণ করিয়া সজনীকান্তের সাহিত্যজীবনের সূচনা ঘটে। ক্রমে প্রায় প্রত্যেক খ্যাতিমান লেখক তাঁহার সমালোচনায় এভাবে আক্রান্ত হইতে থাকেন যে তাঁহার বা 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণের লক্ষ্য হওয়া সাহিত্যে প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক হইয়া দাঁড়ায়।[১৮]

আগে থেকেই যেমন বোঝা গেছে, জীবনানন্দ সজনীকান্তের বহু কন্টকাকীর্ণ গোলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন।

জীবনানন্দের প্রথম বই *ঝরা পালক* বের হয় ১৯২৭-এর শরৎকালে।[১৯] এতে ছিল ৩৫টি কবিতা, যার কয়েকটা প্রথম প্রকাশিত হয় *কল্লোল* ও *কালি কলম*-এ, আরেকটা ছাপা হয়েছিল *প্রগতি*তে। তিনি পরবর্তী সময়ে বইটির কবিতাগুলো প্রত্যাহার করেন। আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস লিখতে চাইছিলেন, এমন একজনের কাছে তিনি ১৯৪৬ সালের ২ জুলাই এক চিঠিতে লেখেন: 'প্রথম কবিতার বইটি পাঠাব কিনা ভাবছি সে বইয়ের বিশেষ কোনো importance আছে ব'লে মনে হয় না।'[২০] তৎসত্ত্বেও এই ৩৫টির মধ্যে তিনটি, মাত্র তিনটি কবিতা ১৯৫৪ সালে তাঁর জীবনের শেষ দিকে এসে প্রকাশিত *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ*

দুনিয়ার পাঠক এক হও

কবিতার অন্তর্ভুক্ত করতে দিয়েছিলেন তিনি। এই তিনটি ছিল 'নীলিমা', 'পিরামিড' ও 'সেদিন এ ধরণীর', যে কবিতাগুলো জীবনানন্দের ভবিষ্যৎ কাব্যিক ভাবনা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়।

সম্ভবত ভারতের মনোযোগ তুরস্কের এবং মেলামেশার সুবাদে পুরো মধ্যপ্রাচ্যের দিকে ঘুরে গিয়েছিল, সে কারণে জীবনানন্দের কাব্যদৃষ্টি ভারতের পশ্চিমের দেশগুলোর ওপর পড়ে। তবে নজরুলের সমসাময়িক বিষয়াবলির ওপর আলোকপাত করার বিপরীতে জীবনানন্দের আগ্রহ ছিল মিসর ও ব্যাবিলনের প্রাচীন সভ্যতার ওপর। মিসরের ফারাও ও সম্রাজ্ঞীরা, সে দেশের পিরামিড ও মমি—এসবের ওপর সারা জীবন বিশেষ করে তাঁর কবিজীবনের প্রথম দিকে ছিল বিশেষ আকর্ষণ। এমনকি তাঁর *ঝরা পালক* গ্রন্থের একটা কবিতার নাম 'মিসর', এটির প্রথম চার লাইনের মধ্যেই মমি, স্ফিংক্স্ ও পিরামিড—এসব শব্দ উদারভাবে ছড়ানো।[২১] যেকোনো কবিতায় পিরামিডের উল্লেখ থাকলে সেটাতে চমকপ্রদ এক স্বাদ পাওয়া যেত। উপরন্তু এসব সময়োত্তীর্ণ স্থাপনা ও বিষয়ের কারণে কলমের এক আঁচড়ে কবি অনন্তের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারতেন। আর জীবনানন্দ বছর কিংবা জীবৎকালের বদলে ভাবতেন অনন্তকাল নিয়ে।

নামেই যে কবিতাটিকে তাৎক্ষণিকভাবে স্থাপন করে মধ্যপ্রাচ্যে, সেই 'পিরামিড' কবিতায় সময়, মৃত্যু ও অমরত্বকে ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন করা হয়েছে।

—বেলা বয়ে যায়!
গোধূলির মেঘ-সীমানায়
ধূম্র মৌন সাঁঝে
নিত্য নব দিবসের মৃত্যুঘণ্টা বাজে!
শতাব্দীর শবদেহে শ্মশানের ভস্মবহ্নি জ্বলে!

কথক মৃত্যু আর প্রাচীনতার প্রতীকের কথা বলে :

কার লাগি হে সমাধি, তুমি একা বসে আছ আজ
কী এক বিক্ষুব্ধ প্রেতকায়ার মতন!

এমনকি জীবনানন্দ যখন ইতিপূর্বে দেখা বর্তমানের ওপর ভাবছেন, তাঁর চিত্রকল্পগুলো তখনো অতীতাশ্রয়ী হয়, যেমন তিনি ভোরকে আহ্বান করার জন্য তলব করছেন প্রাচীন মিসরের মেম্নন নামের প্রকাণ্ড মূর্তিদ্বয়কে।

জ্বলিয়া যেতেছে নিত্য নিশি-অবসানে
নূতন ভাস্কর!
বেজে ওঠে অনাহত মেম্ননের স্বর
নবোদিত অরুণের সনে
কোন্ আশা-দুরাশার ক্ষণস্থায়ী অঙ্গুলি-তাড়নে![২২]

সময় ও মহাশূন্যের এমন বিস্তৃতি জীবনানন্দের বহু কবিতায় স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখে যায়। তিনি বাস করতেন তাঁর নিজের অদ্ভুত কল্পনার জগতে, যার

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন কিছুটা উর্বর, অতি আবেগাক্রান্ত কল্পনাশক্তির মাধ্যমে এবং যা মানুষের একান্তভাবে শারীরিক ইন্দ্রিয়গোচর বোধের ওপর নির্ভরতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানত না। বহু পরে জীবনানন্দ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সত্যিকার সমসাময়িক বাস্তবতার দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন, তবে তার সাফল্য ছিল সীমিত। তিনি উজ্জ্বল থাকেন যখন প্রাকৃতিক মহাশূন্য এবং সময় থাকে উদ্দীপিত, গণ্ডিবদ্ধ নয়।

তাঁর বহু কবিতায় মৃত্যু পরিব্যাপ্ত থাকলেও জীবনানন্দের কাব্যিক ভুবন স্পন্দমানভাবে জীবন্ত। 'সেদিন এ ধরণীর' কবিতায় তিনি প্রকৃতির ওপর এমন মানবীয় গুণাবলি আরোপ করেন যে ভোর, তারকামণ্ডলী, হাওয়া, ঘাস এমনকি বিশ্বমাতা নিজেই জীবনের অলংকার পরে নেন।

চকিতে ছিঁড়িয়া গেল ধরণীর নাড়ীর বন্ধন,—
শুনেছিনু কান পেতে জননীর স্থবির ক্রন্দন,
মোর তরে পিছু ডাক মাটি-মা,—তোমার!
ডেকেছিল ভিজে ঘাস,—হেমন্তের হিম মাস, জোনাকির ঝাড়!
আমারে ডাকিয়াছিল আলেয়ার লাল মাঠ—শ্মশানের খেয়াঘাট আসি![২৩]

অবশ্য বিশ্বকে, ভারত কিংবা বাংলাদেশকে মায়ের ভূমিকায় দেখার চেয়ে প্রকৃতিকে ব্যক্তিকরণ নতুন কিছু নয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস *আনন্দমঠ* (১৮৮২) দেখায় বিপ্লবীরা স্লোগান দিচ্ছে 'বন্দে মাতরম', যার মাধ্যমে মাতৃভূমি অথবা ভারতমাতাকে সম্ভাষণ জানানো হয়। (এই স্লোগান পরবর্তী সময়ে সত্যিকার বাঙালি বিপ্লবীরা গ্রহণ করেছিল, এবং আজ অবধি শোনা যায় দ্বিতীয় জাতীয় সংগীতের মতো)। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' বাংলাকে মা বলে সম্বোধন করে। বি-মানবিক পরিবেশের মাধ্যমে জীবনকে জীবিত বা পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টায় জীবনানন্দ যে তীব্রতায় বাংলায় প্রাণসঞ্চার করবেন সেটা লক্ষণীয়।

ঝরা পালক কোনো অর্থেই খুব বেশি সাফল্য পায়নি। *কল্লোল* বইটির প্রকাশনার খবর দিয়ে জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে সাধারণ কিছু আলোচনা করে নিয়ম রক্ষা করেছিল।

ঝরা পালক

—কবিতার বই শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত প্রণীত। দাম এক টাকা।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত কাব্যসাহিত্যে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তরুণ কবির সমস্ত কবিতাতেই তারুণ্যের উল্লাস ধ্বনিত। তাঁর ছন্দ ভাষা ভাব সবেতেই বেশ বেগ আছে। ত্রুটি যা-কিছু আছে তা কখন কখন সেই বেগের অযথা আতিশয্য। নজরুল, মোহিতলালের প্রভাব তিনি এড়াতে পারেন নি বটে কিন্তু সে প্রভাবকে নিজের বৈশিষ্ট্যের পথে ফেরাতে পেরেছেন বলে মনে হয়।[২৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ বৈদ্য পদবি দাশগুপ্ত নামে লেখা শুরু করেছিলেন, যেটা তাঁর ঠাকুরদা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার পর ছেঁটে দাশ করে দিয়েছিলেন। তাঁর বাবা ও ঠাকুরদার মতো তিনিও 'গুপ্ত' বাদ দিয়ে দেন। বইটির প্রচ্ছদ ও ভূমিকা দুই জায়গাতেই কবির নাম ছিল জীবনানন্দ দাশ, *কল্লোল* অবশ্য তখনো তাঁকে দাশগুপ্ত হিসেবেই জানে।

আরেকটা আলোচনা লেখা হয়েছিল, কিন্তু সেটা কখনোই ছাপা হয়নি। সিটি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ও ব্রাহ্ম সরোজেন্দ্রনাথ রায়কে এক কপি জীবনানন্দের বই উপহার দেওয়া হয়েছিল। তিনি নিয়মিতভাবে বাংলা ও ইংরেজি প্রবন্ধ লিখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে পাঠাতেন, সেগুলো ছাপা হতো হয় *মডার্ন রিভিউ* অথবা *প্রবাসী*তে। এ সময় *ঝরা পালক*-এর ওপর তাঁর লেখা আলোচনা ছাপা হয়নি। রামানন্দ পরবর্তী সময়ে সরোজেন্দ্রনাথের কাছে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, লেখাটা তিনি ছাপতে চেয়েছিলেন, তবে সহসম্পাদকদের একজন আপত্তি তুলেছিলেন।[২৫] সে সময় *প্রবাসীর* সহসম্পাদক ছিলেন সজনীকান্ত।[২৬] জীবনানন্দের পাঠানো *ঝরা পালক* পেয়ে রবীন্দ্রনাথ একটা জবাব দিয়েছিলেন, অবশ্য সেটা কখনোই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। বহু বছর পর জীবনানন্দ এই শ্রদ্ধেয় কবির কাছে লিখেছিলেন, 'প্রায় নয় বছর আগে আমি আমার প্রথম কবিতার বই একখানা আপনাকে পাঠিয়েছিলুম। সেই বই পেয়ে আপনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন; চিঠিখানা আমার মূল্যবান সম্পদের মধ্যে একটি।'[২৭]

৩

সজনীকান্ত দাস ও তাঁর *শনিবারের চিঠি* শুধু জীবনানন্দ নয়, ১৯২০-এর দশকের সকল অগ্রসর লেখককে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই অদ্ভুত স্বভাবের লোকটি নতুন ধরনের সাহিত্যকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝার সুযোগ করে দিয়েছিলেন বিরোধিতার মাধ্যমে। উপরন্তু *সাহিত্যের গুণ্ডা*[২৮] নামে পরিচিত পত্রিকাটি যদিও সমসাময়িক বাঙালি লেখকদের ওপর আক্রমণ চালিয়েই উন্নতি লাভ করেছিল, তবুও পত্রিকাটির সঙ্গে জড়িত একজন লেখক, মোহিতলাল মজুমদার, কিছু গঠনমূলক সমালোচনা লিখেছিলেন। সত্যসুন্দর দাস ছদ্মনামে লিখে মোহিতলাল *শনিবারের চিঠির* প্রধান তাত্ত্বিক হিসেবে পরিগণিত ছিলেন।[২৯] 'সাহিত্যের আদর্শ' নামে একটা প্রবন্ধে মোহিতলাল পত্রিকাটির পরিচালিত যুদ্ধ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন :

> কিন্তু আধুনিক বাংলাসাহিত্যে মানুষের স্বরূপ ও বাস্তবরূপ অঙ্কিত করিবার অজুহাতে তার জীব-জীবনের মসীপঙ্ক উদ্ধার করিয়া এক নূতন আদর্শ-সৃষ্টির উদ্যম চলিতেছে। শাস্ত্র ও সমাজবিধির ত কথাই নাই, এই সব লেখকেরা যেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> উন্মাদ হইয়াছেন—যাহা কিছু সুন্দর, তাহারই বিরুদ্ধে ইঁহাদের আক্রোশ। মানুষ যাহাকে সহজ সংস্কারে কুৎসিত বলিয়া জানে, যাহা চিরদিন আছে ও থাকিবে, কেহ যাহাকে অস্বীকার করে না—তাহাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া, জীবনের যাহা কিছু শোভা ও সান্ত্বনা, তাহাই নষ্ট করিতে ইঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাই নাকি সত্যনিষ্ঠা ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা। এই মসী ও পঙ্ক মুখে মাখাই নাকি সত্যকার মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা! কাগজ, কলম ও কালির অস্ত্রে এই মহাবীর-সম্প্রদায় [মানে, 'শনিবারের চিঠি', যাকে বলা হত শনিমণ্ডল] 'মিথ্যা-সুন্দরে'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন।[৩০]

১৯২০ সালের শেষভাগে *কল্লোল*-এর লেখকেরা যখন সাহিত্যের পরিচয়যোগ্য শক্তি হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হন, তাঁদের এ রকম বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। শব্দটির সবচেয়ে পরিশীলিত অর্থে তাঁদের লেখার পঙ্কিলতা তাঁদেরই অসন্তুষ্ট করেছে, যাঁরা (যেমন ধরুন মোহিতলাল) মনে করেন, সাহিত্যকে মানবতার একটা বেদির ওপর রেখে দিতে হবে, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম হেঁটে যাওয়ার সময় দেখতে পায়। শিল্পের অমর কাজগুলো স্থানীয় মাটি থেকে করার নয়, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সম্মানজনক দূরত্বের খাঁটি মর্মর পাথর তুলে এনে তৈরি করতে হবে। মানুষের মহত্তম চরিত্রের মূল বিষয় হচ্ছে মন, দেহ নয়—যাকে এই জাদুঘরে রাখার সামগ্রীগুলোর সঙ্গে সম্মান করা উচিত। বেদির ওপর তাঁদের অবস্থানের সঙ্গে সংগতি রেখে অমর মানুষেরা কথা বলবেন উচ্চকণ্ঠে, আবর্জনাতুল্য সাধারণ মানুষের মতো বিড়বিড় করে নয়।

সজনীকান্ত গং কাব্যশৈলীর অবক্ষয়ে এত বিরক্ত হন যে গদ্যের মতো মনে হওয়া এই সব কাব্যচর্চাকে ব্যঙ্গ করার জন্য দুটো শব্দ মিলিয়ে তাঁরা একটা নতুন শব্দ আবিষ্কার করেন—'গবিতা', গদ্যের 'গ' ও কবিতার 'বিতা' নিয়ে তৈরি শব্দটি ছিল একই রকম ইংরেজি শব্দ 'Proetry'-র একটা কাঁচা অনুবাদ। সজনীকান্তের এই শব্দটি মূলত ১৯৩০-এর দশকে কী ঘটবে তারই পূর্বাভাস ছিল। কারণ জীবনানন্দসহ আরও অনেকে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তখন গদ্যকবিতা লিখছিলেন। 'গবিতা' শব্দটি দিয়ে কল্লোল যুগের কবিদের কবিতার অবমূল্যায়ন করার চেষ্টা করছিলেন সজনীকান্ত। *শনিবারের চিঠি*তে মোহিতলালের ঘোষণাপত্রটা ছাপা হওয়ার পরের সংখ্যায় 'সাহিত্য-বিভ্রাট' নামে একটা দীর্ঘ লেখা প্রকাশ হয়। এটির লেখকের নাম ছিল শ্রী বররুচি।[৩১] প্রহসনটিতে আদালতের মধ্যে একজন বিচারক (রবীন্দ্রনাথ) ও তরুণ আসামির (তরুণ লেখক) মধ্যে উপস্থাপিত সওয়াল জবাবের মধ্যে বিচারের মূল বিষয়টা জানান :

> তরুণদলের বিপক্ষে অভিযোগের বিষয় অনেক, কিন্তু প্রধান আক্ষেপ এই যে, তারা সাহিত্যকে মানসিক উর্ধ্বলোক থেকে দৈহিক কামলোকে নিয়ে চলেছে।

সাহিত্যের বড়সম্রাট—স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ—তরুণ অপরাধীদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> সাহিত্যের বড়সম্রাট দুঃখিত হ'য়ে বললেন—'আহা, তোমরা ছেলেমানুষের দল, সাহিত্যধর্ম্ম জিনিষটাই বুঝলে না। বস্তুরস ও কাব্যরস—এ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সজিনা-ফুলে বস্তুরস আছে, কিন্তু কাব্যরস নেই। দেহধর্ম্মটা সাহিত্যধর্ম্ম নয়। বিষয়বুদ্ধিটা একটু খাটো ক'রে সাহিত্যবুদ্ধির culture করো।[৩২]

স্মৃতিকথায় সজনীকান্ত কল্লোল যুগের লেখকদের নামে আরও বড় অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁরা পশ্চিমের অনুকরণ করছেন আর তার সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে ঘটছে সাহিত্যিক ক্ষমতার ক্ষতি।[৩৩] বাঙালি কবি-লেখকেরা পশ্চিমি প্রভাবের এই অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন প্রায় এক শতাব্দী ধরে। উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুতাপ করে বলেন, তাঁর নিজ দেশের লোকজন ধরে নেন, বাংলা ভাষায় যেকোনো ভালো কাজ মানেই অবশ্যই কোনো ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ। এই শতাব্দীতে, কোনো নামী সমালোচক একজন সিরিয়াস বাঙালি লেখকের বিরুদ্ধে কোনো পশ্চিমি বইয়ের পুরোদস্তুর কুম্ভীলকবৃত্তির অভিযোগ মেনে নেবেন না, তবে কোনো লেখক বা তাঁর সৃষ্টির ওপর পাশ্চাত্য প্রভাবের অভিযোগ সব সময় একটা নেতিবাচক অর্থ বহন করে।

শুধু সজনীকান্তের সমালোচনার ভিত্তিতে ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের দোসর হওয়া উচিত ছিল তাঁর। কারণ বহুদিন আগে থেকে রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রেরণার জন্য বিদেশের দিকে তাকানোর প্রবণতার ব্যাপারে আশঙ্কিত ছিলেন।[৩৪] ১৯১২ সালে সমসাময়িক সাহিত্যের পটভূমি সম্বন্ধে ভেবে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্য অনুসরণের উন্মাদনার কথা বলেন ও স্বীকার করেন যে তিনি অন্য কারও চেয়ে কম আলোড়িত হননি। কৈফিয়ত হিসেবে তিনি আরও বলেন :

> অথচ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের অবস্থার খুব একটা প্রভেদ ছিল। য়ুরোপীয় চিত্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেখানকার ইতিহাস হইতেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার অন্তরে বাহিরে একটা মিল ছিল। সেখানে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল বলিয়াই ঝড়ের গর্জন শুনা গিয়াছিল। আমাদের সমাজে যে অল্প-একটু হাওয়া দিয়াছিল তাহার সত্যসুরটি মর্মরধ্বনির উপরে চড়িতে চায় না—কিন্তু সেটুকুতে তো আমাদের মন তৃপ্তি মানিতেছিল না, এইজন্যই আমরা ঝড়ের ডাকের নকল করিতে গিয়া নিজের প্রতি জবরদস্তি করিয়া অতিশয়োক্তির দিকে যাইতেছিলাম। এখনো সেই ঝোঁকটা কাটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।[৩৫]

সতীর্থ লেখকদের ভিন্ন সংস্কৃতি (অর্থাৎ ইউরোপীয়) থেকে ধার করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিতে গিয়ে ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ-কেউ মনে করছেন নিত্যপদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না।'[৩৬]

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমমনা হলেও সবাইকে আক্রমণ করাটা বেশি পছন্দ করতেন বলে সজনীকান্ত বৃহৎ আকারের বন্ধু এবং সহযোগী চাইতেন না। তাই ১৯২৭-এর আগস্টে, যে মাসে *শনিবারের চিঠি* পুনঃপ্রকাশিত হয়, সে মাসেই অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটা পত্রিকায় তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সর্বশেষ একটা রচনা 'নটরাজ'কে আক্রমণ করে একটা লেখা লেখেন।[৩৭] এই সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত হন। সজনীকান্ত 'অরসিক রায়' ছদ্মনামে লিখেছিলেন—একটা উপযুক্ত বিশেষণ বটে। ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে প্রায় ধরা পড়ে গিয়ে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে একটা দীর্ঘ চিঠি লেখেন। ক্রোধোন্মত্ত রবীন্দ্রনাথ দ্রুত তার জবাব দিয়েছিলেন।[৩৮]

আঞ্চলিক ভাষার পাশাপাশি শাস্ত্রগতভাবে বাংলার দুটো প্রমিত রূপ আছে: চলিত ও সাধু, এই 'মান' আবার স্থান ও কালভেদে কিছুটা পৃথক হয়। উনিশ শতকে বাংলা গদ্য সমৃদ্ধি লাভ করলে সাধুভাষাটা প্রমিতকরণ করা হয়। ওই শতাব্দীর শেষে সাধু ভাষাকেই কেবল সাহিত্যের প্রকৃত মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হতে থাকে। কোঁনো বিশেষ চরিত্রকে রূপ দেওয়ার জন্য চলিত ভাষা ব্যবহার করা যেত, তবে সাহিত্যের বাকি কাজ হতো সাধু ভাষায়। সব সাংবাদিকতার ভাষা ছিল সাধু, যেমন ছিল জনসমক্ষের বক্তৃতা। শিক্ষিত বাঙালি সমাজ চলিত ভাষায় কথাবার্তা বললেও লিখত সাধু ভাষায়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে চলিত ভাষাকে সাহিত্যের মজলিসে আসন করে দেওয়ার জন্য একটা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের লেখা নিয়ে *সবুজ পত্র*-এর প্রকাশনা শুরু হয় ১৯১৪ সালে। *সবুজ পত্র*-এর পাতাতেই চলিত ভাষা ভদ্র সাহিত্যসভায় প্রথম পা রাখে। আজ কোনো বিশেষ সম্পাদকীয় লেখক ছাড়া আর কেউই সাধু ভাষা ব্যবহার করেন না। কিন্তু বিশের দশকের শেষ দিকে ব্যাপারটা ছিল ঠিক উল্টো, যেকোনো গুরুগম্ভীর লেখার মাধ্যম হিসেবে সাধু ভাষাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া অব্যাহত থাকে। তবে একজন সাধু বা চলিত যেটিই ব্যবহার করুন না কেন, এ দুই ভাষার মিশ্রণ বৈয়াকরণিক ভুলের সমতুল্য বলে পরিগণিত হতো।

সজনীকান্তের বিলম্বিত স্বীকারোক্তিতে রবীন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত জবাব বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল এটির বক্তব্যের চেয়ে শব্দ ব্যবহারের ওপর। সজনীকান্ত লেখেন, 'রবীন্দ্রনাথের সামান্য চিঠিপত্রেও কখনও সাধু-চলিত ভাষার সংমিশ্রণ দেখি নাই; কিন্তু সেদিন তিনি এমনি রাগিয়া গিয়াছিলেন যে, গুরুচণ্ডালী দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল।'[৩৯] 'গুরুচণ্ডালী' বলতে বোঝায় উঁচুর সঙ্গে নিচুর মিশ্রণ: গুরুরা সাধারণত উচ্চতম বর্ণের ব্রাহ্মণ, আর চণ্ডালী হচ্ছে বর্ণপ্রথার স্তরবিন্যাসে নিম্নতম শ্রেণী, অচ্ছুৎ নারী।

সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছিলেন অন্য কিছুর চেয়ে বেশি বিনোদনের জন্য। কারণ সুসাহিত্য সম্পর্কে *শনিবারের চিঠির* ধারণা রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এখানে *কল্লোল*-এর লেখকদের বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এঁদের বিরুদ্ধে প্রচারণাকে সহজতর করার জন্য ১৯২৭-এর অক্টোবর সংখ্যা থেকে *শনিবারের চিঠি* 'মণিমুক্তা' শিরোনামে একটা কলাম চালু করে, যার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লেখকের নামটা ছিল অর্থবহ, 'মণি-মুক্তা, শ্রীডুবুরি কর্তৃক আহৃত।'[৪০] সম্পাদক ব্যাখ্যা করেন : '*শনিবারের চিঠির* ডুবুরি আধুনিক সাহিত্য-সমুদ্রে ডুব দিয়া অনেক মণি-মুক্তা আহরণ করিয়াছেন।'

শনিবারের চিঠি অন্যান্য পত্রিকার যেসব লেখাকে আপত্তিকর বলে মনে করত, তার অংশগুলো তুলে দেওয়া হতো এই শাখায়। বন্ধু যেমন ছিল, তেমনি শত্রুও ছিল, তাঁরা সজনীকান্তের কাছে উল্লেখ করেন, তিনি আপত্তিকর সাহিত্যকে আরও বেশি প্রচারণা দিচ্ছেন, একই সঙ্গে তিনি তাঁর নিজস্ব পাঠকদের অসন্তুষ্ট করেন—বিশেষ করে যাঁরা তাঁর মূল্যায়নের সঙ্গে একমত ছিলেন যে এসব সাহিত্য একেবারেই প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়। সজনীকান্ত মণি-মুক্তার ভূমিকায় নিম্নোক্ত জবাব দিয়েছিলেন :

> 'মণিমুক্তা' প্রকাশ করিবার এখনও প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি। অশ্লীলতার জন্য যাহারা 'শনিবারের চিঠি'র 'মণিমুক্তা' অংশটি না ছিঁড়িয়া বাড়ি যাইতে পারেন না বলিয়া আপত্তি করেন তাঁহাদের জন্য 'মণিমুক্তা' perforate করিয়া দিলাম।[৪১]

শনিবারের চিঠির পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে 'মণিমুক্তা' বিভাগের পাতাগুলো ছিদ্র ছিদ্র করা থাকত।

'মণিমুক্তা' ছাড়াও *শনিবারের চিঠি* 'সংবাদ-সাহিত্য' নামে আরেকটি নিয়মিত সম্পাদকীয় বিভাগ চালু করে, যেখানে সম্পাদক ও তাঁর বন্ধুরা লেখক ও তাঁদের লেখা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। 'মণিমুক্তা'য় যে অভাবটা ছিল, 'সংবাদ-সাহিত্যে' আধুনিক লেখকদের লেখার আপত্তিকর অংশগুলো উদ্ধৃত না করে কেবল তাঁদের এবং তাঁদের লেখার দুর্বলতা সম্পর্কে মন্তব্য করে সজনীকান্ত তা পুষিয়ে নেন। যদিও তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনে সজনীকান্ত নিজেকে জানতেন তীব্র রসিকতা ব্যবহারকারী হিসেবে, *শনিবারের চিঠির* কৌতুকগুলো ছিল প্রায়ই বোকাটে ধরনের, ব্যঙ্গগুলো আর যা-ই হোক সূক্ষ্ম নয় :

> প্রগতি নামে এটি 'লালপত্র' আছে। সবুজই [প্রমথ চৌধুরীর পত্রিকা *সবুজ পত্র*-এর প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত] সম্ভবত লজ্জায় লাল—বয়স কম বলিয়া।[৪২]

শনিবারের চিঠির ডিসেম্বর ১৯২৭ সংখ্যার শেষ পাতায় একটা পূর্ণপৃষ্ঠা নকল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় :

> বিখ্যাত বাংলা মাসিকের জন্য
> সম্পাদক
> সহকারী সম্পাদক
> সমালোচক
> গল্প লেখক
> ঔপন্যাসিক
> চাই...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাংলা ভাষা জানা নিষ্প্রয়োজন
...নং পটুয়াটোলা স্ট্রীটে আবেদন করুন।

কল্লোল-এর অফিস ছিল ১০, পটুয়াটোলা স্ট্রিট, কলকাতা।

অশ্লীলতা, অসাহিত্যিক শব্দপ্রয়োগ ও অস্থানীয় প্রভাব (কুখ্যাত সেই পাশ্চাত্য প্রভাব)—এই তিনটি বায়ুকল, যা দিয়ে *শনিবারের চিঠি* বীরের মতো যুদ্ধ করত। সজনীকান্ত ও তাঁর বীর যোদ্ধারা কখনো কখনো তাঁদের আক্রমণে বীরত্বের রীতিনীতি অগ্রাহ্য করতেন, যেমন—অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উদ্ধৃত করতে দ্বিধা করতেন না তাঁরা। অতীতের ঘটনাবলির কথা স্মরণে রেখে সজনীকান্ত তাঁকে ও *শনিবারের চিঠি*কে অন্যরা যেভাবে দেখত, তার চেয়ে ভিন্ন একটা ভাবমূর্তি ধরে রাখতেন। তাঁর বিরোধীরা তাঁর পরিপ্রেক্ষিত থেকে তাঁর যা উদ্দেশ্য তার থেকে ভিন্নভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করতেন :

> তরুণেরা সেদিন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রৌঢ় বয়স উত্তীর্ণ হইয়া আজিও ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও করিতেছেন যে, 'শনিবারের চিঠি'র অভিযান ছিল অশ্লীলতার বিরুদ্ধে। কথাটা ঠিক নয়। আমাদের জেহাদ ঘোষিত হইয়াছিল ভানের বিরুদ্ধে, ন্যাকামির বিরুদ্ধে, দুর্বল ও অক্ষমের লালায়িত সৃক্বণীলেহনের বিরুদ্ধে।[৪৩]

এসব প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি কী করছেন, সে সম্পর্কে নিজে সম্পূর্ণ সচেতন থাকুন বা না থাকুন সজনীকান্ত অশ্লীলতাকে তাঁর প্রধান লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন।

৪

*প্রগতি*র ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় জীবনানন্দের 'পিপাসার গান', যা সাহিত্যে অমর্যাদাকর সবকিছুর শাস্তিদাতা ক্রুসেডরত সজনীকান্তের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

পিপাসার গান

কোনো এক অন্ধকারে আমি
যখন যাইব চ'লে—আরবার আসিব কি নামি
অনেক পিপাসা লয়ে এ মাটির তীরে
তোমাদের ভিড়ে!
কে আমারে ব্যথা দেছে,—কে বা ভালোবাসে,—
সব ভুলে,—শুধু মোর দেহের তালাশে
শুধু মোর স্নায়ু শিরা রক্তের তরে
এ মাটির 'পরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আসিব কি নেমে!
পথে পথে,—থেমে—থেমে—থেমে
খুঁজিব কি তারে,—
এখানের আলোয়-আঁধারে
যেইজন বেঁধেছিল বাসা!—
মাটির শরীরে তার ছিল যে পিপাসা,
আর যেই ব্যথা ছিল,—যেই ঠোঁট, চুল,
যেই চোখ,—যেই হাত,—আর যে আঙুল
রক্ত আর মাংসের স্পর্শসুখভরা,—
যেই দেহ একদিন পৃথিবীর ঘ্রাণের পসরা
পেয়েছিল,—আর তার ধানীসুরা করেছিল পান,
একদিন শুনেছে যে জল আর ফসলের গান,
দেখেছে যে ঐ নীল আকাশের ছবি
মানুষ-নারীর মুখ,—পুরুষ—স্ত্রীর দেহ সবি
যার হাত ছুঁয়ে আজো উষ্ণ হয়ে আছে,—
ফিরিয়া আসিবে সে কি তাহাদের কাছে!
প্রণয়ীর মতো ভালোবেসে
খুঁজিবে কি এসে
একখানা দেহ শুধু!—
হারায়ে গিয়েছে কবে কঙ্কালে কাঁকরে
এ মাটির 'পরে।

অন্ধকারে সাগরের জল
ছেনেছে আমার দেহ,—হয়েছে শীতল
চোখ—ঠোঁট—নাসিকা—আঙুল
তাহার ছোঁয়াচে;—ভিজে গেছে চুল
শাদাশাদা ফেনাফুলে;
কতবার দূর উপকূলে
তারাভরা আকাশের তলে
বালকের মতো এক—সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
জেনেছি দেহের স্বাদ;—গেছে বুক—মুখ পরশিয়া
রাঙা রোদ,—নারীর মতন
এ দেহ পেয়েছে যেন তাহার চুম্বন
ফসলের ক্ষেতে!
প্রথম প্রণয়ী সে যে, কার্তিকের ভোরবেলা দূরে যেতে যেতে
থেমে গেছে সে আমার তরে!
চোখ দুটো ফের ঘুমে ভরে
যেন তার চুমো খেয়ে!
এদেহ,—অলস মেয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুরুষের সোহাগে অবশ!—
চুমে লয় রৌদ্রের রস
হেমন্ত বৈকালে
উড়ো পাখপাখালীর পালে
উঠানের;—পেতে থাকে কান,—
শোনে ঝরা শিশিরের গান
অঘ্রানের মাঝরাতে;
হিম হাওয়া যেন শাদা কঙ্কালের হাতে
এ দেহেরে এসে ধরে,—
ব্যথা দেয়! নারীর অধরে
চুলে—চোখে—জুঁয়ের নিশ্বাসে
ঝুম্‌কো-লতার মতো তার দেহ-ফাঁসে
ভরা ফসলের মতো পড়ে ছিঁড়ে
এই দেহ,—ব্যথা পায় ফিরে!...
তবু এই শস্যক্ষেতে পিপাসার ভাষা
ফুরাবে না;—কে বা সেই চাষা,—
কাস্তে হাতে,—কঠিন,—কামুক,—
আমাদের সবটুকু ব্যথাভরা সুখ
উচ্ছেদ করিবে এসে একা!—
কে বা সেই!—জানি না তো,—হয় নাই দেখা
আজো তার সনে;
আজ শুধু দেহ—আর দেহের পীড়নে
সাধ মোর;—চোখে ঠোঁটে চুলে
শুধু পীড়া,—শুধু পীড়া!—মুকুলে মুকুলে
শুধু কীট,—আঘাত,—দংশন,—
চায় আজ মন!

নক্ষত্রের পানে যেতেযেতে
পথ ভুলে বারবার পৃথিবীর ক্ষেতে
জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল!—
অন্ধকারে শিশিরের জল
কানে কানে গাহিয়াছে গান,—
ঢালিয়াছে শীতল আঘ্রাণ;
মোর দেহ ছেনে গেছে অলস—আঢুল
কুমারী আঙুল
কুয়াশার; ঘ্রাণ আর পরশের সাধ
জাগায়েছে,—কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
ঢালিয়াছে আলো,—
প্রণয়ীর ঠোঁটের ধারালো
চুম্বনের মতো!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রেখে গেছে ক্ষত
সব্জীর সবুজ রুধিরে!
শস্যের মতো মোর এ শরীর ছিঁড়ে
বারবার হয়েছে আহত
আগুনের মতো
দুপুরের রাঙা রোদ!
আমি তবু ব্যথা দেই,—
ব্যথা পাই ফিরে!—
তবু চাই সবুজ শরীরে
এ ব্যথার সুখ!
লাল আলো,—রৌদ্রের চুমুক,
অন্ধকার,—কুয়াশার ছুরি
মোরে যেন কেটে লয়,—যেন গুঁড়ি গুঁড়ি
ধুলো মোরে ধীরে লয় শুষে!—
মাঠে—মাঠে—আড়ষ্ট পউষে
ফসলের গন্ধ বুকে করে
বারবার পড়ি যেন ঝরে!
আবার পাব কি আমি ফিরে
এই দেহ!—এ মাটির নিঃসাড় শিশিরে
রক্তের তাপ ঢেলে আমি
আসিব কি নামি!
হেমন্তের রৌদ্রের মতন
ফসলের স্তন
আঙুলে নিঙাড়ি
এক ক্ষেত ছাড়ি
অন্য ক্ষেতে চলিব কি ভেসে
এ সবুজ দেশে
আর এক বার! শুনিব কি গান
ঢেউদের!—জলের আঘ্রাণ
লব বুকে তুলে
আমি পথ ভুলে
আসিব কি এ পথে আবার!
ধুলো-বিছানার
কীটেদের মতো
হব কি আহত
ঘাসের আঘাতে!
বেদনার সাথে
সুখ পাব!
লতার মতন মোর চুল!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার আঙুল
পাপড়ির মতো,—
হবে কি বিক্ষত
তোমার আঙুলে—চুলে!
লাগিবে কি ফুলে
ফুলের আঘাত! আর বার
আমার এ পিপাসার ধার
তোমাদের জাগাবে পিপাসা!
ক্ষুধিতের ভাষা
বুকে ক'রে ক'রে
ফলিব কি!—পড়িব কি ঝ'রে
পৃথিবীর শস্যের ক্ষেতে
আর একবার আমি—
নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে।[৪৪]

শনিবারের চিঠি মার্চ ১৯২৮ সংখ্যায় সজনীকান্ত লেখেন :

> অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশগুপ্ত ফাল্গুনের 'প্রগতি'তে 'পিপাসার গান' শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন—
> ১. আচুল কুমারী আঙুল কুয়াশার—
> ২. ফসলের স্তন আঙুল নিঙাড়ি—
> ৩. আমার আঙুল পাপড়ির মত হবে কি বিক্ষত তোমার আঙুলে—চুলে!
> ৪. যে আঙুল রক্ত আর মাংসের স্পর্শসুখভরা—
> ৫. আঙুল তাহার ছোঁয়াচে।
> —হায় আঙুল![৪৫]

জীবনানন্দের আঙুল মনে হয় মারাত্মক রকম উদার, কলঙ্ক রটনাকারী সজনীকান্তের কল্পিত ক্রোধমিশ্রিত ঘৃণা সে রকমই বলে।

অথচ কবিতাটি জীবনানন্দের হৃদয়ের কাছাকাছি একটা বিষয় নিয়ে সংঘাতে লিপ্ত : পুনরুজ্জীবন বা জন্মান্তর। তাঁর এই ভাবনা তাঁর অন্য কবিতায়ও আমরা দেখি, যেমন 'কমলালেবু' :

কমলালেবু

একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব
আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে?
আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।[৪৬]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'পিপাসার গান' কবিতায় কবি একটা কুয়াশাচ্ছন্ন পার্থিব প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা করছেন। এই শব্দ দুটি—কুয়াশাচ্ছন্ন ও পার্থিব—যদি একটির সঙ্গে আরেকটি কারও কাছে যৌক্তিকভাবে বিসদৃশ মনে হয়—হতে পারে। জীবন, মৃত্যু ও সম্ভাব্য পুনর্জন্মকে সব সময় যৌক্তিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে দ্বিধা এবং তাঁর নিজের ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে জীবনানন্দ পুনর্জন্মের ধারণাটিকে বাঁকিয়ে দেন। পুনরুজ্জীবন শব্দটির মধ্যে যে অর্থ রয়েছে তা বোঝায় জৈবিক বিষয়াবলির মধ্যে পুনরাগমন। তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী একটা শিরোনামহীন সনেটে সরাসরি জৈবিক মূর্ততার কথা বলা হয়েছে:

> আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
> হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
> হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
> কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;[৪৭]

কিন্তু বহুমাত্রিক ইন্দ্রিয়জাত উপভোগের অভিজ্ঞতা থেকে 'পিপাসার গান'-এ কবি লতাগুল্মসহ বেশ কিছু পার্থিব বাসস্থলের কথা কল্পনা করেছেন, যা তাঁর 'ঘাস' কবিতার বিষয়বস্তু, যেমন: 'ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার/শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।'[৪৮]

'পিপাসার গান'-এর সব শব্দকল্পের জন্য কুয়াশাচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি থেকে যায়, যেভাবে জীবনানন্দ পুরুষ থেকে স্ত্রী, আবার পুরুষ লিঙ্গে ফিরে আসেন তাতে লিঙ্গের অস্পষ্টতা আরও ঘনীভূত। বাংলা ভাষায় সর্বনামের কোনো লিঙ্গভেদ নেই বলে এতে ইংরেজির চেয়েও বেশি আভিধানিক দ্ব্যর্থকতা থাকে। বাংলায় সর্বনামের নামপুরুষ 'সে' বলতে পুরুষ বা নারী উভয়কেই বোঝায়। বিশেষ্য হিসেবে 'রমণী' অবশ্য লৈঙ্গিকভাবে দ্ব্যর্থক নয়, কিন্তু এই কবিতায় এ রকম শব্দ খুব বেশি ব্যবহৃত হয়নি। দ্ব্যর্থকতা কেবল লিঙ্গবিচারে উপস্থিত নয়, কবির পুনর্বাসনের কল্পচিত্রেও উপস্থিত—এটা কি জৈবিক নাকি তৃণগুল্ম বিষয়ে, অথবা কুয়াশাময় পার্থিব, নাকি দুটোরই সমন্বয়ে?

আনন্দ ও বেদনার মধ্যে যে সংঘাত, সেটা এই দ্ব্যর্থকতায় প্রতিফলিত, এই সংঘাত জীবনানন্দের বহু কবিতায় বিরাজমান। মানবসমাজে বাস করা মানে আবেগের দুঃখভোগ করা। কিন্তু অমানব হিসেবে বাঁচতে গেলেও দুঃখক্লেশ আছে, তবে তা অন্য রকম: ঘাসের আঘাতে কীট-পতঙ্গ পিষ্ট হয়, ধরণীর রয়েছে তৃষ্ণার তীব্র বেদনা। এমনকি তবুও জীবনানন্দের কাছে ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা ভালো, যতই কঠিন হোক, যে রূপেই হোক—জীবনের মূল্যের সত্যায়ন। তিনি আমাদের বলেন, বার বার নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে তাঁর যাত্রা থেকে ফিরিয়ে আনতে চেয়ে আবার 'এ ব্যথার সুখ' পাওয়ার জন্য জীবন নিরন্তরভাবে আমাদের প্রলুব্ধ করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫

সে বছরের (১৯২৮) মার্চ ছিল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। *কল্লোল*-গোষ্ঠী ও তার কুৎসা রটনাকারীরা তখন পরস্পরের প্রতি বিষোদ্‌গার বিনিময় করছিল। উভয় পক্ষ বাঙালি শিক্ষিত সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটির, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের, সম্মোহনী বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে সতর্ক ছিল, কাউকে স্বতন্ত্র পরিচয় পেতে হলে রবীন্দ্রনাথকে সচেতনভাবে প্রতিরোধ করতে হবে, তরুণ লেখকেরা এ রকমই ভাবতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সহজে অস্বীকার করা যায়নি। যখন অন্যেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করছিল অথবা যেটাকে তিনি বাংলা সাহিত্যের সঠিক গতিপথ বলে বিবেচনা করতেন সেটাকে অস্বীকার করছিল, তিনি নিশ্চল বসে ছিলেন না।

আগের বছর রবীন্দ্রনাথ জাভা ও বালি ভ্রমণে গিয়েছিলেন। যাত্রার ঠিক আগে তিনি নতুন সাহিত্যপত্র *বিচিত্রায়* 'সাহিত্যের ধর্ম'[৪৯] নামের একটা লেখা দিয়ে যান। তাঁর সম্পূর্ণ অজান্তে লেখাটি তরুণ লেখকদের মধ্যে হইচই ফেলে দেয়। তাঁদের ধারণা, এ লেখায় তাঁদের সাহিত্য প্রয়াসকে খাটো করে দেখা হচ্ছে। জাহাজে থাকা অবস্থাতেই তাঁর লেখাটি যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছে, সে সম্পর্কে কোনো আভাস ছাড়াই তিনি আরেকটি লেখা লেখেন 'সাহিত্যে নবত্ব', এটা তিনি অক্টোবরে দেশে ফেরার পর *প্রবাসী*তে ছাপতে দেন।[৫০] এই দুটো লেখায় রবীন্দ্রনাথ যুক্তি দেখান, *শনিবারের চিঠিতে* মোহিতলাল মজুমদার আগে যে রকম লিখেছেন, সাহিত্য মানুষের স্থূল পশুপ্রকৃতির প্রতিফলন হওয়া উচিত নয়, বরং হওয়া উচিত আরও বিশুদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের, এবং পশ্চিমের উদারনৈতিকতা ও সামাজিক-রাজনৈতিক ধারণার অংশীদার হওয়া তার উচিত নয়।[৫১] স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন লেখকেরা অনুকরণ করতে পারেন, এটাই হচ্ছে ঝালাই করা নতুন সাহিত্যের দুর্বলতা, যা তাঁর মতে কৃত্রিম বিভিন্ন উপাদানে ফাঁদা। রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> অপটুই কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে; সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য, নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ। বাঁধিগতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই ব'লেই সে হাল-আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলো বাঁধি বুলি সংগ্রহ ক'রে রাখে। বিলিতি পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি ক'রে রাখে; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে; লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে-সাজানো বাঁধিবুলি আছে—অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি-পাউডর'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন[illegible]-একটা লালসার অসংযম।[৫২]

রবীন্দ্রনাথের [illegible] কিছুটা [illegible]ছিল, [illegible]ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তিনি *কল্লোল*-এর বির[illegible] [illegible]র পক্ষা[illegible]লম্বন [illegible]ন। উভয় পক্ষের মধ্যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এমনকি রবীন্দ্রনাথের প্রতিও যখন বাগ্‌বিতণ্ডা বেড়ে যায়, তখন কিছু লোক অনুভব করলেন, সব পক্ষকে বিষয়টা সুশৃঙ্খলভাবে আরও বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে দেখতে হবে। মধ্যস্থতা করতে বলা হলে রবীন্দ্রনাথ অনিচ্ছুকভাবে রাজি হন এবং মার্চ মাসে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় তাঁর পৈতৃক বাড়ির বিচিত্রা ভবনে (সাহিত্যপত্র *বিচিত্রার* সঙ্গে কোনো সম্পর্কবিহীন) একটা দুই দিনের সম্মেলন আহ্বান করেন। সেই সম্মেলনে একাধারে ঘোষক, মুখ্য আলোচক ও সমন্বয়কারী ষাট বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুটো প্রবন্ধের বিষয়গুলো পুনরুল্লেখ করে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে ও সাহিত্য রচনা করতে হবে, এসব নিয়ে তরুণ শ্রোতাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'আধুনিক সাহিত্যের গতি বা রীতি নিয়ে যে তর্ক উঠেছে তার মীমাংসা নিয়েই সে সভা। মীমাংসা আর কি, রবীন্দ্রনাথ কি বলেন তাই শোনা।'[৫৩] দ্বিতীয় দিনের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি *শনিবারের চিঠির* ধাঁচে সাহিত্য-সমালোচনা অনুমোদন করেন কি না, তিনি ওগুলোকে অনুচিত, 'বস্তুত নিষ্ঠুর' সাহিত্যপদ্ধতি বলে আখ্যায়িত করেন, যা তাঁকে কষ্ট দেয়।[৫৪]

সম্মেলনটি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সামান্যই প্রভাব ফেলে, সজনীকান্ত গাদা গাদা লিখে যাচ্ছিলেন তাঁর অসার সমালোচনা। আরও উচ্চকণ্ঠ *কল্লোল*-গোষ্ঠীর লেখকেরা তাঁদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের তিরস্কারের জন্য হইচই করে আগের মতো যে যার কাজ করতে থাকেন। আর জীবনানন্দ, যিনি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না, সাহিত্যের এই ঘূর্ণিপাকের মধ্যে তাঁর কবিতা লিখে যাচ্ছিলেন।

বিবদমান দুই পক্ষ সমঝোতায় না এলেও বিচিত্রা ভবনের সম্মেলন থেকে কিছু ভালো ও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ফল বের হয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ অবচেতনে প্রগতিশীল তরুণ লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিংবা যেভাবেই হোক একটা কাব্যধর্মী উপন্যাস লেখেন, *শেষের কবিতা*,[৫৫] যা আবার তাঁর ক্ষমতা ও চিরায়ত আধুনিকতা প্রকাশ করে। বুদ্ধদেব ও *কল্লোল*-গোষ্ঠী এটিতে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন :

> যা-কিছু চেষ্টা করছিলাম অথচ ঠিক পারছিলাম না, সেই সবই রবীন্দ্রনাথ করেছেন—কী সহজে, কী সম্পূর্ণ ক'রে, কী সুন্দর ভঙ্গিতে। মনে হ'লো বইটা যেন আমাদেরই, অর্থাৎ নবীন লেখকদেরই উদ্দেশে লেখা, আমাদেরই শিক্ষা দেবার জন্যে এটি গুরুদেবের একটি তির্যক ভর্ৎসনা। অবাক হ'য়ে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক' মূর্তি—[৫৬]

এখন *কল্লোল*-গোষ্ঠীকে শুধু *শনিবারের চিঠির* সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছিল না। তাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রশংসামুগ্ধতা ভাঙার জন্যও—*শেষের কবিতার* মূল চরিত্র অমিত রায় যেভাবে বলেন যে তাঁদের অনেকেই বিমুগ্ধতাকে তাঁদের চরম শত্রু বলে মনে করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৬

*শনিবারের চিঠি*তে যা প্রকাশিত হয়েছিল, তার একেবারে বিপরীতে বুদ্ধদেব বসু *প্রগতি*র সেপ্টেম্বর সংখ্যায় জীবনানন্দের কবিতার ওপর একটা সিরিয়াস আলোচনামূলক বক্তব্য প্রকাশ করেন, অনুপম এই আধুনিক কবিকে বোঝার জন্য এটা ছিল কোনো সমালোচকের প্রথম প্রয়াস। বুদ্ধদেব উল্লেখ করেন, আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও ১৯২০-এর দশকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে, সাহিত্যিক আধুনিকতাকে জীবনানন্দ সেভাবে প্রতিনিধিত্ব করেননি। নমুনারহিত জীবনানন্দ ভ্রমণ করেছেন 'বাংলা কবিতার অনাবিষ্কৃত নদীতে'। বুদ্ধদেব লেখেন :

> আজ পর্যন্ত জীবনানন্দবাবু বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে' আমাদের মনে হয়। তিনি এ-পর্যন্ত মোটেই popularity অর্জন করতে পারেননি, বরঞ্চ তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধ হয় বিমুখ;—অচিন্ত্যবাবুর মত তাঁর এরি মধ্যে অসংখ্য imitator জোটেনি। তার কারণ বোধ হয় এই যে জীবনানন্দবাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ;...তাঁর কবিতা একটু ধীরে-সুস্থে পড়তে হয়, আস্তে-আস্তে বুঝতে হয়।[৫৭]

বুদ্ধদেব 'রস' শব্দটিকে যথার্থভাবে বাছাই করেছিলেন, ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে যার সমৃদ্ধ অর্থ রয়েছে। রসের প্রথম অর্থ নির্যাস বা তরল পদার্থ, যেমন কমলার রস। বর্ধিত অর্থ সারবস্তু কিংবা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। আগে সংস্কৃত নন্দনতাত্ত্বিকেরা রস কিংবা আবেগকেন্দ্রের ওপর মনঃসংযোগকে সুসাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে মনোনীত করেছেন। আটটি রস (কারও মতে ১০টি) চিহ্নিত করা হয়েছিল : শৃঙ্গার রস, বীর রস, বীভৎস রস, রৌদ্র রস, হাস্য রস, ভয়ানক রস, করুণ রস ও অদ্ভুত রস। পরবর্তী সময়ে তাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন আবেগকে চিহ্নিত না করে সব আবেগের সারবত্তা—অনুভবকে বিরল ও নির্দিষ্ট কিছু থেকে আলাদা হিসেবে নিয়ে রসের মূল ধারণাকে আরও পরিশুদ্ধ করেন।[৫৮]

সংস্কৃত সাহিত্য সংস্কৃত ভাষার মতোই সাধারণ মানুষের জন্য ছিল না, ছিল খুব সংস্কৃতিবান শিক্ষিত পাঠকের জন্য। এই পাঠক শ্রোতাদের বলা হতো রসিক, নন্দনতত্ত্ব শিক্ষার ফলে যাঁরা রস বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারবেন। বাংলায় এই শব্দটি সংস্কৃতের মতো একই ধরনের অর্থ বহন করে না। বাংলা ভাষায় বিশেষণ রসিক বলতে সাধারণভাবে বোঝায় 'কৌতুকপ্রিয়', কিন্তু কোনোভাবে এমনকি প্রাথমিকভাবেও সাহিত্যবিশারদ বোঝায় না। রসের মূল অর্থ 'নির্যাস' ছাড়াও এখনো এটা বোঝায় সাহিত্যের গূঢ়ার্থ, যদিও সংস্কৃত কাব্যের বিশেষাভিধানিক অর্থটা এখন হারিয়ে গেছে। বাংলায় কেউ যখন একটা ভালো আধুনিক সাহিত্যকর্ম অথবা এমনকি সিনেমায় 'রস' আছে বলে, তার অর্থ বোঝায় যে এটি শিল্পবিচারে সফল। বুদ্ধদেব যখন ইঙ্গিত দেন, যেমনভাবে একজন ধ্রুপদী রসিক প্রশিক্ষিত হতেন তেমনিভাবে জীবনানন্দের কবিতা বোঝার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্য একজনকে সময় ও প্রশিক্ষণ নিতে হবে, তখন তিনি সংস্কৃত ও বাংলায় রসের বিভিন্ন গূঢ়ার্থের দিকে নজর দেন।

রসের উল্লেখ করলেও বুদ্ধদেব জীবনানন্দের কবিতাকে সমসাময়িক সংস্কৃতের মূর্তরূপ বলে প্রশংসা করেননি। বরং তা থেকে অনেক দূরে। অন্য সমালোচকেরা, তবে বিশেষ করে বুদ্ধদেব দৃঢ় যুক্তি দেখান যে সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হলেও (পর্তুগিজ যেমন ল্যাটিন থেকে) বাংলাই বাঙালি কবিদের স্বতন্ত্র ও সম্মানজনক ভাষা হওয়া উচিত। ইংরেজি যেমন ল্যাটিনঘেঁষা শব্দসম্ভার ব্যবহার করে লেখা যায়, তেমনি বাংলাও ব্যবহারোপযোগী সংস্কৃত শব্দের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার ধারণ করে (ভারতীয় জাতীয় সংগীত এমন ভারী সংস্কৃতঘেঁষা বাংলা দিয়ে লেখা যে কোনো কোনো ভারতীয় কিরেকেটে বলবেন—ওটা সংস্কৃতে লেখা, বাংলায় নয়)। ১৯২০-এর দশকে রচনাশৈলী সাহিত্যমহলে একটা বিতর্কের বিষয়বস্তু ও *শনিবারের চিঠির* আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিল। জীবনানন্দের কাব্যশৈলী সম্পর্কে বুদ্ধদেব বলেন :

> তাঁর প্রধান বিশেষত্ব আমরা এই লক্ষ্য করি যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে' শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার ক'রেই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তাঁর diction সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব বস্তু হয়ে পড়েছে—তা'র অনুকরণ করাও সহজ বলে' মনে হয় না।[৫৯]

জীবনানন্দ নিজের জন্য একটা অনবদ্য রচনাশৈলীই শুধু সৃষ্টি করেননি, একটা সম্পূর্ণ কাব্যময় ও নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন যেখানে তিনি পরিতৃপ্তির সঙ্গে বাস করতেন। তাঁর কবিতা পাঠককে তখনকার তথাকথিত আধুনিক বাস্তবধর্মী সাহিত্যের মতো শব্দপীড়িত করে না। তাঁর কবিতা বুদ্ধদেবের মতে জাদুমুগ্ধ করে। বুদ্ধদেব লেখেন :

> এ-কথা ঠিক যে তিনি [জীবনানন্দ] পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক। এক হিসেবে তাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis বলা যেতে পারে। প্রেমেন্দ্রবাবু বাস্তব জগতের সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ, বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে।...জীবনানন্দবাবু এই সংসারের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আমাদের হাত ধরে' এক অপূর্ব রহস্যলোকে নিয়ে যান;—সে মায়াপুরী হয়তো আমরা কোনোদিন স্বপ্নে দেখে থাকবো।[৬০]

প্রগতির আগস্ট ১৯২৯ সংখ্যায় জীবনানন্দের আরও হেঁয়ালিপূর্ণ কৌতূহলোদ্দীপক একটা কবিতা প্রকাশিত হয়—'বোধ'।

বোধ

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়,—কোন্ এক বোধ কাজ করে!
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে;
সব কাজ তুচ্ছ হয়, পণ্ড,—মনে হয়,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়!

সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে!
কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
সহজ লোকের মতো! তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর!—কোনো নিশ্চয়তা
কে জানিতে পারে আর?—শরীরের স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর?—প্রাণের আহ্লাদ
সকল লোকের মতো কে পাবে আবার!
সকল লোকের মতো বীজ বুনে আর
স্বাদ কই!—ফসলের আকাঙ্ক্ষায় থেকে,
শরীরে মাটির গন্ধ মেখে,
শরীরে জলের গন্ধ মেখে,
উৎসাহে আলোর দিতে চেয়ে
চাষার মতন প্রাণ পেয়ে
কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর 'পরে?
স্বপ্ন নয়,—শান্তি নয়,—কোন্ এক বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে!

পথে চ'লে পারে—পারাপারে
উপেক্ষা করিতে চাই তারে;
মড়ার খুলির মতো ধ'রে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
তবু সে মাথার চারিপাশে!
তবু সে চোখের চারিপাশে!
তবু সে বুকের চারিপাশে!
আমি চলি, সাথে সাথে সেও চলে আসে।
আমি থামি,—
সে-ও থেমে যায়;

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?
জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সন্তানের মতো হয়ে,—
সন্তানের জন্ম দিতে দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিংবা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের; কিংবা যারা পৃথিবীর বীজক্ষেতে আসিতেছে চ'লে
জন্ম দেবে—জন্ম দেবে ব'লে
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি?—তাহাদের মন
আমার মনের মতো না কি?—
তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী!

হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল?
বাল্‌টিতে টানিনি কি জল?
কাস্তে হাতে কতবার যাইনি কি মাঠে?
মেছোদের মতো আমি কত নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি;
পুকুরের পানা শ্যালা—আঁশটে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে
গিয়েছে জড়ায়ে;
—এইসব স্বাদ;
—এসব পেয়েছি আমি;—বাতাসের মতন অবাধ
বয়েছে জীবন,
নক্ষত্রের তলে শুয়ে ঘুমায়েছে মন
একদিন;
এইসব সাধ
জানিয়াছি একদিন,—অবাধ—অগাধ;
চ'লে গেছি ইহাদের ছেড়ে;—
ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা করে চ'লে গেছে—যখন ডেকেছি বারে-বারে
ভালোবেসে তারে;
তবুও সাধনা ছিল একদিন,—এই ভালোবাসা;
আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা ক'রে গেছি; যে নক্ষত্র—নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে বার-বার দিয়ে গেছে বাধা

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি তা ভুলিয়া গেছি;
তবু এই ভালোবাসা—ধুলো আর কাদা—।

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে:
সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন!
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন!
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!

এই বোধ—শুধু এই স্বাদ
পায় সে কি অগাধ—অগাধ!
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে?—করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ,
চোখে কালোশিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে,
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব।[৬১]

কী এই বোধ? বাংলা শিরোনাম 'বোধ' শব্দটি—'বুদ্ধ' ও 'বোধিপ্রাপ্ত' শব্দের মতো বুধ থেকে আসে—যাকে ব্যাখ্যা করা যায় সচেতনতা অথবা এমনকি অনুপ্রেরণা হিসেবে। এটির অনুভব ভালোবাসা, শান্তি কিংবা স্বপ্নেরও নয়। এটাকে উপেক্ষা করা যায় না, পরিত্রাণও পাওয়া যায় না এটার কাছ থেকে। আর এটা যখন কারও হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে কাজ করে, সে আর তার সতীর্থ মানুষের মতো থাকে না। সে আর পারে না সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করতে। এমনকি অন্যদের সঙ্গে থাকলেও সে হয় একা।

'বোধ'-এর মতো দ্ব্যর্থক শব্দটাকে দুর্বলভাবে আঁকড়ে ধরে এই কবিতাটি থেকে অসংখ্য ব্যাখ্যা উদ্ভূত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কবিকে ক্লান্ত করে তাঁকে মৃত্যুর প্রশান্তি কামনা করার অদম্য প্ররোচনা বলে আখ্যায়িত করে একজন বিশ্লেষক এটাকে তুলনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেন 'সৃষ্টির যন্ত্রণা' হিসেবে।৬২ আরেকজন সমালোচক 'বোধ'কে দেখেন কাব্যিক প্রেরণার প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ হিসেবে; একটা প্রবল ও দুর্বোধ্য অশান্তি, যা নতুন কিছু সৃষ্টি করার জন্য কবিকে জীবনের পরিচিত বাস্তবতাগুলোকে অতিক্রম করে যেতে সাহায্য করে।৬৩ আরেকজন পাঠক আধুনিক শহুরে উৎপাদনভিত্তিক সংস্কৃতির বুদ্ধিজীবীদের এক বিশেষ ধরনের মস্তিষ্কসংক্রান্ত ব্যাধির অধিক কিছু নয় বলে 'বোধ'কে খারিজ করে দেন।৬৪

পাঠকদের সঙ্গে জীবনানন্দও অস্থির অনুভূতিটা বোঝার জন্য সংগ্রাম করেন যা তাঁকে তাঁর চারপাশের ছড়ানো বিশ্বের ব্যাখ্যাকারী হতে বাধ্য করে এবং 'সহজ লোকের' কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। একদা অন্য জীবনে কথক ছিলেন ভিন্ন মানুষ—তাঁর জীবন ছিল সরল ও 'বাতাসের মতন অবাধ' বহমান. 'নক্ষত্রের তলে শুয়ে' তাঁর হৃদয় ছিল নিদ্রামগ্ন। কিন্তু সেটা ছিল 'একদিন।' এখন একধরনের বোধ তাঁকে অদম্য সনির্বন্ধ অনুরোধে আচ্ছন্ন করে, যাতে তিনি থাকেন 'জেগে পৃথিবীর পরে' এবং সেই চেতনার বিবরণ দেন, তা যত বেদনাময় আর একাকীই হোক না কেন। তিনি আলাদা, সচেতন ও উদ্দীপ্ত কবি : 'আকাশের নক্ষত্রের পথ' ও 'পচা চালকুমড়ার' এবং সবকিছুর একজন পর্যবেক্ষক, যা মানুষের 'হৃদয়ে ফলিয়াছে'।

অনিচ্ছুক বোধিসত্ত্বের মতো এই নবিশ বুদ্ধ সচেতনতার চাদর পরে থাকে, যা তাঁর জন্য পরিবর্তিত হয় অপ্রশম্য সৃষ্টিশীলতায়। সঙ্গী মানুষের মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকার আনন্দ তিনি জানতে পারেন না। গৌতম যে রকম বোধি লাভ করার জন্য ত্যাগ করেছিলেন বাসনা, জীবনানন্দের 'বোধ'ও তাঁকে বাধ্য করে সব বাসনা পেছনে ফেলে রেখে তাঁর 'প্রাণের কাছে চলে' আসতে।

যদিও 'বোধ' তাঁর জীবনের প্রথম ভাগে চলে এসেছিল, এটা তাঁর কাব্যিক প্রেরণার শৈলী ও পরিণতির উল্লেখযোগ্য বিচক্ষণ এক প্রকাশ। এক দশক পরে জীবনানন্দ 'কবিতার কথা' নামে একটা প্রবন্ধ লিখবেন, যাতে কবি হয়ে ওঠা এবং সৃষ্টিশীল প্রেরণার ক্ষমতার পরোক্ষ উল্লেখ করেন তিনি। কিন্তু এখানে 'বোধিপ্রাপ্তি' কিংবা 'সচেতনতা' রূপক ব্যবহার করে তিনি দেখিয়ে দেন একাকিত্ব এবং মরিয়া আহ্বান শুধু তাঁর নিজের নয়, যারা 'অগাধ—অগাধ' পাওয়ার জন্য প্রণোদিত হয়, তাদের জীবনকেও চরিত্রায়িত করে।

*প্রগতি*র যে সংখ্যায় 'বোধ' ছাপা হয়, সেই একই সংখ্যায় বুদ্ধদেব আবারও জীবনানন্দ ও তাঁর কবিতার রচনাশৈলীর ওপর আলোকপাত করে দ্বিতীয় একটা আলোচনা লেখেন। সেই লেখায় জীবনানন্দের কবিতার একজন ভক্ত জীবনানন্দ সম্পর্কে এমন একজনকে বলছেন, যিনি তাঁর নাম কখনো শোনেননি :

> দ্যাখো, এতদিনে আমাদের এ-কথাটা উপলব্ধি করা উচিত যে সংস্কৃত আর বাঙলা এক ভাষা নয়, সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার নাড়ির বাঁধন বহুকাল ছিঁড়ে গেছে। বাঙলা এখন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সাবালক ভাষা—, তা'র ব্যাকরণ, তা'র বিধি-বিধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> তা'র spirit সংস্কৃত থেকে আলাদা।...অথচ আশ্চর্যের বিষয় বাঙলা কবিতা এখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত কথাগুলোর প্রতিই পক্ষপাত দেখাচ্ছে, সংস্কৃত conventionগুলো এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের কবিতায় এখনো সুন্দরীরা বাতায়ন-পাশে দাঁড়িয়ে কেশ আলুলিত ক'রে দেয়, মুকুরে মুখ দেখে, চরণ অলক্তক-রঞ্জিত করে, শুভ্র ও শিতল শয্যায় শোয়। আমাদের নায়িকাদের এখনো হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং ইত্যাদি, যদিও ও-সব ফ্যাশান দেশ থেকে বহুকাল উঠে গেছে। সংস্কৃতের দুয়ারে এই কাঙালপনা করে' আর কতকাল আমরা মাতৃভাষাকে ছোট করে' রাখবো? আমাদের ভুল জীবনানন্দ দাশ বুঝতে পেরেছেন বলে' মনে হয়; ভাষাকে যথাসম্ভব খাঁটি বাঙলা করে' তোলবার চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায়।...কেন কবিতায় জানালাকে জানালা বলবো না, বিছানাকে বিছানা? ...যতো কথা আমাদের মুখের ভাষায় স্থান পেয়েছে..., কাব্যসমাজ থেকে তাদের একঘরে করে' রেখে কেন আমরা আমাদের কবিতাকে এক বিপুল শব্দ-সম্ভার থেকে বঞ্চিত করবো? মৌখিক ভাষার ইডিয়মগুলো ব্যবহার করে' কবিতাকে স্বাভাবিক ও সহজ করে' তুলবো না কেন?...আমি তো বলি...জীবনানন্দের কবিতার ভাষা purest বাঙলা, কারণ তা বাঙলা ছাড়া আর কিছু নয়।[৬৫]

খাঁটি বাংলা কী? তখনকার দিনে কিংবা আজকেও প্রশ্নটার কোনো সহজ উত্তর নেই। জাতিগত বিশুদ্ধতার মতো ভাষাগত বিশুদ্ধতা অদ্ভুত ও অসার কল্পনাশক্তির পর্যায়ে পড়ে। তবে বুদ্ধদেব উল্লেখ করেন, ভাষার শুদ্ধতার বিভিন্ন মাত্রা থাকতে পারে। তিনি তাঁর বিদগ্ধ পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেন—খুব বেশি সংস্কৃতঘেঁষা ও আরোপিতভাবে উচ্চাসনে বসানো বাংলার (সাধু) সঙ্গে কথ্য প্রকাশভঙ্গির বাংলার (চলিত) পার্থক্য আছে—তারপর তিনি বলেন, সাধুর চেয়ে চলিত ভাষা বিশুদ্ধতর বাংলার প্রতিনিধিত্ব করে এবং এই বিশুদ্ধ মাতৃভাষাতেই বাংলা কবিতা লেখা উচিত। টি এস এলিয়ট যে রকম বলেছেন, 'কবিতার প্রতিটি বিপ্লব সংগতভাবে কখনো প্রচারমাফিক সাধারণ কথ্য ভাষাতে প্রত্যাবর্তন।'[৬৬] *কল্লোল*-চালিত আন্দোলন কোনো ব্যতিক্রমের প্রমাণ দেয় না, কিন্তু জীবনানন্দ প্রথাগত বিপ্লবী ছিলেন না।

বুদ্ধদেব বলেননি যে জীবনানন্দ চলিত ভাষায় লিখেছেন। তিনি বলেন, তিনি বিশুদ্ধ বাংলায় লিখেছেন, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। এই তথাকথিত খাঁটি বাংলা কোনো সর্বলোকের ব্যবহার্য ভাষা নয়, কোনো আঞ্চলিক ভাষাও নয়, নয় জীবনানন্দের কোনো অপভাষাও। বুদ্ধদেব তাঁর প্রথম প্রবন্ধে যেমন বলেছিলেন, জীবনানন্দ প্রধানত সাধু ভাষার খুব বেশি সংস্কৃতঘেঁষা শব্দ পরিহার করে, আবার একই সঙ্গে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সাধু ও চলিত উভয় রূপ ব্যবহার করে 'সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব' রচনাভঙ্গি তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তরে ব্যাকরণের যে অনবধানতা, যা সজনীকান্তকে বিস্মিত করেছিল, জীবনানন্দ সে সময়ে তাঁর কবিতায় তা অকুণ্ঠিতভাবে প্রয়োগ করেছেন। 'বোধ' কবিতার এই পঙ্‌ক্তিগুলো :

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হয়ে—
সন্তানের জন্ম দিতে দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়

প্রথম শব্দটি, 'জন্মিয়াছে' সাধুরূপের ক্রিয়াপদ, দ্বিতীয়টি 'যারা' একটা চলিত সর্বনাম। হয়ে, দিতে, গেছে—এগুলোর সবই চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ, 'যাহাদের' একটা সাধু সর্বনাম। বিন্যাসের এই মিশ্রণ নিয়ে এসেছিলেন জীবনানন্দ, আবার তাঁর সঙ্গে সেটি চলেও গেছে। আজ চলিত ছাড়া অন্য কিছু লিখছেন এমন কবি প্রায় নেই বললেই চলে। তবে তখনকার দিনে রীতিকে এভাবে নাড়া দেওয়া ছিল এক সাহসী পদক্ষেপ।

এর আগে সে বছর *কল্লোল*-এ জীবনানন্দের শেষ যে কবিতাটি (সে বছরই *কল্লোল* বন্ধ হয়ে যায়) ছাপা হয়, তার মধ্যে ছিল যাকে বলা যেতে পারে অকাব্যিক রচনাভঙ্গি :

ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।

'পাখিরা' নামের কবিতাটিতে আরও আছে :

সাগরের ওই পারে—আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এইসব পাখি ছিল;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিল তারা তারপর,—
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে!
বাদামি—সোনালি—শাদা—ফুট্‌ফুট্‌ ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোটো বুকে
তাদের জীবন ছিল,—
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হয়ে![৬৭]

বুদ্ধদেব স্মরণ করেন কবিতাটি প্রথম পড়তে গিয়ে 'স্কাইলাইট', 'রবারের বলের মতন ছোটো বুকে' এবং 'রয়েছে মৃত্যু লক্ষ লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে' এসব দেখে তিনি কেমন রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। 'স্কাইলাইট', 'রবারের বল' ও 'মাইল'—সাধারণ বাংলা ভাষায় (জীবনানন্দ ইংরেজি শব্দ বাংলা হরফে লিখতেন) যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য এসব শব্দ তখনকার দিনের কোনো শোভন বাংলা কবিতার রচনাভঙ্গি ছিল না। এসব 'গদ্যময়' বিদেশি শব্দ যেভাবে অনায়াসে জীবনানন্দের কবিতায় জীবন্তভাবে এসেছে, তাতে বুদ্ধদেব রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। পেছনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাকিয়ে তাঁর এই সতীর্থ কবি *কল্লোল* যুগের কবিদের কাছে কী ছিলেন, তা বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব তাঁদের উদ্ভাবনশীল হওয়ার সাহস জোগানোর কৃতিত্ব দেন জীবনানন্দকে। একালের সবচেয়ে সহজাত ঔপন্যাসিক ও কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনানন্দের প্রাপ্তিগুলোকে একবাক্যে এভাবে বর্ণনা করেন, 'আর বাংলার কবিতার জগতে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিপ্লবী জীবনানন্দ দাশ, কারণ তিনি শব্দের প্রথাগত বন্ধন ভাঙার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন।'[৬৮] সুনীল বলতেও পারতেন যে তিনি শব্দের বর্ণপ্রথা ভেঙে দিয়েছেন। কারণ কবিসমাজে জীবনানন্দের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আভিধানিক ছুঁৎমার্গ দূর হয়। একজন বাঙালির ব্যবহৃত সম্পূর্ণ শব্দসম্ভার—তা সে গ্রাম্য হোক বা অভিজাত, স্থানীয় বা বিদেশি—কবিতায় ব্যবহারের জন্য গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

বাঙালিরা ইংরেজদের চেয়ে কম সারগ্রাহী নয়, তাই যখনই প্রয়োজন তখন ধার করে।[৬৯] যদিও বাংলার বেশির ভাগ শব্দ, এমনকি চলিত ভাষারগুলোও, এসেছে সংস্কৃত থেকে। তবুও আধুনিক বাংলা ভাষা ফার্সি, আরবি, পর্তুগিজ, ইংরেজি ও সন্তোষজনক ব্যুৎপত্তিগত উৎস পাওয়া যায় না এমন স্থানীয় শব্দের প্রাচুর্যে ভরপুর। জীবনানন্দ জীবন্ত অভিব্যক্তির ভানহীন ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ কাব্যিক রচনাভঙ্গিতে, এবং বিশেষ করে তাঁর কবিতায়, প্রাণ সঞ্চালন করেছেন। যে ভাষায় তিনি কবিতা লেখেন, হতে পারে তিনি সে ভাষায় কথা বলেন না, কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন যেকোনো ভাষা—অর্থাৎ সব ভাষাই কবিতার ভাষা। জীবনানন্দের রচনাভঙ্গি কিংবা বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ কোনোটাই *শনিবারের চিঠির* দৃষ্টি এড়ায়নি, কিন্তু কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য ফলাফল ছাড়াই নিজস্ব কায়দায় গালভরা ও আবোলতাবোল কথায় চলতে থাকে সাহিত্যের সেন্সরশিপ।

৭

আগস্ট ১৯২৮ সংখ্যা থেকে সজনীকান্ত *শনিবারের চিঠিতে* ধারাবাহিকভাবে 'নকুড় ঠাকুরের আশ্রম' নামে একটা ব্যঙ্গাত্মক লেখা শুরু করেন, যাতে ক্রমবর্ধমান হাতুড়ে গুরুদের হাতে সহজেই ফাঁদে পড়ে এমন বাঙালিদের শিকারে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটা দেখানো হয়। লোভী ধার্মিক নকুড়কে একটা পতঙ্গখেকো গাছ হিসেবে দেখানো হয়, এ জাতীয় মানুষেরা তাদের নিঃসন্দিগ্ধ খদ্দেরদের প্রলুব্ধ করে ডেকে এনে টাকাকড়িসমেত তাদের খেয়ে ফেলে। কীভাবে এই উদ্ভিদবিদ্যার পণ্ডিত তাঁর শিকারের জীবন শুষে নেয়—সেপ্টেম্বর সংখ্যায় তার সুস্পষ্ট বর্ণনা শিষ্টাচারের মান লঙ্ঘন করে, যার জন্য অলীক কল্পনাপূর্ণ জেহাদ ও অশ্লীল বিবেচনায় অতি উৎসাহী সেন্সরশিপের জন্য সজনীকান্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় পেনাল কোডের ২৯২ ধারা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়, যা জনগণের শিষ্টাচার ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অপরাধ প্রমাণিত হয় এবং তাঁকে ৫০ টাকা জরিমানা করা হয়।[৭০] তখনকার দিনে সাহিত্য পত্রিকার দাম ছিল আট আনা, তাই ৫০ টাকা জরিমানাকে নামমাত্র বলেই মনে হয়।

এটাও তাঁর যথেষ্ট উচিত শাস্তি ছিল না যেন। যে মাসে তাঁর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার মামলা শুরু হয়, সেই একই মাসে সজনীকান্তকে আরেকটি অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার এই কৌতুককর মোড় *কল্লোল*-গোষ্ঠীকে আনন্দিত করে থাকতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা নেহাত হাস্যকর ছিল না। আগের ডিসেম্বরে সজনীকান্তের সগর্ব সৌভাগ্য ঘটেছিল আমেরিকান লেখক জাবেজ টি স্যান্ডারল্যান্ডের *ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজ* বইটার ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার। ১৯২৯-এর মে মাসে পুলিশ *প্রবাসী* প্রেসের অফিস ও *প্রবাসী* সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে স্যান্ডারল্যান্ডের বইটির সব কপি বাজেয়াপ্ত করে, তারপর রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করে বইটির প্রকাশক ও মুদ্রক সজনীকান্তকে। বিতর্কমূলক বইটির ভেতর একঝলক চোখ বোলালে ব্রিটিশ সরকারের তৎপরতার কারণ বোঝা যায়। যেমন বোঝা যায় প্রথম সংস্করণের ভূমিকা পড়লে: 'খ্রিষ্টের পর এই বিশ শতাব্দীতে বিশ্বের কোনো দেশ কি অন্য দেশের বাধ্যতামূলক অধীনস্থ থাকা উচিত? তাহলে কেন মহান ভারত?'[৭১]

রাজদ্রোহের মামলা শুরু হয় জুনে। আপিলসহ তা ১৯৩০ সাল পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। দুজনকেই অপরাধী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে জরিমানা হয়।[৭২] এ দুই মামলা ছাড়াও *শনিবারের চিঠি*তে ছাপা তাঁর বিরুদ্ধে একটা ব্যঙ্গাত্মক লেখার কারণে লেখক ও আইনজীবী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সজনীকান্তের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার হুমকি দেন। তারপর ১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে, অশ্লীলতার মামলাটি শেষ হয়ে আসতেই আরেকটি লেখার বেআইনি পুনঃপ্রকাশের জন্য *শনিবারের চিঠি*র সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে বলে হুমকি আসে।[৭৩] সজনীকান্ত কেবল রাজদণ্ডধারীর শাস্তির ক্ষমতা টের পাননি, সে বছর তিনি আরেকটা নতুন ক্ষণস্থায়ী পত্রিকার বজ্রবাণের শিকার হন, এবং পরের বছরের প্রথম দিকে এ রকম আরেকটা পত্রিকার দ্বারা মুগুরপেটা হন।

১৯২৯ সালের এপ্রিলে প্রথম মামলাটি যখন মাঝপথে তখন এই বজ্রবাণ আঘাত করে। সে মাসে *কল্লোল*-গোষ্ঠীর কয়েকজন, বিশেষ করে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে মিলে *মহাকাল* (প্রলয়ের দেবতা শিবের একটি রূপ) নামে একটা কাগজ বের করেন। সজনীকান্তের বর্ণনামতে পত্রিকাটির প্রচ্ছদ ছিল কালো আর তার ওপর আগুন-লাল রঙে তিন শব্দের সাবটাইটেলে লেখা থাকত 'শনিবারের চিঠির অশনি'।[৭৪] *মহাকাল* সম্পাদকেরা 'শনি', 'শনিবার' ও 'অশনি' শব্দ তিনটা দিয়ে শব্দকৌতুক করেছিলেন। শেষোক্ত শব্দটি দেখলে প্রথমে মনে হয় এটা বুঝি শনির নঞর্থক, কিন্তু শব্দটি আসলে সদর্থক। তবে এটির নঞর্থক গূঢ়ার্থ অবশ্যই ইচ্ছাকৃত ছিল, যেহেতু বজ্রবাণ থেকে শুরু করে প্রলয়দেব শিব পর্যন্ত শব্দটির বিভিন্ন অর্থ আছে।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অচিন্ত্যকুমার *মহাকাল*-এর উত্থান ও বিলুপ্ত হওয়া প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> এ সময়ে নবাগত বন্ধুদের সমাগমে 'মহাকাল' নামে এক পত্রিকার আবির্ভাব হয়। 'শনিবারের চিঠি'র প্রত্যুক্তি। 'শনিবারের চিঠি' যেমন বাংলাসাহিত্যের শ্রদ্ধেয়দের গাল দিচ্ছে—যেমন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র—তেমনি আরো ক'জন শ্রদ্ধাভাজনদের—যাদের প্রতি 'শনিবারের চিঠি'র মমতা আছে—তাদেরকে অপদস্থ করা।...
>
> তাছাড়া এমনিতেও 'মহাকাল' চলত না। তার কারণ অন্য কিছু নয়, এ ধরনের কাগজ চালাতে যে কূটনীতি দরকার তা তার জানা ছিল না। হেয়়-র সঙ্গে উপাদেয়কে মিশিয়ে দেওয়া, লঘুর সঙ্গে গম্ভীর, খিস্তি-খেউড়ের সঙ্গে বৈরাগ্যশতক বা বেদান্তদর্শন। 'শনিবারের চিঠি' এ বিষয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমান।[৭৫]

সজনীকান্তের মতে, *মহাকাল* টিকে ছিল মাত্র তিন মাস।[৭৬] তবে তাঁর ও *শনিবারের চিঠির* ওপর প্রাতিষ্ঠানিক আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ *মহাকাল*-এর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়নি। ১৯৩০ সালের প্রথম তিন মাস *রবিবারের লাঠি* নামের একটা পত্রিকার প্রকাশনা লক্ষ করা যায়, এটাও *শনিবারের চিঠি*কে ঠেকানোর জন্য একটা অস্ত্র ছিল। সজনীকান্ত লিখেছেন, এটি কটূক্তিতে *মহাকাল*কে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[৭৭]

রবিবারের লাঠি আসার আগেই অবশ্য *শনিবারের চিঠি* বন্ধ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে ১৯২৯-এর শেষ কয়েক মাস বেশ কয়েকটা পত্রিকার জন্য সর্বনাশা বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯২৯-এর অক্টোবরে বের হওয়া *প্রগতি*র শেষ সংখ্যায় জীবনানন্দের একটা কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নাম ছিল এক ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী, 'অবসরের গান'। *কল্লোল*-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় সে বছরের ডিসেম্বরে। *কালি কলম* ১৯২৯-এর শেষার্ধে অনিয়মিতভাবে প্রকাশের পর ১৯৩০-এর জানুয়ারিতে বের করে তার অন্তিম সংখ্যা। এসব পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর জীবনানন্দ তাঁর প্রকাশনার সুযোগ হারান : ১৯২৯-এর অক্টোবর থেকে ১৯৩৫-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁর একটি মাত্র কবিতা ছাপা হয়েছিল। *কল্লোল* যুগ-পরবর্তী সময়ে বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র কর্তৃক *কবিতা* পত্রিকা প্রকাশ করার আগ পর্যন্ত তিনি ছয়টি অবসরমূলক বছর পেয়েছিলেন, যেখানে তাঁর কবিতা আবার একটা নিয়মিত প্রকাশক ও সপ্রশংস পাঠকগোষ্ঠী পায়।

৮

কল্লোল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে ১৯২৮ সালে জীবনানন্দের প্রথম শিক্ষকতা পেশার সমাপ্তি ঘটে। কিছু কিছু লেখক তাঁর চাকরিচ্যুতির সঙ্গে তাঁর লেখা কবিতার সরাসরি সম্পর্ক পেয়েছিলেন। অন্যদের যুক্তিমতে তাঁর কাব্যিক বিনোদনের সঙ্গে সিটি কলেজে চাকরিচ্যুতির কোনো সম্পর্ক নেই।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বছরটি শুরু হয় দুই ধরনের রাজনৈতিক উত্তেজনার মেঘ নিয়ে: জাতীয়তাবাদী (ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ও ঔপনিবেশিক শক্তির মধ্যে) ও সাম্প্রদায়িক (হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে)। আবেগোত্তপ্ত এই সময়ে জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িকদের মধ্যকার তফাতটা অস্পষ্ট হয়ে আসে। ধর্মীয় মতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ, কোনো একনিষ্ঠ স্বদেশি স্বাধীনতাসংগ্রামীর অমান্যকারী মতপ্রকাশে বাধ্য করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, মসজিদের সামনে গানবাজনা কিংবা ঢোল বাজানোর ওপর নিষেধাজ্ঞার মতো একই রকম রাজনৈতিকভাবে উত্তেজক 'বন্দে মাতরম' স্লোগানকে বাধা দেওয়ার কারণে কিছু হিন্দু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সে কারণে জাতীয়তাবাদী মনোভাব গাঢ় হয়ে ওঠার মতো অনুঘটক থাকা সত্ত্বেও সংকীর্ণ আনুগত্য বাংলাকে বিভক্ত করে রাখে। রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এই উত্তেজনা ছড়ানোর মূল কেন্দ্র হিসেবে কিছু ভূমিকা পালন করে।

ব্রাহ্মসমাজের সিটি কলেজে সব ধর্মের ছাত্রদের জন্য একটা ছাত্রাবাস ছিল—রামমোহন হোস্টেল। প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের রবিবাসরীয় প্রাত্যুষিক বক্তৃতা ছাড়া হোস্টেল সীমানায় কোনো ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুমোদিত ছিল না। বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজ মূর্তিপূজার বিরোধী ছিল বলে হোস্টেল চত্বরে এ ধরনের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু জানুয়ারি মাসে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে অজনপ্রিয় ব্রিটিশ সংসদীয় কমিটি বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করলে কিছু সংবাদপত্র ও নেতা ভারতীয়দের তাদের অধিকারের স্বপক্ষে উঠে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানায়। এটা ছিল তৎকালীন শাসকদের প্রতি আপসহীন চ্যালেঞ্জ জানানোর একটা সময় এবং সিটি কলেজ, তার ব্রাহ্ম শিক্ষকমণ্ডলী ও কলেজের নিয়মকানুনও ছিল একটা শাসক-কর্তৃপক্ষ।

বিদ্যাদেবী সরস্বতী বোধগম্য কারণেই ছাত্রদের কাছে প্রিয়। ১৯২০-এর দশকের শেষার্ধ থেকে সরস্বতীপূজার জনপ্রিয়তা বেড়ে যাচ্ছিল, এটা সাধারণত প্রত্যেক বছরের জানুয়ারির শেষ অথবা ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একই সঙ্গে বাড়ছিল বাংলায় ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যেকার শত্রুতা। বরিশালের নিজস্ব *ব্রহ্মবাদী* আগের বছর এ বিষয়ে একটা সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেছিল:

> কয়েক বৎসর যাবৎ বঙ্গের সর্ব্বত্রই এই পূজাতে একটী প্রবল উৎসাহ লক্ষিত হইতেছে। ইহার আধ্যাত্মিকতার কথা যেমন ভাবে সমাজ-ক্ষেত্রে পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইত, এখন আর তেমন হয় না। এবারে সহরের অনেক স্কুলে ওর ধর্ম্মরক্ষিণী সভাগৃহেও নানা উপাচারে পূজাদি সম্পন্ন হইয়াছে। এই আনন্দের অনুষ্ঠানে গভীর পরিতাপ ও দুঃখের কথা এই যে, কলিকাতার সেই পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু মুসলমানের অমূলক ও অবাঞ্ছনীয় ঘৃণ্য বিবাদ বিসম্বাদের দূষিত বাতাসে আজিও এইক্ষেত্রে দুঃখজনক ও আপত্তিমূলক ঘটনা সকল উৎপন্ন হইতেছে।[৭৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সিটি কলেজের হিন্দু ছাত্ররা আগের বছরগুলোতে পূজা অনুষ্ঠান করত। এক তথ্যমতে, সিটি কলেজ হোস্টেল চত্বরে এই অনুষ্ঠান প্রিন্সিপাল মৈত্রের আদেশে ১৯১৭ সালের পর থেকে বন্ধ ছিল। তবে হোস্টেল চত্বরের বাইরে ছাত্রদের পূজায় কোনো বাধা ছিল না।[৭৯] তখন ১৯২৮ সালের ২৭ জানুয়ারি খুব ভোরে আইন অমান্য করার উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় হোস্টেলের ছাত্ররা সীমানার ভেতরে সরস্বতীপূজার অনুষ্ঠান করেন। সিটি কলেজে জীবনানন্দের সহকর্মী বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'এইবার ছাত্রগণ গোপনে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া গভীর রাত্রিতে প্রতিমা আনাইয়া রাখিয়াছিল এবং রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই পুরোহিত ডাকিয়া ছাত্রাবাসের প্রাঙ্গণে পূজা আরম্ভ করিয়াছিল।'[৮০]

বিনোদবিহারী স্মরণ করেন, সিটি কলেজের আরেকজন ব্রাহ্ম প্রফেসর বরিশালের ব্রজসুন্দর রায় তাঁর দরজায় উদয় হয়ে জানালেন যে পূজা শুরু হয়ে গেছে। ওরা দুজন ত্বরিত প্রিন্সিপাল মৈত্রর কোয়ার্টারে যান এবং তাঁর কথামাতো ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর যদুনাথ সরকারের সঙ্গে দেখা করলে তিনি জোর খাটিয়ে দমন করতে নিষেধ করেন।[৮১] দুই দিন পর একটা ইংরেজি খবরের কাগজে নিম্নোক্ত খবরটি বের হয়:

> **কলকাতায় সরস্বতীপূজা—সিটি কলেজে গোলযোগ**
> **ছাত্রদের দৃঢ় অবস্থান**
>
> সিটি কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত রামমোহন হোস্টেলের একটা দুঃখজনক ঘটনা ছাড়া কলকাতায় এবারের সরস্বতী পূজা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
>
> ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রামমোহন ছাত্রাবাসের ছাত্ররা এ বৎসর হোস্টেলের সীমানার মধ্যে সরস্বতী দেবীর পূজার আয়োজন করেছিল। কিন্তু এটা হোস্টেল কর্তৃপক্ষের প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে ছিল বলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাবু ব্রজ মোহন রায় ছাত্রদেরকে হোস্টেলের সীমানার ভেতর পূজা করতে নিষেধ করেন এবং সেখান থেকে প্রতিমা সরিয়ে ফেলতে বলেন বলে জানা যায়।
>
> জানা যায়, ছাত্ররা তাদের দাবী নিশ্চিত করার জন্য সুপারিন্টেন্ডেন্টের কথায় কর্ণপাত করেনি। তারপর সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্রুদ্ধ হয়ে যেখানে প্রতিমা রাখা আছে সেই ঘেরার মধ্যে ঢুকতে চাইলে ছাত্ররা তাঁকে ঢুকতে দেয়নি বলে জানা গেছে।
>
> এতে সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং ছাত্রদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয় এবং কোনো উপায়ান্তর না দেখে সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্থানত্যাগ করেন। আর কোনো গোলযোগ ছাড়াই পূজা সম্পন্ন হয়।[৮২]

তবে অনুষ্ঠানের সফল সমাপ্তি ও প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে সিটি কলেজের সমস্যা মিটে যায়নি। অপরাধীদের ক্ষমা চাইতে বলা হলে তারা অস্বীকার করে।[৮৩] তার বদলে ছাত্ররা ঘটনা সম্পর্কে তাদের নিজেদের ভাষ্য পত্রিকায় প্রকাশ করে, যার শেষাংশে ছিল এ রকম আবেদন:

> আমরা হিন্দু জনগণকে ঘটনা পরম্পরা এবং ছাত্রদের বিরুদ্ধে গৃহীত কলেজ কর্তৃপক্ষের পরবর্তী ব্যবস্থার ওপর নজর রাখতে আবেদন জানাই, এই ব্যবস্থা আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> কিছুর জন্য নয়, হস্টেলে ঢোকার পর ছাত্ররা তাদের ধর্মকে ত্যাগ করতে পারেনি এবং বিশ্বাসানুযায়ী তাদের ধর্মীয় উৎসব পালন করেছে সেজন্য।[৮৪]

সিটি কলেজ আবাসিক ছাত্রদের মধ্যে অভিযুক্তদের জরিমানা করে শাস্তি দিতে চেয়েছিল।[৮৫] কয়েক মাসের মধ্যে অবস্থার এত অবনতি ঘটে যে কর্তৃপক্ষ গ্রীষ্মের আগাম ছুটি দিয়ে কলেজ বন্ধ করে দেয়।[৮৬]

ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়নি। যুদ্ধরেখাটি ছিল স্পষ্ট। একপক্ষে ছিলেন যাঁরা মনে করেন যে হিন্দুত্বকে অপমান করা হয়েছে এবং সিটি কলেজের ব্রাহ্মদের হাতে হিন্দুদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে না হলেও ব্রাহ্ম অধ্যুষিত অন্যপক্ষ মনে করেন, কলেজের কর্তৃত্বাধীন সীমানার ভেতর ছাত্রদের জন্য আচরণবিধি প্রয়োগ করার অধিকার কলেজ কর্তৃপক্ষের রয়েছে। বিরোধটার মধ্যে বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব জড়িত হয়ে পড়েন। তখনকার সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাবশালী বাঙালি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রয়াত সি আর দাশের উত্তরসূরি সুভাষচন্দ্র বসু হিন্দু ছাত্রদের পক্ষ নেন, অন্যদিকে সিটি কলেজের সম্মানিত সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ব্রাহ্ম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর *মডার্ন রিভিউ* ও *প্রবাসী* পত্রিকায় সিটি কলেজের সপক্ষে বহু বক্তৃতা-বিবৃতি ছাপেন, রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি ছাড়াও গণ্যমান্যদের মধ্যে দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ ও অ্যানি বেসান্ট প্রমুখ ছিলেন বিবৃতিদাতাদের মধ্যে। এমনকি ব্রাহ্মদের হাতে তাদের ধর্ম অপবিত্র হচ্ছে বলে দাবিকারী মেকি পবিত্রতার পক্ষাবলম্বী হিন্দুদের খোঁচা দিয়ে সজনীকান্ত ও *শনিবারের চিঠি*ও এই বিবাদে যোগ দেয়।[৮৭]

তবে আর যা-ই হোক, ব্যাপারটা সিটি কলেজের জন্য মোটেই হাস্যকর থাকে না। প্রতিষ্ঠানটিকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে ছাত্রভর্তি কমে যায়। অবস্থা যে কত মারাত্মক হয়ে পড়ে, ১৯২৮ সালের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক বিবরণী থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়:

> বর্তমান বছরে ছাত্রের সংখ্যা গতবার যা ছিল তার চেয়ে পঞ্চাশ শতাংশ কম। গত সেশনের শেষে এগারোজন শিক্ষককে চাকরি থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়। তারপরও বেশ বড় অঙ্কের ঘাটতি বহন করতে হয়।[৮৮]

অব্যাহতিপ্রাপ্ত এই ১১ জনের মধ্যে যোগদানের ছয় বছর পরও ইংরেজি বিভাগের সবচেয়ে কনিষ্ঠ ও একমাত্র শিক্ষক জীবনানন্দও ছিলেন।[৮৯]

সংগতভাবে এটাই মনে হয় যে একজন ব্রাহ্ম হলেও সরস্বতীপূজা-পরবর্তী ঘটনায় কলেজের ছাঁটাইপ্রক্রিয়ায় জীবনানন্দ চাকরি হারান। মূলত, অনেকেই খুব দৃঢ় যুক্তিতে বলেন, অর্থনীতির সহজ সূত্রই জীবনানন্দকে বের হয়ে আসতে বাধ্য করে। কিন্তু আরও অনেকে আছেন, যাঁরা মনে করেন, তাঁর কবিতা এখানে কোনোভাবে জড়িত।[৯০] এ সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিজন, সহকর্মী ও *কল্লোল*-এর কিছু লেখক ছাড়াও কিছু লোক এই লাজুক ব্রাহ্মর চাকরিচ্যুতির ব্যাপারটা লক্ষ করেন। তখনকার ব্যস্ত সময়ে হইচই করার মতো আরও অন্যান্য রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিষয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বিচিত্রা ভবনের সম্মেলন হয়ে গেছে সে বছরের মার্চে, ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুদের মধ্যকার কলহ চলতে থাকে গ্রীষ্মজুড়ে। জীবনানন্দের চাকরিচ্যুতি কেবল বিতর্কের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয় আরও অনেক পরে, যখন তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বই *কল্লোল যুগ* প্রথমে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় ১৯৪৯ সালে, আর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় পরের বছর। জীবনানন্দ ও সিটি কলেজ সম্পর্কে তিনি লেখেন :

> সিটি কলেজে লেকচারারের কাজ করত জীবনানন্দ। কবিতায় শস্যশীর্ষে স্তনশ্যামমুখ কল্পনা করেছিল বলে শুনেছি সে কর্তৃপক্ষের কোপে পড়ে। অশ্লীলতার অপবাদে তার চাকরিটি কেড়ে নেয়। যতদূর দেখতে পাই অশ্লীলতার হাড়িকাঠে জীবনানন্দই প্রথম বলি।[৯১]

অচিন্ত্যকুমার তাঁর সম্পর্কে কী লিখেছেন, তা জীবনানন্দ পড়েন বইটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময়। উপরন্তু, বন্ধু তাঁর স্মৃতিকথার একটা অংশে তাঁর মতে যে ভুল মন্তব্য করেছেন, সেটা সংশোধন করে তার জবাব দেওয়ার কষ্টটাও করেছেন তিনি। এক চিঠিতে জীবনানন্দ লেখেন, '*কল্লোল*-এর সেই ঘরটায় আমি দুচারবার নয় দুশো বার তো গিয়েছি খুবই; তুমি বিকেলের দিকে আসতে—আমি সকালের দিকে যেতাম।'[৯২] তাঁর সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমারের মন্তব্যের এটুকু সংশোধনীই তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর চাকরি যাওয়ার কারণ হিসেবে অশ্লীলতা সম্পর্কে মন্তব্যটি প্রতিবাদহীন থেকে যায়।

এ ব্যাপারে পরবর্তী সাধারণ ঘোষণাটি আসে জীবনানন্দের মৃত্যুর বহুদিন পর, ১৯৬৮ সালে। বুদ্ধদেব বসু 'অশ্লীলতা ও সাহিত্য'-বিষয়ক *দেশ* পত্রিকার একটা সংখ্যায় একটা নাটিকা লিখেছিলেন, যার অংশবিশেষ ছিল এ রকম :

> প্রবীণ লেখক। আমার অন্য একটা কথা মনে পড়লো। জীবনানন্দ দাশের চাকরি যাওয়ার গল্প জানো তো?
>
> অধ্যাপক (মৃদু হেসে)। সেই 'ঘাই-হরিণী'।
>
> প্রবীণ লেখক : 'পরিচয়ে' 'ক্যাম্প'।-এ' কবিতা সদ্য বেরিয়েছে। একদিন কলেজে যাওয়ামাত্র জীবনানন্দর তলব পড়লো প্রিন্সিপালের ঘরে। সেই কলেজেই পড়েছিলেন জীবনানন্দ, প্রিন্সিপাল তাঁর মাষ্টার মশাই। জীবনানন্দ ঘরে ঢোকামাত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক—'পরিচয়ে'র সংখ্যাটা হাতে দিয়ে নিশেনের মতো নাড়তে নাড়তে বললেন, 'তুমি "ঘাই-হরিণী" লিখেছো? "ঘাই-হরিণী" লিখেছো? যাও—চ'লে যাও এক্ষুনি!' আর জীবনানন্দ তাঁর লাজুক ভঙ্গি নিয়ে, তির্যক চাহনি নিয়ে, নিঃশব্দ গোপন অট্টহাসি নিয়ে, আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলেন।[৯৩]

তাঁর তথ্যের সূত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে অচিন্ত্যকুমার বলেন, জীবনানন্দ নিজেই তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর লেখা কবিতার জন্যই সিটি কলেজ থেকে তাঁর চাকরি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিল। একই প্রশ্নের জবাবে বুদ্ধদেব বলেন, এটা এমন একটা ব্যাপার যা সাহিত্যমহলের সবাই জানেন যে কবিতায় কথিত অশ্লীলতার কারণে জীবনানন্দ চাকরি হারিয়েছিলেন।[৯৪]

বুদ্ধদেব বসুর লেখাটির উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন সিটি কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহকর্মী সরোজেন্দ্রনাথ রায়। সরস্বতীপূজার ঘটনা থেকে তিনি ছাঁটাই-সম্পর্কিত বিতর্কটিকে আরও টেনে নিয়ে গিয়ে বলেন :

> মৈত্র মহাশয় অতি নীতিপরায়ণ ও রুচিবাগীশ ব্যক্তি বলে খ্যাত। তাঁর নীতিপরায়ণতা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে যার কিছু কিছু তিনি নিজেও জানতেন ও কৌতুক অনুভব করতেন। জীবনানন্দ বাবুর চাকুরি-যাওয়া ও তাঁর নীতিপরায়ণতাকে যুক্ত করে একটি কাহিনী রচিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। শুধু বুদ্ধদেব বসু একলা নন, আরও কেউ কেউ করেছেন।[৯৫]

উনিশ শতকের বিশিষ্ট সংস্কারক ব্রাহ্মরা সাধারণত নৈতিকভাবে অনমনীয় হিসেবে সুনাম কুড়িয়েছিলেন। আগে যেমনটি বলা হয়েছে, ব্রাহ্ম শব্দটির বিকৃত রূপ 'বেম্ম' বলতে এখন বোঝায় অতিরিক্ত শালীনতাবোধসম্পন্ন লোক।[৯৬] শালীন হোক বা না হোক, নৈতিক বোধের উন্নতি সব সময় এই ধর্মীয় গোষ্ঠীটির মূল ভাবনা ছিল। উদাহরণস্বরূপ, চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্ম যুবকদের সংগঠন *স্টুডেন্টস উইকলি সার্ভিস* কলকাতায় গঠিত হয় ১৮৭৯ সালে। ১৯২০-এর দশকে এই 'চরিত্র-গঠন' কথাটি কেবল ধূমপান, মদ্যপান থেকে বিরত থাকাই বোঝাত না, ঘন ঘন পেশাদারি থিয়েটারে যাওয়া থেকে বিরত থাকাও বোঝাত, যেখানে কুখ্যাত মহিলারা অভিনয় করত বলে অনুমান করা হতো।[৯৭] পরবর্তী সময়ে ১৯৩২ সালে বরিশালের *ব্রহ্মবাদী* সিনেমা অথবা বায়োস্কোপ সম্পর্কে ব্রাহ্মদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে একটা সম্পাদকীয়ও ছাপে :

> আদর্শচ্যুতি—শিক্ষা, নীতি, ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়েই বরিশাল সেই পূর্ব্বতন উচ্চ আদর্শ হইতে নামিয়া পড়িতেছে, সমস্ত বিষয়ের আলোচনা এই কাগজে সম্ভবপর নহে। একটা বিষয়েই অনাদর্শের কথা আজ উল্লেখ করিতেছি। এত আন্দোলন, আলোচনার পরেও টাউনহলে আবার বায়োস্কোপের স্থান হইয়াছে, ইহার পক্ষে যত কারণই থাক্ না কেন, অশ্বিনীকুমারের পবিত্র উচ্চ আদর্শের কাছে, এই দুর্দ্দিনে ইহা একান্তই অশোভন।[৯৮]

সরোজেন্দ্রনাথ যেমনটি বলেছিলেন, প্রিন্সিপাল মৈত্রের হয় উচ্চ ব্যক্তিগত নৈতিক মান, না হয় নীতিবাগীশ মনোভাব নিয়ে—তা সে ভালো না মন্দ, সে যার যার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার—বহু গল্প চালু ছিল। তেমনি একটা বহুশ্রুত শোনা কথা আছে নীরদ সি চৌধুরীর *অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান* বইতে এভাবে :

> ব্রাহ্ম নৈতিকতার মূলমন্ত্রের সবচেয়ে ভাল উদাহরণ বোধকরি দেওয়া যায় তখনকার দিনের একজন খুব নামকরা ব্রাহ্ম, প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সম্পর্কে একটা কাহিনী দিয়া। বলা হয় তিনি একদিন কলিকাতার কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট ধরিয়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> হাঁটিয়া যাইতেছিলেন, তখন এক লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন স্টার থিয়েটারটি কোথায়। একটা বাজে লোকের এই প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া প্রিন্সিপাল মৈত্র নাকি প্রথমে বলিয়াছিলেন, 'আমি জানি না,' তাহার পর তিনি যে একটি মিথ্যা কথা বলিয়াছেন তাহা উপলব্ধি করিয়া লোকটির নিকট ছুটিয়া যান, এইবার তাহাকে বলেন, 'আমি জানি, তবে বলিব না।' গল্পটি নিশ্চয়ই প্রমাণবিহীন, কিন্তু মর্মার্থের দিক দিয়া সত্য।

নীরদ বলেন গোঁড়া ব্রাহ্মগণ, 'যেহেতু লাম্পট্য, মিথ্যাচার, অথবা মাতলামি পরিহার করিবার শপথ নিয়াছিলেন তাই কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন...থিয়েটার বর্জন করিবার জন্য, কারণ নায়িকাগণ ছিল কুলটা শ্রেণীর।'[৯৯] তাহলে একেবারে বিস্ময়কর নয় যে, বুদ্ধদেব ও অন্যরা ধারণা করতে পারেন, সজনীকান্তের মতো একজন পত্রিকার সম্পাদককে লজ্জায় ফেলে দিতে পারে, জীবনানন্দের এমন কবিতা ব্রাহ্মদের কলেজ থেকে তাঁর চাকরিচ্যুতির কারণ হতে পারে।

উভয় পক্ষের হয়ে ওকালতিকারীরা—বিশেষ করে বুদ্ধদেব—কিছু তথ্যগত ভুল করেন, যা তাঁদের বক্তব্যের বৈধতাকে খাটো করে ফেলে। জীবনানন্দ কখনোই সিটি কলেজের ছাত্র ছিলেন না এবং হেরম্ব মৈত্রও তাঁর শিক্ষক ছিলেন না। 'ক্যাম্পে' কবিতাটি *পরিচয়* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, কিন্তু *পরিচয়* ১৯৩১-এর আগে বের হয়নি, অথচ জীবনানন্দ সিটি কলেজ থেকে পদচ্যুত হয়ে বেরিয়ে গেছেন ১৯২৮ সালে। কবিতা তাঁর চাকরিচ্যুতির পেছনে ভূমিকা রেখেছিল, এই কথাটি কল্পনাপ্রসূত। তবুও এর বিরুদ্ধ মতের সাক্ষ্য, প্রমাণবিহীন ইঙ্গিতবাহীমাত্র। সরোজেন্দ্রনাথ রায় জোর দিয়ে বলেন, হেরম্ব মৈত্র কখনোই সমসাময়িক বাংলা ম্যাগাজিন অথবা বই পড়তেন না।[১০০] এতদসত্ত্বেও এটা অস্বাভাবিক মনে হয় যে তিনি তাঁর ইংরেজি বিভাগের একজনের বিরুদ্ধে *শনিবারের চিঠি* ও সজনীকান্তের সমালোচনার কথা শুনবেন না। সরস্বতীপূজায় একটা ঘটনা ঘটেছিল, তার একটা পরিণতি হিসেবে আসে সিটি কলেজের ছাঁটাইনীতি। তবে একমাত্র এই ছাঁটাইয়ের কারণে যে জীবনানন্দ চাকরি হারিয়েছিলেন, তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা যায় না।

যে কারণেই হোক, জীবনানন্দ ১৯২৮ সালের মাঝবরাবর চাকরিহীন হন। ১৯২৯-এর শেষভাগের আগ পর্যন্ত তিনি আর কোনো চাকরি পাননি। এবার যেটা পান সেটা কলকাতা আর বরিশালের মাঝামাঝি বাংলাদেশের খুব ছোট একটা শহর বাগেরহাটের সদ্য স্থাপিত প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে। সেখানে তিনি ছিলেন মাত্র কয়েক মাস। তারপর দিল্লির রামযশ কলেজে একটা চাকরি পান তিনি, যেটির উপাধ্যক্ষ ছিলেন বরিশালের সবচেয়ে নামকরা ব্যক্তিত্ব অশ্বিনীকুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র সুকুমার দত্ত, যিনি নিজেও ছিলেন বরিশালের খ্যাতনামা লোক। এবারেও জীবনানন্দ এই পদে স্বল্প সময়ের জন্য ছিলেন, ১৯২৯-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৩০-এর মার্চ পর্যন্ত।[১০১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রামযশ কলেজে সহকর্মী ও বন্ধু প্রভাসচন্দ্র ঘোষের মতে, জীবনানন্দ দিল্লিতে একাকী ও অসুখী বোধ করতেন। তবে তাঁর অন্ততপক্ষে আরেকজন বন্ধু ছিলেন সেখানে, বরিশালের আরেক ব্রাহ্ম সুধীরকুমার দত্ত। সুধীরকুমার নয়াদিল্লির রাইসিন নামের একটা হোটেলে থাকতেন। জীবনানন্দের কলেজটা ছিল দিল্লির উপকণ্ঠে যাকে তিনি বলেছেন, ঊষর, জলহীন পাহাড়ি অঞ্চল, যার নাম ছিল কালাপাহাড়, পরে নাম পরিবর্তন করে এটি হয়েছিল আনন্দপর্বত।[১০২] দুজন রোজ সন্ধ্যায় নিয়মিত দেখা করতেন, কখনো জীবনানন্দ সুধীরকুমারকে তাঁর কলেজ ক্লাবে নিয়ে যেতেন। সুধীরকুমারকে স্মরণ করে জীবনানন্দ কয়েক বছর পর লেখেন :

> আমাদের College ছিল একটা পাহাড়ের উপরে, পুরানো দিল্লী হইতে ঢের দূরে, Raisine এর নূতন দিল্লী আরো অনেক দূরে।
>
> December মাস, দিল্লীতে তখন গভীর শীত—পাহাড়ে আরো শীত...সমস্ত অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া সে এই marooned পাহাড়ে আমার সঙ্গে আসিয়া থাকিতে লাগিল।[১০৩]

দিল্লিতে যত অতৃপ্ত থাকুন না কেন, প্রভাসচন্দ্রের মতে জীবনানন্দ সেখানে তাঁর শিক্ষকতাটা টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। পরিকল্পনা করেছিলেন বিয়ে করে রামযশ কলেজে ফিরে আসার। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রভাসচন্দ্র ও অন্যান্য সহকর্মীকে অনুরোধ করেন, যাতে তাঁরা তাঁর অর্থাৎ জীবনানন্দের চাকরিটার মেয়াদ বাড়ানো এবং বিয়ে করতে বাড়ি যাওয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত ছুটি মঞ্জুর করার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে প্রিন্সিপালকে অনুরোধ করেন। প্রিন্সিপাল এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং দিল্লিতে জীবনানন্দের চাকরির মেয়াদ শুরু হওয়ার চার মাসের মাথায় শেষ হয়ে যায়।[১০৪]

রামযশ কলেজে যা ঘটে তা সত্ত্বেও জীবনানন্দ বিয়ের ব্যাপারে এগিয়ে যান। তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে জানা যায়, তাঁকে তাঁর মা-বাবা দিল্লি থেকে ডেকে পাঠান, যাতে ব্যবস্থাদি করা যায়। প্রকৃতপক্ষে লাবণ্য দাশের (গুপ্ত) অভিভাবকই এই সম্বন্ধটার প্রস্তাব করেছিলেন। লাবণ্য দাশ, তাঁর দুই বোন ও এক ভাই সেনহাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র চার মাসের ব্যবধানে তাঁরা মা-বাবা দুজনকেই হারান, লাবণ্যর বয়স তখন মাত্র সাত বছর। তাঁর বাবা রোহিণীকুমার গুপ্ত হিন্দু হলেও তাঁর বড় দুই ভাই, অমৃতলাল ও বিহারীলাল ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলেন। ঢাকায় পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক অমৃতলাল লাবণ্যর অভিভাবক হন। তিনিই তাঁদের স্বধর্মী (ও জাতের বিচারে বৈদ্য—যদিও ব্রাহ্মপ্রথায় জাতপাত কোনো ব্যাপার নয়) সত্যানন্দ ও কুসুমকুমারী দাশের কাছে তাঁদের ছেলের সঙ্গে তাঁর ভাইঝির বিয়ের প্রস্তাব করেন।[১০৫]

অমৃতলাল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন তাঁর ভাইঝিটি পাছে আবার ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে শরিক হয়ে যায়। লাবণ্য জানান, ঢাকার ইডেন কলেজে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আইএ পড়ার সময় তিনি রাজনীতির প্রতিও কিছুটা ঝুঁকে পড়েছিলেন। তাঁর জ্যাঠামশায় (অমৃতলাল গুপ্ত) হয়তো তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন কী ঘটছে। আর তাই তাঁকে কোনো কিছু না জানিয়ে, এবং কী ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝার সময় না দিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিয়ের আয়োজন করে ফেলেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি তাঁকে এটাও জানতে দেননি যে দিল্লির রামযশ কলেজ থেকে এক অধ্যাপক তাঁকে দেখতে আসবেন।

> ঢাকা ইডেন কলেজে আই. এ. পড়ার সময় রাজনীতির দিকে একটু বেশিরকমই ঝুঁকে পড়েছিলাম। আমার জেঠামশাই (ঁঅমৃতলাল গুপ্ত) বোধহয় সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ধরে ফেলেছিলেন। তাই বিনা নোটিশেই অর্থাৎ আমাকে বুঝবার কিছুমাত্র সময় না দিয়েই একেবারে আমার বিয়ে ঠিক ক'রে ফেললেন। শুধু তাই—ই নয়, দিল্লীর রামযশ কলেজের অধ্যাপক ভদ্রলোক যে আমাকে দেখতে আসবেন, সেটুকুও জানতে দিলেন না।[১০৬]

একদিন অমৃতলাল লাবণ্যকে ছাত্রীনিবাস থেকে বাড়িতে ডাকিয়ে আনেন। লাবণ্য স্মৃতিচারণা করেন, হোস্টেল থেকে তাঁর জ্যাঠামশায়ের বাড়ি যেতে পথে একটা কর্দমাক্ত মাঠ পড়ত এবং সেদিন তাঁর পরনে ছিল নকশি পাড়ের একখানা সাধারণ সুতির শাড়ি। বাড়িতে ঢুকলে জ্যাঠামশাই তাঁকে বলেন, বাড়িতে একজন অতিথি এসেছেন, তিনি যাতে ওঁর জন্য চা-নাশতা বানিয়ে নিয়ে আসেন। তিনি যখন নাশতা নিয়ে বসার ঘরে ঢোকেন, তখনো তাঁর পরনে কাদার ছিটে লাগা সেই শাড়ি। সেখানে একজনমাত্র অতিথি, ২৮-২৯ বছরের সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা কালো এক লোক।[১০৭]

রীতি এটাই যে একজন যুবক তার মা-বাবার পছন্দ করা কনেকে নিজে দেখবে ও মত দেবে। সেদিন সেই ভদ্রলোক তাঁকে দেখে অনুমোদন করার পর লাবণ্যর জ্যাঠামশায় বিয়ের ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর মত চান। বিয়ের চেয়ে লাবণ্য কলেজের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও গোপন রাজনীতির প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন বলে বহুভাবে বোঝানোর পর তিনি একসময় বিয়েতে রাজি হন। ঢাকার ব্রাহ্মমন্দিরে ১৯৩০ সালের ৯ মে ব্রাহ্মরীতিতে এ বিয়ে পরিচালনা করেন জীবনানন্দের পিসেমশাই মনমোহন চক্রবর্তী; এতে যোগ দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত ও আরও দু-একজন লেখক। কয়েক দিন পর নববিবাহিত দম্পতি লঞ্চে করে বরিশালে পৌঁছান। অধিকাংশ বাঙালি সমাজের রীতি হলো, বিয়ের পর দম্পতি থাকবে বরের বাবার বাড়িতে, সে অনুযায়ী জীবনানন্দ ও লাবণ্য বরিশাল মূল শহরের বগুড়া ও গোরস্থান রোডের মোড়ে দাশ পরিবারের সাদাসিধে বাড়ি সর্বানন্দ ভবনে ওঠেন। সেখানে মে মাসের ১৪ তারিখে তরুণী লাবণ্য বৌভাত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন, যেখানে নববধূকে রান্না করতে হয় তার শ্বশুর পক্ষকে খাওয়ানোর জন্য, যাতে স্বামীর সংসারের একজন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে।[১০৮]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিয়ের ফলে লাবণ্যর পড়াশোনা সাময়িক বিঘ্নিত হয়, আর তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ফোটার আগে কুঁড়িতেই বিনষ্ট হয়। এই দম্পতির দুই সন্তানের মধ্যে প্রথমজন মঞ্জুশ্রীর জন্ম হয় ১৯৩১ সালে। পরবর্তী সময়ে লাবণ্য আবার পড়াশোনার উদ্দেশ্যে ফিরে যান এবং ১৯৩৫ সালে বরিশালের স্থানীয় কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তাঁর এই অর্জনের খবর *ব্রহ্মবাদী*তে প্রকাশিত হয়েছিল :

মহিলাদের কৃতিত্ব

> ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস বি, এ, মহাশয়ের পুত্রবধূ অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশের পত্নী শ্রীমতী লাবণ্যবালা একটী পাঁচ বৎসরের শিশু কন্যার মা হইয়া আই, এ, পাস করিয়ে এবার বি, এম, কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তির্ণ হইয়াছেন।[১০৯]

তাঁদের এক পুত্রসন্তান হয়, সমরানন্দ, ১৯৩৮ সালে। এই ছিল তাঁর পুরো পরিবার।

এটা সম্ভবত কখনোই নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে জীবনানন্দ বিয়ের পর সত্যিই দিল্লি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, নাকি তাঁর নিজ দেশ বাংলাদেশেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। আমি ধারণা করব, তিনি জানতেন নিজ দেশে থাকার তৃপ্তিটা কী। কারণ, তিনি তাঁর দেশকে ভালোবাসতেন তীব্র অনুরাগে। তিনি সহসাই আবার সনেট লিখতে শুরু করেন, যার ভেতর দিয়ে এই ভালোবাসা প্রকাশ পায়। তবে জীবনানন্দের আগে ও পরে অন্যরাও বাংলাদেশের জন্য তাঁদের ভালোবাসার কথা লিখেছেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ মধুসূদন তাঁর 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটা শুরু করেছেন এভাবে :

> *'শুভরাত্রি, স্বদেশ আমার!'—বায়রন*
>
> রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
> সাধিতে মনের সাদ,
> ঘটে যদি পরমাদ,
> মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।[১১০]

রবীন্দ্রনাথের গান সরাসরি শুরু হয় : 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। জীবনানন্দের ভালোবাসার অনুভূতির প্রকাশ একই রকম আন্তরিক, কিন্তু একই সঙ্গে আমরা যা দেখি তা স্বকীয়ভাবে জীবনানন্দীয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তথ্যসূত্র

১. অশোকানন্দ দাশের সাক্ষাৎকার। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে হতো, ১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের যে কেউ সদস্য হতে পারতেন।

২. জীবনানন্দ দাশ, 'আমার মা বাবা', ৬।

৩. জীবনানন্দ দাশ, *ঝরা পালক* (কলকাতা : সুধীরচন্দ্র সরকার, ১৯২৭), ৫১-৫২, *বঙ্গবাণী* অঘ্রান ১৩৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৪. এই উদ্ধৃতিটি আমার অনুবাদে ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে প্রকাশিত হয়। কাজী আবদুল মান্নান ও ক্লিন্টন বি সিলি অনূদিত *লিরিক পোয়েট্রি* (নিউ ইয়র্ক : 'লার্নিং রিসোর্সেস ইন ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ', ১৯৭৪), ৫-৬।

৫. ইয়ারোস্লাভ প্রুসেক ও দুসান জবাভিতেল সম্পাদিত: *ডিকশনারি অব ওরিয়েন্টাল লিটারেচারস* (নিউ ইয়র্ক : বেসিক বুকস, ১৯৭৪), ১০৭।

৬. নজরুল ইসলাম, *দ্য ক্রনিকল অব দ্য হার্ট* (*চিত্তনামা*) (নামটির প্রথমাংশ চিত্তরঞ্জন দাশের 'চিত্ত' এবং দ্বিতীয়াংশ মুসলমান রাজাদের প্রশংসাপূর্ণ ইতিহাস 'নামা') প্রকাশনা জুলাই ১৯২৫; এতে ছিল সি আর দাশ স্মরণে কবিতা ও গান, যার একটির পাদটীকায় লেখা ছিল : 'দেশবন্ধুর অন্ত্যেষ্টিযাত্রা মিছিলের গান।' *নজরুল রচনা-সম্ভার*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা : হরফ প্রকাশনী, ১৯৭০), ২৪১।

৭. অশোকানন্দ দাশ, 'আমার দাদা জীবনানন্দ দাশ', ৪।

৮. জীবনানন্দ দাশ, 'আমার মা বাবা', ১৩।

৯. স্বামী বিবেকানন্দ, 'মাই মাস্টার', চতুর্থ খণ্ড, *কমপ্লিট ওয়র্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ*, চতুর্থ খণ্ড (মায়াবতী মেমোরিয়াল দশম সংস্করণ, কলকাতা : অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৭২), ১৫৬।

১০. লিয়োনার্ড এ গর্ডন উদ্ধৃত পাকিস্তানের এক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, '[সি আর দাশ ছিলেন] একমাত্র হিন্দু নেতা যিনি মুসলমানদের মাঝে অনর্গল বিশ্বাস প্রণোদিত করেছিলেন; আর কখনোই হিন্দু নেতৃত্ব এতো উপরে উঠে আসেনি।' গর্ডন, *বেঙ্গল: দ্য ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট, ১৮৭৬-১৯৪০* (নিউ ইয়র্ক অ্যান্ড লন্ডন: কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৪), ২১৯।

১১. *ঝরা পালক*, ৫৬-৫৯, *বঙ্গবাণী*, আষাঢ় ১৩৩৩ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

১২. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, *কল্লোলের কাল* (কলকাতা : কথাশিল্প, ১৯৭৩), এতে 'ফোর আর্টস ক্লাব' সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৩. *ঝরা পালক*, ৩৩-৩৪।

১৪. *ময়ূখ*, পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-৬২, ১২২-২৩।

১৫. প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসুর সাক্ষাৎকার।

১৬. অজিত দত্ত, 'কবিতা লেখার কথা', *দেশ*, বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৯, ২০২।

১৭. *শনিবারের চিঠি* জুলাই ১৯২৪ থেকে শুরু হয় সাপ্তাহিকী হিসেবে, কিন্তু টিকে ছিল মাত্র ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ পর্যন্ত। তারপর আগস্ট ১৯২৭ থেকে আবার মাসিক হিসেবে শুরু হয়। সাপ্তাহিকীটি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদনা করতেন যোগানন্দ দাস, আর প্রকাশিত হতো রামানন্দের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায়। মাসিকটি প্রথমে সম্পাদনা করেছেন যোগানন্দ দাস, সহকারী সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। পরের বছরের জানুয়ারি থেকে নীরদ সি চৌধুরী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তবে ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সজনীকান্তকে সম্পাদনা ও প্রকাশনার সর্বময় দায়িত্ব গ্রহণের অনুমতি দেন।

১৮. দেবজ্যোতি দাস, *সজনীকান্ত দাস* (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭০), ৫১।

১৯. বইটিতে কোনো প্রকাশকাল দেওয়া নেই। জীবনানন্দের নিজের লেখা ভূমিকার তারিখ আশ্বিন ১৩৩৪ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯২৭)। সে বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা *কল্লোল*-এ বইটির একটা আলোচনা ছাপা হয়েছিল।

২০. *ময়ূখ*, পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-৬২, ২২৬।

২১. *ঝরা পালক*, ৬৮-৭০।

২২. প্রাগুক্ত, ৭১-৭৪।

২৩. প্রাগুক্ত, ৮৭-৮৯।

২৪. *কল্লোল*, অঘ্রান ১৩৩৪, ৬২৩।

২৫. সরোজেন্দ্রনাথ রায়ের সাক্ষাৎকার।

২৬. এপ্রিল ১৯২৫ থেকে সজনীকান্ত *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউর* সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৮-এর মে থেকে তাঁকে *প্রবাসী* প্রেসের ম্যানেজার হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়। দেবজ্যোতি দাস, *সজনীকান্ত দাস*, ৬-৭।

২৭. মার্চ ৫ ১৯৩৬ তারিখের উদ্ধৃত চিঠি—আবদুল মান্নান সৈয়দ, *শুদ্ধতম কবি*, ২৫৩-৫৪।

২৮. আমার জানামতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'সাহিত্যের গুণ্ডা' অভিধা দিয়েছিলেন *শনিবারের চিঠি*কে লক্ষ্য করেই।

২৯. দেবজ্যোতি দাস, *সজনীকান্ত দাস*, ৩১-৩২।

৩০. মোহিতলাল মজুমদার, *সাহিত্য কথা*, দ্বিতীয় সংস্করণ (সাঁতরাগাছি, পশ্চিমবঙ্গ: বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৯), ৬-৭। 'সাহিত্য আদর্শ' প্রথম ছাপা হয় *শনিবারের চিঠি*, আশ্বিন ১৩৩৪ সংখ্যায়। মোহিতলালের মনোভাবের পূর্ণ বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য*, পঞ্চম সংস্করণ (কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৫৯), ১-২২।

৩১. সজনীকান্ত বিভিন্ন ছদ্মনামে লিখতেন, তবে এটা সেগুলোর কোনোটাই নয়। তাঁর ছদ্মনামগুলোর তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য, দেবজ্যোতি দাস, *সজনীকান্ত দাস*, ৪৯-৫০।

৩২. *শনিবারের চিঠি*, কার্তিক ১৩৩৪, ১১৯-১২০।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৩. সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি* (কলকাতা : ডি এম লাইব্রেরি, ১৯৫৬) ২ : ৫৪-৫৫।

৩৪. সজনীকান্তের প্রতি সর্বতো সততায় এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তিনি একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ১৯২৭ সালের প্রথম দিকে তিনি নির্দিষ্ট কিছু *কল্লোল*-এর ও প্রগতিশীল লেখকদের সবার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠিতে এই দলাদলির মধ্যে তিনি অসফলভাবে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পক্ষে টানতে চেয়েছিলেন। সজনীকান্তের চিঠি ও রবীন্দ্রনাথের জবাব উদ্ধৃত আছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *কল্লোল যুগ* বইতে। *কল্লোল যুগ*, পঞ্চম সংস্করণ (কলকাতা : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৬৫), ১৮৩-১৮৫।

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৬৫), ১৭ : ৩৭৫।

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যধর্ম', *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৫৮), ২৩ : ৪০৭।

৩৭. দেবজ্যোতি দাসের মতে *আত্মশক্তি*, ভাদ্র ৯ থেকে আশ্বিন ২৭ ১৩৩৪ সংখ্যায় ছাপা হয় সজনীকান্তের লেখা, *সজনীকান্ত দাস*, ৬২।

৩৮. দুটো চিঠির তারিখই ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭ এবং সজনীকান্ত দাসের *আত্মস্মৃতি*তে, ২ : ৪-৭, পুনর্মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বহুমুখী যে সম্পর্ক সজনীকান্ত রক্ষা করেছিলেন, সে সম্পর্কে পূর্ণ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, জগদীশ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত* (কলকাতা : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৩)।

৩৯. সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি*, ৬।

৪০. *শনিবারের চিঠি*, অঘ্রান, ১৩৩৪, ২৭২।

৪১. *শনিবারের চিঠি*, আষাঢ় ১৩৩৫।

৪২. *শনিবারের চিঠি*, অঘ্রান, ১৩৩৪, ২৮০।

৪৩. সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি*, ১ : ২৬৮। তিনি তাঁর দাবির সমর্থনে মোহিতলালের 'সাহিত্যের আদর্শ' (*শনিবারের চিঠি*, আশ্বিন ১৩৩৪) থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন। যে অংশটি উদ্ধৃত করে ছাপানো হয়েছিল সেটির সঙ্গে পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত মোহিতলাল মজুমদারের *সাহিত্য কথার* যথেষ্ট গরমিল ছিল।

৪৪. জীবনানন্দ দাশ, *ধূসর পাণ্ডুলিপি*, তৃতীয় সিগনেট সংস্করণ (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ১৯৬৭), ৭৩-৭৬।

৪৫. *শনিবারের চিঠি*, চৈত্র ১৩৩৪, ২২৫।

৪৬. জীবনানন্দ দাশ, *বনলতা সেন*, অষ্টম সিগনেট সংস্করণ (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ১৯৬৮), ২৮।

৪৭. *রূপসী বাংলা*, ২৪।

৪৮. *বনলতা সেন*, ১৫।

৪৯. শ্রাবণ ১৩৩৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *নটরাজ*, যেটিকে সজনীকান্ত আক্রমণ করেছিলেন, সেটি ছাপা হয় *বিচিত্রার* সর্বপ্রথম সংখ্যায়।

৫০. অঘ্রান ১৩৩৪, রচনাটি প্রথমে *প্রবাসী* পত্রিকায় 'যাত্রীর ডায়ারি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫১. এখানে উল্লেখ করা দরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে যা করেছিলেন, অর্থাৎ ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে পরিগ্রহণ—কিছুটা মার্জিতভাবে—সে কারণেই নিন্দা করছিলেন অন্যদের। দ্বীপপুঞ্জ থেকে ফিরে আসার পর তিনি *নটরাজ* পরিমার্জনা করেন, নতুন সংগীত যুক্ত করে *ঋতুরঙ্গ* নামে কলকাতায় মঞ্চস্থ করেন ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে। রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার লেখেন, এবারের নৃত্যগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫২), ৩ : ২২৯।

৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যে নবত্ব', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ২৩, ৪১১।

৫৩. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, ২৯১।

৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য সমালোচনা', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ২৩ : ৫০৯।

৫৫. কৃষ্ণ কৃপালনী এই উপন্যাসটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন *ফেয়ারওয়েল, মাই ফ্রেন্ড* নামে। 'মিতা' নামে রবীন্দ্রনাথের একটা গল্পের বর্ধিত রূপ এই উপন্যাসটির ধারাবাহিক প্রকাশনা শুরু হয়েছিল এই সম্মেলনের কয়েক মাস পরে আগস্ট ১৯২৮ থেকে।

৫৬. বুদ্ধদেব বসু, *রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য* (কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৫৫), ১২৫-২৬।

৫৭. *প্রগতি*, আশ্বিন ১৩৩৫; পুনর্মুদ্রিত বুদ্ধদেব বসু, *প্রবন্ধ সংকলন* (কলকাতা : ভারবি, ১৯৬৬), ৯৬।

৫৮. দ্রষ্টব্য, এস কে দে, *স্যাংস্ক্রিট পোয়েটিকস অ্যাজ আ স্টাডি অব ইসথেটিক* (বার্কলে অ্যান্ড লস এনজেলেস : দ্য ইউনিভারসিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৬৩), ৪৮; এবং ভি রাঘবন অ্যান্ড নগেন্দ্র, *অ্যান ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান পোয়েটিকস* (বোম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ ও লন্ডন : ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৭০), ৩৬।

৫৯. বুদ্ধদেব বসু, *প্রবন্ধ সংকলন*, ৯৬।

৬০. প্রাগুক্ত, ৯৭।

৬১. *ধূসর পাণ্ডুলিপি*, ৪১-৪৪। *প্রগতি*, ভাদ্র ১৩৩৬ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

৬২. দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, তৃতীয় সংস্করণ (কলকাতা : নাভানা, ১৯৬৪), ১৮২।

৬৩. অম্বুজ বসু, *একটি নক্ষত্র আসে* (কলকাতা : মৌসুমি, ১৯৬৫), ১১১-১৪।

৬৪. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, *জীবনানন্দ প্রতিভা* (কলকাতা : আলফা পাবলিশিং কনসার্ন, ১৯৭২), ৪৪।

৬৫. বুদ্ধদেব বসু, 'বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ', *প্রগতি*, ভাদ্র ১৩৩৬; আংশিকভাবে অন্তর্ভুক্ত তাঁর *প্রবন্ধ সংকলন*-এর 'জীবনানন্দ দাশের স্মরণে'তে, ১০০-১০১।

৬৬. 'দ্য মিউজিক অব পোয়েট্রি', *সিলেকটেড প্রোজ অব টি এস এলিয়ট*, ফ্রাঙ্ক কারমোড সম্পাদিত (লন্ডন : ফেবার অ্যান্ড ফেবার, ১৯৭৫), ১১১।

৬৭. *ধূসর পাণ্ডুলিপি*, ৭৭-৭৮; *কল্লোল*, বৈশাখ ১৩৩৬।

৬৮. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'কবিতা কি', *বেলা অবেলা*, ফাল্গুন ১৩৭৬, পৃষ্ঠা নম্বর নেই।

৬৯. উদাহরণস্বরূপ ইংরেজি শব্দসম্ভারের ৮০ শতাংশ বিদেশি ভাষাজাত বলে বলা হয়; রবার্ট ম্যাক্রাম, উইলিয়াম ক্র্যান অ্যান্ড রবার্ট ম্যাকনিল, *দ্য স্টোরি অব ইংলিশ* (নিউ ইয়র্ক : এলিজাবেথ সিফটন বুকস : ভাইকিং পেংগুইন, ১৯৮৬), ৪৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৭০. সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি,* ২ : ৫৯, ৬৪।

৭১. জাবেজ টি স্যান্ডারল্যান্ড, *ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজ,* পরি : সং (নিউ ইয়র্ক : লুই কপল্যান্ড কোম্পানি, ১৯৩২), সাত।

৭২. সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি,* ২ : ৬৪, ৭৪।

৭৩. প্রাগুক্ত, ৭৩। আলোচ্য লেখাটি ছিল 'ছন্দ-সরস্বতী', ছন্দ সম্পর্কে প্রয়াত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (মৃত্যু ১৯২২) একটি প্রবন্ধ।

৭৪. প্রাগুক্ত, ৮৭।

৭৫. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ,* ২৫৮।

৭৬. এপ্রিল-জুন, ১৯২৯। সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি,* ২ : ৮৯।

৭৭. প্রাগুক্ত, ৯২।

৭৮. *ব্রহ্মবাদী,* অঘ্রান, পৌষ, মাঘ, ১৩৩৩, ১৪৩-৪৪।

৭৯. বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্মৃতিকথা* (কলকাতা : বিদ্যাসাগর বুক স্টল) [১৯৪৯], ২ : ৬৮।

৮০. প্রাগুক্ত, ৬৯।

৮১. প্রাগুক্ত, ৬৮।

৮২. *অমৃতবাজার পত্রিকা,* ২৯ জানুয়ারি ১৯২৮, ৩। বাংলার অন্যান্য জায়গা থেকেও এ সময় পূজা-সম্পর্কিত গোলযোগের খবর পাওয়া যায়। কলকাতা পুলিশ বিসর্জন মিছিলের দিন মসজিদের পাহারায় ছিল, হিন্দু-মুসলমান সংঘাত ঠেকাতে। বরিশালের খবর : 'সরস্বতী পূজার সতর্কতা—একটি বিজ্ঞপ্তি—অনুমতি ছাড়া মিছিল নিষিদ্ধ।' প্রাগুক্ত, ২৭ জানুয়ারি, ১৯২৮, ৩।

৮৩. প্রাগুক্ত, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮, ৪।

৮৪. প্রাগুক্ত, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮, ৫।

৮৫. বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্মৃতিকথা,* ২ : ৭০।

৮৬. *সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বার্ষিক প্রতিবেদন,* ১৯২৮, ৪১।

৮৭. *শনিবারের চিঠি,* আষাঢ় ১৩৩৫, ৩০৯-১৪।

৮৮. *সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯২৮,* ৪২।

৮৯. সরোজেন্দ্রনাথ রায়ের মতে, ১৯২৮ সালে ইংরেজি বিভাগ জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নিম্নোক্ত সদস্যদের দ্বারা গঠিত ছিল : হেরম্ব মৈত্র, রজনীকান্ত গুহ (বিভাগীয় প্রধান), সুরেশচন্দ্র রায়, তারপর হয় প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় অথবা ব্রজসুন্দর রায়, বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সরোজেন্দ্রনাথ রায়, নির্মলচন্দ্র চক্রবর্তী ও সবশেষে জীবনানন্দ দাশ।

৯০. বিতর্কের উভয় পক্ষই দাবি করেছেন, তাঁরা স্বয়ং জীবনানন্দের কাছ থেকে বিষয়টা যাচাই করেছেন।

৯১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ,* ১৫৮। 'শস্য' নামে কোনো কবিতা নেই। অচিন্ত্যকুমারের মনে হয়তো 'পিপাসার গান' কবিতাটি ছিল, যেখানে 'ফসলের স্তন' শব্দবন্ধ পাওয়া যায়।

৯২. *ময়ূখ,* পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১-৬২, ১২২-২৩। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, তিনি জীবনানন্দকে কয়েকবার *কল্লোল* অফিসে নিয়ে গেছেন, তবে জীবনানন্দ অস্বস্তি বোধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেছেন। পরের মাসে অচিন্ত্যকুমারকে লেখা জীবনানন্দের দ্বিতীয় চিঠিটি সম্পর্কে *কল্লোল যুগ*-এ আর কোনো প্রসঙ্গ নেই; প্রাগুক্ত, ১২৪।

৯৩. বুদ্ধদেব বসু, 'চরম চিকিৎসা', *দেশ,* ২৮ বৈশাখ, ১৩৭৫, ২৩৭।

৯৪. বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার।

৯৫. *দেশ,* ২৯ আষাঢ়, ১৩৭৫, ১২২৪।

৯৬. ব্রাহ্ম ও নীতিবাগীশ পিউরিটানিজম সম্পর্কে জীবনানন্দের ভাই লেখেন, 'সে যুগের ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেরই puritanism ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের একনিষ্ঠ সেবক হয়েও বাবার মধ্যে কোনও puritanism দেখিনি...।' অশোকানন্দ দাশ, 'বাল্যস্মৃতি', ১৩০।

৯৭. *সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯২৩,* ২৪।

৯৮. *ব্রহ্মবাদী,* মাঘ, ১৩৩৯, ২২৩।

৯৯. নীরদ সি চৌধুরী, *দ্য অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান,* ২১১।

১০০. সরোজেন্দ্রনাথ রায়ের সাক্ষাৎকার।

১০১. মনোরঞ্জন কর—যিনি প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে জীবনানন্দের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন—এবং প্রভাসচন্দ্র ঘোষের সাক্ষাৎকার।

১০২. *রামযশ কলেজ গোল্ডেন জুবিলী, ১৯৬৭; স্যুভেনির,* ৬।

১০৩. জীবনানন্দ দাশ, 'সুধীরকুমার', *স্মৃতি-তর্পণ,* সম্পাদক নেই ([বরিশাল] : প্রকাশক নেই, তারিখ : এপ্রিল, ১৯৪২), ১৩৭। বরিশালের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। দাশ পরিবার যখন সর্বানন্দ ভবন ছেড়ে দেন এবং চিরদিনের জন্য বরিশাল ত্যাগ করেন, তাঁদের লাইব্রেরির একাংশ এই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল।

১০৪. প্রভাসচন্দ্র ঘোষের সাক্ষাৎকার।

১০৫. লাবণ্য দাশের সাক্ষাৎকার।

১০৬. লাবণ্য দাশ, 'সহধর্মিণীর চোখে কবি জীবনানন্দ', *বেতার জগৎ,* শারদীয়া, ১৩৭৬, ১৩৯।

১০৭. কবিতা সিংহের সঙ্গে লাবণ্য দাশ, 'আমার স্বামী জীবনানন্দ দাশ', *দৈনিক কবিতা,* ২৫ বৈশাখ, ১৩৭৫, ২; লাবণ্য দাশ, *মানুষ জীবনানন্দ* (কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৭১), ১-২।

১০৮. লাবণ্য দাশ, 'সহধর্মিণীর চোখে কবি জীবনানন্দ', ১৩৯; কবিতা সিংহের সঙ্গে লাবণ্য দাশ, 'আমার স্বামী জীবনানন্দ দাশ', ২; *ব্রহ্মবাদী,* জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, ৪৭-৪৮।

১০৯. *ব্রহ্মবাদী,* আষাঢ়, ১৩৪২, ৭১।

১১০. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত : *মধুসূদন রচনাবলী* (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৫), ১৮৬।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বরিশাল ফেরা

হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতোদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

—জীবনানন্দ দাশ, 'বনলতা সেন', *বনলতা সেন*

১

১৯৩০-এর দশকের প্রথমার্ধে জীবনানন্দ নববিবাহিত ও বেকার অবস্থায় বরিশাল প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৩৫ সালের আগে তিনি তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার সর্ববৃহৎ কলেজ বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের ইংরেজি বিভাগে পুনরায় আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষকতা শুরু করেননি।[১] ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় *ঝরা পালক*। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ *ধূসর পাণ্ডুলিপি* প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে, যদিও এই গ্রন্থের প্রায় সব কবিতা ১৯৩০ সালের মধ্যে পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়ে গেছে।

এ দুই গ্রন্থের মাঝখানে তিনি বহু কবিতা ও গল্প রচনা করেন, কিন্তু সেসব ছাপাতে দেননি। এমনকি একটা শিরোনামহীন অসমাপ্ত উপন্যাসও লিখেছিলেন ১৯৩৩ সালে।[২] এসব গদ্য প্রকাশের পর জীবনানন্দের বাস্তব ভাষারীতিসিদ্ধ কথ্য বাংলা এবং জীবনঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য ভুবন আবিষ্কার করার ক্ষমতার—যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে আত্মজীবনীমূলক চরিত্রের সূক্ষ্ম ইশারার উপস্থিতিসমৃদ্ধ—এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়।

১৯৩০-এর দশকের ছোটগল্প-প্রধান গদ্য লেখার শুরুটা জীবনানন্দের জীবনের বড় ধরনের একটা পরিবর্তনের সময়ের সঙ্গে মিলে যায় (যেমনটি হয়েছিল যখন তিনি কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন)। তাঁর বয়স যখন তিরিশের কোঠায় তখন তাঁর জীবনযাপন আরেকজন মানুষের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। যিনি তাঁর মতো নন; তরুণী, অপূর্ব সুন্দরী ও তাঁর সদ্যপরিচিতা প্রাণবন্ত এক রমণী, যাঁকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। এক দশকেরও বেশি সময়ের ব্যস্ত জীবনের পর (প্রথমে ছাত্রাবস্থায় কলকাতায়; তারপর শিক্ষক হিসেবে কলকাতা, বাগেরহাট ও দিল্লিতে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বরিশালে ফিরে মনোযোগ দেওয়ার মতো এবং সার্বক্ষণিক লেখালেখিতে ব্যস্ত থাকার মতো একটা পারিবারিক জীবন লাভ করেন তিনি। ১৯৩৫ সালে কলেজের শিক্ষকতা শুরু করে ১৯৪৬ সালে আবার সেই পেশা ছেড়ে দিয়ে (স্থায়ীভাবে, তেমনটিই ভেবেছিলেন তিনি, যদিও শেষ পর্যন্ত সেভাবে ঘটেনি), এমনকি তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে সাংবাদিকতা করে পুনরায় কলকাতায় বসবাস করার অদ্ভুত খেয়াল চাপে ওঁর। কিন্তু তাঁর জীবনের এই সন্ধিক্ষণে জীবনানন্দের বাস্তব ও উপমিত ভুবন সম্ভবত একীভূত হয়ে যায়। কারণ তাঁর গল্পে যে আনন্তর্য ও স্বচ্ছতা ছিল, তাঁর বহু কবিতা সেখানে পৌঁছাতে পারেনি।

তত দিনে প্রকাশিত তাঁর পাঁচটি ছোটগল্প ও তিনটি উপন্যাসের মধ্যে একটা ছাড়া বাকি সব লেখা হয় প্রমিত চলতি ভাষায়। অসাধারণভাবে আত্মপ্রবণ স্বভাবের সংকর যে বাংলা আমরা তাঁর কবিতায় পাই, তাঁর গদ্যে তা দেখা যায় না। গদ্যগুলো গল্প হলেও বাস্তব জগতের ভাষায় বর্ণিত বাস্তব চিন্তাপ্রসূত। সংলাপে রয়েছে অকৃত্রিমতার ছোঁয়া, কথোপকথন সপ্রতিভ স্বাভাবিক গতিতে প্রবহমান। শব্দভান্ডার বিস্তৃত, বিশাল ও তীক্ষ্ণ। এককথায় একটা বাস্তব মানবীয় পরিবেশকে জীবন্তভাবে চিত্রিত করার জন্য জীবনানন্দের ছিল গল্পের ভাষার ওপর পূর্ণ দখল—এটা তাঁর কাব্যভাষা ও কাব্যক্ষেত্রের বিপরীত, যার বেশির ভাগই অদ্যাবধি গতানুগতিক দৈনন্দিন জগতের বাইরে পড়ে আছে।

তাঁর গল্পে যা প্রতিভাত হয়, সেটা প্রাথমিকভাবে বর্ণিত হয় সাধারণত কলকাতা অথবা বরিশালের সঙ্গে তুলনীয় কোনো মফস্বল শহরের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির মধ্যকার মিথস্ক্রিয়ার ভেতর দিয়ে। যেসব বিষয় তাদের ভাবিত করে, সেসব প্রায়ই আবর্তিত হয় প্রতিদানহীন ভালোবাসা কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক মুখ্য চরিত্রের সঙ্গে অন্যের অপূরণীয় বিবাহকে কেন্দ্র করে। কবিতায় জীবনানন্দ বারবার কথককে আক্রান্ত পক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ করান :

> তোমার শরীর,—
> তাই নিয়ে এসেছিলে একবার;—তারপর,—মানুষের ভিড়
> রাত্রি আর দিন
> তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানিনি তা,—হয়েছে মলিন
> চক্ষু এই;—ছিঁড়ে গেছি,—ফেঁড়ে গেছি,—পৃথিবীর পথে হেঁটে-হেঁটে
> কত দিন রাত্রি গেছে কেটে![৩]

কিংবা

> আমার এ-গান
> কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে,—
> আজ রাত্রে আমার আহ্বান
> ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—
> তবুও হৃদয়ে গান আসে।
> . . . . . .

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তুমি শুধু একদিন,—এক রজনীর!—
মানুষের—মানুষীর ভিড়—
তোমারে ডাকিয়া লয় দূরে,—কত দূরে![৪]

অথবা

ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা করে চলে গেছে—যখন ডেকেছি বারে-বারে
ভালোবেসে তারে;[৫]

গল্পেও একইভাবে সচরাচর পুরুষই হয় ব্যভিচারী স্ত্রীর স্বামী এবং কখনো প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংক্ষুব্ধ ভূমিকা পালন করে।

ডাক্তার এল। ছোক্‌রা সাহেব মানুষ।

ঘর-দোর দেখে মুখ ফিরিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিলে। পাঁচ মিনিটের ভিতর বার সতেরো 'সুট' ঝেড়ে নিলে। আমার খদ্দরের পিরানের দিকে তাকিয়ে নিজেই সে লজ্জিত হল। রুমাল দিয়ে ঘাড়ের ঘাম চোখ নাক মুখ মুছে কোনো রকমে এই জীর্ণ জীবনের জোড়াতালিটাকে সায়েস্তা করে নিতে হ'ল তার।

...তবুও আসছিল...রোজ।

দিন ফুরুলে যখন ছায়া ঘনায় আকাশে, ঠিক সেই সময়।

ছায়ারই মতো আচম্‌কা।...

বললে, 'আপনার চশমাটা দেখি তো।'

খুলে আস্তে আস্তে তুলে দিলুম।

'বাবা,—বড্ড পুরু লেন্স তো, চোখের মাথা খাওয়া!'

'তা নয় তো কী!...' তিরতির করে হাসতে হাসতে বললুম।

চশমাজোড়া ঘুরিয়ে নাচিয়ে ফিরিয়ে দুলিয়ে ঢের কিছু বললে, বোঝালে।

বুঝলুম না।

শুনিনি।

কথা সে বলে যাচ্ছে, এইটুকু শুধু টের পাচ্ছিলুম।

এইটুকু শুধু!

চশমা ফিরিয়ে দিলে আমাকে।

বললুম, 'হল?'

'চোখ গেল কীসে?...কাঁচা বয়সেই গিয়েছে বোধ হয়।'

'যা গিয়েছে—!'

আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার ঘেন্না আর ফুরুতে চাইল না যেন!

এই বিকৃত শবদেহ নিয়ে মানুষ বলে আপনাকে চালিয়ে দিচ্ছি—মনুষ্যত্বের এত বড় অপমান তার বড় অসহ্য মনে হল।

আমি কিছু বলবার আগেই রেবা চা এনে দিলে।

পেয়ালাটায় ফাটল ধরেছে; পিরিচেও।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডাক্তারের চেয়েও এ-জন্যে রেবা অনেক বেশি লজ্জিত। কী বলে সে আপনাকে খারিজ করে নেবে, ভেবেই পাচ্ছে না।

অনেক কথা বলছে রেবা।

আমি চশমার ফাঁক দিয়ে আমার ক্ষুধিত আত্মাটাকে গালিয়ে নিয়ে দু'জনের দিকে একবার তাকালুম।

ওরা আমাকে দেখতে পেলে না।

নোনা-ধরা দেয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়ে চোখ বুজে থাকতে ভালো লাগছিল।

এমনি।

ডাক্তার উঠছে না—রেবাও লেগে আছে।

এত দিন পরে সে পেয়েছে।

ওরা অনেক কথা বলছে।

চোখ বুজে বুজে মনে হয়...আমিও বলতে পারি—তোমরা যা বলেছ—সব; তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি তুমুল করে।...আমি বলতে পারি। আমি বলতে পারি।...আমি যা-ই হই-না কেন, নিজেকে আমি এমন করে ছেড়ে দিতে পারি, তোমরা তা পার না,—পারই না। ওরা যত গরম হয়ে ওঠে, যত নগ্ন হ'য়ে পড়ে—আমার মনে হচ্ছিল, ওরা তত আড়ষ্ট হ'য়ে আসে।

আমার কাছে ওরা কী!

এই কি ওদের ভালোবাসা!

আমাকে যদি ভালোবাসতে দিতে!

রেবা বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছে।'

মিনিট খানেক সব চুপচাপ।

তারপর চুমোর শব্দ...।

দু'জনে উসখুস করছে।

শেষে সব চুপ।

অন্ধকারে একা ঘরটা ঠান্ডা মেরে গেছে।

এ বীভৎস, না সুন্দর!

বুঝে উঠতে পারছি না।

রেবাকে ডেকে এনে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছি।

পেয়েছি, পেয়েছি, ভরসা পেয়েছি।

সেদিন যে সে শালপাতায় করে ভিখিরিকে ফ্যান্‌সা ভাত দিয়েছিল, সেদিনও তো তার মুখখানা এমন চমৎকার দেখিনি।...না—না—এ বীভৎস হতেই পারে না। এ সুন্দর,—এ পরম সুন্দর!

রেবা বললে, 'কেন ডাকছিলে?'

খাঁচার পাখি যেন ছাড়া পেয়েছে,—গলার স্বর এমনি। আমিও আকাশটাকে ফিরে পেয়েছি।

পেয়েছি ফিরে আকাশের যা কিছু আলো—সবটুকু। অন্ধকারের চেয়ে আলোই বড়।

ঢের বড়।

অত বড় আকাশটার চেয়ে উঁচু সত্য আর কিছুই নেই।

'ডাকছিলে তুমি!'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ল একেবারে। কুণ্ঠা লজ্জা ভয় ঘেন্না—সমস্ত উৎরে অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে সে যেন।

সে-ই বড়ো নির্ভর,—বাসি মড়াটার ওপরেই।

'ডাকছিলে!'...দু'জোড়া চোখের পাপড়ি মিশেই যেত আরেকটু হলে।

না-মিশতেই রেবার চলে যেতে হল।...এমনি।[৬]

জীবনানন্দের প্রথম দিককার গল্পগুলোর একটা শেষ হয় এভাবেই, যেখানে মূল চরিত্র ঘুমের ভান করে আর তাঁর স্ত্রী ও বাড়িতে আগত তরুণ ডাক্তার বিশুদ্ধ বিয়েটা অশুচি করে দেয়।

বেশির ভাগই কলকাতার পটভূমিতে লেখা জীবনানন্দের গল্প শহুরে ও গ্রামীণ পরিবেশের জীবনের সংঘাত ধারণ করে আছে। মফস্বল শহরেও রয়েছে কলকাতার মতো স্থূলরুচির স্থায়ী বাসিন্দারা, কিন্তু এসব স্থান ও বাংলার অগণন গ্রামগুলোর প্রতিবেশের ভেতর রয়েছে চিরন্তন প্রলোভন। ১৯৩০-এর দশকের প্রথম দিকের আরেকটা গল্পের সমাপ্তিতে বিবাহিতা শচী অবিবাহিত সোমেনকে প্রস্তাব দিচ্ছে শহরের জনারণ্য থেকে রোমান্টিক জীবনের দিকে পালিয়ে যেতে। গল্প যখন শেষ হয় বেকার ভবঘুরে সোমেন মধ্যদুপুরে শচীর সঙ্গে দেখা করে যখন ওর স্বামী কর্মক্ষেত্রে। ইঙ্গিতের পূর্ব পর্যন্ত পাঠকের ধারণা করার কোনো কারণ থাকে না যে শচী একজন সফল ব্যবসায়ীর স্ত্রীর ভূমিকায় অসুখী :

শচী পাশের ঘরে দেরাজের থেকে হ্যাভেনার একটা বাক্স এনে সোমেনের সুমুখে একটা তেপয়ের ওপর রাখল।

সোমেন একটা চুরুট বের করে নিয়ে বললে, 'হ্যাভেনা অনেক দিন খাইনি—'

শচী যথাস্থানে গিয়ে বসেছিল।

সোমেন চুরুট জ্বালাচ্ছে—

মুহূর্তের জন্যে নিজেকে বারবিলাসিনীর মতো মনে হচ্ছিল শচীর;—আবাল্য আপ্যায়নকুশলা বারবিলাসিনী—এই শুধু; এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। সোমেনেরও মনে হচ্ছিল শচীকে যেন খানিকটা meretricious বোধ হচ্ছে;—নিতান্ত দুর্মূল্য harlot-এর মতো এক মুহূর্তের জন্যে সোমেনের হৃদয়ের ভিতর দিয়ে চমকে যাচ্ছে যেন শচী;—দুর্মূল্য, অথচ যে নিজেকে প্রিয় নিকটতম করে তুলতে চাচ্ছে—অবিশ্যি এক নিমেষের জন্যে।

শচীর মনে হচ্ছিল, আপ্যায়নে কিছু তো ভুল করেনি সে?

শাড়িটা—নোংরা নয়—কিন্তু তবুও ঠিক হয়েছে কি?

খোঁপা-বাঁধা চুল—ছেড়ে দিলে ঠিক হ'ত কি—না, বিনুনি বাঁধলে?

পায়ে বিজাপুরী চটি জুতো না-চড়িয়ে আলতায় শুধু-পায় থাকলে কেমন হ'ত?

কাজল পরলে? কাঁচপোকার টিপ দিলে?

এই সব প্রসাধন জীবনে একদিন ছিল,—সোমেন তা দেখেছে; আজও আর একবার তাকে তা দেখাবার জন্যে একটা ব্যাকুলতাকে কিছুতেই যেন উৎরে উঠতে পারছিল না শচী।

সোমেনও বললে, 'মনে পড়ে একদিন বকমোহানার নদীর পাড়ে ভাঁটশ্যাওড়া জিউলি ময়নাকাঁটা আলোকলতার জঙ্গলে তোমাকে খুঁজে দিয়েছিলাম; বাড়ি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তোমাদের আধ কোশ দূরে সেখান থেকে; তুমি ঘাড় নেড়ে বলেছিলে, "খুব পারব চিনে যেতে—কত বার গিয়েছি।"—কিন্তু এক বারও যাওনি; আম কাঁঠাল বাঁশের জঙ্গলে হারিয়ে গেলে। তারপর তোমাকে একটা পাতলা সরপুঁটির মতো কানকোতে বেঁধে একটা বাচ্চা রুইয়ের মতো নদীতে ভেসে এলাম আমি। সেই নদী—নলের গন্ধ—রাত—অন্ধকার—নক্ষত্র—ভিজে বালির চর—তোমার ঠাণ্ডা শরীর কত দিন আমার হৃদয়কে শাসন করেছে—'

একটু হেসে বলেছিল, 'কিন্তু আজ সে-সব ঘটনা-ব্যাপারের পুনরভিনয় তো দূরের কথা—পুনরুক্তিও অত্যন্ত অন্যায্য।'

'কেন?'

'সে-পাড়াগাঁর জীবন তুমি কোনোদিন ফিরে পাবে না—অন্তত তেমন করে কিছুতেই না; না, শচী, কিছুতেই না। আমিও তাই গাঁয়ের পথে আর ফিরে যাই না, ভাবতেও চাই না, পাড়াগাঁ কেমন—সেই তেলাকুচো ফণীমনসা বনধুঁধুল কোন অন্ধকারে কোন জ্যোৎস্নায় কত দূরে চলে গিয়েছে।...আমরা সেখানে নেই—আমরা আর সে-সব নই—কী হবে সে-সব দিয়ে! কলকাতার মেসের জানলার ভিতর থেকে তাকিয়ে যখন দেখি দূরে একটা পাতাশূন্য শিমুলগাছের লাল ফুলগুলো সবে ফুটল তখন যে-আক্ষেপ যে-গ্রামলোলুপতা আমাকে পেয়ে বসতে পারত নতুন জীবনের প্রয়োজনের কাছে সে সবকে উপহাসাস্পদ করে তোলাই ঠিক মনে করি—অনেক দিন থেকেই মনে করে আসছি; নতুন জীবনের নতুন প্রয়োজন চাইনি আমি যদিও,—কিন্তু সেগুলো যখন ঘাড়ে চেপে বসেছে তখন আমাকে হড়কাতে দেখবে না নিশ্চয়ই—'

চুরুটের নিরবচ্ছিন্ন ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, 'যে-মধু হারিয়ে গেছে, তা গেছে—তা যাদের জন্যে, তাদের জন্যেই শুধু। কিন্তু কলকাতার হৃৎপিণ্ডের থেকেও কলতানি বের করা না শুধু, যা কিছু রস সম্ভব—প্রয়োজনীয় তাই গ্রহণ করা।'

শচী অনেকক্ষণ পরে বললে, 'চল না, পাড়াগাঁয় যাই—'

'কোন্ পাড়াগাঁয়?'

'যেখানে ছিলাম আমরা—'

'সেই বকমোহানার নদীর ধারে? ভাঁটশ্যাওড়া ময়নাকাঁটার জঙ্গলে?'

শচী মাথা নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ—সেখানেও—'

সোমেন বললে, 'অসম্ভব।'

'অনেকদিন আমি ভেবেছি, যাব—'

সোমেন মাথা নেড়ে বললে, 'কী করে যাবে?'

শচী আনত মাথায় ভাবছিল।

একটু পরে মুখ তুলে বললে, 'কেন?'

সোমেন বললে, 'তুমি আবার ফিরে আসতে চাইবে যে—'

'ফিরে আসব না কেন?'

চুরুটটা সোমেনের শ্লথ আঙুলের ভিতর ঢিলে হয়ে যাচ্ছিল; সেটাকে শক্ত করে চেপে ধ'রে বললে, 'কেন ফিরে আসবে?'

'কেন আসব না?'

সোমেন বললে, 'তোমাকে নিয়ে সেই বকফুল বনধুঁধুল কলমীলতা বাঁশবনের ভিতর গেলে আমি যে আর ফিরে আসতে পারব না। কিন্তু কথা হচ্ছে, যা ছিলাম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা, তা নেই আমরা—সে-আমিও নেই, তুমিও নেই। তোমার এখন একটু বেড়িয়ে আসবার সাধ—মানুষ যে-লোভে তাজমহল দেখতে যায়, ঠিক তেমনি একটা ফরমাসমতো ট্রিপে খানিকটা সময়োপযোগী ভাবপ্রবণ হয়ে; হয়তো চোখের জল ফেলবে, আমাকে জড়িয়ে ধরবে, চুমো দিতে দেবে—কাঁধে মাথা রেখে কাঁদবেও হয়তো—হয়তো আর ফিরেও যেতে চাইবে না—হয়তো ব্যবহার করতে দেবে তোমাকে—কিন্তু সে সব একটা দুপুরের জন্যে, শচী, পাড়াগাঁর মাঠ জঙ্গলের আচ্ছন্ন দুপুর বা মারাত্মক—কিংবা একটা সন্ধ্যা—একটা রাতের জন্যে। পরদিন ভোরেই তুমি এক সাঁতারে বারো-চোদ্দো বছরের ওপারে চলে যাবে; কে তোমাকে ধরতে পারবে? মেয়েরা যখন পরিবর্তিত হয়, কেউ তাদের নাগাল পায় না। আমি নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারি—অত্যন্ত স্থায়ীভাবে; তুমি ট্রিপের ফুর্তির জন্যে শুধু।'

সোমেন দগ্ধ চুরুটটাকে অন্যমনস্ক ভাবে মেঝের ওপর ছেড়ে দিয়ে বললে, 'মেয়েদের ও পুরুষদের ভিতর এই তফাৎ।'

সোমেন উঠে দাঁড়াল।

আজকের দুপুরের জন্যে অন্তত শচী সেই শচী হয়ে গেছে।

আজকের সে শচীকে পুরোপুরি নিজের যে-কোনো প্রয়োজনে লাগাতে পারে—শচী সে-জন্যে প্রস্তুত, ব্যাকুল; কিন্তু এই সোফার ওপর?—বকমোহানার নদীর ধারে যা একদিন হয়েছিল বনজঙ্গলের আবছায়ায় নক্ষত্রের নিচে জলের গন্ধের কাছে!

ভাবতে গেলেও ব্যথা—ভাবতে গেলেও ব্যথা।

এই কামরার ভিতর এক মুহূর্তের জন্যেও আর টিকে থাকতে পারছে না সোমেন। একটা হ্যাভেনা নিয়ে এক মুহূর্তের ভিতরেই রাস্তায় উঠল গিয়ে।[৭]

চল্লিশের দশকের শেষদিকে কলকাতায় থেকে জীবনানন্দ ঠিক এ রকম দৃশ্যের বিন্যাসে তাঁর উপন্যাস *সুতীর্থ* শেষ করেন।

প্রথম দিকের লেখা জীবনানন্দের একটা গল্প তাঁর অন্যগুলোর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এমনকি এটার ভাষাও আলাদা, জীবনানন্দের প্রবন্ধ ও সাহিত্যিক রচনার মধ্যে একমাত্র এটাই সাধু ভাষায় লেখা* ('সঙ্গ, নিঃসঙ্গ', নামটি প্রকাশকের দেওয়া)। এই গল্পের বিষয়বস্তুও একইভাবে তাঁর অন্যান্য গল্পের চেয়ে ভিন্ন, এতে রয়েছে কেবল একটা চরিত্র, কথক, যে তিন বছর আগে বিয়ে করা তার স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখছে। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যকার মেলামেশা এতে অনুপস্থিত, যার প্রবণতা অন্য গল্পগুলোতে প্রধান। বড় নগরও এতে অনুপস্থিত। যদিও নাম দেওয়া হয়নি, তবুও চেনা কিছু ল্যান্ডমার্কের উল্লেখ থাকায় এই মফস্বল শহরের সঙ্গে পরিচিত যে কেউ নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবেন, বরিশালই এর পটভূমি। অনামিত মুখ্য চরিত্র আবারও আহত প্রেমকাতর ভূমিকা পালন করে। এ ধরনের চরিত্র জীবনানন্দের কবিতায় বা গদ্যে বিরল নয়। তাঁর গদ্যের অন্য কোথাও যা দেখা যায়নি, সেটা

* জীবনানন্দ দাশের সর্বপ্রথম প্রবন্ধ "কালীমোহন দাশ'এর শ্রাদ্ধবাসর"ও সাধু ভাষায় লেখা। এ রচনাটির বিষয়বস্তু অবশ্য সাহিত্য নয়।—অনুবাদক

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে সেই প্রাকৃতিক জগতের অবিশ্বাস্য প্রাচুর্যে ঘিরে থাকা সে চরিত্রটি একজন অসাধারণ সংবেদনশীল কথক, যে শহরের মধ্যে নৈমিত্তিক ঘটনাবিহীন পদচারণে আর সবার চেয়ে বেশি দেখে ও অনুভব করে। বাংলার একটা অঞ্চলের আভরণময় বর্ণনাসমৃদ্ধ পত্রাকারে লেখা এই গল্পটি জীবনানন্দের বহু সনেটের পূর্বাভাস দেয় (অথবা হতে পারে প্রতিফলন ঘটায়, কারণ গল্পটির রচনাকাল অনিশ্চিত), যেগুলোর ওপর হয়তো তিনি তখন কাজ করছিলেন। গল্পটির বর্ণনাবহুল আবহ থেকে যেন কবিতা ঝরে পড়ে :

> বাপের বাড়ি গিয়া এবার তুমি খুব কায়েমি হইয়া বসিয়াছ দেখিতেছি। অনেকদিন তোমাকে চিঠি লিখি নাই—বিবাহ আমাদের তিন বছরের পুরান—তিন বছর অবিশ্যি এমন বেশি কিছু সময় নয়—অনেকের বিবাহ দশ-পনেরো, কুড়ি-পঁচিশ, এমনকি পঞ্চাশ বছর অবধি, নবীন ও সজীব থাকে। প্রতিদিন, অন্তত সপ্তাহের মধ্যে তিন-চার দিন, চিঠিপত্রের বিনিময় না হইলে তাহাদের চলে না।
>
> কিন্তু তুমিও জান, আমিও জানি—ইহাদের মতো যদি আমাদের জীবনের ব্যবস্থাও হইত তাহা হইলে এ পৃথিবীতে পলাইবার পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।
>
> এই যে দীর্ঘকাল তুমি আমার কোনো খোঁজ খবর নেও নাই, আমিও তোমাকে কিছু লিখি নাই—এই শূন্যতা আমার কাছে বড় গভীর পরিতৃপ্তির জিনিস। জীবনটাকে এই রকম নিস্তব্ধতা ও শূন্যতায়ই ভরিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে আমার। আমার কামনা কী জান? বঁইচি, ময়নাকাঁটা, বাবলা, ফণীমনসা, বন-অপরাজিতার পাশ দিয়া এক একটা সাদা ধুলা মাখা ভারি স্নিগ্ধ আঁকাবাঁকা গ্রামের পথ থাকে—তাহারই পাশে থাকে এক-একটা প্রান্তরের অপরিসীম নিঃশ্বাসের নিস্তার—সবুজ ঘাস আছে সেখানে, ঘাসের ভিতর শ্যামাপোকা আছে, দিয়ালিপোকা আছে, গঙ্গাফড়িং আছে, কাঁচপোকা আছে, সুদর্শন উড়িয়া আসে, হলুদ, কমলা, জর্দা, নীল রঙের প্রজাপ্রতি কাশফুলের ভিতর সমস্ত দুপুর ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বেড়ায়—কোথাও হয়তো কতকগুলো পলাশ, অর্জুন গাছ, হিজল গাছ, উলুখড়ের জঙ্গল, মাছরাঙার ডানার শিরশিরানি, এমনই এক জায়গায়, ঘাসের নরম গন্ধের কাছে, প্রান্তরের একটেরে বনের দেবতা অশ্বত্থ যেখানে অনেক দিন হইতে ছায়া রচনা করিয়া বাঁচিয়া আছেন, রাত্রিদিন শালিখ, বুলবুলি, কোকিল ও কাককে আশ্রয় দিয়া আসিতেছেন, সেইখানে, খড়ের একখানা ঘর তুলিয়া পড়ি, লিখি, চুরুট ফুঁকি, দিন কাটাইয়া দেই—
>
> জীবনের ব্যবস্থা যদি আমি এইরকম করিয়া লইতাম, আমি জানি তুমি ইহাতে কোনো আপত্তি করিতে না। আমাকে নিঃসঙ্গ মনে করিয়া আমাকে তোমার সাহচর্য দিবার আকাঙ্ক্ষাও অনুভব করিতে না তুমি।

আরও কিছু পরে সে তাদের একসঙ্গে থাকার সময়গুলোর কথা বলে :

> তোমার মনে আছে কি না জানি না, তুমি এখানে থাকিতেও আমার নিজের ঘরের ভিতর একটা জলের কলসি সব সময়ই রাখিতাম; তৃষ্ণা পাইলে নিজেই গড়াইয়া নিয়া জল খাইতাম, তোমাকে কোনো দিন জল ঢালিয়া দিতে অনুরোধ করি নাই। তুমিও অনুগ্রহ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছ বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ইহাই আমার ভালো লাগিয়াছে। এখনো যখন মনে হয়, বুঝিতে পারি, তোমার সঙ্গ আমাকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> গভীর নিঃসঙ্গতার নিস্তার দিয়াছিল; সেই নিস্তারের পথে এখনো চলিতেছি: চিরকালই চলিব। ইহার চেয়ে অনুপম উপলব্ধি পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি? অবিশ্যি, আট বছর আগের ধারণা আমার অন্য রকম ছিল। তখনো আমি বিবাহ করি নাই। মনে হইত বধূকে দিয়া পা টিপাইয়া লইব, কপালে চুল বুলাইয়া দিবে সে, পাখা দিয়া বাতাস করিবে—
>
> আরো কত কী!
>
> কিন্তু তুমি যখন আমার জীবনে আসিলে, দেখিলাম, এসব কিছুই করিলে না তুমি; আমিও চাহিলাম না। ধীরে ধীরে হৃদয়ের ভিতর সাপ-খেলানো বাঁশির সুর কেমন যেন বাজিয়া উঠিল আমার। বুঝিতে পারিলাম না, এ সুর কাহার নিকট হইতে আসে। দিন-রাত্রির ভিতর হইতে, গ্রামের পথের প্রান্ত হইতে, উলুখড়ের জঙ্গল হইতে, আকাশ হইতে, নিস্তব্ধ অপরূপ দুপুরবেলার বুক হইতে, এ সুর কে যে পাঠায় ভাবিয়া-ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইতাম। কিন্তু কেমন অচেনা গভীর; বড় ভালো লাগিল আমার। কোনোদিন কাহাকেও ভালোবাসিয়াছিলাম, হারাইয়া ফেলিয়াছি—এ কি তাহারই হ্লাদিনী? না, তা নয়। এ তুমিও নও—আমিও নই; এ শুধু দিন-রাত্রির গভীর রঞ্জনী ধ্বনি—অনন্ত অপরিসীমের দিকে চলিতে-চলিতে নারিকেলের পাতায়, চিলের ধবল গলায় খয়েরি ডানায়, ভোরের নৌকার রঙিন পালে, খর রৌদ্রে, মেঘনা-ধলেশ্বরীর স্ফীত স্তনের বন্যায়, মধুকূপী ঘাসে, কাশের সমুদ্রে, দ্রোণফুলের ভিড়ে, মৃতা রূপসীর ললাটের সিন্দুরে, গোধূলির মেঘে, শীতসন্ধ্যার কুয়াশায়, স্থবিরের বিষণ্ন চোখের নির্জন স্বপ্নতন্তুর ভিতরে, তাহারা যে সুর বাজাইয়া যায়—এ শুধু তাহারই ধ্বনি।
>
> এ সুর তোমার জীবনে আছে কি না জানি না; যদি না থাকে—আহরণ করিয়া লও, জীবনে এক গভীর অবলম্বন পাইবে।[৮]

গল্পটির পাণ্ডুলিপির ওপর জীবনানন্দের স্বহস্তে লিখিত তারিখ যে ১৯৩৩। তাঁর ও লাবণ্যর বিয়ে হয়েছিল তিন বছর আগে ঠিক একই মাসে। ১৯৩৩ সালে তাঁদের ও গল্পের পত্রলেখকের বিয়ের তিন বছর পূর্ণ হয়।

২

এই গল্পের ঐশ্বর্যপূর্ণ কাব্যময় ভাষা, যার ভেতর দিয়ে বরিশালের পরিবেশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তার সঙ্গে ঠিক সে সময় বা বছরখানেক পরে রচিত তাঁর ৪০টিরও বেশি নোটবই ১৯৩১ থেকে ১৯৫৪ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত কালপর্বকে ধরে রেখেছে। মার্চ ১৯৩৪ তারিখ-সংবলিত এগুলোর একটিতে রয়েছে ৬০টি সনেট ও অল্প কয়েকটা কবিতা, যেগুলো সনেট নয়। একটা কবিতার উৎসারিত ভাবের ওপর ভিত্তি করে একটা গ্রন্থ *রূপসী বাংলা* নামে কবির ভাইয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। ৩১ জুলাই ১৯৫৭ তারিখের ভূমিকায় অশোকানন্দ লেখেন, 'পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবিতাগুলো রচিত হয়েছিল। এ-সব কবিতা *ধূসর পাণ্ডুলিপি* পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল।'[৯]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন ১৪ মাত্রার অন্ত্যমিলযুক্ত মধ্যযুগের বাংলা পয়ারকে সনেটে প্রয়োগ করতে শুরু করেন, সেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সনেট বাংলায় একটা সৃষ্টিশীল কাব্যিক মাধ্যমে পরিণত হয়। চিরাচরিত মধুসূদনীয় ঢঙে তিনি ১৮৬৫ সালে দান্তের ৬০০তম জন্মবার্ষিকীতে ভার্সাই থেকে 'কবি দান্তে' নামে ফরাসি অনুবাদসহ একটা বাংলা সনেট পাঠান ইতালির রাজা দ্বিতীয় ভিক্তর ইমানুয়েলের কাছে, যে উপহারকে মধুসূদন বর্ণনা করেছেন 'প্রাচ্যের এক ছোট্ট ফুল' হিসেবে। জবাবে রাজার মন্ত্রী লেখেন, তাঁর রাজা 'গঙ্গার তীরে ইতালীয় প্রতিভার একটা প্রতিধ্বনি পেয়ে' খুশি হয়েছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন, ইতালি হবে সেই 'অঙ্গুরীয়, যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে এক করবে।'[১০] রাজনৈতিকভাবে রাজার প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়। তবে শিশিরকুমার দাশ লেখেন যে সনেট হচ্ছে অন্য ভাষা থেকে নেওয়া একমাত্র কাব্যশৈলী, যা বাংলা ভাষার মধ্যে বেড়ে উঠেছে এবং আশ্বাস দিচ্ছে দীর্ঘ জীবনের। তিনি আরও লেখেন, অন্যান্য ইউরোপীয় কবিতার কাঠামো অন্য কবিরা বাংলা ভাষার সঙ্গে যুক্ত করেছেন, কিন্তু ইতালীয় যে অপরিচিত জিনিসটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত গঙ্গার তীরে এনে রোপণ করেছিলেন, সেটা অবারিতভাবে বেড়ে উঠে ফুল দিয়েছে, আর বাংলাও এটিকে তুলে নিয়েছে তার ঘরে।[১১]

কবিতার এই গদ্যভঙ্গি চর্চাকারী বাঙালি কবিদের দীর্ঘ তালিকার মধ্যের একজন জীবনানন্দ[১২] তাঁর প্রথম বাংলা সনেট প্রকাশ করেন *ধূসর পাণ্ডুলিপি* গ্রন্থে (১৯৩৬)। তবে আরও আগে তিনি এই শৈলীতে কিছু কবিতা লিখেছেন। মধুসূদনের মতো জীবনানন্দও কয়েকটা ইংরেজি সনেট লিখে বাংলা সনেটের পূর্বাভাস দিয়েছেন। যেমন :

> I have felt the breath of autumn wind,
> With the fragrance of spring still in my heart;
> I have touched, shiveringly, the skirt
> Of Autumn—her treasures nervously gleaned;
> She laughed not like summer, nor grinned
> Like the wind-weary phantom-girt;
> Nights that out of winter dart
> To her own winning sadness she I pinned.
>
> With flower, or two—a vanishing scent,
> A flash of smile on her demure face,
> She walks with a light half-spent
> By the life and half in death's embrace;
> She looks like a lady that is gracefully bent
> To track the lost lover's fading trace.[১৩]

জীবনানন্দের মৃত্যুপরবর্তী *ময়ূখ*-এর যে বিশেষ জীব[illegible]ন্দ-সংখ্যা[illegible] কবিতাটি ছাপা হয়েছিল, তার সম্পাদকমণ্ডলী পাঠকদের জানান, [illegible]রিবারচালিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্রহ্মবাদী কাগজে 'বর্ষ আবাহন' কবিতার মাধ্যমে জীবনানন্দ যখন বাংলা কবিতা লেখা শুরু করেন, এটিকে সে সময়ে লেখা তরুণ বয়সের রচনার চেয়ে বেশি কিছু যাতে বিবেচনা করা না হয়।[১৪] কবিতাটির ছন্দ হয়তো প্রত্যাশার চেয়ে কম হতে পারে, কিন্তু বেশ কিছু কারণে এটি উল্লেখযোগ্য। জীবনানন্দ ১৯৩৪ সালের কবিতার খাতায় বেশির ভাগ কবিতায় মধুসূদনের পছন্দের একই পেত্রার্কীয় সনেটের গঠনবিন্যাস ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ আট পঙ্‌ক্তি ও ছয় পঙ্‌ক্তির অনুচ্ছেদ। পরবর্তী কবিতাগুলোতে তিনি হেমন্তের, অর্থাৎ স্মৃতিজাগানিয়া আসন্ন মৃত্যুর ওপর মনঃসংযোগ করেছেন। জীবনানন্দের পরবর্তী রচনাগুলোতে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে তাঁর কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—মৃত্যু, যেমন দেখা যাবে প্রকৃতিকে সুন্দরী রমণী হিসেবে মূর্ত করা। তাঁর *রূপসী বাংলার* 'রূপসী' শব্দটা বিশেষণ ও স্ত্রীলিঙ্গ; আবার একই সঙ্গে এটা স্ত্রীবাচক বিশেষ্য, যার অর্থ 'সুন্দরী রমণী'। সে জন্য দুই শব্দের শিরোনামটি অন্য শব্দগুচ্ছ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়: 'সুন্দরী রমণী বাংলা'।

বিষ্ণু দের কাছে ১৯৩০-এর দশকের প্রথম দিকে লেখা এক চিঠিতে জীবনানন্দ তাঁর ইংরেজি কবিতার ব্যাপারে উল্লেখ করেছিলেন, তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোনো বিশেষ কবিতার উল্লেখ করেননি তিনি। প্রায় ৪০ বছর পর বিষ্ণু দে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে অনুমান করতে পেরেছিলেন, এটা নিশ্চয়ই সেই কবিতা, যেটা তাঁকে পড়ে সমালোচনা করতে দেওয়া হয়েছিল।

Sarvananda Bhavan
Barisal
18.10.31

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়ে হরষে বিষাদ উপস্থিত হ'ল: আমার ইংরেজী কবিতা পাঠাবার যোগ্য নয় এই জেনে; অনেকদিন আগে তা ছেড়েও দিয়েছি লিখতে; অবিশ্যি ভবিষ্যতে কি করব জানিনা। বাংলা কবিতা কলকাতায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব আশা করি। কলকাতায় আমি November এর শেষাশেষি যাব।

সকলের খবর জানতে পারলাম। কলকাতায় গিয়ে দেখা হবে সবাইর সঙ্গে আশা করি। প্রভাস বাবুর চিঠি আমি পাই নি; তিনি কি দিল্লী চ'লে গেছেন? 'পরিচয়' কবে বেরুল? কি আছে? 'মজা' তো মারাত্মক কৌতূহল উদ্রেক করে। পূজোয় কলকাতায়ই আছেন? কলকাতায় যেতে আমার এখনও একমাসের উপরে দেরি।

আশা করি আপনারা ভাল আছেন।

জ[১৫]

জীবনানন্দ যে ইংরেজি কবিতাটার পরোক্ষ উল্লেখ করেছিলেন, সেটা সনেট কি না তা হয়তো কখনোই আর জানা যাবে না। আমরা জানি, ১৯৩০-এর দশকের প্রথম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিকে তিনি বাংলায় বেশ কিছু চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছিলেন—সেগুলো মিত্রাক্ষর-পদ্ধতিতে কাঠামোগতভাবে বিভক্ত, কিন্তু প্রস্তাবনা ও সিদ্ধান্তের আট লাইন ও ছয় লাইনের সঙ্গে বৈপরীত্যপূর্ণ নয়। জীবনানন্দ, যিনি তাঁর কবিতা ব্যাপকভাবে কাটাছেঁড়া করতেন বলে মনে হয়, তিনি যে প্রায় কোনো কাটাছেঁড়া ছাড়া প্রায় ৬০টির মতো সুরচিত সনেট দ্রুত লিখে ফেলতে পারতেন—যেমনটি তাঁর ভাই *রূপসী বাংলার* ভূমিকায় লিখেছেন—তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। খাতার শেষদিকে কাটাছেঁড়ায় ভর্তি দীর্ঘ কবিতা এবং সম্ভবত কিছু কবিতাংশের উপস্থিতি ইঙ্গিত করে যে তাঁর সংশোধিত সনেট এবং তখনো সংশোধন করা হয়নি এমন কবিতাগুলো কপি বা পুনর্লিখন করতে কবি এই খাতাটা ব্যবহার করেছেন ১৯৩৪ সালের মার্চ মাস থেকে। সনেটগুলো কখন লেখা হয়, তার সঠিক কালবিস্তারে কিছুই আসে যায় না। তবে যে কেউ অশোকানন্দের সঙ্গে একমত হবেন যে তাঁর ভাই সত্যিকারভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। কিন্তু এত কিছু বলার পরও এ-প্রশ্নটা এখনো থেকে যায় যে জীবনানন্দ তাঁর জীবদ্দশায় কবিতাগুলো কখনো প্রকাশ করেননি কেন।

বাংলাদেশকে মহিমান্বিত করে রচিত ৬০টি সনেট পরিবেশের সঙ্গে কবির প্রগাঢ় আবেগপূর্ণ সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে। আর বহিরঙ্গে যেটাই বলা হোক না কেন, জীবনানন্দের সনেটগুচ্ছ বুদ্ধিজীবীসুলভ রচনা নয়। নাড়িছেঁড়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বক্তব্যের ভেতর দিয়ে এগুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কোনো এক রোমান্টিকের শিশুসুলভ হৃদয়ের পুনর্লব্ধ ভালোবাসার কথা। তিনি যখন এ রকম উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে আপনমনে কথা বলেন, তখন কান পেতে শুনলে বোঝা যেত, এসব অতি ব্যক্তিগতপ্রায় বক্তব্যের জন্য কবি লজ্জায় দগ্ধ হয়ে যেতেন। এ রকম একান্ত চর্চায় জীবনানন্দ পরিপূর্ণভাবে পুনর্যাপন করেন বাংলার সঙ্গে, প্রাণী-উদ্ভিদ-আকরিক গ্রামবাংলার সঙ্গে, নগরবাংলার মানবসমাজের সঙ্গে নয়।

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সবচেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে,—সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ;

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর—
শঙ্খমালা নাম তার : এ-বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।[১৬]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'বিশালাক্ষী' আক্ষরিক অর্থে 'বিশাল চোখের কেউ', যা দুর্গা নামে সমধিক পরিচিতা বাঙালি দেবীকে ইঙ্গিত করে। কবিতাটির সরল স্বীকারোক্তি হচ্ছে, বিশালাক্ষী দেবীর বর পেয়ে সেখানে আমি যাই। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর করুণ এই দেশে জন্ম নিয়েছে, এমন সৌভাগ্যবান জীবনানন্দ এবং অন্যান্য সবার প্রতিনিধিত্ব করে রূপকথার রাজকন্যা শঙ্খমালা, যেখানে নদীগুলো জলের দেবতা বরুণ ও তাঁর স্ত্রী বারুণীর বাসস্থান বঙ্গোপসাগরে নিঃশেষিত হয়। জীবনানন্দ বিশাল পৃথিবীর অল্পই দেখেছেন, তবে দিল্লিতে থাকার কারণে অল্প কয়েক মাসের জন্য তিনি বাংলার বাইরে ছিলেন। এটাই বোধ হয় তাঁকে তাঁর মফস্বলের বাসভূমির গুণাবলির যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় করেছিল। বাংলার উদ্ভিদ, পাখপাখালি, নদ-নদী সম্পর্কে তাঁর একটা পাঠই মন্ত্রোচ্চারণের মতো করে বাংলাকে মানসপটে তুলে ধরে।

পাছে কেউ তাঁর বিশ্বস্ততায় সন্দেহ করে, তাই জীবনানন্দ অন্যান্য আপাত কাঙ্ক্ষিত স্থানের উল্লেখ করেন, যেগুলো তাঁর মতে তাঁর প্রিয় বাসভূমির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না।

> এই ডাঙা ছেড়ে হায় রূপ কে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে।
> বটের শুকনো পাতা যেন এক যুগান্তের গল্প ডেকে আনে:
> ছড়ায়ে রয়েছে তারা প্রান্তরের পথে পথে নির্জন অঘ্রানে;—
> তাদের উপেক্ষা ক'রে কে যাবে বিদেশে বলো—আমি কোনো-মতে
> বাসমতী ধানক্ষেত ছেড়ে দিয়ে মালাবারে—উটির পর্বতে
> যাব নাকো, দেখিব না পামগাছ মাথা নাড়ে সমুদ্রের গানে
> কোন্ দেশে,—কোথায় এলাচিফুল দারুচিনি বারুণীর প্রাণে
> বিনুনি খসায়ে ব'সে থাকিবার স্বপ্ন আনে,—পৃথিবীর পথে
>
> যাব নাকো: অশ্বত্থের ঝরাপাতা ম্লান শাদা ধুলোর ভিতর,
> যখন এ-দু'-পহরে কেউ নাই কোনো দিকে—পাখিটিও নাই,
> অবিরল ঘাস শুধু ছড়ায়ে র'য়েছে মাটি কাঁকরের 'পর,
> খড়কুটো উল্টায়ে ফিরিতেছে দু'একটা বিষণ্ন চড়াই,
> অশ্বত্থের পাতাগুলো প'ড়ে আছে ম্লান শাদা ধুলোর ভিতর;
> এই পথ ছেড়ে দিয়ে এ-জীবন কোনোখানে গেল নাকো তাই।[১৭]

মালাবার দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের আরামদায়ক উপকূলীয় অঞ্চল। উটি হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের এক শৈলস্টেশন। এ ধরনের শৈলশহর নিদাঘ গ্রীষ্ম থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য অবকাশ-যাপনকেন্দ্র। এ রকম কোনো কেন্দ্র অথবা মালাবার উপকূলের পামগাছে ঢাকা সৈকত, এমনকি এলাচিফুল দারুচিনির মনোরম দেশের সঙ্গে বাংলা ও তার সুগন্ধি বাসমতী ধানের ক্ষেতের কোনো তুলনা হয় না। নভেম্বরের কোনো এক দিন, বর্ষা শেষ হয়েছে বহুদিন আগে, শুষ্ক ভূমিতল, ইতস্তত ছড়ানো পাতা, দু-একটা সাধারণ ছোট চড়ুই, শূন্য প্রান্তর চিত্তবিক্ষেপহীন নির্জনতা—এই অবস্থায় কবি আবার স্মরণ করেন, কেন তিনি অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য বাংলাকে পরিত্যাগ করেননি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাংলার বিস্ময়কে প্রত্যক্ষ করার জন্য এক জীবনের বিস্তার যথেষ্ট মনে হয় না :

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হ'ব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারা দিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপ্‌সার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক : আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—[১৮]

পাখির বেশ ধরে অথবা সবুজ কলমির গন্ধমাখা অগণন পুকুরের একটিতে ভেসে থাকা হাঁস হয়ে কুয়াশার ভেতর দিয়ে ধানসিড়ির তীরে (বাংলার প্রতীক এখানে, তবে বরিশালের অদূরে বয়ে যাওয়া একটা নদীর নামও) যদি ফিরে আসতে পারতেন তিনি। বোধ হয় কোনো এক অনির্দিষ্ট আকারে বাংলাকে কেবল পর্যবেক্ষণ করতেন : বাংলার পাখি, ক্রীড়ামগ্ন শিশু, রূপসার তরুণ মাঝি—এসব। জীবনানন্দ সম্ভবত ডিঙি দেখে থাকবেন খুলনা ও বাগেরহাটের ছোট লোকালয়ের মধ্যবর্তী নদীতে ১৯২৯ সালে যেখানে স্বল্প সময়ের জন্য তিনি শিক্ষকতা করেন।

যদিও বৃক্ষ, প্রাণী ও নদনদীগুলো বাস্তব, অল্প কিছু বাস্তবের মানুষ এসব কবিতায় উপস্থিত, কবির সঙ্গে তাদের মানবিক সম্পর্ক ঘটে কদাচিৎ। যাদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা হয়েছে তারা 'তুমি' হিসেবে অনামিত রয়ে যায়। এসব চরিত্র বিশেষ করে রমণীরা রয়ে যায় যথেষ্ট সন্দেহের আড়ালে। এসব সনেটের অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্র যেমন বাংলার রূপকথা, লোকগাথা, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ভূমিকার তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবের মানুষ নগণ্য।

সনেটে সংযুক্ত চম্পা ও বেহুলা উপাখ্যান অভিজ্ঞতার এক ধারাবাহিকতা স্থাপন করে দেখায় আজ কবি যেভাবে দেখছেন তারাও সেভাবে বাংলার রূপ প্রত্যক্ষ করেছে। বঙ্গোপসাগর অভিমুখী নদী বেয়ে তার বাণিজ্যতরী নিয়ে যাওয়ার সময় চাঁদ সদাগর উপভোগ করেছে বাংলার অপরূপ দৃশ্যাবলি। বিশ্বস্ততা আর সদ্‌গুণের প্রতীক বেহুলাও মৃত স্বামীকে নিয়ে ভাটির দিকে যেতে যেতে বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনসামঙ্গল-এর পরোক্ষ উল্লেখ *রূপসী বাংলার* আরেকটা সনেটে আছে:

হায় পাখি, একদিন কালীদহে ছিলে না কি—দহের বাতাসে
আষাঢ়ের দু'-পহরে কলরব করনি কি এই বাংলায়!
আজ সারাদিন এই বাদলের কোলাহলে মেঘের ছায়ায়
চাঁদ সদাগর: তার মধুকর ডিঙাটির কথা মনে আসে,
কালীদহে কবে তারা পড়েছিল একদিন ঝড়ের আকাশে,—
সেদিনো অসংখ্য পাখি উড়েছিল না কি কালো বাতাসের গায়,
আজ সারাদিন এই বাদলের জলে ধলেশ্বরীর চড়ায়
গাংশালিখের ঝাঁক, মনে হয়, যেন সেই কালীদহে ভাসে;

এইসব পাখিগুলো কিছুতেই আজিকার নয় যেন—নয়—
এ নদীও ধলেশ্বরী নয় যেন—এ-আকাশ নয় আজিকার:
ফণীমনসার বনে মনসা রয়েছে না কি?—আছে; মনে হয়,
এ নদী কি কালীদহ নয়? আহা, ঐ ঘাটে এলানো খোঁপার
সনকার মুখ আমি দেখি না কি? বিষণ্ন মলিন ক্লান্ত কি যে
সত্য সব;—তোমার এ স্বপ্ন সত্য, মনসা বলিয়া গেল নিজে।[১৯]

পৌরাণিক কালীদহ বাংলার মঙ্গলকাব্যে নদী বা সাগরের এমন একটা জায়গা, যেখানে হয় দেবী দেখা দেন অথবা কিছু একটা ধ্বংস করেন।[২০] চাঁদ সদাগরের সাতটি তরী এখানেই ডুবেছিল।

তাঁর আরও অন্য কয়েকটা সনেটে *মনসামঙ্গল* ও *চণ্ডীমঙ্গল*-এর উল্লেখ আছে:

...বেহুলার লহনার মধুর জগতে
তাদের পায়ের ধুলো-মাখা পথে বিকায়ে দিয়েছি আমি মন (পৃ. ১৯)

...চেয়ে দেখি কালো দাঁড়কাক
সবুজ জঙ্গল ছেয়ে শুপুরির—শ্রীমন্তও দেখেছে এমন; (পৃ. ৩৭)

...এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন,
ধনপতি, শ্রীমন্তের, বেহুলার, লহনার ছুঁয়েছে চরণ; (পৃ. ৩৯)

...ছিন্ন ভিজে খড়
বুকে নিয়ে সনকার মতো যেন পড়ে আছে নরম প্রান্তর; (পৃ. ৪৮)

মনসামঙ্গল-এ চরিত্রায়িত হয়েছে চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকা ও পুত্রবধূ বেহুলা; আর ধনপতির বড় বউ লহনা ও পুত্র শ্রীমন্ত রয়েছে *চণ্ডীমঙ্গল*-এ।

জীবনানন্দ ইতিহাস ও পুরাণের চরিত্রদেরও উপস্থাপন করেছেন, যেমন: প্রাচীন বাংলার রাজা বল্লাল সেন, রাজবল্লভ—যাঁর কীর্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কীর্তিনাশা নদীর দ্বারা, *মহাভারত* থেকে অর্জুন, বুদ্ধ ও কনফুসিয়াস, মধ্যযুগের স্বনামধন্য বাঙালি কবি মুকুন্দরাম, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ ও রায়গুণাকর (ভারতচন্দ্র রায়) ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, যাঁর স্মৃতির উদ্দেশে প্রথম দিকে জীবনানন্দ একটা কবিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

লিখেছিলেন। তাঁর এই গ্রন্থটিতে বাস্তবের জীবিত মানুষ প্রায় অনুপস্থিত। কারণ তাঁর বাংলা বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে মানবসমাজসৃষ্ট নয়, কেবল স্থির মানবজীবনসৃষ্ট। লালাভ পায়ের তরুণী, খই ছড়ানোরত শিশু, যুবক মাঝি—নদী ও বৃক্ষের মতো প্রাকৃতিক প্রতিবেশের উপাদান হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকে এসব নীরব কুশীলব যেন সৃষ্টি করে জীবন্ত দৃশ্যপট।

সারা জীবন জীবনানন্দ গুটিকয় মানুষ ছাড়া সবার সঙ্গে যোগাযোগ পরিহার করে চলেছেন। মৃত্যু একজন থেকে আরেকজনকে বিযুক্ত করার একটা উপায়। এই মৃত্যু তাঁর কবিতায় পরিব্যাপ্ত। কিন্তু কেবল সনেটগুলো মৃত্যুর আচ্ছন্নতার চেয়েও অধিকতর কিছু প্রকাশ করে। এগুলোর একটিতে কবি মানবজাতিকে বর্জন করে মরণোত্তর সময়ে রূপান্তরিত হতে চান বাংলার বৃক্ষ ও পাখিতে। অন্যটিতে তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশ ছেড়ে চলে যাবেন, শুধু যদি মৃত্যু নিয়ে যায় তাঁকে। এখানেই তাঁর সংকট—বাংলার প্রতি সুনিশ্চিত উদ্বেলিত আবেগ ও মৃত্যুর প্রলোভনের মধ্যকার সংঘাত। এই সংকলনটি কেবল নৈসর্গিক কবিতাগুচ্ছের সমষ্টিমাত্র নয়, তার চেয়ে অধিক কিছু, অস্তিত্ববাদী টানাপোড়েনে জীবনানন্দের ভাষ্যের সরল স্বীকারোক্তি।

তোমার বুকের থেকে একদিন চ'লে যাবে তোমার সন্তান
বাংলার বুক ছেড়ে চ'লে যাবে; যে ইঙ্গিতে নক্ষত্রও ঝরে,
আকাশের নীলাভ নরম বুক ছেড়ে দিয়ে হিমের ভিতরে
ডুবে যায়,—কুয়াশায় ঝ'রে পড়ে দিকে দিকে রূপশালী ধান
একদিন;—হয়তো বা নিমপেঁচা অন্ধকারে গা'বে তার গান,
আমারে কুড়ায়ে নেবে মেঠো ইঁদুরের মতো মরণের ঘরে—
হৃদয়ে ক্ষুদের গন্ধ লেগে আছে আকাঙ্ক্ষার—তবুও তো চোখের উপরে
নীল মৃত্যু উজাগর—বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, শিশিরের ঘ্রাণ—

কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিখের প্রাণ
জানি নাকো;—তবু যেন মরি আমি এই মাঠ-ঘাটের ভিতর,
কৃষ্ণা যমুনার নয়—যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোখে মুখে—রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে; তারি নিচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।[২১]

কালীদহ এখানে মৃত্যুর একটা লোককথার পরোক্ষ উল্লেখ। এলাহাবাদে প্রমত্তা গঙ্গা ও যমুনা যেখানে মিলেছে, সেখানে কালো যমুনার জল গঙ্গার জলের চেয়ে কালো দেখা যায়। এই যমুনা বয়ে গেছে দিল্লির পাশ দিয়ে, যেখানে জীবনানন্দ কয়েক মাস শিক্ষকতা করেছেন। বাংলা ছেড়ে দিল্লিতে বসবাস ছিল তাঁর জন্য অসহনীয়। তবে জীবনানন্দ দিল্লির চেয়ে বাংলায় মৃত্যুকে অগ্রাধিকার দিতেন বলে বেঁচে থাকার কথা বলেননি, বলেছেন মরণের কথা। মৃত্যুর পরও প্রাকৃতিক বাংলা তাঁর সঙ্গে থাকবে, তাই তিনি কামনা করেন অর্ধনারীশ্বর হতে। তিনি নিজে হবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অর্ধপুরুষ ও বাংলা হবে অর্ধনারী—যা শিবের একটি রূপ, যাঁর বাম অর্ধ হচ্ছে নারী ও ডান অর্ধ ঈশ্বর। হিন্দু পটশিল্পে এই শিব মড়ার মতো চিত হয়ে পড়ে থাকেন আর তাঁর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন কালী। তাঁর সনেটে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে কবি রামপ্রসাদ, যিনি প্রায়ই নিজেকে উপেক্ষাকারী দেবী মায়ের সন্তান হিসেবে গান গেয়েছেন। এখানেও জীবনানন্দ এক শিশুর ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু যেখানে রামপ্রসাদ পৃথিবীকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কুহক আর সত্যকে উপলব্ধির বাধা হিসেবে মনে করেছেন, জীবনানন্দ এই বিশ্বপ্রকৃতিকে, বিশেষ করে বাংলাকে মনে করছেন একমাত্র বাস্তব হিসেবে। তাঁর আবাস ছেড়ে যাওয়া হতো সর্বনাশা, নিঃশেষ হয়ে যেত এই ব্রহ্মাণ্ড, খসে পড়ত তারকামণ্ডলী। কিন্তু তাঁকে মৃত্যুবরণ করতেই হতো, যে রকম করতে হবে সবাইকে। তাই তিনি শারীরিকভাবে বাংলার একটা অংশ হয়ে মরতে চান এখানেই, যে রকম অর্ধনারীশ্বরের শরীর দুই অর্ধাংশে বিভক্ত, যাতে তাঁর বুকের ওপর পাওয়া যায় তাকে, যে রকম কালী দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁর শায়িত সঙ্গীর ওপর।

আরেকটা কবিতায় তিনি সৎকারের চিতা ও শ্মশানের বর্ণনা দিয়ে মৃত্যুকে আরও ঘনিষ্ঠতা দিয়েছেন :

যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে
অপরাজিতার মতো নীল হয়ে—আরো নীল—আরো নীল হয়ে
আমি যে দেখিতে চাই;—সে আকাশ পাখনায় নিঙড়ায়ে লয়ে
কোথায় ভোরের বক মাছরাঙা উড়ে যায় আশ্বিনের মাসে,
আমি যে দেখিতে চাই,—আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে;
পৃথিবীর পথে ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে স'য়ে
ধানসিড়িটির সঙ্গে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব ব'য়ে,
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে,

যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি প'রে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দন চিতায় চড়ে—আমের শাখায় শুক ভুলে যায় কথা;
যেইখানে সবচেয়ে বেশি রূপ—সবচেয়ে গাঢ় বিষণ্নতা;
যেখানে শুকায় পদ্ম—বহু দিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব;
যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার
কাঁকন বাজিত, আহা, কোনোদিন বাজিবে কি আর![২২]

রামপ্রসাদ মা কালী, শ্যামা অথবা তারার উদ্দেশে ভক্তিমূলক গান গেয়েছেন। কালী যেমন তাঁর ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক রূপে আবির্ভূতা। দুর্গা বা বিশালাক্ষী প্রভুত্ব করেন সমৃদ্ধি, বিজয় ও মানবজাতির নিয়তির ওপর। দুর্গা হলেও তিনি ব্যর্থ, তিনি ছেলেবেলার রূপকথার কাঁকন-নিক্বণে শোনা রাজকুমারীদের প্রতীকে আগেকার দিনের সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনতে পারেননি। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য—বিষণ্নতার পাশাপাশি শ্মশানে বসবাস করেও কবি বাংলার প্রকৃতি থেকে সান্ত্বনা পান, যদিও থেকে যায় মৃত্যুর কঠোর সত্য। হিন্দু বিধবাদের পোশাক সাদা থানের বদলে সধবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মহিলাদের অলংকৃত শাড়ি পরা সুন্দরী নারী তখনো থেকে যায় জীবনের মূলধারায়। ব্যথাবিধুর বাচনক্ষম টিয়া বসে থাকে নির্বাক। ভারতীয় পুরাণে ভালোবাসাকে প্রতীকায়িত করে শুকশারি (হিন্দু দেবতা কামদেবের বাহন হিসেবে কাজ করে শুক), শারির সঙ্গে সুন্দরী রমণীর সাযুজ্য টানা যায়। কারণ বৃক্ষশাখায় একাকী শুক চন্দন কাঠের চিতায় শায়িতা মৃতা রমণীর স্বামীর সঙ্গে সমদুঃখে দুঃখী। সৎকারের চিতার কথা এসেছে এই সনেটগুলোতে :

> সাজায়ে রেখেছে চিতা : (পৃ. ১৪)
>
> ...কবে যেন তারপর শ্মশানচিতায় তার হাড়
> ঝরে গেছে, কবে যেন; (পৃ. ২১)
>
> আবার যখন জাগি, আমার শ্মশানচিতা বাংলার ঘাসে
> ভরে আছে, (পৃ. ২৩)
>
> হৃদয়ে প্রেমের দিন কখন যে শেষ হয়—চিতা শুধু পড়ে থাকে তার, (পৃ. ৬৪)

মূলত বাংলাই ছিল শ্মশানভূমি :

> শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছ— (পৃ. ৪৩)

'ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে...বয়ে'—জীবনানন্দ তাঁর নিজের মৃত্যুকে রূপান্তরিত করেন মধুর ভীতিহীন নিদ্রায় :

> ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে;
> তখনো যৌবন প্রাণে লেগে আছে হয়তো বা—আমার তরুণ দিন
> তখনো হয়নি শেষ—সেই ভালো—ঘুম আসে—বাংলার তৃণ
> আমার বুকের নিচে চোখ বুজে—বাংলার আমের পাতাতে
> কাঁচপোকা ঘুমায়েছে—আমিও ঘুমায়ে রবো তাহাদের সাথে,
> ঘুমাব প্রাণের সাধে এই মাঠে—এই ঘাসে—কথাভাষাহীন
> আমার প্রাণের গল্প ধীরে ধীরে মুছে যাবে—অনেক নবীন
> নতুন উৎসব র'বে উজানের—জীবনের মধুর আঘাতে
>
> তোমাদের ব্যস্ত মনে;—তবুও, কিশোর, তুমি নখের আঁচড়ে
> যখন এ ঘাস ছিঁড়ে চ'লে যাবে—যখন মানিকমালা ভোরে
> লাল লাল বটফল কামরাঙা কুড়াতে আসিবে এই পথে—
> যখন হলুদ বোঁটা শেফালির কোনো এক নরম শরতে
> ঝরিবে ঘাসের 'পরে,—শালিখ খঞ্জনা আজ কতদূর ওড়ে—
> কতখানি রোদ—মেঘ—টের পাব শুয়ে শুয়ে মরণের ঘোরে।[২৩]

মৃত্যু হলেও 'ঘুমিয়ে' থেকে কথকের হৃদয় শান্ত হয়ে উপভোগ করতে থাকবে বাংলার প্রকৃতি।

রূপসী বাংলা কিছু পাঠকের কাছে জীবনানন্দের সবচেয়ে সার্থক গ্রন্থ হিসেবে অনুমোদন পেয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এই গ্রন্থের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবিতাগুলোকে এ-দেশের মূল সুরের প্রকাশ হিসেবে গণ্য করা হতো, যে দেশের জন্য যুদ্ধ করছিল মুক্তিবাহিনী। যুদ্ধের নয় মাসের মধ্যে এই গ্রন্থের দুটো সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কেবল সাধারণ পাঠকগোষ্ঠী নয়, উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও সনেটগুলোকে একইভাবে মূল্যায়ন করেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা কাব্য সংকলনে গৃহীত জীবনানন্দের পাঁচটি কবিতার ভেতর তিনটি *রূপসী বাংলা* থেকে নেওয়া সনেট। যাঁরা কবিতাগুলোর প্রশংসা করেন, তাঁরা সাধারণত এতে গাঙ্গেয় বাংলার প্রাচুর্যপূর্ণ সৌন্দর্যের চিত্রায়ণের জন্যই সেটা করে থাকেন।

তবে গ্রন্থটি সর্বসম্মত সমর্থন পায়নি। এ প্রসঙ্গে তীব্র সমালোচনা করেছেন আলোক সরকার, যিনি নিজে একজন কবি এবং জীবনানন্দের কিছু কবিতার প্রকাশকও :

> 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলোর পাশাপাশি ধরা যাক 'আট বছর আগের একদিন' বা 'বোধ' নামের কবিতাটি পড়লে আমরা বুঝতে পারি অপরিণত আবেগ, তরল কাব্যময়তা, ছলছল কবিত্ব কবিতার কতো বড় শত্রু।[২৪]

যে দুটো কবিতার কথা আলোক সরকার উল্লেখ করেছেন সেগুলোর উৎকর্ষ নিয়ে কেউ বিতর্ক করবেন না। অনুরূপভাবে কেউ কেউ মনে করতে পারেন, কোনো একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাংলার নৈসর্গিক সৌন্দর্য বিষয়ে জীবনানন্দ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী অনুরাগ ও মগ্নতা নিঃসারিত করেছেন, যা রসালো চিত্রকল্প ও আবহের আতিশয্যে পাঠককে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। তবে, এসব সনেটকে যদি পরাক্রমশালী সৌন্দর্যকে মেনে নিতে সচেষ্ট শক্তিশালী আবেগের মিশ্রণে সৃষ্ট মন্তাজের খণ্ডচিত্র হিসেবে গণ্য করা যায়, তাহলে বিস্ময়কর লোভনীয় জীবনের মুখোমুখি মৃত্যু : এই দুর্বহ সত্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কবির নিষ্ফল সংগ্রামের দৃশ্যমান ইতিহাস হয়ে কবিতাগুলো সামষ্টিকভাবে একটা বাড়তি মাত্রা লাভ করে।

জীবনানন্দ নিজেও সমগ্র কাব্যের সঙ্গে প্রত্যেকটি কবিতার একক সম্পর্ককে চিত্রিত করেছেন।

> এরা প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপরপক্ষে সার্বিক বোধে একশরীরী : গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশ প্রসৃতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পরনির্ভর।[২৫]

মনে হয় এভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যৌক্তিক যে, জীবনানন্দ পরবর্তীকালে কবিতায় ব্যবহার করবেন, এমন কিছুর ওপর কাজ ও অনুশীলন করছিলেন। জীবনানন্দের বন্ধু, সমর্থক ও তাঁর একটা গ্রন্থের প্রকাশক সঞ্জয় ভট্টাচার্য লেখেন :

> হয়তো সে-সময়েই তিনি একটা বিশ্বাসের মূর্তি গড়তে চেয়েছেন তাঁর নির্জন বাসে এবং শান্তি লাভ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত (সুতরাং তাঁর ইচ্ছায় নয়) 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলো পড়লে মনে হয় 'বনলতা সেন'-এর 'দু-দণ্ড শান্তি'র বীজ 'রূপসী বাংলা'তেই ছিল,...।[২৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

জীবনানন্দের তৃতীয় গ্রন্থ *বনলতা সেন*-এ উল্লিখিত কবির 'দু-দণ্ড শান্তি' সম্পর্কে সঞ্জয় যুক্তি দেখান যে জীবনানন্দ বাস্তব বিশ্বের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন, আর তা একরকমভাবে পুনরুদ্ধার করেন *রূপসী বাংলা* ও *বনলতা সেন* গ্রন্থে মূর্ত স্বীকৃত কল্পিত ভুবনে। সঞ্জয়ের তত্ত্ব কেউ গ্রহণ করুন বা না করুন, *রূপসী বাংলা* আর *বনলতা সেন*-এর সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ পর্যবেক্ষণকে দুটো পর্যায়ে উপলব্ধি করা যায়। প্রথমত, *বনলতা সেন*-এ ফলবতী হওয়া যে বীজকে সঞ্জয় নবায়িত বিশ্বাস হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা ধারণ করা হয় *রূপসী বাংলায়*। *বনলতা সেন*-এ পাওয়া 'দু-দণ্ড শান্তি'র 'বীজ' কেবল *রূপসী বাংলায়* অস্তিত্বশীল নয়, সঞ্জয়ের ধারণাকে আরও বিস্তৃত করলে বরং অবস্থান করে বাংলাতেই। বাংলা কবিকে শান্তি দিয়েছে, যেমন দিয়েছিল বনলতা সেন। অতএব বাস্তবের লোকায়ত বাংলা রূপান্তরিত হয় বনলতা সেনে।

দ্বিতীয়ত, আরও প্রকরণগত পর্যায়ে *রূপসী বাংলায়* অস্তিত্বশীল যে বীজের কথা সঞ্জয় বলেছেন, *বনলতা সেন*-এ অঙ্কুরিত সেই বীজকে চিত্রকল্প মোটিফ ও বিশেষ শব্দ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। *রূপসী বাংলার* আবহ সংগীতের মতো 'পৃথিবীর পথে' ধ্বনিত হয় *বনলতা সেন*-এ। *বনলতা সেন* গ্রন্থভুক্ত একটিসহ দুটো কবিতার শিরোনাম 'ঘাস' যেন *রূপসী বাংলার* সর্বত্র বিরাজমান একটা উপাদান। জীবনানন্দের প্রথম দিকের প্রিয় পেঁচা তাঁর শব্দসম্ভারে অনুবর্তিত থাকে, যেমন থাকে ইঁদুর আর পেঁচা একসঙ্গে। শঙ্খমালা, ধানসিড়ি, সোনালি চিল, কমলা-রং রোদ ও নগ্ন হাত—এসবই *রূপসী বাংলা* ও পরবর্তী কবিতাগুলোতে উপস্থিত, যার বেশির ভাগই দেখা গেছে *বনলতা সেন*-এ। *রূপসী বাংলা* ও পরের কবিতাগুলোর মধ্যে আরও অনেক যোগাযোগ দেখতে পাওয়া যায়। অশোকানন্দকৃত ভূমিকায় উদ্ধৃত জীবনানন্দের ভাষা অনুযায়ী এই গ্রন্থভুক্ত সনেটগুলোর মধ্যকার যোগাযোগকে সামগ্রিকভাবে ধরলে গ্রামবাংলার একটা ভাষাচিত্র হিসেবে গণ্য করা যায়।

প্রেমকাব্যের চরমোৎকর্ষ পেত্রার্কীয় সনেটের সঙ্গে জীবনানন্দের ছিল এক মজার সম্পর্ক। আগে যে রকম বলা হয়েছে, তাঁর কাব্যচর্চার প্রথম দিকে তিনি ইংরেজিতে রোমান্টিক ও প্রকৃতিনির্ভর সনেট লিখেছেন। *রূপসী বাংলার* পাণ্ডুলিপির কয়েক বছর আগের তারিখ-সংবলিত এক খাতা থেকে আরও কিছু বাংলা পেত্রার্কীয় সনেট পাওয়া যায়, যার কোনোটাই তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ করা হয়নি। ১৯৩১ সালের একটা খাতা থেকে অপ্রকাশিত একটা ছোট কবিতা কিছুটা আলোকপাত করতে পারে, কেন কিছুটা প্রথাগত এই কবিতা পাণ্ডুলিপিতেই রয়ে গেছে:

> আমি যতই নতুন কবিতা আবিষ্কার করি না কেন
> তোমরা এসে বলবে: ও এক যুগ গিয়েছে, ও এক হাল ছিল
> ও সবের ঢের ঢের হয়েছে
> আমাদের কল্পনা জাল ছিঁড়ে বাঁচল
> আমাদের কলম
> মায়ার পাহাড়মুখো ময়নাদের মত
> নীল আকাশ বিঁধে চলেছে।[২৭]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যদিও জীবনানন্দ বলেন না, কোন 'নতুন কবিতা'কে তিনি বিগত-যৌবনা বলে বিবেচিত হবে বলে ভয় পাচ্ছেন। তিনি সম্ভবত সে সময়কার পেত্রার্কীয় সনেটগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে যেগুলো বাংলার প্রতি তাঁর অদম্য ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে।

রূপসী বাংলা হয়তো তাঁকে যা লিখতে হয়েছে তার প্রতিনিধিত্ব করে, তবে যেকোনো কারণেই হোক তিনি সেসব প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—তার একটা কারণ ছিল তাঁর কবিতাগুলো প্রকাশ করার মতো সহানুভূতিশীল প্রকাশকের অভাব। *কল্লোল*-এর মতো বাকি কাগজগুলো দীর্ঘদিন হলো বন্ধ হয়ে গেছে। ১৯৩৫-এর সেপ্টেম্বরের আগে *কবিতা* পত্রিকা বের হয়নি। এর মধ্যে পাঁচ বছরেরও বেশি সময়ে জীবনানন্দের একটি মাত্র কবিতা বের হয় *পরিচয়* কাগজে, যার সম্পাদকীয় পর্ষদ সে রকম কবিতা পছন্দ করেনি।

৩

বাংলার সবচেয়ে অভিজাত সাহিত্য ও বুদ্ধিজীবী পত্রিকা *পরিচয়* ত্রৈমাসিক কাগজ হিসেবে বের হতে শুরু করে ১৯৩১-এর জুলাই থেকে। এটির প্রতিষ্ঠাতা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সাত বছর ধরে কাগজটি সম্পাদনা করেন, তারপর যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেন হিরণকুমার সান্যালের সঙ্গে। ১৯৪৩-এর জুন সংখ্যার পর সুধীন্দ্রনাথ কাগজটির দায়িত্ব ছেড়ে দেন। পরবর্তী সময়ে এটি পরিণত হয় বামপন্থী লেখক ও সমালোচকদের মুখপত্রে। পত্রিকাটির প্রথম দিককার বছরগুলোতে এর লেখকদের কয়েকজনের মধ্যে ছিলেন সর্বক্ষেত্রের বাঙালি লেখক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারকারী পদার্থবিদ (স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথ বসু) থেকে শুরু করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী (রুশ বিপ্লবের ওপর লেখক সুশোভন সরকার) এবং কবিতার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সম্পাদক স্বয়ং সুধীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। *পরিচয়*-এ স্থান পেত ধর্ম, দর্শন, সংগীত ও প্রাচীন ইতিহাস। তার সঙ্গে ইউরোপীয়, রুশ, আমেরিকান এমনকি চীনা সাহিত্য আলোচনা, যার সবগুলো ইংরেজিতে অনূদিত হয়নি তখনো। কাগজটার পরিধি ছিল সত্যিই প্রভাবশালী। বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুসহ তখনকার সব আধুনিক কবি এ কাগজে লিখতেন।

পরিচয়-এর আবির্ভাব সাহিত্যিক মহলে যথেষ্ট উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। বুদ্ধদেব তাঁর এমএ পরীক্ষা চলাকালে *পরিচয়*-এর প্রথম সংখ্যাটা হাতে পেয়েছিলেন এবং সে সংখ্যায় কী আছে দেখার জন্য তিনি পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেননি।[২৮] বিষ্ণু দের কাছে লেখা চিঠিতে জীবনানন্দ *পরিচয়* সম্পর্কে তাঁর উত্তেজনা প্রকাশ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁর উৎসাহের আংশিক কারণ ছিল *কল্লোল*-লেখকদের কাছে গ্রহণযোগ্য যথেষ্ট আধুনিক বাংলা কাগজের অপ্রতুলতা।[২৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংখ্যায় ছিল কবিতার প্রকৃতি সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'কাব্যের মুক্তি', যা ছিল আগামী দশকে বাংলা কবিতার ভূমিকাবিষয়ক এক ধরনের নান্দীপাঠ। এই প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ কবিদের ভূমিকা সম্পর্কে বলেন, তাঁরা নিজস্ব ধারণার বদলে প্রকাশ করবেন মানবজাতির কথা। বলবেন কাব্যের ভাষার কথা, যা ১৯২০-এর দশকে বিতর্কের বিষয় ছিল : '...ক্ষেত্রবিশেষে, বিশিষ্ট ভাবানুষঙ্গের খাতিরে আধুনিক কবি সাধু-অসাধু, নবীন-প্রবীণ, দেশী-বিদেশী, সকল শব্দকেই সমান প্রশ্রয় দেয়।' এবং আধুনিক উত্তরোত্তর জটিলতা, প্যাঁচ ও দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে বলেন, '...দুরূহতার দুটো দিক আছে, একটা পাঠকের দিক, অন্যটা লেখকের। যে দুরূহতার জন্ম পাঠকের আলস্যে, তার জন্য কবির উপরে দোষারোপ অন্যায়।'[৩০] সুধীন্দ্রনাথের কিছু বক্তব্য জীবনানন্দের পক্ষে সাফাই মনে হলেও ব্যাপার তা নয়। এই দুজন কবিতাকে দেখেছেন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে।

জানুয়ারি ১৯৩২ সালে *পরিচয়*-এর তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয় জীবনানন্দের বিতর্কিত 'ক্যাম্পে' কবিতাটি। লেখা চেয়ে জীবনানন্দকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিলেন বিষ্ণু দে। তবুও কবিতাটি পৌঁছালে *পরিচয়*কর্মীরা এক ধরনের বিভ্রান্তিতে পড়ে যান। বিশেষ করে ঘাইহরিণীর 'ঘাই' শব্দটা ছিল বিব্রতকর।[৩১] মূল বক্তব্যে শব্দটাকে বোধগম্য মনে হলেও এটার প্রকৃত অর্থ কেউই জানত না। প্রাসঙ্গিকভাবে এই শব্দের গূঢ়ার্থের ভেতর নিহিত যৌন উত্তেজনা কবিতাটিকে বিতর্কিত করে তোলে। শব্দটির অর্থ এখনো অযথার্থভাবে বিশ্লেষিত হয়ে আসছে। 'ঘাই' একটা অসমিয়া শব্দ, যা অন্য পাখিকে ফাঁদে ফেলার জন্য টোপ হিসেবে ব্যবহৃত পাখিকে অথবা একটা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ পাখি বা টোপ পাখিকে বোঝায়। জীবনানন্দ এই টোপের সংজ্ঞাটিকে পুরুষ পাখি থেকে হরিণীতে রূপান্তর করেছেন। মনে হয় এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, যৌনতাই এই টোপের প্রতি প্রলোভন জাগ্রত করে। হরিণের কাছে যেমন কামোত্তেজিত হরিণী আকর্ষণীয়, তেমনি পাঠকদের কাছে জীবনানন্দের কবিতাও অপ্রতিরোধ্য রকম আকর্ষণীয় প্রমাণিত হয়েছে। সেই কবিতাই 'ঘাইহরিণী' শব্দ দুটোর মতো মাঝেমধ্যে পাঠকদের হতবুদ্ধি করে ফেলে।

কবিতাটি *পরিচয়*-এর লোকজনের কাছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লাভ করেছিল। সুধীন্দ্রনাথ এটা একেবারেই ছাপতে চাননি।[৩২] প্রথম সাত বছর *পরিচয়*-এ জীবনানন্দের কবিতার প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি থেকে সমগোত্রীয় এই কবি সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের মনোভাব বোঝা যায়। অশোক মিত্রের একটা বক্তব্য উল্লেখ করে হায়াৎ মামুদ জানান, জীবনানন্দ কখনোই অভিজাত সাহিত্য মহলে ঠিক গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। একটা পাদটীকায় হায়াৎ মামুদ লেখেন : 'প্রসঙ্গত, আমরা শুনেছি যে, সুধীন্দ্রনাথ নাকি জীবনানন্দকে কবি বলে স্বীকার করতেন না; জীবনানন্দ লোকান্তরিত হবার পরেও সুধীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে নীরব ছিলেন।'[৩৩] এ কথা সত্যি, তবে জীবনানন্দের মৃত্যুর সপ্তাহ খানেকের বেশি সময় পর সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা এক চিঠিতে এই নীরবতার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছিলেন :

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৬ নং সুইট
৬, রাসেল স্ট্রীট
কল : ১৬

প্রিয়বরেষু,

সর্দিজ্বরে ভুগছি গত দুহপ্তা ধ'রে। তাই জীবনানন্দের শ্রাদ্ধবাসরে যেতে পারিনি গত কাল। আপনার চিঠির জবাব দিতে দেরী হলো একই কারণে।

আমার মাথা একেবারে ফাঁকা হয়ে আছে; বেশ কিছু দিন থেকে; হাতে একেবারে সময় নেই, তুচ্ছ অথচ অর্থকরী কাজের তাড়ায়। এ অবস্থায় জীবনানন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে বসলে, তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো হবে। অতএব আমাকে ক্ষমা করবেন।

আশা করি কুশলে আছেন। আসবেন একদিন। ইতি

১ নভেম্বর ১৯৫৪
ভবদীয়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।[৩৪]

সুধীন্দ্রনাথ শ্রাদ্ধে যোগ না দিতে পারেন, তবে আর যা-ই হোক, তিনি জীবনানন্দ সম্পর্কে বিস্মৃত ছিলেন না। জীবনানন্দের মৃত্যুর দুই দিন আগে তিনি তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন।[৩৫] তা সত্ত্বেও তাঁর মতামত বদলাননি তিনি। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর বুদ্ধদেব বসু *কবিতা* পত্রিকার একটা জীবনানন্দ স্মারক সংখ্যা বের করেছিলেন, এতে প্রচুর কাটাছেঁড়ায় ভর্তি তাঁর একটা কবিতার পাণ্ডুলিপির ছবি ছাপা হয়েছিল, মরণোত্তর নামকরণ করা হয়েছিল কবিতাটির, 'সে'। এত বেশি সংশোধনী দেখে সুধীন্দ্রনাথ এই মর্মে মন্তব্য করেছিলেন, এত অল্পের জন্য এত বিশাল প্রয়াস কেন?[৩৬] জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে তাঁর মূল সমালোচনা ছিল বোধহয় যে, অখণ্ডতার অভাব, অর্থাৎ সার্বিকভাবে সমন্বিত নয়। প্রকৃতপক্ষে জীবনানন্দের কিছু কবিতা সত্যিই অসংলগ্ন বিক্ষিপ্ত বলে প্রতিভাত হয়েছে এবং সুধীন্দ্রনাথের কাছে এমন কবিতা অসহ্য।[৩৭]

শুধু কবিতায় নয়, জীবনযাপনেও জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল তার চেয়ে আর বেশি সম্ভব ছিল না। শেষোক্তজন প্রতিনিধিত্ব করতেন নাগরিক ভদ্রলোকদের। তিনি পরতেন শার্ট-প্যান্ট, কখনো কখনো বো-টাইও। তাঁর বাড়িতে মদ দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। তাঁর কথ্য ভাষা ছিল ইংরেজি।[৩৮] প্রচুর বিদেশ ভ্রমণ করেছেন তিনি, প্রথমবার ১৯২৯ সালে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান ও আমেরিকায়, পরে সে-বছরেই নিজেই গেছেন ইউরোপে। এমনকি অল্প সময়ের জন্য একসময়ে তিনি শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছেনও। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত ও সংস্কৃতময়। যাকে আবার ঘষেমেজে নতুন করার জন্য তিনি অনেক কষ্ট করেছেন, সেই মাতৃভাষাকে কোনোভাবেই অবজ্ঞা করেননি তিনি। তবে একে তিনি ব্যবহার করতেন আধুনিক অর্থের দ্যোতনার আবরণে ঢাকা-পড়া ভাষাগত প্রাচীন নিদর্শনের ভেতর লুকানো গূঢ়ার্থ আবিষ্কার করা ভাষাবিজ্ঞানীর মতো। জীবনানন্দ তাঁর স্বাভাবিক বাংলার ব্যবহারে ছিলেন প্রায় পাণ্ডিত্যবিরোধী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওপরে যে রকম বলা হয়েছে, সুধীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতাটি অমনোনীত করতেন। বিষ্ণু দে যুক্তি দেখান, তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করে *পরিচয়*-এর জন্য জীবনানন্দের কাছ থেকে লেখাটি নিয়েছেন। তাই এটা ছাপতেই হবে এবং ১৯৩২-এর জানুয়ারিতে *পরিচয়* লেখাটা ছাপে।

ক্যাম্পে

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি,—
কাহারে সে ডাকে!

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে শুয়ে
ঘুম আর আসে নাকো
বসন্তের রাতে।

চারিপাশে বনের বিস্ময়,
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন!
ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে;
কোথাও অনেক বনে—যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই
পুরুষ-হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার;
তাহারা পেতেছে টের,
আসিতেছে তার দিকে।
আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে;
তাহাদের হৃদয়ের বোন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়—
পিপাসার সান্ত্বনায়—আঘ্রাণে—আস্বাদে!
কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন!
মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,
সন্দেহের আবছায়া নাই কিছু;
কেবল পিপাসা আছে,
রোমহর্ষ আছে।
মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়!
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হয়ে উঠিতেছে সব দিকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আজ এই বসন্তের রাতে;
এইখানে আমার নক্‌টার্ন্‌—।

একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের-নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে ওই
সুন্দরী গাছের নিচে—জ্যোৎস্নায়!—
মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে
হরিণেরা আসিতেছে।
—তাদের পেতেছি আমি টের
অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়,
ঘাইমৃগী ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়।
ঘুমাতে পারি না আর;
শুয়ে শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি;
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি।
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে;
এইখানে প'ড়ে থেকে একা একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জমে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণীর ডাক শুনে শুনে।

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া;
সকালে—আলোয় তারে দেখা যাবে—
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা প'ড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তারে এইসব।
আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাব,
...মাংস খাওয়া হল তবু শেষ?
...কেন শেষ হবে?
কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই আমিও কি?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকেনি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
ওই ঘাইহরিণীর মতো?

আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মতো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে?

তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে!
মৃত পশুদের মতো আমাদের মাংস লয়ে আমরাও প'ড়ে থাকি;
বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মতো—।
প্রেমের সাহস-সাধ-স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু নাই;
পাই না কি?

দোনলার শব্দ শুনি।
ঘাইমৃগী ডেকে যায়,
আমার হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো
একা একা শুয়ে থেকে;
বন্দুকের শব্দ তবু চুপে চুপে ভুলে যেতে হয়।
ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায়।
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন—
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরও হৃদয়
কথা ভেবে—কথা ভেবে—ভেবে।

এই ব্যথা,—এই প্রেম সব দিকে রয়ে গেছে—
কোথাও ফড়িঙে-কীটে,—মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।[৩৯]

কারও জানামতে জীবনানন্দ তাঁর জীবনে কখনোই শিকার অভিযানে যাননি। হরিণ শিকার প্রসঙ্গে তাঁর অন্য একটা কবিতায় ('শিকার') তিনি শিকারির প্রতি তাঁর অসমর্থন প্রকাশ করেন। বিশেষ 'ঘাই' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে যদি অসমিয়া হয়, যার অর্থ টোপ হিসেবে ব্যবহৃত জ্যান্ত পাখি, তাহলে বোঝা যায়, অসমিয়া ভাষাভাষী কারও সঙ্গে কিংবা শিকারিদের সঙ্গে অথবা উভয়ের সঙ্গেই জীবনানন্দের কোনো যোগাযোগ ছিল। তাঁর ভাইয়ের মতে, জীবনানন্দ কখনোই আসাম যাননি। তবে তিনি মুনিরুদ্দি নামে একজনের কথা বলেন, যার অন্য পেশা ছিল বরিশালের স্থানীয় রাজমিস্ত্রি। অশোকানন্দ লোকটির বর্ণনা দেন এভাবে:

> বলিষ্ঠ দেহ, ইস্পাতের মত বুক। বুট পরে, কালো কোট গায় দিয়ে, বন্দুক হাতে নিয়ে যখন মুনিরুদ্দি আর তার ভাই লাখুটিয়া কিম্বা কাশীপুরের জঙ্গলের দিকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> বীরদর্পে যেতো, তখন তার অন্য মূর্তি। তখন তার কাছে যাই এমন সাহস আমাদের ছিল না। দূরের থেকেই ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধায় তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। যখন সে রাজমিস্ত্রীর কাজ করত, অবসরের সময় যখন মন-মেজাজ ভালো থাকত তার কাছ থেকে নানা রকমের শিকারকাহিনী শোনা যেত। দাদা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তার কাছ থেকে শিকারের অনেক তথ্য সংগ্রহ করতেন।[৪০]

আর তাঁদের ঠাকুরমা প্রসন্নকুমারী দাশ এই বালকদের তাঁদের এক ডেপুটি কনজারভেটর অব ফরেস্ট কাকার শিকারের বীরত্বের গল্প করতেন। তাঁদের বরিশালের বাড়িতে সেই কাকার শিকার করা হরিণের চামড়া, বুনো মোষের শিং, দেয়ালে ঝোলানো বাঘের মাথা—এসব ছিল।[৪১]

অবশ্য 'ক্যাম্পে' আদৌ হরিণী শিকার-সম্পর্কিত নয়, বরং মানুষ সম্বন্ধে, বিশেষ করে কথক সম্পর্কে এবং মানুষের মধ্যকার সম্বন্ধ সম্পর্কে। কবিতাটিতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, জীবনানন্দের জীবনে এক রমণী থাকতে পারে, যে-প্রেমিকা তাঁকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। কবিতাটির ওপর তাঁর নিজের লেখায় তিনি তাকে 'সৃষ্টি' বা জীবনের কাছে দুর্লভ করে তুলেছেন এ ব্যাপারে দৃঢ় সমর্থিত জীবনীমূলক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধুদের মতে, বিয়ের আগে বা পরে কারও সঙ্গে প্রেমের মতো সামান্যতম সম্পর্কও তাঁর ছিল না। তথাপি তাঁর আরও বহু কবিতা কোনো এক নারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে, কয়েকটি কোনো এক রমণীর নাম ধরে সম্বোধন করেও লেখা।

এ রকম সম্পর্ক সত্য না হলেও বস্তুত তা উৎসারিত আবেগকে নাকচ করে দেওয়া নয়। জীবনানন্দ তাঁর অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্য শিকার, শিকারি ও প্রলোভনের এক জটিল নমুনা সৃষ্টি করেছেন। টোপ হিসেবে ব্যবহৃত কামোত্তেজিত হরিণী বনের পুরুষ হরিণকে আমন্ত্রণ করে। তবে তার নিজের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য নয়, বরং হরিণগুলোকে শিকারির বন্দুকের আওতায় আসতে প্ররোচিত করার জন্য। হরিণী একটা ধ্বংসাত্মক শক্তির পক্ষে ওকালতি করে, তার আবেদন এত প্রবল যে হরিণ তাদের প্রাকৃতিক শিকারিদের ভয়ও বিস্মৃত হয়। তারপর বন্দুক গর্জে ওঠে, আর শিকারির শিকার হয় হরিণ।

তিনি যা শুনেছেন, তার সঙ্গে সেই এলাকা সম্পর্কে তাঁর সাধারণ জ্ঞান ও সম্ভাব্য পরিস্থিতির বিবরণে তা পূর্ণ করে কবিতাটির কথক পরোক্ষে ও যথেষ্ট দূরে থেকে ঘটনা নিরীক্ষণ করেন। যদিও ধারণা করা যায় তিনি শিকারিদলের সঙ্গেই সেখানে গেছেন। তবে যখন সত্যিকার শিকার ও হত্যার ঘটনা ঘটে, তখন তিনি ক্যাম্পের খাটে শুয়ে ছিলেন। তিনি শিকারিদের সঙ্গে কতখানি ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ দিয়েছেন তা পরিষ্কার নয় : প্রথমে তিনি বলেন, 'ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি', তারপর বলেন, 'আমিও তাদের [শিকারীদের] ঘ্রাণ পাই যেন।' কিন্তু তিনি পরে শিকারিদের সঙ্গে হরিণের মাংসের ভোজে অংশগ্রহণ করেন। হত্যাকাণ্ড ও প্রতারণা দুটোর দায়ই যুক্তিসংগতভাবে মানুষের ঘাড়ে এসে পড়ে। তারা হরিণীকে শিখিয়েছে প্রলুব্ধ করতে, অসংবেদনশীল হতে তার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সগোত্রীয় হরিণের প্রতি, অবশ্য শরীরের ঘ্রাণ ও কামোত্তেজনায় যে অবস্থা হয়, তা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, সেখানে হরিণীর কিংবা তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

তারপর যারা ধ্বংস করে কিংবা সহজাতিদের খুন করতে যারা সহায়তা করে, কথক তাদের জন্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন : শিকারিরা দুর্নীতিবাজ মানবসমাজের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা সমাজের লাভের জন্য অন্যদের নিষ্ঠুরতা শিক্ষা দেয়; হরিণীরা প্রাকৃতিকভাবে ভালোবাসার বস্তু; আর হরিণেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষের হাতে। কথক নিজেকে সেই উপমার ভেতর বসিয়ে দেন। আমি কি তাদের মতো নই—আমার হৃদয়, একটা হরিণ, যা এক রাতে মরে গেছে, আর 'তুমি' প্রলুব্ধকারী হরিণী আবার প্ররোচিত করার জন্য বেঁচে আছ? তুমি যা করছ তা করার জন্য কেউ কি তোমায় শিখিয়ে দিয়েছে?—কারণ এটা স্বাভাবিক নয়। তারপর কবিতার শেষের দিকে তিনি 'তুমি'কে শিকারির সঙ্গে এক করে দৃষ্টান্তটা মিলিয়ে দিয়েছেন। এখন 'তুমি'র দুটো সমান অর্থ আছে—সে অন্যের হয়ে ওকালতি করে, আবার নিজ থেকে হত্যা করে। আর আমরা—মানবজাতি—তার ধ্বংসক্ষমতার ও তাকে ব্যবহারকারী মানুষের শিকার হচ্ছি। পাঠক কখনোই জানতে পারে না 'তুমি'র পরিচয় অথবা ঠিক কী সে করেছিল। জীবনানন্দের দিক থেকে দেখলে সে (নারী) তাঁর ভালোবাসার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তার ভুবনের সহিংসতায় তার সাবধান থাকা উচিত ছিল। কিন্তু ভালোবাসা তাকে জীবনের নিষ্ঠুরতার দিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বিষণ্ণতর এবং অভিজ্ঞানী ও কম বিশ্বাসযোগ্য কথক শেষ স্তবকে জানান যে ভালোবাসা হচ্ছে বেদনা এবং যারা ভালোবাসে—সে মানুষ বা পতঙ্গ যে-ই হোক—ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ঘাইহরিণী—সরল তবু পুরোপুরি নির্দোষ নয়—বেঁচে থাকার জন্য জীবনানন্দের সবচেয়ে শক্তিশালী রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয় : বঙ্গদেশ, স্বয়ং প্রলুব্ধ জীবন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ, সমাজ, স্বাভাবিক মানবিক সম্পর্কগুলো রয়ে গিয়েছিল মারাত্মক বিপজ্জনক।

সজনীকান্ত দাস ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আবার বের হওয়া তাঁর *শনিবারের চিঠির* মাধ্যমে জীবনানন্দের এই সর্বশেষ কাব্যপ্রয়াসটির ওপর একগাদা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্য ঢেলে দিয়েছিলেন :

> কবিতাচ্ছলে কবি যে বিরহিণী ঘাই-হরিণীর আত্মকথা ও তাহার হৃত্তুতো দা'র মর্মকথা কহিয়াছেন, তাহা পরম রমণীয় হইয়াছে।
>
> হৃৎতুতো দা'র কথা পাঠক বোধ হয় বুঝিলেন না। কবি বলিতেছেন যে, বনের যাবতীয় ভাই-হরিণকে 'তাহাদের হৃদয়ের বোন' ঘাই-হরিণী 'আঘ্রাণ' ও 'আস্বাদে'র দ্বারা তাহার 'পিপাসার সান্ত্বনা'র জন্য ডাকিতেছে। পিস্তুতো মাস্তুতো ভাই-বোনদের আমরা চিনি। হৃৎতুতো বোনের সাক্ষাৎ এই প্রথম পাইলাম।...
>
> মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়!
> লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হয়ে উঠিতেছে সব দিকে
> আজ এই বসন্তের রাতে,
> এইখানে আমার নক্টার্ন—।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণে বুঝিলাম কবিতার নাম 'ক্যাম্পে' হইল কেন! যাহাই হউক নক্‌টার্ন শব্দের পরে ড্যাস মারিয়া কবি তাঁহার নৈশ রহস্যের সরস ইতিহাসটুকু চাপিয়া গিয়া আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন।...

এই সম্পর্কে একটু অবান্তর কথা বলিব। আমরা জানি যে অনেকে শনিবারের চিঠিকে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট করেন এবং বলেন যে আমরাই পুনরুদ্ধার করিয়া অশ্লীল লেখা ও লেখকদের প্রসার ও সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দিতেছি। তাঁহাদিগকে একটি কথা মনে রাখিতে অনুরোধ করি।

'পরিচয়' একটি 'উচ্চ-শ্রেণী'র কালচার-বিলাসীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা রবীন্দ্রনাথ ইহাকে সস্নেহ অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ইহাতে লিখিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিরা যে কাগজের সম্পর্কে সম্পর্কিত, তাহাতে কি প্রকার জঘন্য অশ্লীল লেখা বাহির হইতে পারে ও হয় তাহার একাধিক পরিচয় 'পরিচয়' দিয়াছেন। 'ক্যাম্পে' কবিতা তাহার চূড়ান্ত নমুনা। সুতরাং এ-শ্রেণীর লেখকদের প্রসার ও প্রতিপত্তি কাহাদের আওতায় বাড়িতেছে। পাঠক সাধারণ তাহার বিচার করিবেন।[৪২]

স্বেচ্ছায় ব্যাখ্যার এক দুর্লভ মুহূর্তে জীবনানন্দ সজনীকান্তের অশ্লীলতার অভিযোগের বিরুদ্ধে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সাফাই গেয়েছেন। তাঁর জীবদ্দশায় কখনোই ছাপা না হওয়া খণ্ডন করা এই বক্তব্যটি এই বিশেষ কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি কী বলতে ছেয়েছেন শুধু তা নয়, ইরেজি সাহিত্যে তাঁর পড়াশোনা অন্তত একটি কবিতাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে এবং সমসাময়িক বাংলা কবিতার ভুবনে তিনি নিজেকে কীভাবে দেখেছেন, সে সম্পর্কেও আমাদের সামান্য জ্ঞান দান করে :

আমার 'ক্যাম্পে' কবিতাটি সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা দরকার মনে করি। কবিতাটি যখন শেষ হয় তখন মনে হ'য়েছিল সহজ শব্দে—শাদা ভাষায় লিখেছি বটে, কিন্তু তবুও কবিতাটি হয়তো অনেকে বুঝবে না। বাস্তবিকই 'ক্যাম্পে' কবিতাটির মানে অনেকের কাছে এতই দুর্বোধ্য র'য়ে গেছে যে এ কবিতাটিকে তাঁরা নির্বিবাদে অশ্লীল ব'লে মনে করেছেন।

কিন্তু তবুও 'ক্যাম্পে' অশ্লীল নয়। যদি কোনো একমাত্র স্থির নিষ্কম্প সুর এ কবিতাটিতে থেকে থাকে তবে তা জীবনের—মানুষের-কীট-ফড়িঙের সবার জীবনেরই নিঃসহায়তার সুর। সৃষ্টির হাতে আমরা ঢের নিঃসহায়—'ক্যাম্পে' কবিতাটির ইঙ্গিত এই; এইমাত্র। কবিতাটির এই সুর শিকারী, শিকার, হিংসা এবং প্রলোভনে ভুলিয়ে যে হিংসা সফল—পৃথিবির এই সব ব্যবহারে বিরক্ত তত নয়,—বিষণ্ণ যতখানি; বিষণ্ণ—নিরাশ্রয়। 'ক্যাম্পে' কবিতায় কবির মনে হ'য়েছে তবু যে স্থূল হরিণ শিকারীই শুধু প্রলোভনে ভুলিয়ে হিংসার আড়ম্বর জাঁকাচ্ছে না, সৃষ্টিই যেন তেমন এক শিকারী, আমাদের সকলের জীবন নিয়েই যেন তার সকল শিকার চলেছে; প্রেম-প্রাণ-স্বপ্নের একটা ওলট পালট ধ্বংসের নিরবচ্ছিন্ন আয়োজন যেন সবদিকে : 'King Lear-এর As this to wanton toys are we to the gods, They kill us for their sport' এই আয়োজন।

বাংলা সাহিত্যে—অন্ততঃ কাব্যে এ সুর—'ক্যাম্পে' কবিতাটির এই পবিত্র কঠিন নিরাশ্রয়তার সুরঃ 'জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মত আমরা সবাই'—এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুর আগে এসেছে কিনা জানি না। অন্ততঃ এ সুরের সঙ্গে চলতি বাঙালী পাঠক ও লেখক যে খুব কম পরিচিত তা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। যে জিনিস অভ্যস্থ বুদ্ধি বিচার কল্পনাকে আঘাত করে—যা পরিচিত নয় তার অপরাধে ঢের। কিন্তু তবুও অশ্লীলতার দোষে 'ক্যাম্পে' কবিতাটি সবচেয়ে কম অপরাধী। ইংরেজী, জার্মান বা ফ্রেঞ্চ এ কবিতাটি অনুবাদ ক'রে যদি বিদেশী Literary circle-এ পাঠান হ'ত তাহ'লে এ কবিতাটির কিরকম সমালোচনা হ'ত ধারণা করতে পারা যায়; 'ক্যাম্পে' কবিতাটির যে সুরের কথা আমি ইতিপূর্বে বলেছি তাই নিয়ে বিশ্লেষণ চলত। দু একটি prurient মন ছাড়া এ কবিতাটির ভিতর থেকেই নিজেদের প্রয়োজনীয় খোরাক খুঁজে বার করবার অবাধ শক্তি যাদের রয়েছে; এই তাদের একমাত্র শক্তি এই prurience-র কাছে 'ক্যাম্পে' অশ্লীল—আকাশের নক্ষত্রও শ্লীল নয়। শেলীর 'Souls' sisters' পাশ্চাত্য কবি সমালোচক ও পাঠকদের গভীর আদরের expression—কিন্তু 'হৃদয়ের বোন' (এই expressionটির জন্য শেলীর কাছে আমি ঋণী)—এই শব্দ দুটি prurient অন্তঃকরণকে শুধু বুঝতে দেয় যে সে কত prurient—তার ভিতর অন্য কোনো চেতনা জাগায় না। Muteykeh [একটি ঘোটকী] সম্বন্ধে Browning বলছেন 'She was the child of his heart by day, the wife of his breast by night.' না জানি Browning সম্বন্ধে prurience কি বলত!

কিন্তু বাংলাদেশে সজ্‌নে গাছ ছাড়া আরো ঢের গাছ আছে—সুন্দরী গাছ বাংলার বিশাল সুন্দর-বন ছেয়ে রয়েছে যে সজনের কাছে তা অবিদিত থাকতে পারে—prurience-র কাছে প্রকৃত সমালোচকের অন্তরাত্মা যেমন চিরকালই অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত।[৪৩]

বাংলাদেশের সব কবিই এই ১৯৩২ সালে কলেজীয় কবিতা যুদ্ধের naivete-র ভিতর রয়ে যায় নি। কিন্তু হায়, যদি তেমন হ'য়ে থাকতে পারা যেত! সহজ সরল বোধ নিয়ে সুসাধ্য-সুগম পথে চিন্তালেশশূন্যতার অপরূপ উল্লাসে জীবন কত মজারই না হ'ত তাহ'লে।

...শ্রীজীবনানন্দ দাশ[৪৪]

৪

'ক্যাম্পে'র পর জীবনানন্দ আর কোনো কবিতা প্রকাশ করেননি। যত দিন পর্যন্ত না সমর সেনসহ বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় এ শতাব্দীর সর্বপ্রধান বাংলা কবিতা পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু হয়। বাংলা কবিতা ও কবিতার আলোচনায় একচেটিয়াভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল *কবিতা*—অথবা বুদ্ধদেব নিজে যেভাবে বলতেন, কবিদের জন্য নিবেদিত ছিল এটি :

> 'কবিতা' আরম্ভ হয়েছিলো কবিতার পত্রিকা-রূপে নয়, কবিদের পত্রিকা-রূপে। অর্থাৎ, প্রতি সংখ্যায় কিছু কবিতা—এমনকি, কিছু ভালো কবিতা ছাপা হবে, আমাদের লক্ষ্য ঠিক এই রকম ছিলো না; সমকালীন সৎকাব্যের সমগ্র ধারাটিকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা এর মধ্যে সংহত করতে চেয়েছিলাম। একটি সৌভাগ্যময় সমাপতন আমাদের সহায় ছিলো; তিরিশের বছরগুলিতে যে-সব কবিরা নতুন দৃষ্টি ও নতুন সুর নিয়ে এসেছিলেন, যাঁদের ক্রিয়াকলাপ, কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তাঁদের বাহন এবং প্রচারক-রূপে আমাদের যাত্রারম্ভ।[৪৫]

১৯৩৫ সালে ত্রৈমাসিক *কবিতা* বের হওয়ার পর জীবনানন্দ আবার কবিতা প্রকাশ করা শুরু করেন। প্রথম বছরেই তাঁর ১০টি কবিতা ছাপা হয়। সে বছর কেবল সহযোগী সম্পাদক সমর সেনের প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা তাঁর চেয়ে বেশি ছিল (১৬টি)। ১০টি কবিতা দিয়ে বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের রচনার সঙ্গে সমতা রক্ষা করেন। পরের বছর জীবনানন্দের কবিতার সংখ্যা (১৩টি) বাকি সবার কবিতাকে ছাড়িয়ে যায় এবং তৃতীয় বছরেও একই ঘটনা ঘটে। সে বছর তাঁর কবিতার সংখ্যা ছিল ১০। সে বছরই *কবিতার কথা* নামে তাঁর একটা প্রবন্ধ এবং বুদ্ধদেব বসুর একটি গ্রন্থের (*কঙ্কাবতী*) আলোচনা প্রকাশিত হয়। স্পষ্টতই জীবনানন্দ আবারও একটি সমঝদার সম্পাদকমণ্ডলী পেয়েছিলেন। *কবিতার* প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'মৃত্যুর আগে' :

মৃত্যুর আগে

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষসন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভ'রে গেছে; যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোন সাধ নাই তার ফসলের তরে;

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত-রাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার;
পুরানো পেঁচার ঘ্রাণ;—অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো!
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ,—মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা; অশথের ডালে-ডালে ডাকিয়াছে বক;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এইসব নিভৃত কুহক;

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে;
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে-ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারো মাস;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে;—পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে;

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে :
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে;

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নিচে লাল লাল ফল
প'ড়ে আছে; নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে;
যত নীল আকাশেরা রয়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তল;
পথে পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে;
আমরা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ;

আমরা বুঝেছি যারা বহু দিন মাস ঋতু শেষ হলে পর
পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা
ক'য়ে গেছে—আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো এক আলো আছে : দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা;
চোখের-দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির;
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর;

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ;—একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল—সোনা ছিল যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায়;—যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
কি বুঝিতে চাই আর?...রৌদ্র নিভে গেলে পাখি-পাখালীর ডাক
শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক![৪৬]

শেষ দুটো স্তবক ছাড়া কবিতাটি জীবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সহজ স্মৃতিচারণা। এটা একজন কবির দৃষ্টিভঙ্গিকে উপস্থাপন করে। আরও নিশ্চিতভাবে বললে সেই কবি যার রয়েছে 'অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা' (তাঁর 'কবিতার কথা' প্রবন্ধের বাক্যাংশ), যা তাঁকে দেখায় 'মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল/কুয়াশার...'। সে জন্য তিনি লেখেন 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে,...।'[৪৭] 'আমরা' যারা ভালোবেসেছি, দেখেছি ও বুঝেছি তারা কবি। কেবল একজন কবিই দেখে, 'মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে'। একজন কবিই কেবল বুঝতে পারে 'জীবনের এইসব নিভৃত কুহক'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবিতার এপ্রিল ১৯৩৮ সংখ্যা ছিল কবিতার আলোচনা ও তত্ত্ব নিয়ে একটা বিশেষ সংখ্যা। বুদ্ধদেব জীবনানন্দের কাছ থেকে একটা লেখা চেয়েছিলেন, তিনি 'কবিতার কথা' লেখাটা দিয়েছিলেন, যাতে জীবনানন্দ ব্যাখ্যা করেন, কী উপাদান বিশেষ কাউকে নগণ্য কবি হওয়ার বদলে কবি হতে সাহায্য করে :

> সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্য প্রাপ্ত হয়; নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।...কিন্তু যাঁরা বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে—পৃথিবীর কিংবা স্বকীয় দেশের বিগত ও বর্তমান কাব্যবেষ্টনীর ভিতর চমৎকার রূপে দীক্ষিত হয়ে নিয়ে, কবিতা রচনা করতে হবে তাঁদের এ দাবির সম্পূর্ণ মর্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারলাম না।[৪৮]...খণ্ড-বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়,—একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে-সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়, যার ভিতর সমাজশিক্ষা, লোকশিক্ষা, নানা রকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুর্যই পাঠকের চিত্তকে খোঁচা দেয় সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে বেশি করে; কিন্তু তবুও যাদের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী, পাঠকের মন কোনো আনন্দ পায় না, কিংবা নিম্নস্তরের তৃপ্তি বোধ করে শুধু, এবং বৃথাই কাব্যশরীরের আভা খুঁজে বেড়ায়।[৪৯]

জীবনানন্দ স্পষ্টতই গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন 'অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা'য়। সে বছরের শেষে ঢাকার এক তরুণ কবি, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর প্রথম কবিতার বই *স্বপ্ন-কামনার* ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ করে একখানা চিঠি লেখেন। জীবনানন্দের লেখা একমাত্র বইয়ের ভূমিকায় (বইটি ডিসেম্বর ১৯৩৮ সালে বের হয়) তিনি আবারও সত্যিকার কবিতা রচনায় কল্পনাকে একটা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেন :

> অল্প বয়সের লেখকদের কাছ থেকে আমরা প্রায়ই চিক্কণ কবিতা পেয়ে থাকি। কিন্তু এ কবিতাটি—কিরণশঙ্করের পক্ষে খুব আশ্বাসের কথা—কারণ এটা তার একটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক রচনা—কেবল মাত্র চতুর রচনা নয়। আবেগের আন্তরিকতা অনেকেই বোধ করেন; কিন্তু হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার যে স্বতন্ত্র সারবত্তা তাকে কাব্যে পরিণত করে, আমার মনে হয় এ কবিতাটির ভিতর সেসবের প্রায় সম্পূর্ণ সফলতা আমি ছাড়া আরো কেউ কেউ অনুভব করতে পারবেন।[৫০]

কথকের দৃষ্টিতে 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় জীবনের সহজাত সৌন্দর্য উৎসারিত হয় শরৎ শেষের কিংবা শীতের মাসগুলো থেকে, যখন দিনগুলোর অন্ধকার আলোর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চেয়ে দীর্ঘতর, যখন মাঠের ফসল কাটা শেষ। এই ঋতু কোনোভাবেই তাঁর রুগ্‌ণতাকে উপমিত করে না, বরং ঠিক তার বিপরীত। সে বরং অন্ধকার কুয়াশা এবং এ সময়ের নির্জনতাকে উপভোগ করে। এখানে আবার তাঁর প্রবন্ধ থেকে :

> কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুই রকম উৎসারণ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়। কিন্তু সাধারণত বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি তার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন তবুও কাব্যের ভিতর থাকে না: আমরা এক নতুন প্রদেশে প্রবেশ করেছি: পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায় কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে এক নতুন প্রদীপের কল্পনা করা যায়—তা হলে পৃথিবীর এই দিন, রাত্রি, মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধুলো, সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে যা কাব্য—অথচ জীবনের সঙ্গে যার গোপনীয় সুড়ঙ্গ-লালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ : সম্বন্ধের ধূসরতা ও নূতনতা।[৫১]

কবির দেহের 'ধূসরতা' তাহলে 'সম্বন্ধের ধূসরতা ও নূতনতা', এমন একটা সম্বন্ধ যা কবিতা ও জীবনের মধ্যে রয়েছে—সাদাও নয় কালোও নয়—বরং মাঝামাঝি কিছু, চকচকে উজ্জ্বল ও নতুনও নয়, তবুও এক রকম নতুন—নতুন তো বটেই, কিন্তু একই সঙ্গে নতুন ও পুরোনো দুটোই। কবির দৃষ্টিতে এটা নিশ্চিতভাবে কেবল প্রাকৃতিক ও বাস্তবের বিশ্লেষণক্ষম উপাদানের চেয়েও অধিক কিছু। তিনি আরও বৃহৎ সমষ্টিকে দেখেন যাকে মাঠ, ঘাট, পথ—সবকিছুর ধূসরতা ধারণ করে এক 'নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে যা কাব্য'। বিকেলের উজ্জ্বলতা কেবল মানুষের দর্শনেন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করে না। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে দৃষ্ট 'অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবন'-এর জগৎ কাউকে তৃপ্ত করতে পারে না। আমরা সবাই সেটাই দেখতে পাই, যার ভেতর 'বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে।' কিন্তু কবি আরও বেশি কিছু দেখতে পান। তাঁর পর্যবেক্ষণের একপর্যায়ে তাঁর 'চোখের—দেখার হাত' তাঁর ইন্দ্রিয়জাত প্রবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে 'পৃথিবীর সমস্ত জল' থেকে 'সমস্ত দীপ' থেকে অন্য ভুবনের দিকে চলে যেতে পারেন। সেখানে এই প্রাকৃতিক ভুবন ছাপিয়ে মুহূর্তের অভিজ্ঞতা হয়ে যায় নিরন্তর। রূপকথার চরিত্র কঙ্কাবতী যদি তাঁর কাব্যদেবী না-ও হন—আমি আসলে বিশ্বাস করি তিনি তা-ই, তবুও অকৃত্রিম কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টি চিহ্নিত করেন। তিনি যদিও 'পৃথিবীর...কন্যা' এবং সময়ে ও পৃথিবীতে বাস করতে বাধ্য, তবুও কালাতীত ও মৃত্তিকাতীত।[৫২]

মৃত্যুর আগে আমরা কবিরা যদি জীবন ও কবিতার মধ্যে এই গোপন অন্তঃসলিলা সম্পর্ক দেখতে পেতাম, যদি সত্যিই আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম,

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাহলে আর বোঝার কী থাকে? সেই উপলব্ধি নিজের ভেতরেই শেষ হয়। সেই সম্পর্কের আর প্রয়োজন হয় না 'মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষার'। এর কোনো প্রয়োজন নেই গতানুগতিক পৃথিবীর। আর তাই মৃত্যু হয়ে ওঠে গ্রহণযোগ্য। 'মৃত্যুর আগে'র সপ্তম স্তবকে কথক কাব্যিক উপলব্ধির কথা বলছেন। অষ্টম স্তবকে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। কারণ, তিনি পৃথিবীকে দেখেছেন কবির দৃষ্টি দিয়ে। এখানে আগের বহু লেখার মতো আমরা দেখতে পাই, মৃত্যুর সঙ্গে জীবনানন্দের একটা সমঝোতায় আসার সংগ্রামের পাশাপাশি সুন্দর প্রকৃতিকে।

সম্পাদকেরা নিয়মিত পত্রিকার কপি পাঠাতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। কবিরাও প্রায়ই আলাদা করে তাঁদের লেখা পাঠাতেন তাঁর মন্তব্যের জন্য (জীবনানন্দও ঠিক তা-ই করেছিলেন, একবার তাঁর কবিতার বই বের হওয়ার আগে, আরেকবার *ঝরা পালক* ছাপা হওয়ার পর)[৫৩]। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যেকোনো মন্তব্য ছিল খুব বড় মাপের পুরস্কার, এমনকি প্রথাভাঙা কবিদের কাছেও। কারণ ১৯৪১ সালে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি শিক্ষিত বাঙালিদের গুরু হিসেবে গ্রহণীয় ছিলেন। আর সেভাবেই তখনকার দিনের রীতি মোতাবেক *কবিতার* একটা কপি রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিল। আর তিনি বুদ্ধদেব বসুর কাছে জবাব দিয়েছিলেন, যেখানে 'মৃত্যুর আগে' প্রসঙ্গে তিনি লেখেন 'জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।'[৫৪] কবিতাটি অবশ্যই চিত্রময়, বিশেষ করে প্রথম ছয় স্তবক।

৫

কবিতার দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হয় ১৯৩৬-এর অক্টোবরে (বইটি প্রকাশিত হয় ডিসেম্বরে) জীবনানন্দের দ্বিতীয় গ্রন্থ *ধূসর পাণ্ডুলিপির* একটা পূর্ণপৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে, পত্রিকাটির পরবর্তী সংখ্যাগুলোতেও নতুন গ্রন্থের আগমনের ঘোষণা অব্যাহত থাকে।

> আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের সূচনায় 'কল্লোল' এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত সব কবিতা, যেগুলো যথেষ্ট প্রশংসা এবং নিন্দার উদ্রেক করেছিল, এই গ্রন্থে একত্রিত করা আছে। তার ওপর আরো রয়েছে তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক কবিতাগুলো, 'ক্যাম্পে', 'শকুন' এবং 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'মৃত্যুর আগে'। সর্বতোভাবে, সবচেয়ে জাগ্রত এবং পরিণতিশীল এই কবির ক্রমবিকাশের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা পাওয়া যাবে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে।[৫৫]

জীবনানন্দ বরিশালে আচ্ছন্নচিত্ত হয়ে ছিলেন। তাঁর রচনাগুলো প্রকাশের দায়িত্ব বর্তায় বুদ্ধদেবের ওপর, যিনি কয়েক বছর আগে ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় থিতু হয়েছেন। *ধূসর পাণ্ডুলিপির* প্রচ্ছদে প্রকাশক হিসেবে কলকাতার প্রকাশক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুস্তকবিক্রেতা ডি এম লাইব্রেরির নাম ছাপা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে জীবনানন্দই ছিলেন প্রকাশক, যেমন ছিলেন তাঁর প্রথম গ্রন্থে এবং পরেরটার বেলায়ও। প্রকাশক বলতে তিনি শুধু অর্থের জোগান দিয়েছিলেন। প্রেসের জন্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা, প্রুফ সংশোধন করা, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা (অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকৃত, যিনি *প্রগতি* ও *কবিতা* দুটোরই প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন)—সব ব্যবস্থা বুদ্ধদেবকেই করতে হয়েছিল। জীবনানন্দ *ধূসর পাণ্ডুলিপি* উৎসর্গ করেন বুদ্ধদেবকে, যিনি বাঙালি পাঠকের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করানোর জন্য এত কিছু করেছেন ও করছিলেন।

বিজ্ঞাপনে যেমনটি বলা হয়েছিল, গ্রন্থটির ১৭টি কবিতার মধ্যে বেশির ভাগই ১৯৩০ সালের আগে ছাপা হয়েছিল—*প্রগতি*তে ১১টি, *ধূপছায়া* নামের পত্রিকায় দুটো, আরেকটা *কল্লোল*-এ। ভূমিকায় জীবনানন্দ লিখেছিলেন, ১৭টি কবিতাই তিনি লিখেছিলেন ১৯২৫ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে :

> আজ ন'বছর পরে আমার দ্বিতীয় কবিতার বই বার হ'ল। এর নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এর পরিচয় দিচ্ছে। এই বইয়ের সব কবিতাই ১৩৩২ থেকে ১৩৩৬ সালের মধ্যে রচিত হয়েছে।...আজ যেসব মাসিকপত্রিকা আর নেই—প্রগতি, ধূপছায়া, কল্লোল—এই বইয়ের প্রায় সমস্ত কবিতাই সেই সব মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল একদিন। সেই সময়কার অনেক অপ্রকাশিত কবিতাও আমার কাছে রয়েছে—যদিও ধূসর পাণ্ডুলিপির অনেক কবিতার চেয়েই তাদের দাবি একটুও কম নয়—তবুও সম্প্রতি আমার কাছে তারা ধূসরতর হ'য়ে বেঁচে রইল। আশ্বিন ১৩৪৩।[৫৬]

সেই সব অপ্রকাশিত কবিতা থেকে তিনি 'শকুন' নামের একটি কবিতা *ধূসর পাণ্ডুলিপির* প্রথম সংস্করণের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। কবিতাটি পেত্রার্কীয় সনেটের স্তবকরীতিতে ছিল না, ছিল দান্তের ত্রিচরণবিশিষ্ট চার স্তবকের পর দুই পঙ্ক্তির সমাপ্তি স্তবকের *কখক খগখ গঘগ ঘঙঘ ঙঙ* মিলবিন্যাসে রচিত সনেট। বাংলা কবিতায় এটি ছিল অভিনব। অবশ্য প্রমথ চৌধুরী তিন পঙ্ক্তির স্তবকসংবলিত কবিতা আগে লিখেছেন, তবে সনেট নয়।[৫৭] পাঁচ পঙ্ক্তিবিশিষ্ট সনেটের মতো স্তবকে রচিত পার্সি বি সি শেলির 'ওড টু দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' নিশ্চয়ই ইংরেজির অধ্যাপক জীবনানন্দের কাছে সুপরিচিত ছিল। পৌষ-মাঘ ১৩৩৮ (১৯৩১-৩২) তারিখ-সংবলিত 'শকুন' কবিতার একটা খসড়া পাওয়া যায় তাঁর খাতায়। এই খাতায় আরও কিছু পেত্রার্কীয় সনেট ছিল, যেগুলো তাঁর জীবদ্দশায় কখনো প্রকাশিত হয়নি।

শকুন

মাঠ থেকে মাঠেমাঠে—সমস্ত দুপুর ভ'রে এশিয়ার আকাশেআকাশে
শকুনেরা চরিতেছে; মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি,—নিস্তব্ধ প্রান্তর
শকুনের; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আরেক আকাশ যেন,—সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর
কঠিন মেঘের থেকে;—যেন দূর আলো ছেড়ে ধূম্র ক্লান্ত দিক্‌হস্তিগণ
প'ড়ে গেছে;—প'ড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার ক্ষেত মাঠ প্রান্তরের 'পর

এইসব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু;—আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম্‌ গাছে—পাহাড়ের শিঙে শিঙে সমুদ্রের পারে;
একবার পৃথিবীর শোভা দেখে,—বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন

বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দেখে তাই;—একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
উড়ে যায়;—কোন্‌ এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন্‌ মৃত্যুর ওপারে;

যেন কোন্‌ বৈতরণী অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ন লেগুন
কেঁদে ওঠে...চেয়ে দেখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেইসব হুন।[৫৮]

গ্রিক পুরাণের স্টিক্স নদীর মতো বৈতরণী হচ্ছে সেই নদী, হিন্দু পুরাণমতে সব মৃত আত্মাকে যা পার হতে হয়। এখানে হুনদের গূঢ়ার্থ সেই সব নারী-হরণকারী যাযাবর নয়, যদিও শকুনেরা হরণ করে গলিত শব, 'নিস্তব্ধ প্রান্তর' পছন্দ করা পুরো এশিয়া চষে ফেলা পরিব্রাজক এই হুনরা, সমাজের অপরিচিত আগন্তুক। বৈতরণী অথবা কোনো হ্রদ—যার চারপাশে এসব অস্বাস্থ্যকর পাখি সমবেত হয়—সেই হ্রদ মৃতের রাজ্য থেকে এই পৃথিবীর জীবনকে আলাদা করে ফেলে। শকুনেরা বিচরণ করে উভয় বিশ্বে, এই পৃথিবী ও 'মৃত্যুর ওপারে', অথচ মানুষ ও পৃথিবীর পাখিরা সেটা পারে না। 'বৈতরণী' নামে এই সময়ের একটা কবিতার প্রথম স্তবকে আমরা দেখি :

কি যেন কখন আমি মৃত্যুর কবর থেকে উঠে আসিলাম
আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী
শকুনের মতো কালো ডানা মেলে পৃথিবীর দিকে উড়িলাম
সাত-দিন সাত-রাত উড়ে গেলে সেই আলো পাওয়া যায় যদি
পৃথিবীর আলো প্রেম?
আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী।[৫৯]

এই কবিতার অন্য জায়গায় জীবনানন্দ শকুনের সঙ্গে কথা বলেন, আবার দেখেন তার বাসা, পুনরায় মূর্ত হওয়ার কথা ভাবেন, শেষ পর্যন্ত এক ক্লান্ত শকুন হয়ে বাস্তবের অন্য তীরে ফিরে যান। 'শকুন' কবিতায় তিনি জীবনের এপার থেকে দেখেন কেবল।

*ধূসর পাণ্ডুলিপি*র দ্বিতীয় ও পরের সব সংস্করণে কবির ভাই আরও ১৫টি কবিতা যুক্ত করেন, 'বৈতরণী' তারই একটা। অশোকানন্দ ব্যাখ্যা করেন :

সেই সব 'ধূসরতর' কবিতা সন্ধান করতে গিয়ে দেখছি, তাদের অনেকগুলি আজ আর বেঁচে নেই; কীটদষ্ট হয়ে উদ্ধারের অতীত হয়েছে। মাত্র দুখানি খাতা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে। সেই খাতা দুটি থেকে মোট পনেরোটি কবিতা এ-সংস্করণে সংযোজিত হল। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সুর ও সাময়িকতা যে-সব কবিতায় মোটামুটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> প্রখর, সেই সব কবিতাই অগ্রাধিকার পেল। কোনো-কোনো কবিতাতে অবিশ্যি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরেকার কাব্যপর্যায়ের চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যের আভাস চোখে পড়তে পারে। হয়তো এ-সব কবিতা বিবর্তনশীল কাব্যপ্রবাহের একটা অন্তর্বর্তীকালীন সন্ধিপর্বের চিহ্নযুক্ত। এই ক্রমবিবর্তন-শীলতার উপর নির্ভর না-করে কবিতার বিন্যাসসাধনের বিষয়ে মোটামুটিভাবে রচনার কালক্রম অনুসরণ করা হয়েছে।[৬০]

১৫টি অতিরিক্ত কবিতার মধ্যে নয়টি হচ্ছে তিন পঙ্‌ক্তির স্তবকযুক্ত সনেট, যার মধ্যে একটা 'নদীরা', যেটা *কবিতার* সেই সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর ১৯৩৬) ছাপা হয়, যাতে *ধূসর পাণ্ডুলিপির* বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল।

নদীরা

বঁইচির ঝোপ শুধু—শাঁইবাবলার ঝাড়—আর জাম হিজলের বন,—
কোথাও অর্জুন গাছ—তাহার সমস্ত ছায়া—এদের নিকটে টেনে নিয়ে
কোন্ কথা সারাদিন কহিতেছে অই নদী? এ নদী কে?—ইহার জীবন

হৃদয়ে চমক আনে; যেখানে মানুষ নাই—নদী শুধু—সেইখানে গিয়ে
শব্দ শুনি তাই আমি;—আমি শুনি—দুপুরের জলপিপি শুনেছে এমন
এই শব্দ কত দিন;—আমিও শুনেছি ঢের বটের পাতার পথ দিয়ে

হেঁটে যেতে ব্যথা পেয়ে : দুপুরে জলের গন্ধে একবার স্তব্ধ হয় মন;
মনে হয় কোন্ শিশু মরে গেছে—আমারি হৃদয় যেন ছিল শিশু সেই;
আলো আর আকাশের থেকে নদী যতখানি আশা করে—আমিও তেমন

একদিন করিনি কি? শুধু একদিন তবু? কারা এসে ব'লে গেল : 'নেই
গাছ নেই—রোদ নেই—মেঘ নেই—তারা নেই—আকাশ তোমার তরে নয়!'
হাজার বছর ধ'রে নদী তবু পায় কেন এইসব? শিশুর প্রাণেই

নদী কেন বেঁচে থাকে?—একদিন এই নদী—শব্দ ক'রে হৃদয়ে বিস্ময়
আনিতে পারে না আর;—মানুষের মন থেকে নদীরা হারায়—শেষ হয়![৬১]

প্রকৃতি ও আমাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম যোগ আমরা গড়ে তুলি, সেই শিশুর কল্পনা আমাদের বেড়ে ওঠা ও প্রাকৃতিক বিশ্ব থেকে দূরে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিকে হয়ে আসে। একসময় বড়রা আমাদের জানান, আকাশ কেবলই আকাশ, শুধু আমাদের নিজস্ব কিছু নয়। *রূপসী বাংলার* ঘনিষ্ঠ উপাদান, আনন্দদায়ী প্রকৃতি 'নদী'তেও প্রতিধ্বনিত, কিন্তু এখানে কথক প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের জন্য অনুতাপ করার সময় বয়স্ক মানুষের ভূমিকা গ্রহণ করেন। *রূপসী বাংলায়* বেড়ে ওঠা শিশু সেই নিষ্পাপ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে পুনর্জাগ্রত করার চেষ্টা করে। তখনকার সবচেয়ে আধুনিক মনোভাব, বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ করা এটিই সেই কবিতা, যেটা জীবনানন্দ ১৯৩৬ সালে প্রকাশ করার জন্য মনোনীত করেছিলেন। *রূপসী বাংলার* উচ্ছ্বাসপ্রবণ শিশুসুলভ আবেগকে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ থেকে বিরত ছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯২০-এর শেষ ও ১৯৩০ দশকের প্রথম দিকে জীবনানন্দ প্রথাগত কাব্যিক কাঠামো সনেটের স্পেন্সরীয় স্তবকবিন্যাস নিয়ে *ধূসর পাণ্ডুলিপির* কয়েকটা কবিতায় নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। বাঙালি ছন্দপ্রতিভা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জীবনানন্দের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, যা তাঁর প্রথম গ্রন্থ *ঝরা পালক*-এ স্পষ্ট। পরবর্তী সময়ে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রকাশ করতেন 'তাঁর কবিতার বক্তব্যের তুচ্ছতা' এবং 'সূক্ষ্মতার চেয়ে অনুনাদী, সত্যিকার সমালোচনামূলক অথবা গুরুত্বের চেয়ে বেশি চাতুর্যের' জন্য।[৬২] *ধূসর পাণ্ডুলিপি*তে ও ১৯৩০-এর দশকের প্রথম দিকে জীবনানন্দ কাব্যিক আঙ্গিক ও প্রকাশের পদ্ধতির ওপর মনঃসংযোগ করেন। *ধূসর পাণ্ডুলিপির* আলোচনায় বুদ্ধদেব বসু অবশ্য বৃহত্তর আনুষ্ঠানিক কাঠামোর তেমন কোনো উল্লেখ করেননি। তবে কিছুটা ছন্দ—এসবের ওপর অবস্থান করেছেন, যা 'ছন্দকে ইচ্ছেমতো বাঁকিয়ে-চুরিয়ে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি নিয়ে গেছেন...এ-ছন্দ মন্থর, যেন ইচ্ছে ক'রে ভাঙা-ভাঙা, অসমান ও পালিশ-না-করা...।'[৬৩] ১৯৩০-এর দশকের শেষার্ধে এসে একটা আলোচনায় কবিতার ছন্দের ওপর জোর দেওয়া হবে কেন, তার একটা যথার্থ কারণ আছে: ১৯২০-এর দশকের মধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত রচনাশৈলী বা শব্দপ্রয়োগ, লিঙ্গ কিংবা যৌনতা ও বিদেশি প্রভাব যে রকম ছিল (আলোচনার বিষয়বস্তু), এখন ছন্দ হয়েছে তা-ই। ছন্দ তখন আধুনিক কবিদের প্রাচীন কবিদের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলেছে।

বুদ্ধদেব আরও বলেন, *ধূসর পাণ্ডুলিপি*তে জীবনানন্দ নিজেকে প্রকৃতির কবি হিসেবে প্রমাণ করেছেন।

> এক হিশেবে সকল কবিই প্রকৃতির কবি, এ-কথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু সকল কবিকেই ঐ আখ্যা দেয়া যায় না; কারণ সকলের পক্ষেই প্রকৃতি একমাত্র কিংবা প্রধান বিষয় নয়। অনেক কবির পক্ষে প্রকৃতি মানবজীবনের নানা অভিজ্ঞতার পটভূমিকা; অনেকের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিলাস, আবার কারো-কারো পক্ষে আমাদের মনের অবস্থার প্রতিরূপমাত্র। প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব না করেন এমন কোনো কবি নেই; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবির সংখ্যা অল্প। তাঁরাই বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি।[৬৪]

বুদ্ধদেবের মতে, কেবল একজন বাঙালি কবিকে সত্যিকার প্রকৃতির কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়, তিনি জীবনানন্দ দাশ। বুদ্ধদেব যুক্তি দেখান, এমনকি যেসব কবিতাকে প্রেমের কবিতা বলে মনে হয়, সেসব কবিতাও মূলত প্রকৃতির কবিতা। কারণ 'এ-সমস্ত কবিতায় প্রেমের পাত্রী অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিই অনেক বড়ো ও জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে কবির কল্পনায়।'[৬৫] প্রভাবের কথা বলতে গেলে, কিটস ছিলেন, প্রাক-রাফায়েল গোষ্ঠীর কবিরা ছিলেন এবং তাঁর কবিতা তরুণ ইয়েটসের কথাও মনে করিয়ে দেয়। এসব কিছু বলার পর বুদ্ধদেব তাঁর চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আবারও বলেন, জীবনানন্দের সৃষ্টিশীলতা ও তাঁর কল্পনাশক্তি একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধদেব বলেন, এই কবিতায় সুদূরতা আর নির্জনতা পরিব্যাপ্ত। সেখানে রয়েছে আমাদের নিজেদের পৃথিবীর বাইরের ভুবনের রূপকথার গল্প, অদ্ভুত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্র :

> জীবনানন্দর কাব্যে দেখা যায় যে চিত্ররচনার অজস্রতা, তার বিশেষত্বও উল্লেখযোগ্য। যত উপমায়, যত ইঙ্গিতে তিনি কল্পনাকে প্রকাশ করেন সেগুলি ভাবাত্মক নয়, রূপাত্মক; চিন্তাপ্রসূত নয়, অনুভূতিপ্রসূত। আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সবচেয়ে কম 'আধ্যাত্মিক', সবচেয়ে বেশি 'শারীরিক'; তাঁর রচনা সবচেয়ে কম বুদ্ধিগত, সবচেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়নির্ভর।[৬৬]

বুদ্ধদেব জানান, শব্দচিত্রকর হিসেবে জীবনানন্দের রয়েছে অনন্যসাধারণ দক্ষতা। 'তার উপর ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শেরও বটে, বিশেষভাবে গন্ধের ও স্পর্শের।' তিনি উপসংহারে মূল্যায়িত করেন, '...জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি ব'লে মনে করি, এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তাঁর প্রথম পরিণত গ্রন্থ।'[৬৭]

বুদ্ধদেব মন্তব্য করেন, সেদিন (মার্চ ১৯৩৭) পর্যন্ত আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনায় জীবনানন্দের কথা যথেষ্ট উল্লেখ করা হয়নি। তিনি নিজে *প্রগতির* দুই সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর ১৯২৮ ও আগস্ট ১৯২৯) দুটি প্রবন্ধে জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। সজনীকান্ত অবশ্য *শনিবারের চিঠিতে* জীবনানন্দের কয়েকটা কবিতা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিলেন। তারপর ১৯৩৭-এর এপ্রিলে সেই *পরিচয়*-এ তাঁর *ধূসর পাণ্ডুলিপির* সমালোচনা ছাপা হয়, যে পত্রিকা অনিচ্ছার সঙ্গে তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতাটা ছেপেছিল। বুদ্ধদেবের মতো উৎসাহী না হলেও এই সমালোচক জীবনানন্দের কবিতার অনুকূলে লিখেছিলেন। যদিও *ধূসর পাণ্ডুলিপির* '...সমগ্র কবিতা মাঝে মাঝে নিষ্প্রভ ও অস্পষ্ট মনে হয়'; অন্তত বইটির কতগুলো কবিতা, তার মধ্যে 'ক্যাম্পে' 'জীবনানন্দের জন্যে আধুনিক কবিদের প্রথম শ্রেণীতে স্থান নির্দ্দেশ করবে'। আলোচক রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে জীবনানন্দের কাব্যিক দূরত্ব প্রমাণ করেছেন : মোহিতলাল মজুমদার বয়োজ্যেষ্ঠ কবিদের দ্বারা মোহাবিষ্ট, বিষ্ণু দের কবিতা সেই প্রভাব থেকে প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত, আর জীবনানন্দ তার মাঝামাঝি কোথাও[৬৮] (পছন্দ হোক বা না হোক, ১৯২০-এর ও ১৯৩০-এর দশকের কবি ও সমালোচকদের সর্বত্র বিরাজমান রাবীন্দ্রিক মানের সঙ্গে চলতে হয়েছে)।

১৯৩০-এর দশকের শেষার্ধে সবকিছুই জীবনানন্দের দিকে চোখ তুলে তাকায়। তিনি একটা চাকরি লাভ করেন। এবার *কবিতা* পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপানোর মতো অবস্থায় বুদ্ধদেবের মতো একজন খুব সহানুভূতিশীল সম্পাদক পান আবার। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এ সময়। আর কিছু লোক—সংখ্যায় যদিও খুবই অল্প—তাঁর রচনার প্রতি কিছুটা সম্মান প্রদর্শন করতে শুরু করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৬

কবিতা পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার সৌজন্য সংখ্যা পাওয়ার পর জীবনানন্দ বুদ্ধদেবকে লিখেছিলেন :

Sarbananda Bhavan
Barisal
23.12.35

প্রিয়বরেষু,

পৌষমাসের 'কবিতা' পেয়ে খুব খুশি হ'লাম। Test examination-এর কাগজ দেখতে বড্ড ব্যস্ত ছিলাম; চিঠি লিখতে একটু দেরী হ'য়ে গেল।

এবারকার 'কবিতায়' রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি, আপনার 'কোকিল, ওগো কোকিল' ও সমর সেনের কবিতা আমার খুব ভালো লেগেছে। কোকিলকে আশ্রয় ক'রে আপনি একটি অপূর্ব্ব কবিতা লিখেছেন, বাংলাদেশে বা বিদেশে এ সম্বন্ধে যত কবিতা লেখা হ'য়েছে সেসবের মধ্যে আপনার এই কবিতাটি যেমন অনন্যসাধারণ—তেম্নি চমৎকার;—আমি অনেকবার পড়েছি,—প্রত্যেকবারই নতুন ও refreshing মনে হয়, এবং হৃদয়কে lament করতে থাকে। 'দয়াময়ী' কবিতাটি Browning-এর Dramatic lyricsগুলোকে মনে করিয়ে দেয়—তেমনি জোরালো ও সরস—কিন্তু ভঙ্গি ও রস আপনার সম্পূর্ণ নিজস্ব।

বুড়োবয়সের রচনা অনেক ক্ষেত্রেই dotage হ'য়ে দাঁড়ায়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনার যৌবন চিরকাল কিরকম অগাধ স্রোতে চলেছে দেখলে মুগ্ধ ও আবিষ্ট হ'য়ে থাকতে হয়;—তাঁর 'ছুটি' কবিতার opening lineগুলো বিশেষভাবে মনকে মোহাবিষ্ট ক'রে তোলে;—আগাগোড়া সমস্ত কবিতাটি Superb।

'কবিতা'র এই দুই সংখ্যায়ই দেখলাম সমর সেনের achievement খুব ভালো হ'চ্ছে; সমরবাবুর 'continuously poetical quality of mind' আছে। এ জিনিষ তাঁকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে আশা করি।

আপনার 'আধুনিকতার মোহ' ও অন্যান্য মন্তব্য পড়লাম। এই propaganda ও snobberyর দিনে এমন নিরপেক্ষ স্থিরমস্তিষ্ক ও অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল সমালোচনার যে কত মূল্য ও কত প্রয়োজন দেশের নানারকম পত্র ও পত্রিকার দিকে তাকালেই তা প্রগাঢ়ভাবে বোধ করি।

'কবিতা' পত্রিকাটির প্রচলন কি রকম হচ্ছে? এক এক সংখ্যায় ক'শো কাগজ ছাপানো হয়? Christmas এর ছুটিতে কলকাতায়ই থাকবেন?

'কবিতা'র পরবর্তী সংখ্যার জন্য কয়েকটি কবিতা পাঠাব।

আশা করি ভালো আছেন।

শ্রী জীবনানন্দ দাশ।[৬৯]

ডিসেম্বর ১৯৩৫ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর চারটি কবিতার একটি *বনলতা সেন*, যেটা পরিণত হয় তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতায়। বেশ কজনের হাতে এটার শিল্পসম্মত ইংরেজি তর্জমা হয়েছে। মূলত জীবনানন্দ নিজেই এটা অনুবাদ করেছিলেন; তুলনার জন্য আমার নিজের অনুবাদটা করি তারপর (যদিও দুটো অনুবাদ লক্ষণীয়ভাবে ভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছিল, দুটোই করা হয় একই মূল কবিতা থেকে—জীবনানন্দ তাঁর কাব্যিক স্বাধীনতা প্রয়োগ করেছিলেন)।

বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।[৭০]

সিংহল (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) ও মালয়ের* পরিচিতি নিষ্প্রয়োজন। বিম্বিসার ও অশোক একদা প্রাচীন ভারতের শাসক ছিলেন। বিদর্ভ ও বিদিশা শ্রাবস্তীর মতোই নগর, যেখানকার কারিগরদের ছিল চমৎকার দক্ষতা। এদিকে নাটোর বাংলাদেশের একটা সাধারণ ছোট মফস্বল শহর। আর বনলতা সেন শুধুই একজন রমণীর নাম। এই নারীর প্রকৃত পরিচয় অনুমান করা সাহিত্যরসিকদের একটা প্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যা হোক, সবার জানামতে, বনলতা সেন কোনো বাস্তব চরিত্র নয়। এর গুরুত্ব নিহিত নামটির সাধারণত্বে, সেন বলতে বৈদ্য গোত্র বোঝায়, যেটি জীবনানন্দ দাশেরও নিজের গোত্র। অন্য বাংলা নামের মতো বনলতারও রয়েছে একটা আক্ষরিক অর্থ। নামটির অর্থ বনের লতা, যা রূপসী বাংলার নৈসর্গিক পরিবেশের প্রতি জীবনানন্দের প্রবণতার কারণে তাঁকে প্রলুব্ধ করতেও পারে।

* বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশের বেশ কয়েক বছর পর লেখক উপলব্ধি করতে পারেন যে 'মালয়' বলতে মালয় উপদ্বীপ বোঝায় না, এটি ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল, যা মালাবার উপকূল হিসেবে পরিচিত। দ্রষ্টব্য, ক্লিন্টন বি সিলি, 'শিফটিং সিজ অ্যান্ড "বনলতা সেন"'—*বরিশাল অ্যান্ড বিয়ন্ড: এসেজ অন বাংলা লিটারেচার* (ক্রনিকল বুকস, নয়া দিল্লি, ২০০৮)।—অনুবাদক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানুষের সব সৃষ্টির মতো নামকরণেরও একটা বিশেষ রীতি থাকে। কোনো নারীর নামের দ্বিতীয়াংশের লতা জীবনানন্দের পিতৃমাতৃ-প্রজন্মের কাছে প্রিয় ছিল বলে মনে হয়। তাঁর এক মাসির নাম ছিল স্নেহলতা, যেটি ছিল সম্ভবত প্রথম বাঙালি মহিলা ঔপন্যাসিক কুসুমকুমারী রায়চৌধুরীর প্রথম উপন্যাসের শিরোনাম। *স্নেহলতার* প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ (১৮৮৯-৯০ খ্রি.) বঙ্গাব্দে। এই লেখিকা নায়িকাদের নামে নামকরণ করে আরও দুটো বই লেখেন *প্রেমলতা* ও *শান্তিলতা* নামে। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস *স্বর্ণলতা* (১৮৭৩) উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কলকাতার পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প *নষ্টনীড়*-এ বৌদির ভূমিকায় মূল চরিত্রের নাম ছিল চারুলতা। অতএব বনলতা নামটা সাধারণত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি পূর্ব প্রজন্মের চেতনা বহন করে, যে প্রজন্ম নিরাপত্তা ও লালন-পালনকারী পিতা-মাতাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

জীবনানন্দ তাঁর সবচেয়ে নিশ্ছিদ্রভাবে রচিত কবিতাগুলোর একটি উপস্থাপন করেছিলেন 'বনলতা সেন'-এ। বাংলা ছন্দের প্রাচীনতম ও সবচেয়ে সাধারণ পয়ারের ওপরই নির্ভর করেছেন তিনি। এই কবিতায় ২২ মাত্রার (৮-৮-৬) তিনজোড়া সমিল চরণের অন্ত্যমিলের বিন্যাস *কখকখগগ, রূপসী বাংলায়* যা বহুল ব্যবহৃত। শেষ দুই স্তবক অবশ্য বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের। প্রত্যেকটা স্তবক পাঠকের মনোযোগকে বিশাল থেকে ক্ষুদ্রতে সংকীর্ণ করে আনে। একইভাবে তিনটি স্তবকই তুলনামূলকভাবে বড় থেকে ছোটর দিকে চালিত মনে হয়। প্রথম স্তবকে বিশ্ব থেকে সমুদ্র, রাজ্য, নগর হয়ে আমরা যাই মূল লক্ষ্যবিন্দু এক রমণীর কাছে। দ্বিতীয় স্তবকে আবার রাজ্য থেকে এক ব্যস্ত বাণিজ্যিক নগর, এক দ্বীপ হয়ে আমরা আবার সেই রমণীর কাছে পৌঁছাই। তৃতীয় স্তবকে আমরা আরও একবার একটা সম্পূর্ণ দিন থেকে সন্ধ্যার প্রারম্ভ, তারপর সেই দিনের শেষ এবং তার সব আয়োজন হয়ে বিশ্রাম নিতে পৌঁছাই সেই রমণীর কাছে। প্রথম স্তবক বিস্তৃত প্রাচীন রাজ্যের ভুবনে। দ্বিতীয় স্তবক সেই রমণীর ওপর আলো ফেলতে শুরু করে, তবে তাকে বিস্তৃত পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত করে—তার চুলকে বিদিশা, মুখমণ্ডলকে শ্রাবস্তীর সঙ্গে : বিশাল থেকে ক্ষুদ্রত্বে পৌঁছানোর সংশ্লেষণ। তৃতীয় স্তবক কেন্দ্রীভূত হয় ক্ষুদ্রের ওপর : চিল, জোনাকি ও সবশেষে আবারও একজন। শুধু স্থানিক নয়, কালিকভাবেও পুরো কবিতাসহ স্তবকগুলো রাজত্বগুলোকে মুহূর্ত হিসেবে উপস্থাপন করে এগিয়ে নিয়ে যায় মুহূর্তের শান্তিকে অনন্তের দিকে।

ঐতিহাসিক কাল ও স্থানকে নিপুণ ব্যবহারের এই অদ্ভুত জীবনানন্দীয় বৈশিষ্ট্য সাহিত্য-সমালোচকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। 'বনলতা সেন' সম্পর্কে দীপ্তি ত্রিপাঠী লেখেন :

> ইতিহাসচেতনার কবিতাগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'বনলতা সেন'। Timeless এবং temporal-এর এমন সমন্বয় বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে হয়নি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> বর্তমান যুগে প্রেমের অচরিতার্থ রূপ দেখে কবি ব্যথিত, সৌন্দর্যহীনতায় পীড়িত। তাই তিনি প্রেমের ও সৌন্দর্যের প্রকৃত স্বরূপকে খুঁজেছেন ভূগোল ও ইতিহাসের বৃহত্তর পটে। দেশকালে সীমাবদ্ধ নাটোরের বনলতা সেনের পশ্চাতে রয়েছে ভূগোলের বিস্তৃতি ও ইতিহাসের বেধ (depth)। এই দুই আয়তনের যোগে একটি ক্ষুদ্র লিরিক কবিতা মহাকাব্যের ব্যাপ্তি পেয়েছে।[৭১]

ধূসর পাণ্ডুলিপি ও *রূপসী বাংলার* 'তুমি' এ কবিতায় একটা যথাযথ নাম খুঁজে পায় : বনলতা সেন, এক স্বস্তিদায়িনী নারী—যে মানবসংসারের আর সবার চেয়ে আলাদা। সে অন্তত এই কবিতায় কবিকে উপলব্ধি করতে পারে। পক্ষান্তরে কবিও বিম্বিসারের যুগ থেকে অদ্যাবধি সদ্য ক্লান্তিকর মানবসমাজকে যে রকম পরিহার করে এসেছেন, তাকে সেভাবে পরিহার করেননি। ঐতিহাসিক মাত্রা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের আবেগকে আরও জোরালো করে তোলে। তাঁর কুশীলবেরা যে মঞ্চে পদচারণ করে, সেটাকে তিনি ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারের মাধ্যমে আরও বিস্তৃত করেন, আর এভাবে ঘটনাস্থলকে প্রসারিত করে তিনি তাঁর বক্তব্যকে দান করেন গতি। মানববিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁকে অর্থাৎ, কবিতার 'আমি'কে যথেষ্ট আঘাত দিয়েছে। সেই মানববিশ্ব দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দক্ষিণ এশিয়া ও ঐতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত বলে যে আঘাত তিনি অনুভব করেন, সেটা আরও বিপুল।

কবি সরাসরি বলেন, জীবনের চারদিকের ফেনিল জলরাশি থেকে বনলতা সেন তাঁকে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছে। কবিতার শেষ দুচরণে সিদ্ধান্তহীন অস্পষ্টতা রয়ে যায় যে, বনলতা সেন আরাম ও ক্লান্তিকর জীবন থেকে বিশ্রাম অর্থাৎ মৃত্যুকে প্রতীকায়িত করে কি না। অবশ্যই বনলতা সেন সান্ত্বনার প্রতীক, আর জীবনানন্দ ওর এই গুণটির কথা ব্যক্ত করেন দ্বিতীয় স্তবকের শেষ চরণের বিখ্যাত চিত্রকল্পটির মাধ্যমে : পাখির নীড়ের মতো চোখ। কল্পিত কর্ম (নিরাপত্তা ও শান্তি) এবং কারণ (নীড়)—এই সংশ্লেষের মতো বাংলা ভাষার কোনো শব্দ বা গতানুগতিক উপমা তখন শুধু নয়, আজ পর্যন্ত 'পাখির নীড়ের মতো চোখ'-এর মতো পাঠককে চ্যালেঞ্জ করেনি।

জীবনানন্দ অন্যত্রও একই চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। আগে যেমনটি বলা হয়েছে, ১৯২৯-৩০ সালে দিল্লির রামযশ কলেজে শিক্ষকতা করার সময়টা তিনি উপভোগ করেননি। বরিশালে তাঁর সতীর্থ ব্রাহ্ম ও বছর খানেকের ছোট সুধীরকুমার দত্ত তাঁকে কিছুটা সাহচর্য দিয়েছিলেন। তাঁরা ঘন ঘন পরস্পর দেখা করতেন। জীবনানন্দ যখন দিল্লি আসেন, তখন সুধীরকুমার তাঁর সঙ্গে রেলস্টেশনে দেখা করেন। প্রায় পাঁচ বছরেরও বেশি সময় পর জীবনানন্দ সেই উপলক্ষে সুধীরকুমার সম্বন্ধে লেখেন '...মুখে তার পাখীর নীড়ের মত আশ্বাস ও আশ্রয়ের হাসি'।[৭২] 'বনলতা সেন' কবিতার ক্লান্ত পথচারীর দিকে চোখ তুলে সেই একই আশ্রয়ের স্বস্তি ও আশ্বাস প্রদান করেছে। এটা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, কোনটা আগে,

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুধীরকুমার সম্পর্কে (মৃত্যু—জুন ১৯৩৫) বক্তব্য, নাকি 'বনলতা সেন' (ডিসেম্বর ১৯৩৫-এ প্রকাশিত)। এটাও জানা যায় না, চিত্রকল্পটা তিনি কখন কল্পনা করেছিলেন, ১৯২৯ সালে জীবনানন্দ যখন তাঁর বন্ধুকে দেখেন, তখন? নাকি আরও বহু পর সুধীরকুমারের অকালমৃত্যুর পর, তিনি যখন দিল্লি স্টেশনের সেই সাক্ষাতের স্মৃতিচারণা করছিলেন।

নয় মাস পর আরেকটি কবিতায় বনলতা সেনের দেখা পাওয়া যায়। এটিও ছাপা হয় *কবিতা* পত্রিকায়। পয়ারবদ্ধ *কখকখগগ* অন্ত্যমিলে ছয় পঙ্‌ক্তির 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতাটি স্তবকবিন্যাসে 'বনলতা সেন'-এর মতো। উভয় কবিতায়ই প্রাথমিকভাবে হাজার বছরের কালিক বিস্তারের অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, উপান্তের চরণগুলো জীবনের লেনদেনের সমাপ্তির কথা বলে, সর্বোপরি দুটো কবিতায়ই মূর্ত বনলতা সেন।

'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতাটির দুটো প্রকাশিত ভাষ্য পাওয়া গেছে। যেটি *কবিতা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি তাঁর চতুর্থ গ্রন্থ *মহাপৃথিবীর* প্রথম সংস্করণে (১৯৪৪) অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আরও একবার হয় তাঁর সপ্তম ও জীবদ্দশায় প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থ *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতায়* (১৯৫৪)। অন্য ভাষ্যটি সিগনেট প্রেস প্রকাশিত তাঁর ষষ্ঠ গ্রন্থ *বনলতা সেন* (একই নামে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত বইটির পরিবর্ধিত সংস্করণ) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। দুটোর পটভূমি ছিল আলাদা।

হাজার বছর শুধু খেলা করে

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো;
চারিদিকে পিরামিড—কাফনের ঘ্রাণ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না—খেজুর ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : এশিরিয়—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
শরীরে মমীর ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;
'মনে আছে?' শুধাল সে—শুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন?'[৭৩]

হাজার বছর শুধু খেলা করে

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো;
চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান;
বালির উপরে জ্যোৎস্না—দেবদারু ছায়া ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : দ্বারকার;—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;
'মনে আছে?' শুধাল সে—শুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন?'[৭৪]

একটি কবিতায় ব্যবহৃত হয় মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকল্প, অন্যটিতে ভারতীয়। জীবনানন্দের প্রথম গ্রন্থ *ঝরা পালক*-এ মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকল্পের বহুল ব্যবহার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রয়েছে। এ গ্রন্থে এসবের ব্যবহার ছিল মূলত আক্ষরিক, কোনো ক্রিয়ার প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যবহৃত। 'বনলতা সেন' কবিতায় উৎকীর্ণ ইতিহাস ও ভূগোলের ভূমিকার সমার্থক স্থান সময়ের দূরত্বের ভেতর যে রকম দ্যোতনা পাওয়া যায়, পরবর্তীকালে তাঁর মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকল্পগুলো আক্ষরিকভাবে তেমন বেশি কিছু প্রতীকায়িত করে না। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক চিত্রকল্পগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্ট দূরত্বকে আরও দূরবর্তী করার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকল্পগুলো যোগ করে অভারতীয় বিচিত্র চমকপ্রদ উপাদান।

সাধারণভাবে ঐতিহাসিক ভৌগোলিক চিত্রকল্প ও নির্দিষ্টভাবে মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকল্পগুলোর ব্যবহারিক সাদৃশ্যের কারণে জীবনানন্দ উপলব্ধি করেন, কবিতাটিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেও মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকল্পের বিকল্প হিসেবে ভারতীয় চিত্রকল্প ব্যবহার করা যায়। বস্তুত 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতায় এশিরিয়ার পরিবর্তে দ্বারকা (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রাচীন রাজধানী), খেজুরগাছের (এই গাছ ভারতেও জন্মে, তবে কবিতায় যেগুলোর কথা বলা হয়েছে, সেগুলো নিশ্চিতভাবে মিসরীয় কিংবা এশিরীয়) পরিবর্তে ভারতীয় দেবদারুর ব্যবহার যথার্থ। কবিতাটির জন্য পিরামিড কিংবা মমি আক্ষরিক অর্থে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু প্রথম পঙ্‌ক্তির 'হাজার বছর'-এর ভেতর অনির্দিষ্ট মহাকালের ধারণাকে আরও বেগবান করে। একই উদ্দেশ্য সাধন করে এশিরিয়া ও দ্বারকার উল্লেখও।

এই ছয় পঙ্‌ক্তির কবিতাটা তিন স্তবকবিশিষ্ট 'বনলতা সেন'কে পুনর্দখল করে। 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতাটি বোঝার জন্য পাঠককে বনলতা সেন এবং কবিতাটি যা উপস্থাপন করে তার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। দীর্ঘ কবিতাটা যত দূর করে, ছোটটিও তা-ই করতে চেয়েছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা খুব কমই কার্যকরী হয়। ছয়টি পঙ্‌ক্তি বিশাল নৈর্ব্যক্তিকতা থেকে বনলতা সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দিকে এগিয়ে যায়। পথরোধকারী লাইনগুলো মাঝপথে এসে পড়ে। কোনো সত্যিকার গতি নেই সেখানে। প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তির মধ্যে নেই তেমন কোনো বন্ধন। যে পরিবেশে কথক ও বনলতা সেনের দেখা হয়, তা পরিবর্ধিত হয়, ইতিহাসের পরোক্ষ উল্লেখের কারণে ধারণ করে বিচিত্র সুবাস, কিন্তু 'বনলতা সেন'-এ রয়েছে সত্যিকার গতিময়তা—প্রাচীন থেকে অব্যবহিত বর্তমান পর্যন্ত উত্থান। প্রাচীনকালের উল্লেখ কবিতার মধ্যকার চরিত্র যে জায়গাগুলোতে ভ্রমণ করছিল, সেসব স্থানের প্রতি বিশেষত্ব আরোপ করে। সে তুলনায় 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' উপস্থাপন করে একটা স্থিরচিত্র।

বনলতা সেন কবিতায় জীবনের সব লেনদেন সাঙ্গ হওয়া-বিষয়ক বক্তব্য ('সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন') কর্মতৎপরতার প্রস্তাবনা বহন করে। কবিতার এই অংশের পূর্ববর্তী সম্পূর্ণ অংশে আলোকপাত করা হয় জীবনের সক্রিয়তার ওপর (হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে)। একই রকম একটা বক্তব্য যখন 'হাজার বছর শুধু খেলা করে'তে আসে ('ঘুচে গেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবনের সব লেনদেন'), সেটা অনুমানসিদ্ধ হিসেবে আসে না। কারণ জীবন ও জীবনের লেনদেনের তেমন কিছুই এখানে উন্মোচিত হয় না। এ কবিতায় বনলতা সেন ও কথকের মধ্যকার সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের ভেতর কেউ কিছুটা সান্ত্বনার রেশ পেতে পারেন—বস্তুত 'বনলতা সেন' কবিতা এটাকেই সঠিক ব্যাখ্যা হিসেবে ইঙ্গিত প্রদান করে। কিন্তু পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তিগুলো এ রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পাঠককে খুব একটা সাহায্য করে না। কেবল দীর্ঘটির সামস্বরিক হওয়া ছাড়া কবিতাটির ব্যর্থতা 'বনলতা সেন'-এর সার্থকতার একটা মূল অনুষঙ্গ—সংগত বিস্তারকে বিশেষায়িত করে। কেউ ভাবলেও ভাবতে পারেন 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' 'বনলতা সেন'-এর প্রাথমিক খসড়া থেকে সুচিন্তিতভাবে বাতিল করে দেওয়া কোনো স্তবক কি না।

মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকল্পগুলো আরও বিস্তৃত ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক শ্রেণীর চিত্রকল্পগুলোর একটা অংশ হিসেবে উপস্থাপিত। *রূপসী বাংলার* একটা সনেটে প্রশ্ন করা হয় 'স্বপ্ন কি দেখেনি রোম, এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড়-বাংলা, দিল্লী, বেবিলন?'[৭৫] *কবিতা* পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত একটি কবিতায় কবি এশিরিয়া, মিসর ও বিদিশাকে এক পঙ্‌ক্তিতে একসঙ্গে গ্রথিত করেন।

হাওয়ার রাত

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত;
সারা রাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনো বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে;
এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—
মাথার উপরে মশারি নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে!
কাল এমন চমৎকার রাত ছিল।
সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল—আকাশে এক তিল ফাঁক ছিল না;
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের
ভিতর দেখেছি আমি;
অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের
মতো ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা;
জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ!
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিল।

যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে;
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—
মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য?

আড়ষ্ট—অভিভূত হয়ে গেছি আমি,
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন;
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল!
আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে, শাঁই শাঁই করে,
সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো!

হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব
রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়!

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে,
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চলল
একটা দুরন্ত শকুনের মতো।[৭৬]

৭

আঙ্গিকের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আলোকোজ্জ্বল কাব্যময় এই কল্পলোকবিহার জীবনানন্দের কয়েকটি গদ্যকবিতার একটি। ১৯৩০-এর দশকের মধ্যেই বাংলায় গদ্যকবিতাবিষয়ক একটি বিতর্ক শুরু হয়েও শেষ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম তাঁর কিছু গীতিকবিতাকে ইংরেজি গদ্যে ভাষান্তর করেন এবং ১৯১২ সালে সেগুলো কবিতা হিসেবে *গীতাঞ্জলি* নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর ইংরেজি গদ্যগুলো কবিতা হিসেবে পরিবেশিত হওয়ার পর এবং সেগুলো গৃহীত হওয়ার পর তাঁর বাংলা গদ্যকবিতার প্রথম গ্রন্থ—*পুনশ্চ*-এর ভূমিকায় তিনি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেন: 'পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।'[৭৭]

১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এসে গদ্যকবিতা বাঙালি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর ভেতর কিছুকালের জন্য প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করে। *কবিতার* প্রথম সংখ্যায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রকাশিত অল্প কয়েকজনের ছাড়া জীবনানন্দসহ অন্য প্রায় সবার কবিতাই ছিল গদ্যছন্দে। *কবিতার* তৃতীয় সংখ্যায়—যেটিতে 'হাওয়ার রাত' ছাপা হয়—গদ্যছন্দের ওপর একটা সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। এতে বলা হয়, ইংরেজি ফ্রি ভার্স ও বাংলা গদ্যছন্দের মধ্যে কোনো সংস্রব নেই। ফ্রি ভার্স হচ্ছে পদ্য, আর বাংলা গদ্যছন্দ হচ্ছে গদ্য, পদ্য নয়। সম্পাদকীয়তে জোর দিয়ে বলা হয়, গদ্যছন্দের মাধ্যমে কেউ যা বলতে চায় তা-ই বলে, তার বেশি কিছু নয়। এজরা পাউন্ড ও ইমেজিস্ট ম্যানিফেস্টোর উল্লেখ করা হয় এতে। গদ্যকবিতা লেখার জন্য কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালার মধ্যে সম্পাদকীয়তে কবিদের প্রতি অনুরোধ করা হয়, যাতে সাধারণ পরিচিত শব্দের সংস্কৃত সমার্থক শব্দ যথাসম্ভব পরিহার করা হয়। *প্রগতিতে* বিশেষভাবে জীবনানন্দের রচনাশৈলীর প্রশংসামূলক বুদ্ধদেবের আগের লেখাগুলোর কথা স্মরণ করে জীবনানন্দের কবিতাগুলো দৃষ্টান্তমূলক বলে প্রশস্তি করা হয়।

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই উদ্যোগের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে ওঠেন। *কবিতার* ডিসেম্বর ১৯৩৬ সংখ্যায় 'গদ্যকাব্য' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি ক্ষুব্ধভাবে মৃদু তিরস্কারের স্বরে উপদেশ দেন, হ্যাঁ, গদ্যকবিতা ঠিকই আছে, তাঁর তাতে কোনো আপত্তি নেই; তবে খবরদার, ওঁরা সে দিকে গেলে বিপদ হতে পারে, ক্ষতির সম্ভাবনাও আছে, তাই এ ব্যাপারে সাবধান; সেভাবে না লিখলেও হয়, ইত্যাদি।[৭৮] পরের বছর, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভাষায়, 'গদ্য কবিতা নিয়ে উত্যক্ত হয়েই' রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার একটা সংকলন তৈরির কাজে হাত দেন।[৭৯] তার পরের বছর, ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় *বাংলা কাব্যপরিচয়*। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে কোনো গদ্যকবিতা এটিতে সংকলিত হয়নি।[৮০] বুদ্ধদেব এই রক্ষণশীল সংকলনটির তীব্র সমালোচনা করেন এবং প্রতিক্রিয়া হিসেবে দুই বছর পর তিনি নিজে একটা সংকলন প্রকাশ করেন *আধুনিক বাংলা কবিতা* নামে। তত দিনে গদ্যকবিতা বাংলা কবিতার ভুবনে আর গুরুত্বের সর্বোচ্চ আসনে নেই। মধ্য-তিরিশে, ব্যাপারটা যখন একটা তপ্ত বিষয়, তখন জীবনানন্দ এ রকম কিছু গদ্যকবিতা লেখেন, 'হাওয়ার রাত' ছিল সেগুলোর একটা, যেমন ছিল এই কল্পচিত্রটি :

নগ্ন নির্জন হাত

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে :
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।

যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠছে।

মনে হয় কোন্ বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভারতসমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,
কোন্ এক প্রাসাদ ছিল;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ
পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা;
আর তুমি নারী—
এইসব ছিল সেই জগতে একদিন।

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক;
অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল;
অনেক কমলা রঙের রোদ;
আর তুমি ছিলে;
তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।

পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ন নির্জন হাত;

তোমার নগ্ন নির্জন হাত।[৮১]

'বনলতা সেন' ও তাঁর অন্যান্য কবিতার মতো এখানেও রয়েছে এক রমণী—উপবিষ্টা— দৃশ্যমান কেবল তার হাত। এতেও কালের পরিমাপ শতাব্দী দিয়ে, আর ঘটনাস্থল বিস্তৃত ভারত থেকে ভূমধ্যসাগর অবধি। এ কবিতায় রয়েছে একজন কবির আবেগমথিত কল্পনায় সূর্যাস্তের দৃশ্য। তিনি স্মরণ করেন এক কল্পনার প্রাসাদ। তারপর ডুবে যেতে যেতে রক্তিম হয়ে যাওয়া অস্তগামী কমলা-রং সূর্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাহায্যে পাঠকের চোখের সামনে কবি ছিটিয়ে দেন রাশি রাশি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্প—কাকাতুয়া, অবিরল পত্ররাজি, কোনো এক দুর্গের কাঠামো, দুর্লভ ফল (নাশপাতি), হরিণ ও সিংহের ছালের পাণ্ডুলিপি, উজ্জ্বল পর্দা ও গালিচায় মাখানো উষ্ণ স্বেদাক্ত রং, রক্তিম গেলাসে ততোধিক লাল তরমুজ মদ। আর এসব বর্ণের ভেতর সহসা পড়ে থাকতে দেখা যায় এক নিরাভরণ হাত, আপাত প্রতীয়মান হয়, এটি সেই রহস্যময়ী রমণীরই হাত, যাকে জীবনানন্দ নামিত করেছেন কিছু কবিতায়, এখানে যাকে রেখেছেন অনামিত।

রূপসী বাংলায় অনেকটা এ রকম সন্ধ্যার চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি :

একদিন পৃথিবীর পথে আমি ফলিয়াছি; আমার শরীর
নরম ঘাসের পথে হাঁটিয়াছে; বসিয়াছে ঘাসে
দেখিয়াছে নক্ষত্রেরা জোনাকিপোকার মতো কৌতুকের অমেয় আকাশে
খেলা করে; নদীর জলের গন্ধে ভ'রে যায় ভিজে স্নিগ্ধ তীর
অন্ধকারে; পথে পথে শব্দ পাই কাহাদের নরম শাড়ির,
ম্লান চুল দেখা যায়; সান্ত্বনার কথা নিয়ে কারা কাছে আসে—
ধূসর কড়ির মতো হাতগুলো—নগ্ন হাত সন্ধ্যার বাতাসে
দেখা যায় : হলুদ ঘাসের কাছে মরা হিম প্রজাপতিটির

সুন্দর করুণ পাখা প'ড়ে আছে—দেখি আমি; চুপে থেমে থাকি;
আকাশে কমলা রঙ ফুটে ওঠে সন্ধ্যায়—কাকগুলো নীল মনে হয়;
অনেক লোকের ভিড়ে ডুবে যাই—কথা কই—হাতে হাত রাখি;
করুণ বিষণ্ণ চুলে কার যেন কোথাকার গভীর বিস্ময়
লুকায়ে রয়েছে বুঝি...নক্ষত্রের নিচে আমি ঘুমাই একাকী;
পেঁচার ধূসর ডানা সারারাত জোনাকির সঙ্গে কথা কয়।[৮২]

এখানে কবি প্রাকৃতিক বিশ্ব নিয়ে আরম্ভ করেন : ঘাস, নক্ষত্র, নদীর গন্ধ ইত্যাদি। তাঁর নিজস্ব পরিবেশে অভ্যস্ততা বোধ থেকে তিনি কোনো রমণী হেঁটে গেলে তাদের মাড় না দেওয়া শাড়ির শব্দ পান। তাদের শাড়ির মতো চুলও বলে দেয় যে তারা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যাচ্ছে না, বরং কোনো গৃহস্থালি কাজে ব্যস্ত। কথক জানান, যাঁদের নগ্ন হাত (চুড়িবিহীন) তিনি ধরেছেন, তাঁদের মধ্যে কী কথা লুকানো আছে, তা রোমন্থন করে। একসময় তিনি এক রমণীর সঙ্গে অবস্থান করার কল্পলোক ফেলে রেখে প্রাকৃতিক বিশ্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবে ফিরে আসেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই সনেটে কবি কখনোই ভূমি ছেড়ে যাননি। 'নগ্ন নির্জন হাত'-এর কল্পনাকে উসকে দেওয়া উপাদানগুলো যদিও এটিতেও উপস্থিত—কমলা রঙের সূর্যাস্ত, নগ্ন হাত—সনেটটি বাংলার মাটিতেই প্রোথিত, অন্যদিকে 'নগ্ন নির্জন হাত' তাঁর কল্পনায় বাধাহীন ছোটে।

জীবনানন্দ যে উপলব্ধিতে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাঁর অধিকাংশ কবিতায় প্রকৃতিকে উপস্থাপন করতে পারেন, অনুরূপভাবে তিনি যে প্রাকৃতিক বি-মানবিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন, তা সুস্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ তাঁর ১৯৩০-এর দশকের কবিতাগুলোতে। যেমন :

শিকার

ভোর;
আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল :
চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।
একটি তারা এখনো আকাশে রয়েছে :
পাড়াগাঁর বাসরঘরে সবচেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো;
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে মুক্তা
আমার নীল মদের গেলাসে রেখেছিল
হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে তেমনি—
তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনো।

হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা
সারারাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে—
মোরগফুলের মতো লাল আগুন;
শুকনো অশ্বত্থ পাতা দুমড়ে এখনো আগুন জ্বলছে তাদের;

সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর;
হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।
সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ
ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।

ভোর;
সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে
অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল।
এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে;
কচি বাতাবিলেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে;
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামল—
ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেগ দেওয়ার জন্য
অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো
একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য;
এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল মচকাফুলের মতো লাল।
আগুন জ্বলল আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরনো শিশিরভেজা গল্প;
সিগারেটের ধোঁয়া;
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।[৮৩]

সুন্দরীগাছের উল্লেখ কবিতাটিকে স্থাপন করে বরিশালের দক্ষিণে সুন্দরবনের অরণ্যে, যেখান থেকে কথক ভোরের আকাশে শুকতারা দেখতে পায়। প্রাকৃতিক পরিবেশকে রূপান্তরিত করে সেখানে প্রথমে মানুষকে উপমার মতো উপস্থাপন করে সব সময়ের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে জীবনানন্দ চিত্রিত করেন ভোরকে। 'গোধূলি-মদির' মেয়েটি ব্যাখ্যা দাবি করে। বহু বাঙালি হিন্দুর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় কনের বাড়িতে। রীতিমাফিক কনের বন্ধু ও আত্মীয়রা বরের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা এবং কনের সঙ্গে গল্প করে নবদম্পতিকে রাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত জাগিয়ে রাখে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটিতে শিহরিত একটি মেয়ে সারা রাত জেগে থাকতে পেরেছিল। জীবনানন্দের মধ্যপ্রাচ্যীয় চিত্রকল্পের সম্ভার থেকে তুলে আনা চমৎকার মিসরীয় রমণী ও পুরোপুরি এই বাঙালি কুমারী ঠিক পাশাপাশি বসানো যেন।

অনুমান করা যায়, শিকারিরা বাঙালি, সঙ্গের দেহাতি ভৃত্যরা পাহারায় রত থেকে তাঁবুকে উষ্ণ রাখার চেষ্টায় প্রায় সারা রাত জেগে থাকে। এসব বাস্তব অবিশিষ্ট মানুষ উপমার বিশিষ্টা নারীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। যখন সূর্য ওঠে তখন অরণ্যের স্বাভাবিক ভোরের আলোকচ্ছটার তুলনায় ওদের আগুনের রং বিবর্ণ হয়ে আসে। মানুষকেই কেবল শীতরাত্রি পার করতে হয় না। হরিণও শিকারি চিতাবাঘিনীর থাবা থেকে নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য পালিয়ে থেকে রাত অতিবাহিত করে। একটা নতুন জীবন, নতুন দিন তার জন্য অপেক্ষা করে, যখন চারপাশের আলো থেকে, জল আর ঘাস থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে তার দেহ।

কয়েক মিনিট স্থায়িত্বের দৃশ্য ধারণ করা এসব মানসছবির পর আসে হন্তারক গুলি। বহু চেষ্টায় যে হরিণ চিতাকে এড়াতে সফল হয়েছিল, সে হরিণ শিকার হয় মানুষের হাতে। যে সৌন্দর্যের ভেতর কবি এতক্ষণ বিরাজ করছিলেন, কয়েক স্তবকে চিত্রিত বিস্তারিত কয়েক মুহূর্তের সেই দৃশ্য ধ্বংস হয়ে যায়। কবিতাটির বাকি অংশ সংক্ষিপ্ত, ছাঁটা বাক্যাংশের সমাহারে যত শিগগির সম্ভব নিয়ে আসে কুৎসিত দৃশ্য। সুস্পষ্ট ঘৃণার সঙ্গে কথক এসব মানুষের উল্লেখযোগ্য বিশেষণগুলোর কথা উল্লেখ করে : তাদের নিরস গল্প, ধূমপান, টেরিকাটা চুল ও নিরপরাধ ঘুম।

মৃত্যু-পরবর্তীকালে প্রকাশিত একটা কবিতায় জীবনানন্দ এক সম্পূর্ণ অন্য ধরনের শিকারের চিত্র আঁকেন :

সুন্দরবনের গল্প

ভোরের নদীর জলে হরিণ নামলো
কাল সারারাত বাঘিনী ছিল তার পিছু পিছু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাল সমস্ত জ্যোৎস্নার রাত সুন্দরী চিতাবাঘিনী
এই হরিণের ছায়ার পিছনে ছুটেছে

বাতাসের পায়ের মতো এর ছায়ার পিছনে
ছুটেছে কামনার মতো
গহন রূপের আঘাতে যে রক্তিম কামনার জন্ম হয়
হিংসা নয়—
কাল রাতে চিতাবাঘিনী হরিণের মুখের রূপে
ফেনিল হয়ে উঠেছিল

কাল চৈত্রের জ্যোৎস্নায়
রূপালি শিশির বেগুনি ছায়ার দেশে
জাফরিকাটা জানালার রাজ্যে
সবুজ জাফরান রঙের বাতাসের উষ্ণতায়
প্রান্তরে প্রান্তরে চাঁদের আলোর কমলাবর্ণের মদিরার ভিতর
এরা দু'জনে অরণ্যের স্বপ্ন তৈরি করেছিল কাল
এই হরিণ—এই চিতা—
জ্যোৎস্নার কোমল স্নায়ু এদের শরীরকে বানিয়েছিল ছবি
অপরূপ নারীর ছবি এঁকেছিল এই বাঘিনীর দেহ দিয়ে
ছুটেছে হাওয়ার মতো তার (ঈপ্সিত) তরুণের পিছে
আঁকাবাঁকা ডালপালা এদের শরীরের উপর
চেক-কাটা কার্পেট বুনে চলেছে দ্রুত গতিতে
সবুজ পাতার অজস্র দেয়াল
জানালার মতো ফাঁক হয়ে যাচ্ছে
চৈত্রের বাতাসে
অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতো নীল হয়ে যাচ্ছে আবার
যেন মেহগিনির গহন ঘন ছায়ায়
হয়ে যাচ্ছে মেহগিনির কাঠের হরিণ
নীল দারুময়ী বাঘিনী
অন্ধকার রাত্রি ঘিরে
নিরাকুল সমুদ্রের মতো
পাহাড়ের গুহায় গুহায় আবেগে স্ফীত হয়ে উঠছে

রূপালি চাঁদের আলোর ফোয়ারায়
হাওয়ার ফোয়ারায়
রাশি রাশি কাঞ্চন ফুলের মতো ফুটে উঠছে এদের দেহ আরেকবার
ছুটেছে ফিটকিরির ঝর্ণার মতো
নীল ছায়ার পর্দার ভিতর হারিয়ে গিয়ে
ছায়ার ভিতর থেকে হীরের মতো জ্যোৎস্নাকে খুঁড়ে বার করে
অন্ধকারকে তম্বুরার মতো বাজিয়ে বাজিয়ে
বাতাসকে তরমুজের মতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চাঁদকে একবার খুঁজে পেয়েছে এরা
একবার হারিয়ে ফেলেছে।[৮৪]

প্রকৃতির ভেতর এ রকম মনঃপূত জীবনযাপন তাঁর সে-সময়কার বহু কবিতার উপাদান ছিল :

ঘাস

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে!
আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের এই ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।[৮৫]

হরিণের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পরিবর্তে জীবনানন্দ ঘাসের প্রতি তাঁর মনোযোগ চালিত করেন। *রূপসী বাংলার* বহু সনেটে লক্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ঘাস, তেমনিভাবে এসেছে শুধু মানুষের নয়, প্রকৃতির দেহান্তরের ধারণাও।

৮

জীবনানন্দ কেবল নামকরণের স্বার্থেই নাম দেওয়ার সুবিধা গ্রহণ করেছেন সত্যিকারভাবে। *ধূসর পাণ্ডুলিপির* 'তুমি' তাঁর পরবর্তী রচনায় একটি নাম পরিগ্রহ করেছে, যেমন এ ক্ষেত্রে 'বনলতা সেন'। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত *বনলতা সেন*-এর পরিবর্ধিত সংস্করণে বহু নাম এসেছে। ৩০টি কবিতার ভেতর সাতটির শিরোনাম তাঁর কল্পনার নারীদের নামানুসারে: বনলতা সেন, শঙ্খমালা, সুদর্শনা, শ্যামলী, সুরঞ্জনা, সবিতা ও সুচেতনা। জনৈকা শেফালিকা বোস হঠাৎ করে (ক্ষণিকের জন্য) 'হরিণেরা' কবিতায় উপস্থিত হয়। 'আকাশলীনা'তে কথক আবার সম্বোধন করে এক সুরঞ্জনাকে, একই সময়ে 'বুনো হাঁস' নামের কবিতাটিতে অরুণিমা সান্যাল নামের এক মহিলাকে স্মরণ করেন তিনি। (*কবিতা* পত্রিকায় প্রকাশিত মূল কবিতায় অরুণিমা সান্যালের নাম ছিল অশ্রুকণা সান্যাল। *মহাপৃথিবী* (১৯৪৪) ও পরবর্তী সব সংকলনে অরুণিমাই এসেছে)। শঙ্খমালার দেখা পাওয়া যায় বেশ ক-বার বিভিন্ন কবিতায়, যার একটিতে তাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শঙ্খমালা

কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে,
বলিল, তোমারে চাই :
বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি—কুয়াশার পাখনায়—
সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক
জোনাকির দেহ হতে—খুঁজেছি তোমারে সেইখানে—
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রানের অন্ধকারে
ধানসিড়ি বেয়ে বেয়ে
সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।

দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা;
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা—
বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপর,
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর।

কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়।

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার!
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার!
এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।[৮৬]

প্রথম স্তবকে কল্পিত এক প্রাচীন রূপকথার নারী কথককে খোঁজ করে, কবিতার বাকি অংশে সে রমণীরই বর্ণনা। শঙ্খিনীমালা (শঙ্খিনী হচ্ছে সংস্কৃত ভাষ্যে রমণীর চারটি শ্রেণীর একটি) এবং শঙ্খমালা নামের মধ্যকার সাদৃশ্য তাঁর নারীচরিত্রকে সমৃদ্ধ করার একটা পন্থা হিসেবে জীবনানন্দের ভাবনায় থাকতে পারে।[৮৭] আগে উল্লিখিত সনেটগুলোতে এই শঙ্খমালাকেই বিশালাক্ষী বর দিয়েছিল 'নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভেতর' জন্মানোর জন্য। আর বাংলা হচ্ছে সেই স্থান 'যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার/কাঁকন বাজিত, আহা, কোনোদিন বাজিবে কি আর!' শঙ্খমালার মতো রমণীর কথা লেখার সময় তাঁর মনের ভেতর কী ঘটেছিল, *রূপসী বাংলার* একটি সনেটে তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও

এ-সব কবিতা আমি যখন লিখেছি ব'সে নিজ মনে একা;
চালতার পাতা থেকে টুপ্ টুপ্ জ্যোৎস্নায় ঝরেছে শিশির;
কুয়াশায় স্থির হয়ে ছিল ম্লান ধানসিড়ি নদীটির তীর;
বাদুড় আঁধার ডানা মেলে হিম জ্যোৎস্নায় কাটিয়াছে রেখা
আকাঙ্ক্ষার; নিভু দীপ আগলায়ে মনোরমা দিয়ে গেছে দেখা
সঙ্গে তার কবেকার মৌমাছির...কিশোরীর ভিড়
আমের বউল দিল শীতরাতে;—আনিল আতার হিম ক্ষীর;
মলিন আলোয় আমি তাহাদের দেখিলাম,—এ-কবিতা লেখা

তাহাদের ম্লান চুল মনে ক'রে, তাহাদের কড়ির মতন
ধূসর হাতের রূপ মনে ক'রে; তাহাদের হৃদয়ের তরে।
সে কত শতাব্দী আগে তাহাদের করুণ শঙ্খের মতো স্তন
তাদের হলুদ শাড়ি—ক্ষীর দেহ—তাহাদের অপরূপ মন
চ'লে গেছে পৃথিবীর সবচেয়ে শান্ত হিম সান্ত্বনার ঘরে:
আমার বিষণ্ন স্বপ্নে থেকে থেকে তাহাদের ঘুম ভেঙে পড়ে।[৮৮]

এ কবিতায় শুধু নয়, ১৯৩০-এর দশকে বিশেষ করে প্রথম দিকে, জীবনানন্দের বহু কবিতা কল্পনার এসব কালো তেলহীন রুক্ষ-চুল নারীদের কথা লিখেছে, লিখেছে তাদের জন্য, 'তাহাদের হৃদয়ের তরে'।

এমনকি সন্দেহাতীতভাবে পাশ্চাত্য ছাঁচের ভিত্তিতে লেখা একটা কবিতায় জীবনানন্দীয় ধাঁচ সেই রমণীকে প্রদর্শন করে:

হায় চিল

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে।
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
        বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে![৮৯]

কবিতায় প্রথম দিকে প্রকাশিত জীবনানন্দের বহু কবিতার মতো 'হায় চিল'-এর একই সময়ে লেখা বহু কবিতা ও *রূপসী বাংলার*[৯০] সনেটগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। *রূপসী বাংলা* থেকে এসব উদাহরণ টানা যায়, যেমন: '...ভাঁট আঁশশ্যাওড়ার বন/বাতাসে কি কথা কয় বুঝি নাকো—বুঝি নাকো চিল কেন কাঁদে;' 'প্রান্তরের পার থেকে গরম বাতাস/ক্ষুধিত চিলের মতো চৈত্রের এ-অন্ধকারে ফেলিতেছে শ্বাস' এবং 'বহুকাল গেয়ে গেছ গান/সোনালি চিলের মতো উড়ে উড়ে আকাশের রৌদ্র আর মেঘে...।'[৯১] কিংবা:

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ-দুপুর—চিল একা নদীটির পাশে
জারুল গাছের ডালে ব'সে ব'সে চেয়ে থাকে ওপারের দিকে;
পায়রা গিয়েছে উড়ে চবুতরে, খোপে তার;—শসালতাটিকে
ছেড়ে গেছে মৌমাছি;—কালো মেঘ জমিয়াছে মাঘের আকাশে,
মরা প্রজাপতিটির পাখার নরম রেণু ফেলে দিয়ে ঘাসে
পিঁপড়েরা চ'লে যায়—দুই দণ্ড আম গাছে শালিখে শালিখে
ঝুটোপুটি, কোলাহল—বউকথাকও আর রাঙা বউটিকে
ডাকে নাকো—হলুদ পাখনা তার কোন্ যেন কাঁঠালে পলাশে

হারায়েছে; বউও উঠানে নাই—প'ড়ে আছে একখানা ঢেঁকি;
ধান কে কুটিবে বলো—কত দিন সে তো আর কোটে নাকো ধান
রোদেও শুকাতে সে যে আসে নাকো চুল তার—করে নাকো স্নান
এ-পুকুরে—ভাঁড়ারে ধানের বীজ কলায়ে গিয়েছে তার দেখি,
তবুও সে আসে নাকো; আজ এ-দুপুরে এসে খই ভাজিবে কি?
হে চিল, সোনালি চিল, রাঙা রাজকন্যা আর পাবে নাকি প্রাণ?[৯২]

শেষ ছয় চরণের অনুপস্থিত রমণী জীবনানন্দের বাংলার আরেকটা উপাদান সৃষ্টি করে। কিন্তু এ কবিতায় চিল আর তরুণীর সম্পর্ক 'হায় চিল'-এর মতো এত ঘনিষ্ঠ নয়, যেখানে চিলের কান্না বেদনা-জাগানো রমণীর স্মৃতি জাগিয়ে দেয়, আর এই সনেটে উপস্থাপিত আছে চিত্রের একটা মালা এবং উধাও হয়ে যাওয়া সেই তরুণীর জন্য একটা আবছা আবেগ।

জীবনানন্দের এ-যাবৎ লেখা কবিতাগুলোর মধ্যে চমৎকার একটা কবিতা *কবিতা* পত্রিকার মার্চ ১৯৩৮ সংখ্যায় ছাপা হয়।

আট বছর আগের একদিন

শোনা গেল লাশকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;
কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'ল তার সাধ।

বধূ শুয়ে ছিল পাশে—শিশুটিও ছিল;
প্রেম ছিল, আশা ছিল—জ্যোৎস্নায়,—তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি!
রক্তফেনা-মাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার;
কোনোদিন জাগিবে না আর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'কোনোদিন জাগিবে না আর
জাগিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর—'
এই কথা বলেছিল তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

তবুও তো প্যাঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন—যেন কোন্ বিকীর্ণ জীবন
অধিকার ক'রে আছে ইহাদের মন;
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা;
যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা
এই জেনে।

অশ্বত্থের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি?
থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা এসে
বলেনি কি: 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার!—
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার!'
জানায়নি প্যাঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার?

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ব যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'ল;
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে—গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্ত-মাখা ঠোঁটে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শোনো
তবু এ মৃতের গল্প;—কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে,
চোখ পালটায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার!
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার—'

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হব—বুড়ি চাঁদটারে আমি
করে দেব কালীদহে বেনোজলে পার;
আমরা দু'জনে মিলে শূন্য ক'রে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।[৯৩]

ঘটনাটা যথেষ্ট সহজ : একজন লোক আত্মঘাতী হয়। সে কেন এ রকম করে আমরা জানি না। কথক প্রকাশ্যে চিন্তা করতে করতে ঘটনাটাকে আত্মহত্যা বলে বোঝাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চাইছিলেন, যদিও শেষ স্তবকে নিজেই আবার সেই ধারণার বিরোধিতা করেন, তাঁর 'দ্বৈত মত' কবিতাটির সম্মোহনী উত্তেজনায় ইন্ধন জোগায়।

আজ পর্যন্ত কবিতাটির তারিখ-সংবলিত কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, ফলে এটা ঠিক কখন লেখা হয়েছিল তা জানার কোনো উপায় নেই। কবিতার নাম থেকে বোঝা যায়, যখনই লেখা হোক, কবিতার প্রেরণা ছিল কমপক্ষে আট বছর আগের, অর্থাৎ ১৯৩০ কিংবা আরও আগের। আর ১৯৩০-এর বহু আগে থেকেই বরিশালে লাশকাটা ঘরের[৯৪] অস্তিত্ব ছিল। অশোকানন্দ তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর পর লেখেন :

> প্রায় ছোটবেলা থেকেই বরিশালের উপকণ্ঠে শ্মশানভূমির পাশ দিয়ে আমরা দুজনে হেঁটেছি, অবাক হ'য়ে কখনো বা লাসকাটা ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখেছি।[৯৫]

মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কবিতার লোকটিকে। তার মরার সাধ জেগেছিল আগের রাতে, যখন শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর চাঁদ ফাল্গুনের রাতের আঁধারে ডুবে গেছে। অর্ধেকও পুরো নয়, এমন পঞ্চমীর চাঁদ অস্তমিত হয় মধ্যরাতের আগে। চাঁদের ষষ্ঠী হচ্ছে দেবী ষষ্ঠীর দিন। বর্ণহিন্দু না হলেও জীবনানন্দ হিন্দু লোককাহিনি সম্পর্কে কোনোভাবেই অজ্ঞ ছিলেন না। শিশুদের দেবী ষষ্ঠী নবজাতককে লালন-পালন করে দান করেন নতুন জীবন। লোকটি নতুনভাবে জন্মলাভ করার জন্য ফাঁসিতে ঝুলতে পারে।[৯৬] মানুষ হিসেবে নয়, অন্য কোনো রূপে ওর বেঁচে থাকার সাধ হয়েছিল হয়তো। 'যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের—মানুষের সঙ্গে তার হয় নাকো দেখা', এই জেনে সে হয়তো তার মনুষ্য-অস্তিত্ব শেষ করতে চেয়েছিল, যাতে সে মিশে যেতে পারে প্রাকৃতিক বিমানবিক মহাবিশ্বের সঙ্গে। *রূপসী বাংলার* একটা কবিতায় জীবনানন্দ লেখেন :

> আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
> হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
> হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে[৯৭]

'ঘাস' কবিতায় তিনি তেমনই লিখেছেন : 'ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার/শরীরের সুস্বাদু অন্ধকার থেকে নেমে।'

লোকটি ফাঁসিতে ঝোলে অশ্বত্থ গাছ থেকে (গাছটিকে পিপুলও বলা হয়), যার বৈজ্ঞানিক নাম *Ficus religiosa* বা 'পবিত্র ডুমুরগাছ'। গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এই গাছ, কারণ এর নিচে তিনি বোধি লাভ করেছিলেন। 'আট বছর আগের একদিন' একভাবে জীবনানন্দের পুনর্ব্যক্ত বুদ্ধের কাহিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে। কবিতার লোকটি, বুদ্ধের মতো চরিত্র, দুঃখভোগ করেছিল। সম্ভবত বহুদিনের নিদ্রাহীন সে সহ্য করেছে 'জাগিবার গাঢ় বেদনার/অবিরাম—অবিরাম ভার।' তার ছিল স্পর্শাতীত বিপজ্জনক শ্রান্তি, যার এই ধাঁধার সমাধান দরকার। লোকটির ছিল স্ত্রী ও সন্তান, ভালোবাসা ও আশা। তার অভাব ছিল না খাদ্য বা বাসস্থানের। জীবনের স্বাদ পেয়েছে সে, পেয়েছে হেমন্তের সুপক্ব গমের ঘ্রাণ। কিন্তু তার উদ্দেশ্য থেকে সরে যায়নি সে। শেষ পর্যন্ত বোধিবৃক্ষ বা জ্ঞানবৃক্ষের নিচে এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

সে বুঝতে পারে, এই পৃথিবীর যাবতীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষের কী করা উচিত। সে ছিল পরিপূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্ত। তাই মৃত্যু বেছে নিয়েছিল সে।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়াও অশ্বত্থ গাছের অন্য ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। একটা সংজ্ঞামতে, অশ্বত্থ হচ্ছে সেই গাছ যা কোনো বিরোধিতা ছাড়াই দীর্ঘদিন বাঁচে : অ (বিরোধিতাহীন) +শ্ব (অনন্তকাল) +স্থ (দাঁড়ানো)। আরেকটা ব্যাখ্যা ভিন্ন ধরনের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা দিলেও একই মৌলিক অর্থে উপনীত হয়। অ (নহে) + শ্বত্থ (সাময়িকভাবে দাঁড়ানো)—এবং বোঝায় যে অশ্বত্থ হচ্ছে সংসার কিংবা এই পৃথিবীর বৃক্ষ। এ রকম একটা অর্থ উপনিষদ ও *ভগবদ্গীতা* দুটোতেই পাওয়া যায়। অনেক ব্যাখ্যার মধ্যে একটির ব্যাপারে শেষোক্তটি বলে :

> অশ্বত্থ শব্দ বলতে সেটাই বোঝায় যা আজ নয় যেমন ছিল গতকাল। শব্দটি ইঙ্গিত করে সংসার কিংবা প্রপঞ্চের অস্তিত্বের দিকে। এটা অনশ্বর, তবে জড় কিংবা অটল নয়।[৭৮]

'আট বছর আগের একদিন'-এর নায়ক উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছিল সংসারবৃক্ষে ঝুলে, যে-বৃক্ষ অবিনশ্বর হলেও সদা পরিবর্তনশীল। পাঠক বা কথক কেউই নিশ্চিতভাবে জানে না, মানুষটির জীবন বৃক্ষের মতো এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হওয়া শালিক পাখি বা শঙ্খচিল কিংবা ভোরের কাক বা ঘাস হয়ে থাকা অবিনশ্বর কিছু কি না।

এর প্রায় দেড় বছর আগে জীবনানন্দ একটা কবিতা প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে একটা অশ্বত্থগাছ তার মনের কথা বলেছে :

বলিল অশ্বত্থ সেই

বলিল অশ্বত্থ ধীরে : 'কোন্ দিকে যাবে বলো—
তোমরা কোথায় যেতে চাও?
এত দিন পাশাপাশি ছিলে, আহা, ছিলে কত কাছে;
ম্লান খোড়ো ঘরগুলো—আজো তো দাঁড়ায়ে তারা আছে;
এইসব গৃহ মাঠ ছেড়ে দিয়ে কোন্ দিকে কোন্ পথে ফের
তোমরা যেতেছো চ'লে পাই নাকো টের!
বোঁচকা বেঁধেছো ঢের,—ভোলো নাই ভাঙা বাটি ফুটো ঘটিটাও;
আবার কোথায় যেতে চাও?

'পঞ্চাশ বছরও হায় হয়নিকো,—এই-তো সে দিন
তোমাদের পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠামহাশয়
—আজো, আহা, তাহাদের কথা মনে হয়!—
এখানে মাঠের পারে জমি কিনে খোড়ো ঘর তুলে
এই দেশে এই পথে এইসব ঘাস ধান নিম জামরুলে
জীবনের ক্লান্তি ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষার বেদনার শুধেছিল ঋণ;
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে সব দেখেছি যে,—মনে হয় যেন সেই দিন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> 'এখানে তোমরা তবু থাকিবে না? যাবে চ'লে তবে কোন্ পথে?
> সেই পথে আরো শান্তি—আরো বুঝি সাধ?
> আরো বুঝি জীবনের গভীর আস্বাদ?
> তোমরা সেখানে গিয়ে তাই বুঝি বেঁধে রবে আকাঙ্ক্ষার ঘর!...
> যেখানেই যাও চ'লে, হয় নাকো জীবনের কোনো রূপান্তর;
> এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর
> ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর!'
> বলিল অশ্বত্থ সেই ন'ড়ে ন'ড়ে অন্ধকারে মাথার উপর।[৯৯]

জীবনের অক্ষয় বৃক্ষ অশ্বত্থগাছ জীবনের পরিবর্তন লক্ষ করেছে। এর মধ্যে জন্মেছে ও মরেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। এ সময় সেখানকার কিছু লোক আরও শান্তির খোঁজে সে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়। জীবনানন্দ ১৯৩০-এর দশকে তাঁর পূর্বপুরুষদের ভূমি বরিশালে ফিরে এসেছিলেন। আর তাই অশ্বত্থকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে যারা প্রত্যাশিত সুখী জীবনের জন্য অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা ভাবছিল, তাদের তিরস্কার করে কবি হিসেবে তিনি গাছটির পক্ষে কথা বলেন। একজন মানুষ যখন ফাঁসির দড়ি হাতে গাছের একটি শাখার কাছে যায়, সেই জীবনবৃক্ষ আরেকটি প্রস্থানের প্রতিবাদ করেছিল।

মৃত্যু সব সময় জীবনানন্দকে আকর্ষণ করেছে। *রূপসী বাংলার* সনেটগুলো জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে চাপা উত্তেজনায় আকীর্ণ। কবি এখানে জবাবহীনতার উত্তর দিতে চেষ্টা করছেন: মৃত্যু কি বাংলাকে বঞ্চিত করে? আত্মহত্যার জন্য জেদের প্রকৃতির প্রতি জোর দেওয়ার সঙ্গে 'আট বছর আগের একদিন' এই সমস্যার সঙ্গে নতুনভাবে লড়াই শুরু করে—মানুষ কেন মৃত্যুকে বেছে নেয়।

বন্ধু সুধীরকুমার দত্ত, যাঁর চোখকে তিনি পাখির নীড়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, তাঁর জন্য এক শোকগাথায় জীবনানন্দ বলেন, 'মৃত্যু যেন জীবনেরই আর এক ফিরতি'। একই রচনায় তিনি পরে লেখেন:

> মনে হয় যতদিন জীবন থাকিবে মরণের সংঘাতে আসিয়া আসিয়া আমরা নানারকম ছবি দেখিব, স্বপ্ন দেখিব, প্রশ্ন করিব, কল্পনা করিব; কিন্তু ইহাকে লইয়া কোন time-table বা মানচিত্র তৈরি করিতে পারিব না। American touristদের মত আনন্দে ওপারে যাত্রা এবং উল্লাসে এপারে ফিরিয়া আসা সম্ভব হইবে না।[১০০]

চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর, সবকিছু আঁধারে ঢেকে গেলেও খাবারের খোঁজে পেঁচা জেগে থাকে, জীবন্ত। এমনকি অর্ধমৃত ব্যাঙ প্রার্থনা করে আরও কয়েক মুহূর্ত সময় কিংবা আরেকটি ভোরের। মশারাও বৌদ্ধবিহারের অন্ধকারে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বিরত না থেকে জীবনের রক্তস্রোতে শুঁড় ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করে যায়। মাছিগুলোও মৃতদেহ আর ময়লা ভাগাড় থেকে খাবার খুঁজে খায় যাতে বেঁচে থেকে ছুটে যেতে পারে রৌদ্রকিরণে; অন্যান্য পতঙ্গ-প্রাণিকুলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটও পূর্ণ জীবন বেঁচে থেকে খেলা করে সূর্যের জীবনদায়ী আলোয়। প্রত্যেকটা জীবিত প্রাণী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

যেন দুর্দম সীমাহীন অর্থবহ জীবন ভোগ করে। এমনকি দুষ্ট বালকের হাতে ধরা অসহায় ঘাসফড়িংও একাকী সংগ্রাম করে মৃত্যুর বিরুদ্ধে। প্রকৃতি আরও তীব্রতর করে মানুষের এই মর্মভেদী আচরণ। আর সব প্রাণিকুল যদি তাদের জীবনকে এত মূল্যবান মনে করে, তাহলে সে কেন তার জীবনকে এমন তুচ্ছ জ্ঞান করে? যদি সে জানে বাকিরা জীবনের জন্য কী মূল্য দেয়, সে কেন নিজেরটা ছেড়ে দেয় মূল্যহীন? অন্যান্য জীবকুল কি তার অস্বাভাবিক আচরণের প্রতিবাদ করেনি? প্রতিবাদ করেনি কি অশ্বত্থের শাখা? জোনাকিরা কি অন্ধকারের ভেতর জীবনের চিহ্ন জ্বেলে তাকে আলো দেখায়নি? দেখায়নি জীবনের সোনালি কুসুম? কালপেঁচা কি চিৎকার করে জানান দেয়নি যে অন্ধকারেও জীবন থাকে সচল, বলেনি কি যে, অন্ধকার কয়েকটা জীবনদায়ী ইঁদুর ধরার মস্ত সুযোগ করে দেয়?

কবিতাটির এক-তৃতীয়াংশ ধরে জীবনানন্দ নৈর্ব্যক্তিক নামপুরুষ থেকে ব্যক্তিক মধ্যম পুরুষ সর্বনামের সরাসরি ঠিকানায় চলে যান। আত্মহননের ঘটনাটা যখন ফাঁসিবৃক্ষে সংঘটিত হয়, তখন বাচ্যের এই পরিবর্তন আমাদের আতঙ্কবোধকে গভীরতর করে তোলে। আমরা এরই মধ্যে সরাসরি কথা বলে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলেছি। মানুষ ও বৃক্ষের সেই নাটকীয় সাক্ষাতের অনেক পরে কথক যখন মর্গে লাশটিকে দেখে, তখন আবেগবিধুর চঞ্চলতা প্রশমিত। সে কিছুটা বিচ্ছিন্ন তন্ময় হয়ে ভাবে, আত্মহত্যাটা কেন ঘটল। সে উপলব্ধি করে অথবা সে রকমই ভাবে যে মানুষের রক্তের ভেতর স্পর্শাতীত কিছু আছে, যা মানুষের জীবনকে ক্লান্ত করে।

এমনকি তবুও থুত্থুড়ে বুড়ি অন্ধ পেঁচা হৃদয়ে আশা নিয়ে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সব সময়ের মতো আগ্রহী। হয়তো বা তার সহজাত স্বভাবে উত্তেজনায় ডেকে ওঠে সে। চাঁদ ডুবে গেছে আবার। অন্ধত্ব সত্ত্বেও দু-একটা ইঁদুর সে আবার ধরবে। শ্রান্ত অন্ধ হয়ে আসা জীবন কি এখনো এত সুন্দর? ধারণা করা যায়, বুড়ি পেঁচা বলবে, হ্যাঁ। সে অন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত একটা জীবন কাটিয়ে এসেছে, এখন বসে থাকে বোধিবৃক্ষ বা সংসারবৃক্ষ—ফাঁসিগাছের ওপর। এখনো সে পুনর্নিশ্চিত করে জীবনকে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে কথক আত্মহননের বিষয়টিকে খারিজ করে দিয়ে পেঁচার জীবনের মতো একটা জীবনকে (আপাতত) নিশ্চিত করেন। সে আত্মহত্যা করবে না, তার বদলে মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সংগ্রাম চালু রেখে ভোগ করবে জীবন। যে সংগ্রাম করে না, তাকে মরতে হয় ইঁদুরের মতো। সব প্রাণী—পেঁচা যে রকম করে—তেমনি সক্রিয়ভাবে ভোগ করবে জীবনকে। একটা সচ্ছল প্রাচুর্যপূর্ণ পরিবেশ জীবনরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। একটা মানুষ বস্তুগতভাবে যা চেয়ে উঠতে পারে, আত্মহনন তার সবকিছুই দিতে পারত। কিন্তু তবুও সে দিনটা কিংবা জীবনের ভোগটাকে দখল করেনি।

তা সত্ত্বেও কবিতাটির শেষ স্তবকে জীবনানন্দ পেঁচা ও তার জীবনদায়ী ইঁদুরের চেয়ে মৃত্যু ও তার কারণগুলোর প্রতি অনেক বেশি উৎসাহী। বস্তুত শেষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্তবক ছাড়া পুরো কবিতাটাই অনুসন্ধান করে, কেন লোকটা নিজের মৃত্যুকে ডেকে নিয়ে আসে। সে কি ভূত দেখেছিল? নীরব আঁধার কি জানালা দিয়ে উটের মতো গলা বাড়িয়ে তার কানে কানে আত্মহত্যা করতে বলেছিল? দুটো সম্ভাবনাই নিশ্চিত করা অসম্ভব।

একটা তৃতীয় কারণ যা আত্মহননের ঘটনাটা ঘটিয়ে থাকতে পারে সেটা হয়তো সবার ভেতর বিরাজমান: জীবনানন্দ অন্তত‌পক্ষে বুঝতে পারেন, আত্মহত্যার ব্যাপারটা তাঁর ভেতরে বিরাজ করে, তাঁর রক্তের ভেতরে।

> আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
> আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতর
> খেলা করে
> আমাদের ক্লান্ত করে—

এই 'ব্যাপারটা' ক্লান্তির জন্ম দেয়, এমন ক্লান্তি, এমন অবসাদ যাকে কেবল মৃত্যুর ঘুম হয়তো অবসান করতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা—যাকে কবিতায় বলা হয়েছে 'বিপন্ন বিস্ময়'—রহস্যই থেকে যায়। বিপন্ন বিস্ময়টা যা-ই হোক না কেন, ক্লান্তির কারণ ঘটায় ও জোগায় আত্মহননের ইন্ধন। এই শব্দযুগলের ওপর নির্ভর করে ঝুলে আছে কবিতাটা। লোকটি অশ্বত্থগাছের মুখোমুখি হয় কবিতাটির আবেগের চরম পরিণতি হিসেবে, কিন্তু এসব কিছু ছাড়িয়ে প্রশ্ন ওঠে, লোকটি কেন আত্মহত্যা করে। কী এই 'বিপন্ন বিস্ময়'?

দীপ্তি ত্রিপাঠী বলেন, 'বিপন্ন বিস্ময়' সৃষ্টিশীলতার মানসিক যন্ত্রণাকে প্রতিনিধিত্ব করে:

> এই বিপন্ন বিস্ময় তো সৃষ্টির বেদনা। 'বোধ' কবিতাতেও কবি এই সৃষ্টির তাড়নায় কথা বলেছেন...
>
> স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
>
> হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
> আমি তারে পারি না এড়াতে
>
> ('বোধ', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*)

এই মহাশক্তির কাছে কবি অসহায়। সংসারী লোকজনের মতো প্রেম, সন্তান, সচ্ছলতা, খ্যাতি কবি-স্বরূপকে প্রকাশ করতে পারে না। অথচ সৃষ্টির দুর্মর আবেগের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামে তিনি ক্লান্ত।[১০১]

অন্য একজন গবেষক, রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, এই শব্দগুচ্ছকে মৃত্যুর প্রতি জীবনানন্দের সম্ভ্রম জাগানো ভয় ও অদ্ভুত চৌম্বকীয় আকর্ষণের প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেন। তিনিও 'বিপন্ন বিস্ময়' ও 'বোধ'-এর মধ্যে সম্পর্ক আছে বলে দেখতে পান:

> কবি মৃত্যুকেই বিস্ময়ের বোধে দেখেছেন। জীবনানন্দ প্রধানতঃ বিস্ময়বোধের কবি। রোমান্টিক কবির মতো এই বিস্ময়বোধ ঘাস, ফুল, নক্ষত্র, নদী, নারীর মতো মৃত্যুকেও মৃত্যুর অবারণ আকর্ষণকেও বড় বিস্ময়ের চোখে দেখেছেন। ঐ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

> মানুষটির সব ছিল, এখন মৃত্যুনিস্ব; ঐ মানুষটি কাল জীবিত ছিল আজ জীবিত নেই, এই আশ্চর্য কাণ্ডের কারণ খুঁজতে গিয়ে কবি বিপন্ন এবং বিস্মিত।[১০২]

'বিস্ময়' শব্দটি জীবনানন্দের কবিতায় বহুবার দেখা গেছে। শব্দটির মূল অর্থ আশ্চর্যকারী এক ধরনের মনোভাব বা আবেগ, কিন্তু কেউ যেকোনো কিছুর প্রতিই আকস্মিকভাবে বিস্মিত হতে পারে। *ধূসর পাণ্ডুলিপির* বর্ধিত সংস্করণে 'আট বছর আগের একদিন'-এর মতো একটা কবিতা আছে:

পাখি

ঘুমায়ে রয়েছ তুমি ক্লান্ত হয়ে, তাই
আজ এই জ্যোৎস্নায় কাহারে জানাই
আমার এ বিস্ময়—বিস্ময়ের ঠাঁই
নক্ষত্রের থেকে এল;—তুমি জেগে নাই,

আমার বুকের 'পরে এই এক পাখি;
পাখি? না ফড়িং কীট? পাখি? না জোনাকি?
বাদামি সোনালি নীল রোম তার রোমে রোমে রেখেছে সে ঢাকি,
এমন শীতের রাতে এসেছে একাকী

নিস্তব্ধ ঘাসের থেকে কোন্
ধানের ছড়ার থেকে কোথায় কখন,
রেশমের ডিম থেকে এই শিহরণ
পেয়েছে সে এই শিহরণ!

জ্যোৎস্নায়—শীতে
কাহারে সে চাহিয়াছে? কত দূর চেয়েছে উড়িতে?
মাঠের নির্জন খড় তারে ব্যথা দিতে
এসেছিল? কোথায় বেদনা নাই এই পৃথিবীতে!

না—না—তার মুখে স্বপ্ন সাহসের ভর;
ব্যথা সে তো জানে নাই—বিচিত্র এ জীবনের 'পর
করেছে নির্ভর;
রোম—ঠোঁট—পালকের এই তার মুগ্ধ আড়ম্বর।

জ্যোৎস্নায়—শীতে
আমার কঠিন হাতে তবু তারে হ'ল যে আসিতে,
যেই মৃত্যু দিকে দিকে অবিরল—তোমারে তা দিতে
কেন দ্বিধা? অদৃশ্য কঠিন হাতে আমিও বসেছি পাখি,
আমারেও মুষড়ে ফেলিতে

দ্বিধা কেহ করিবে না; জানি আমি, ভুল ক'রে দেবে নাকো ছেড়ে;
তবু আহা, রাতের শিশিরে ভেজা এ রঙিন তুলোর বলেরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোমল আঙুল দিয়ে দেখি আমি চুপে নেড়ে-চেড়ে,
সোনালি উজ্জ্বল চোখে কোন্ এক ভয় যেন ঘেরে

তবু তার; এই পাখি—এতটুকু—তবু সব শিখেছে যে—এ এক বিস্ময়
সৃষ্টির কীটেরো বুকে এই ব্যথা ভয়;
আশা নয়—সাধ নয়—প্রেম স্বপ্ন নয়
চারিদিকে বিচ্ছেদের ঘ্রাণ লেগে রয়;

পৃথিবীতে, এই ক্লেশ ইহাদেরো বুকের ভিতর;
ইহাদেরো; অজস্র গভীর রং পালকের 'পর
তবে কেন? কেন এ সোনালি চোখ খুঁজেছিল জ্যোৎস্নার সাগর?
আবার খুঁজিতে গেল কেন দূর সৃষ্ট চরাচর।[১০৩]

একটা পাখি মরে পড়ে আছে, যদিও কথক তাকে নমনীয়ভাবে বলতে চাইছেন, ঘুমোচ্ছে। তিনি মৃত পাখিটির সঙ্গে সরাসরি মধ্যম পুরুষে কথা বলছেন, আর তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন নাম পুরুষে, বাচ্যের এই পরিবর্তন তিনি 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় আরও নাটকীয়ভাবে ব্যবহার করেছেন, যেখানে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কবির বক্তব্যের একই দৃষ্টান্ত রয়েছে। সেখানে বিষয় ছিল একজন মানুষ যে নিজের জীবন নিজেই নিয়েছে, এখানে পাত্র মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। এখানে কবি আবার জিজ্ঞেস করছেন, কেন এই মৃত্যু। অথবা তিনি জিজ্ঞেস করছেন তাকে যখন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতেই হবে, তাহলে কেন সে বাঁচতে এসেছিল। তিনি বলেন, 'ক্লেশ ইহাদেরও বুকের ভিতর।' এবং কবি নিজেও একদিন মারা যাবেন, তিনিও মৃত্যুর অদৃশ্য কর্কশ হাতে ধরা। পৃথিবীতে বিদায়ের দুর্গন্ধ ছড়ায়—জীবিত বিশ্ব থেকে জীবনের বিচ্ছেদ। প্রথমে কবি ভাবেন এই বোবা পাখি খুশিমনে মারা গেছে। কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠ পরীক্ষার পর তিনি দেখেন মানুষের মতো পাখিও যন্ত্রণা ভোগ করে। বর্ণিল পালকের নিচে তার হৃদয়েও আছে দুঃখ, ভয় ও যন্ত্রণা। এই উপলব্ধিতে আমাদের কথকের 'বিস্ময়' জাগে।

রূপসী বাংলায় সনেটের বাইরে যে কয়েকটি কবিতা রয়েছে, তার শেষটিতে 'আশ্চর্য বিস্ময়' শব্দবন্ধটি রয়েছে। এই কবিতা ও একটি সনেটে জীবনানন্দের 'বিস্ময়' বোধ করার আরও দুটি প্রাসঙ্গিক পরিবেশের কথা রয়েছে।

একদিন কুয়াশার এই মাঠে আমারে পাবে না কেউ খুঁজে আর, জানি;
হৃদয়ের পথ-চলা শেষ হল সেই দিন—গিয়েছে সে শান্ত হিম ঘরে,
অথবা সান্ত্বনা পেতে দেরি হবে কিছু কাল—পৃথিবীর এই মাঠখানি
ভুলিতে বিলম্ব হবে কিছু দিন, এ মাঠের কয়েকটা শালিকের তরে
আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি চেয়ে রবো কিছু কাল অন্ধকার বিছানার কোলে,
আর সে সোনালি চিল ডানা মেলে দূর থেকে আজো কি মাঠের কুয়াশায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভেসে আসে? সেই ন্যাড়া অশ্বত্থের পানে আজো চ'লে যায়
সন্ধ্যা সোনার মতো হলে?
ধানের নরম শিষে মেঠো ইঁদুরের চোখ নক্ষত্রের দিকে আজো চায়

সন্ধ্যা হলে? মউমাছি চাক আজো বাঁধে না কি জামের নিবিড় ঘন ডালে,
মউ খাওয়া হয়ে গেলে আজো তারা উড়ে যায় কুয়াশায় সন্ধ্যার বাতাসে—
কত দূরে যায়, আহা...অথবা হয়তো কেউ চালতার ঝরাপাতা জ্বালে
মধুর চাকের নিচে—মাছিগুলো উড়ে যায়...ঝ'রে পড়ে...ম'রে থাকে ঘাসে—

ভেবে ভেবে ব্যথা পাব;—মনে হবে, পৃথিবীর পথে যদি থাকিতাম বেঁচে,
দেখিতাম সেই লক্ষ্মীপেঁচাটির মুখ যারে কোনোদিন ভালো ক'রে দেখি নাই আমি—
এমন লাজুক পাখি,—ধূসর ডানা কি তার কুয়াশার ঢেউয়ে ওঠে নেচে;
যখন সাতটি তারা ফুটে ওঠে অন্ধকারে গাবের নিবিড় বুকে আসে সে কি নামি?

জিউলির বাবলার আঁধার গলির ফাঁকে জোনাকির কুহকের আলো
ঝরে না কি? ঝিঁঝির সবুজ মাংসে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে বউদের প্রাণ
ভুলে যায়; অন্ধকারে খুঁজে তারে আকন্দবনের ভিড়ে কোথায় হারালো
মাকাল লতার তলে শিশিরের নীল জলে কেউ তার পাবে না সন্ধান।

আর সেই সোনালি চিলের ডানা—ডানা তার দূর থেকে আজো কি মাঠের কুয়াশায়
ভেসে আসে?—সেই ন্যাড়া অশ্বত্থের পানে আজো চ'লে যায়
সন্ধ্যা সোনার মতো হলে?
ধানের নরম শিষে মেঠো ইঁদুরের চোখ নক্ষত্রের দিকে আজো চায়?
আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি চেয়ে রব কিছুকাল অন্ধকার বিছানার কোলে।[১০৪]

এবং

এখানে প্রাণের স্রোত আসে যায়—সন্ধ্যায় ঘুমায় নীরবে
মাটির ভিটের 'পরে—লেগে থাকে অন্ধকার ধুলোর আঘ্রাণ
তাহাদের চোখে-মুখে;—কদমের ডালে পেঁচা গেয়ে যায় গান;
মনে হয় একদিন পৃথিবীতে হয়তো এ-জ্যোৎস্না শুধু র'বে
এই শীত র'বে শুধু; রাত্রি ভ'রে এই লক্ষ্মীপেঁচা কথা ক'বে—
কাঁঠালের ডাল থেকে হিজলের ডালে গিয়ে করিবে আহ্বান
সাপমাসী পোকাটিরে...সেই দিন আঁধারে উঠিবে ন'ড়ে ধান
ইঁদুরের ঠোঁটে-চোখে; বাদুড়ের কালো ডানা করমচাপল্লবে

কুয়াশারে নিঙড়ায়ে উড়ে যাবে আরো দূর নীল কুয়াশায়,
কেউ তাহা দেখিবে না;—সেদিন এ-পাড়াগাঁর পথের বিস্ময়
দেখিতে পাব না আর—ঘুমায়ে রহিবে সব; যেমন ঘুমায়
আজ রাতে মৃত যারা; যেমন হতেছে ঘুমে ক্ষয়
অশ্বত্থ ঝাউয়ের পাতা চুপে চুপে আজ রাতে, হায়;
যেমন ঘুমায় মৃতা,—তাহার বুকের শাড়ি যেমন ঘুমায়।[১০৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ বিস্ময় ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গে, কখনো বিশেষত তাঁর প্রিয় বাংলায় দেখা জীবনের মহিমার প্রতি নিজের অনিঃশেষ অক্লান্ত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রকাশ করতে, কখনো বা মৃত্যুর ধারণাকে ভীতিবিহ্বলতাসদৃশ আকর্ষণ হিসেবে উপস্থাপন করতে। বিশেষভাবে বলতে গেলে তাঁর কবিকৃতি এবং ঘটনাপঞ্জির একজন সংবেদনশীল লিপিকার হিসেবেও তাঁর চিত্রায়িত রক্তের মধ্যে গতিশীল বিপন্ন বিস্ময়েও সেই জীবনের অধিকারী ক্লান্তিতে মৃত্যুবরণ করতে পারে। আত্মহত্যার বিপরীতে জীবনানন্দ যেন শিশুর হাতের ঘাসফড়িং কিংবা বুড়ি থুড়থুড়ে পেঁচা—'অন্ধকার বিছানা' থেকে কেবল তাকিয়ে না থেকে বরং জীবনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে সংগ্রামমুখর। আমাদের কবি 'জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার' থেকে মুখ ফিরিয়ে আত্মহত্যার কারণ বুঝতে পারেন না। তাই জানতে চান জীবনের বৃক্ষ থেকে আহৃত কেন এই স্বেচ্ছামৃত্যুর চূড়ান্ত যাত্রা। ক্লান্তি সত্ত্বেও, 'জাগিবার গাঢ় বেদনার' জ্ঞান সত্ত্বেও তাঁর জীবনও রয়েছে অদৃশ্য হাতের ওপর, যা তাঁকে যেকোনো দিন ছুড়ে ফেলতে দ্বিধা করবে না জেনেও জীবনানন্দ মৃত্যুকে গ্রহণ করবেন শুধু যদি তাঁকে 'মেঠো ইঁদুরের মতো মরণের ঘরে' ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কেবল কাব্যিক দক্ষতা ও গতিশীল দৃষ্টি জীবনানন্দকে 'আট বছর আগের একদিন'-এ এত বিস্ময়কর শ্রবণগ্রাহ্যভাবে বিস্মিত হতে পারঙ্গম করেছে। তিনি জীবন্মৃত্যুর দ্বিবিভাজন সৃষ্টিকারী দ্বৈততা[১০৬] ও সংঘাতের গভীরতার কিনারা করেন এবং নিরীক্ষা করে দেখেন 'এই কুয়াশার মাঠ'-এর নকশায় গঠিত ক্লান্তি ও প্রলোভনের খেলা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তথ্যসূত্র

১. *জুবিলী* (বি এম ইনস্টিটিউশনের ৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মারক প্রকাশনা), বরিশাল, ১৮৮৪-১৯৩৪, ১৯।

২. জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপিগুলো ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া, কলকাতায় বিশেষ সংগ্রহ হিসেবে রক্ষিত আছে। কয়েকটা ছাড়া সব কটি ছোটগল্পের নোটবইয়ে ১৯৩১ অথবা ১৯৩২-এর তারিখ দেওয়া আছে। সেই কয়েকটি ব্যতিক্রমের মধ্যে যেসব লেখা রয়েছে, সেগুলোর তারিখ ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালের। ১৯৩১-এর তারিখসংবলিত একটি নোটবই থেকে প্রকাশিত একটা গল্প 'আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস', তার পর পরই আছে 'সঙ্গ, নিঃসঙ্গ'। দ্রষ্টব্য, দেবেশ রায় সম্পাদিত: *জীবনানন্দ সমগ্র*, প্রথম খণ্ড। প্রথম গল্পটি সম্ভবত লেখা হয়েছিল ১৯৩১ সালে এবং পরেরটি ১৯৩৩ সালে, প্রাগুক্ত, ৪৫৭-৪৫৮। আরও তিনটি গল্প অশোকানন্দ *অনুক্ত* পত্রিকায় প্রকাশ করতে দিয়েছিলেন পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি: 'ছায়ানট', 'গ্রাম ও শহরের গল্প' ও 'বিলাস'। দ্রষ্টব্য, সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তফী সম্পাদিত *জীবনানন্দ দাশের গল্প* (কলকাতা: দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৭২)। একই সময়ের জীবনানন্দের কবিতার রচনাশৈলীর সঙ্গে তুলনা করে এগুলোর প্রথম ও দ্বিতীয়টির রচনাকাল ধারণা করা হয় ১৯৩২ ও ১৯৩৬। দ্রষ্টব্য, ভূমিকা, *জীবনানন্দ দাশের গল্প*, ১৪, ১৬। তৃতীয় গল্প, 'বিলাস' সম্ভবত লেখা হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। দ্রষ্টব্য, সুনীলকুমার নন্দী, *অনুক্ত*, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৭, ১৩৯। আরও ৩৬টা খাতায় পাঁচটা দীর্ঘ উপন্যাস, অনামিত রচনা (১৯৩৩) এবং চল্লিশের দশকের শেষের দিকে লেখা আরও চারটি হচ্ছে: 'মাল্যবান' (১৯৪৮), 'সুতীর্থ' (তারিখবিহীন), 'জলপাইহাটি' (১৯৪৮) ও 'বাসমতীর উপাখ্যান' (১৯৪৯)।

৩. *ধূসর পাণ্ডুলিপির* '১৩৩৩' থেকে, ৬৫-৬৮, *প্রগতি*, বৈশাখ ১৩৩৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৪. *ধূসর পাণ্ডুলিপির* 'সহজ' থেকে, ২০-২১, *প্রগতি*, আষাঢ় ১৩৩৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৫. *ধূসর পাণ্ডুলিপির* 'বোধ' থেকে, ৪১-৪৪, *প্রগতি*, ভাদ্র ১৩৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৬. 'ছায়ানট', *জীবনানন্দ দাশের গল্প*, ৩২-৩৫, সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তফী সম্পাদিত।

৭. 'গ্রাম ও শহরের গল্প', *জীবনানন্দ দাশের গল্প*, ৬১-৬৪।

৮. 'সঙ্গ, নিঃসঙ্গ', *জীবনানন্দ সমগ্র*, দেবেশ রায় সম্পাদিত, ৪১৪-১৬।

৯. ভূমিকার মুখোমুখি পাতায় অশোকানন্দ দাশ এসব সনেটের রচনাকাল দেখান মার্চ ১৯৩২। ১৯৫৭ (প্রকাশ করার সাল) থেকে ২৫ বাদ দিলে হবে ১৯৩২, তবে এই নোটবইয়ে জীবনানন্দের স্বহস্তে লেখা তারিখ আছে 'মার্চ ১৯৩৪'। দ্রষ্টব্য, *রূপসী*

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাংলা : প্রকাশিত-অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও পাঠান্তর সংস্করণ, দেবেশ রায় সম্পাদিত (কলকাতা : প্রতিক্ষণ প্রকাশন বিভাগ, ১৯৮৪)।

১০. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত : *মধুসূদন রচনাবলী*, ৪৭।

১১. শিশিরকুমার দাশ, 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বাংলা সনেট' *মহফিল* ৩, চতুর্থ সংখ্যা (১৯৬৭) : ১০২।

১২. দ্রষ্টব্য, উত্তমকুমার দাশ, *বাংলা সাহিত্যে সনেট* (কলকাতা : কবি ও কবিতা ১৯৭৩)। আরও দ্রষ্টব্য, শিশিরকুমার দাশ, *চতুর্দশী* (কলকাতা : সম্বোধি পাবলিকেশনস, ১৯৬৬)।

১৩. *ময়ূখ*, পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১-৬২, ১৯৫।

১৪. প্রাগুক্ত, ১৯৬-৯৬। অশোকানন্দ, যিনি *ময়ূখ*-এ এই সনেটটি প্রকাশ করেছিলেন, তিনি জীবনানন্দের প্রথম দিককার ইংরেজি লেখা-সম্পর্কিত তথ্যের একমাত্র সূত্র। তিনি জীবনানন্দের ছাত্রাবস্থায় লেখা আরেকটা ইংরেজি সনেটসহ অন্যান্য কবিতার নমুনা সরবরাহ করেছেন। দ্রষ্টব্য, অশোকানন্দ দাশ, 'বাল্যস্মৃতি', ১৩৮-৪০। তিনি আরও জানান, জীবনানন্দ তাঁর স্কুলজীবনে বহু গান রচনা করেছেন, কিন্তু তার কোনোটাই প্রকাশ করেননি। দ্রষ্টব্য, অশোকানন্দ দাশ, 'আমার দাদা জীবনানন্দ দাশ', ৫।

১৫. বিষ্ণু দের সৌজন্যে। প্রভাসচন্দ্র ঘোষ ছিলেন দিল্লির রামযশ কলেজে সহকর্মী বাংলার শিক্ষক, জীবনানন্দ ১৯৩০ সালে তাঁকে সেখান থেকে ছেড়ে এসেছিলেন। *পরিচয়* ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি শ্রাবণ ১৩৩৮ (জুলাই ১৯৩১) সালে প্রকাশনা শুরু করে; দ্বিতীয় সংখ্যাটি বের হয় অক্টোবর ১৯৩১ সালে, জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতাটি জানুয়ারি ১৯৩২ সালে তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৬. *রূপসী বাংলা*, ৩৬।

১৭. প্রাগুক্ত, ৩৮।

১৮. প্রাগুক্ত, ২৪।

১৯. প্রাগুক্ত, ১৭।

২০. কালীদহ পুরাণের বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করে। বৈষ্ণবমতে কৃষ্ণ কালীয় দমন করেছিলেন যমুনার কালীদহে।

২১. প্রাগুক্ত, ২৯।

২২. প্রাগুক্ত, ১৩।

২৩. প্রাগুক্ত, ২২।

২৪. আলোক সরকার, 'জীবনানন্দ', *দৈনিক কবিতা*, ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ৪।

২৫. *রূপসী বাংলার* ভূমিকা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অশোকানন্দ দাশ উদ্ধৃতিটির কোনো সূত্র উল্লেখ করেননি এবং এতে মনে হয়, এটি নোটবইয়ে ছিল, আসলে তা নয়।

২৬. সঞ্জয় ভট্টাচার্য, *কবি জীবনানন্দ দাশ* (কলকাতা : ভারবি, ১৯৭০), ৪৯।

২৭. কবিতা নোটবই নং ৩, ১৯৩১, ১৬; জীবনানন্দ দাশ সংগ্রহ, ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া।

২৮. বুদ্ধদেব বসুর সাক্ষাৎকার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৯. অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর 'চতুর্থ দশক' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন, "১৯৩০ [আসলে ১৯৩১] সালে সুধীন্দ্রনাথের 'কাব্যের মুক্তি' প্রকাশিত হয়েছিল, সেই নিবন্ধে শোনা গিয়েছিল বাংলাদেশে আধুনিক কবিতার নান্দীপাঠ, যেমন ইংরেজি ভাষায় হয়েছিল কিছু আগে এলিয়টের 'ট্র্যাডিশন অ্যান্ড দ্য ইনডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট' প্রবন্ধে।" অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত: *আধুনিক কবিতার ইতিহাস* (কলকাতা: বাকসাহিত্য, ১৯৬৫), ৮০।

৩০. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'কাব্যের মুক্তি', *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ* (কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ: জুন ২০০০) ২৪, ৩৩।

৩১. বিষ্ণু দে ও হিরণকুমার সান্যালের সাক্ষাৎকার।

৩২. বিষ্ণু দের সাক্ষাৎকার।

৩৩. হায়াৎ মামুদ, *মৃত্যুচিন্তা রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জটিলতা* (ঢাকা: সাহিত্যিকা, ১৯৬৪), ৪১।

৩৪. কল্যাণকুমার বসু ও সত্যপ্রসন্ন দত্তের সৌজন্যে। আমার জানামতে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে কখনোই তাঁর ভাবনা লেখেননি।

৩৫. সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছেন: 'তাঁদের সাহিত্যিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সজনীকান্ত শেষ পর্যন্ত সত্যিকার বন্ধুত্ব দেখিয়ে গেছেন এবং সেই শেষ দুদিনে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বাক-হীন প্রকাশ দেখেছি আমি। আমি সব সময় এটা স্মরণ রাখব। কারণ, এঁরাই সেসব লোক, যাঁদের ওপর জীবনানন্দ কখনোই নির্ভর করেননি।' *কবি জীবনানন্দ দাশ*, ১৪৭-৪৮।

৩৬. বুদ্ধদেব বসুর সাক্ষাৎকার।

৩৭. সত্যপ্রসন্ন দত্ত ও পরমানন্দ সরস্বতী সাধুর (মৃণালকান্তি দাশ) সাক্ষাৎকার।

৩৮. হরীন্দ্রনাথ দত্ত, 'ঘরের মানুষ: কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত', *কবিতা বিতা*, বৈশাখ [১৩৭৭], পৃষ্ঠাসংখ্যা নেই।

৩৯. *ধূসর পাণ্ডুলিপি*, ৫০-৫২, *পরিচয়* পত্রিকায়, মাঘ ১৩৩৮, প্রকাশিত।

৪০. অশোকানন্দ দাশ, 'বাল্যস্মৃতি', ১৩৪।

৪১. প্রাগুক্ত।

৪২. *শনিবারের চিঠি*, মাঘ ১৩৩৪, ৬৬৯-৭২।

৪৩. *সজনে* এখানে স্পষ্টতই সজনীকান্তের প্রতি ইঙ্গিত।

৪৪. সন্দীপ দত্ত সম্পাদিত: *জীবনানন্দ প্রাসঙ্গিকী* (কলকাতা: হার্দ্য, ১৯৮৪), ১৫৮-৫৯।

৪৫. বুদ্ধদেব বসু, *কালের পুতুল* (কলকাতা: নিউ এজ পাবলিকেশনস, ১৯৫৯), ১৪৫।

৪৬. *ধূসর পাণ্ডুলিপি*, ৮০-৮১, *কবিতা*, আশ্বিন ১৩৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত। *ধূসর পাণ্ডুলিপিতে* প্রকাশিত ভাষ্য *কবিতা* পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকে যথেষ্ট ভিন্ন এবং *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতার*, দ্বিতীয় সংস্করণ: (কলকাতা: ভারবি, ১৯৬৮) ভাষ্য থেকেও কিছুটা আলাদা।

৪৭. জীবনানন্দ দাশ, *কবিতার কথা*, দ্বিতীয় সংস্করণ: (কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ১৯৬৩), ৯।

৪৮. সমালোচনাটি এখানে টি এস এলিয়ট ও তাঁর 'ট্র্যাডিশন অ্যান্ড দ্য ইনডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট'-এর প্রতি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৯. 'অন পোয়েট্রি', বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত : *অ্যান এনথোলজি অব বেঙ্গলি রাইটিং* (বম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতা : ম্যাকমিলান কোম্পানি অব ইন্ডিয়া, ১৯৭১), ৯৯-১০০।

৫০. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সৌজন্যে।

৫১. 'অন পোয়েট্রি', বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত : *অ্যান এনথোলজি অব বেঙ্গলি রাইটিং,* ১০৩-৪।

৫২. বাংলার চিরায়ত লোককথার নায়িকা হিসেবে কঙ্কাবতীর নাম এসেছে লোকছন্দে রচিত জসীমউদ্‌দীনের *সোজন বাদিয়ার ঘাট* গীতিকাব্যে, এটি প্রকাশিত হয় দুই বছর আগে ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৭ সালে বুদ্ধদেব বসু একটা কবিতা সংকলন প্রকাশ করেছিলেন *কঙ্কাবতী* নামে, তার মধ্যে একই নামে একটা কবিতা ছিল। জীবনানন্দ দাশ—*কবিতা,* পৌষ ১৩৪৪ সংখ্যায়—বইটির ওপর আলোচনা করেছিলেন। তার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'সময় ও মৃত্তিকার ভিতর বাসা বেঁধে "কঙ্কাবতী" মৃত্তিকা ও সময়োত্তর কাব্য।' (বুদ্ধদেব বসুর বড় নাতনি নিজেও একজন লেখক, তাঁর নামও কঙ্কাবতী)। উনিশ শতকের শেষ দিকে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় *কঙ্কাবতী* (১৮৯২) নামে একটা পূর্ণাঙ্গ বই লিখেছিলেন, যার নামচরিত্রের ছোট মেয়েটি জ্বরের ঘোরে কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়।

৫৩. ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে জীবনানন্দকে লেখা রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত উত্তর এবং ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে রবীন্দ্রনাথকে জীবনানন্দের চিঠি যদিও কোনো নির্দিষ্ট বই সম্পর্কে কোনো সরাসরি ইঙ্গিত দেয় না, তবে এগুলো *ঝরা পালক* সম্পর্কে তাঁদের পত্রালাপের অংশ হতে পারে। দ্রষ্টব্য, আবদুল মান্নান সৈয়দ, *শুদ্ধতম কবি,* ২৫০-৫২।

৫৪. বুদ্ধদেব বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির পুরোটাই ছাপা হয়েছিল *কবিতা* পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায়, পৌষ ১৩৪২।

৫৫. *কবিতা,* চৈত্র ১৩৪৩, পৃষ্ঠাসংখ্যা নেই।

৫৬. *কবিতা,* পৌষ ১৩৬১, ১৫২ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

৫৭. নীলরতন সেন, 'ছন্দকুশলী', *জীবনানন্দ স্মৃতি,* দেবকুমার বসু সম্পাদিত (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৯৭১), ২৫।

৫৮. *ধূসর পাণ্ডুলিপি,* ৭৯।

৫৯. *ধূসর পাণ্ডুলিপি,* ৯৯।

৬০. অশোকানন্দ দাশ, *ধূসর পাণ্ডুলিপির* ভূমিকা।

৬১. *ধূসর পাণ্ডুলিপি,* ১০১, *কবিতা,* আশ্বিন ১৩৪৩ সংখ্যায় 'নদী' নামে প্রকাশিত, *ধূসর পাণ্ডুলিপিতে* এর নাম হয় 'নদীরা'। এর পাণ্ডুলিপিটি একই নোটবইয়ের অংশ, যেটিতে 'শকুন' কবিতাটি পাওয়া যায়, ১৯৩১-৩২ সাল-সংবলিত।

৬২. জীবনানন্দ দাশ, 'বেঙ্গলি পোয়েট্রি টুডে', *স্টেটসম্যান* (কলকাতা), ৬ নভেম্বর ১৯৪৯, সানডে সেকশন, ১১।

৬৩. বুদ্ধদেব বসু, *কালের পুতুল,* ৩২।

৬৪. প্রাগুক্ত, ২৭।

৬৫. প্রাগুক্ত, ২৯।

৬৬. প্রাগুক্ত, ৩১।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৬৭. প্রাগুক্ত, ৩২, ৩৩।

৬৮. গিরিজাপতি ভট্টাচার্যকৃত *ধূসর পাণ্ডুলিপির* আলোচনা, *পরিচয়,* বৈশাখ ১৩৪৪, ৪০০।

৬৯. বুদ্ধদেব বসুর সৌজন্যে।

৭০. *বনলতা সেন,* ৯, *কবিতা*, পৌষ ১৩৪২।

৭১. দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়,* ১৮৫।

৭২. '...মুখে তার পাখীর নীড়ের মতো আশ্বাস ও আশ্রয়ের...', 'সুধীরকুমার', *স্মৃতি-তর্পণ,* ১৩৬।

৭৩. *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* ৬৫; *কবিতা* আশ্বিন ১৩৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৭৪. *বনলতা সেন,* ৩৯।

৭৫. *রূপসী বাংলা,* ৪৯ : 'তুমি কেন বহু দূরে'।

৭৬. *বনলতা সেন,* ১২-১৩, *কবিতা,* চৈত্র ১৩৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৭৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী* (পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৬৫), ১৬ : ৫।

৭৮. *রবীন্দ্র রচনাবলীর* সম্পাদকমণ্ডলীর মতে প্রবন্ধটির পুনর্নামকরণ করা হয় 'কাব্য ও ছন্দ' নামে এবং তাঁর *সাহিত্যের স্বরূপ* (১৯৪৩) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দ্রষ্টব্য, *রবীন্দ্র রচনাবলী* (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৬৫), ২৭ : ২৬৬-২৬৮, ৬১৪।

৭৯. সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'আমার কবিতা', *পূর্বাশা,* আষাঢ় ১৩৭৬, ২৬২।

৮০. প্রাগুক্ত, ২৬৩; শ্রাবণ ২১, [১৩৪৪], সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠি।

৮১. *বনলতা সেন,* ১৯-২০।

৮২. *রূপসী বাংলা,* ৪৬।

৮৩. *বনলতা সেন,* ২১-২২।

৮৪. *চতুরঙ্গ,* মাঘ ১৩৬২।

৮৫. *বনলতা সেন,* ১৫। 'ঘাস' নামে দুটো কবিতা ছাপা হয়েছিল, দুটোই *কবিতা* পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৩৫ ও সেপ্টেম্বর ১৯৪১ সংখ্যায়। এখানকার উদ্ধৃতিটি ডিসেম্বর ১৯৩৫ সংখ্যার।

৮৬. *বনলতা সেন,* ১৮; *কবিতা,* আষাঢ় ১৩৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৮৭. কোকশাস্ত্রের সংস্কৃত ভাষ্যে চার প্রকৃতির নারীর বর্ণনা আছে, অ্যালেক্স কমফর্ট অনূদিত (লন্ডন : জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, ১৯৬৪), ১০৩।

৮৮. *রূপসী বাংলা,* ৩৮।

৮৯. *বনলতা সেন,* ১৬; *কবিতা,* চৈত্র ১৩৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৯০. বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন 'হায় চিল' ও ডব্লিউ বি ইয়েটসের 'হি রিপ্রুভস দ্য কার্লিউ'র মধ্যকার সাদৃশ্য খুব কাছাকাছি। জীবনানন্দ ও ইয়েটসের কবিতা দুটোর প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছাড়াও বুদ্ধদেব জীবনানন্দের ওপর শেলি, কিটস, প্রাক-রাফায়েল গোষ্ঠীর কবি ও ইয়েটসের প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তীতে আবদুল মান্নান সৈয়দ একদিকে জীবনানন্দের; অন্যদিকে এডগার অ্যালান পো, শেলি, কিটস, ইয়েটস ও ডিলান টমাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরণগুলো থেকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে আমাদের দেখান যে জীবনানন্দের সবচেয়ে বেশি ঋণ ছিল ইয়েটসের প্রতি। *শুদ্ধতম কবি,* ৭৮-৮৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৯১. *রূপসী বাংলা*, ২১, ২৬, ৩৪ : 'গোলপাতা ছাউনির', 'কখন সোনার রোদ', 'শ্মশানের দেশে তুমি'।

৯২. প্রাগুক্ত, ২৩।

৯৩. জীবনানন্দ দাশ, *মহাপৃথিবী*, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ১৯৬৯), ২৬-২৯।

৯৪. জীবনানন্দ ইংরেজি *মর্গ* ও 'লাশকাটা ঘর', দুটোই ব্যবহার করেন, দুটোই সমার্থক, অন্তত পক্ষে এই কবিতায়।

৯৫. অশোকানন্দ দাশ, 'বাল্যস্মৃতি', ১৩৭।

৯৬. দীপ্তি ত্রিপাঠী নবজীবনকে ষষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত না করেও ঠিক একই ধারণা ব্যক্ত করেছেন, *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, ১৮১।

৯৭. *রূপসী বাংলা*, ২৪।

৯৮. *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, অনুবাদ ও ভাষ্য : স্বামী চিন্তাবানন্দ (তিরুপ্পারাইত্তুরাই : শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবন, ১৯৭২), ৭৪৯।

৯৯. *মহাপৃথিবী*, ২৫, *কবিতা*, আশ্বিন ১৩৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত।

১০০. 'সুধীরকুমার', *স্মৃতি-তর্পণ*, ১২৬-২৭।

১০১. দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, ১৮২।

১০২. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, *জীবনানন্দ প্রতিভা*, ৪৫।

১০৩. *ধূসর পাণ্ডুলিপি*, ৮৯-৯০।

১০৪. *রূপসী বাংলা*, ৬৯-৭০, মুদ্রিত ও পাণ্ডুলিপির ভাষ্যের কয়েক জায়গায় বৈসাদৃশ্য আছে। আমি পাণ্ডুলিপির ভাষ্য অনুসরণ করেছি। দ্রষ্টব্য, দেবেশ রায়, *রূপসী বাংলা : প্রকাশিত-অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও পাঠান্তর সংস্করণ*, ১৭৭-৭৯।

১০৫. প্রাগুক্ত, ৪০।

১০৬. এডওয়ার্ড সি ডিমক, জুনিয়র, এই কবিতায় জীবন ও মৃত্যুর মধ্যকার সম্পর্ক পরীক্ষা করেন, তবে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। 'দ্য পোয়েট অ্যাজ মাউস অ্যান্ড আউল : রিফ্লেকশনস অন আ পোয়েম বাই জীবনানন্দ দাশ', *জার্নাল অব এশিয়ান স্টাডিজ*, ৩৩, সংখ্যা ৪ (আগস্ট ১৯৭৪) : ৬০৩-১০।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধকাল : প্রস্তাবনা ও ফলাফল

> চল্লিশের দশকে বিপ্লব-বিশ্বাসী কবিদের হট্টগোলে নির্জনতার সাধক জীবনানন্দ ভবিষ্যতের সুস্থ মানব-সমাজের পথেই চলেছেন কবিতার ভিন্ন আলো জ্বেলে।
>
> —সঞ্জয় ভট্টাচার্য, *কবি জীবনানন্দ দাশ*

১

১৯৩০-এর দশকের শেষে এবং পরবর্তী দুই দশকে রাজনীতি বাংলা সাহিত্যে গভীরভাবে ছাপ রেখে যায়। *পরিচয়* পত্রিকায় জীবনানন্দের *ধূসর পাণ্ডুলিপির* আলোচক রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তির মাত্রাবিচারে আধুনিক কবিদের দুটি শ্রেণীর কথা বলেছিলেন। উপরন্তু সেই আলোচক জীবনানন্দের রচনাভঙ্গি, যেমন ছন্দ ও শব্দ নির্বাচন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। ১৯৪০-এর দশকের শেষ দিকে এবং ১৯৫০-এর দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নয়, প্রথামাফিক সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যও নয়, বহু আলোচক সাহিত্যের শিল্পগুণ পরিমাপ করতেন রাজনৈতিক মাপকাঠি দিয়ে।

১৯৪০-এর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্ক্সবাদে দীক্ষা নেওয়া বাঙালি লেখকদের প্রসঙ্গ অবশ্যই বিবেচনায় আনা উচিত। আগের দশকগুলোতে সাহিত্যিকেরা নিজেদের আধুনিক ও প্রথাগত ধারায় বিভক্ত বলে মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত ও আধুনিক উভয় ধারার বলে প্রমাণিত ও প্রভাবশালী ছিলেন উভয় শিবিরেই। তবে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে ১৯৪০-এর আগে মার্ক্সবাদ প্রভাব বিস্তার করার আগ পর্যন্ত আধুনিক ও প্রথাগত—এই দুটো ছিল সাধারণ বিভাগ, যার যেকোনো একটিতে লেখকেরা পড়তেন। কিছু লেখক সরাসরি কমিউনিস্ট হয়ে যান, অন্যরা ছিলেন সমর্থক, তবে বাকিরা সমর্থকও ছিলেন না। লেখকদের কেউ কেউ সাহিত্যিক-রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধাচরণ করে একজোট হন, অন্যরা কোনো ধরনের রাজনৈতিক আনুগত্য থেকে মুক্ত ছিলেন। জীবনানন্দ এ ধরনের দলের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন দূরবর্তীভাবে, তবে তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক সচেতনতা প্রতিফলিত হতে থাকে আগের চেয়ে বেশি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯২৮ সালে কমিন্টার্নের ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেস সব জায়গার কমিউনিস্ট পার্টির জন্য খুব শক্ত গোঁড়া নীতিমালা প্রবর্তন করে। এর সদস্যরা খাঁটি কমিউনিস্ট, বাকিরা শত্রু হিসেবে পরিত্যাজ্য—এটাই ছিল মনোভাব। সমাজতান্ত্রিক কিংবা বামঘেঁষা কোনো সংগঠনকে কমিউনিস্ট পার্টি প্রশ্রয় দিত না। ১৯৩৫ সালের আগস্টে কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসে দত্ত-ব্র্যাডলি তত্ত্ব* অনুসারে পার্টির গোঁড়া মনোভাবকে *পপুলার ফ্রন্ট* দর্শনের কাছে হার মানতে হয়—গঠিত হয় 'ভারতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণফ্রন্ট'।[১] এই সহযোগিতা ও জোট বাঁধার নীতির একটা ফলাফল ছিল নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলন (সংক্ষেপে এআইপিডব্লিউএ),[২] যার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৬-এর এপ্রিলে লক্ষ্ণৌতে। সভাপতির ভাষণে শ্রদ্ধেয় উর্দু ও হিন্দি লেখক মুন্সি প্রেমচন্দ ঘোষণা করেন, সাহিত্যে অবশ্যই থাকতে হবে 'সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য অনুপ্রেরণা, জীবনের রূঢ় বাস্তবতাসমূহ তুলে ধরার ক্ষমতা—এককথায় আমরা এমন এক সাহিত্য চাই যা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করবে আন্দোলন, পরিবর্তন ও চাঞ্চল্য।'[৩] যদিও সম্মেলনটি সংগঠিত করেছিল কমিউনিস্টরা, তবুও এআইপিডব্লিউএ অকমিউনিস্ট লেখকদের কাছ থেকেও সমর্থন লাভ করে। এআইপিডব্লিউএর দ্বিতীয় সম্মেলনটি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে। এর অব্যবহিত পরেই সংগঠনটি ভেঙে যায়।

এআইপিডব্লিউএ ভেঙে গেলেও সাহিত্য ও রাজনীতির একত্রকরণ সমানতালে বাড়তে থাকে। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত এই দশক সম্পর্কে লেখেন :

> একটি বিশেষ অর্থে, পঞ্চম দশকের উল্লেখযোগ্য কবিদের একটি প্রধান দলভুক্ত বলেছি, কিন্তু সেই দল কিন্তু অবিভক্ত ছিল না, এবং মনে রাখতে হবে যে এই বিভাজনের মূল প্রেরণা ছিলো রাজনীতি বা রাজনীতি বিষয়ে কবিদের ধারণা।[৪]

আবু সয়ীদ আইয়ুব সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনকে কমিউনিজম ও প্রায়-কমিউনিজম পর্ব বলে আখ্যা দিয়ে এটাকে কিছু ব্যতিক্রম বাদে বরং বন্ধ্যা বলে মন্তব্য করেন। তিনি বামপন্থাকে তখনকার সাহিত্যের ফ্যাশন বলে চিহ্নিত করেন : '...একজন লেখক যত কম গুণশীল তত বেশি অতি-আধুনিক দেখাতে চাইবেন তিনি।'[৫]

বিশেষ করে দুজন ব্যক্তি, *পূর্ব্বাশার* সম্পাদক ও প্রকাশক সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সত্যপ্রসন্ন দত্ত কবিতায় কমিউনিস্ট আদর্শের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া

* কমিন্টার্নের (কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল) সপ্তম কংগ্রেসের পর দুই ব্রিটিশ নেতা আর পি দত্ত ও বেন ব্র্যাডলি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশে এক বক্তব্য দেন। এই বক্তব্যের মাধ্যমে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রয়াস পায়। এই যৌথ দলিলটিই দত্ত-ব্র্যাডলি তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই তত্ত্বানুসারে ১৯৩৬ সালের জানুয়ারিতে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি (সিএসপি) কমিউনিস্টদেরও সদস্যপদ দিতে সম্মত হয়। ফলে বহু কমিউনিস্ট নেতা সিএসপিতে যোগ দেন। তখন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা মতপার্থক্য সত্ত্বেও একসঙ্গে কাজ করেন।—অনুবাদক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জানান।[৬] বাম আদর্শের উপস্থিতি সত্যিই যথেষ্টভাবে ছিল। তবে ১৯৪০-এর দিকে বাংলা সাহিত্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সঞ্জয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একক, তিনি এমনকি বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর কাগজ *কবিতা*কেও কমিউনিস্ট-সমর্থকদের শিবির বলে মনে করতেন।[৭]

১৯৪৪ সালে জীবনানন্দের চতুর্থ গ্রন্থ *মহাপৃথিবী* প্রকাশিত হয় সঞ্জয় ও সত্যপ্রসন্নর প্রকাশনা থেকে। সত্যপ্রসন্নর মতে, যিনি নিজে ছাপার কাজটি করেছিলেন, কবিতায় আবার রোমান্টিসিজম ফিরিয়ে এনে সাহিত্যে কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশ ঠেকানোর একটা প্রচেষ্টা ছিল এ বইটি। সঞ্জয়ের ধারণায় জীবনানন্দের বইটি রোমান্টিসিজমের জয়গান পুনরুত্থিত করার পথে বহুদূর এগিয়ে যাবে, আর এভাবে বাংলা কবিতার ওপর আরোপ করবে একটা ইতিবাচক কমিউনিস্টবিরোধী প্রভাব।[৮]

বুদ্ধদেব বসুর মতো সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর নিজের উপলব্ধিতে আধুনিক সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুরো ১৯৩০-এর দশকজুড়ে সক্রিয় ছিলেন। তিনি নিজে *পূর্বাশায়* লিখতেন ও অন্যদের লেখা ছাপতেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের বিপরীতে সঞ্জয় আবেগগতভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং তাঁর মধ্যে সাহিত্যকে সাদামাটাভাবে রাজনৈতিক বিষয়াবলির সঙ্গে মেশানোর প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৯৩৯ সালে একটা হিটলার ও ব্রিটিশবিরোধী সংখ্যা বের করার পর অর্থনৈতিক কারণে *পূর্বাশার* নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় এবং কয়েক বছরের বিচ্ছিন্নতার পর আবার বের হয় ১৯৪৩ সালে। এই বিরতির সময় অবশ্য সম্পাদক সঞ্জয় অলস বসে ছিলেন না। সত্যপ্রসন্নর মতে, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আরেকটি পত্রিকা বের করার বিষয়ে সঞ্জয়ের কাছে যান। সঞ্জয় ও সত্যপ্রসন্ন দুজনই নতুন কোনো প্রকাশনা উদ্যোগের ব্যাপারে অনীহ ছিলেন। কারণ, ভবিষ্যতে কোনো একসময় আবার *পূর্বাশা* বের করার পরিকল্পনা তাঁদের ছিল। এতদসত্ত্বেও *পূর্বাশা* বন্ধ হওয়ার এক বছরের মাথায় ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের যৌথ সম্পাদনায় *নিরুক্ত* নামের একটা কবিতা ত্রৈমাসিক আত্মপ্রকাশ করে।

অনিচ্ছাকৃত হোক বা না হোক, সঞ্জয় বিশেষ কারণে *নিরুক্তর* দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছিলেন, যার একটা হচ্ছে সাহিত্যে কমিউনিস্ট আগ্রাসন বাধা দেওয়া আর তাঁর হৃদয়লালিত রোমান্টিসিজমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।[৯] পত্রিকাটির নাম তাৎপর্যবিহীন ছিল না, এর আরও একটি লক্ষ্য ছিল—*নিরুক্ত* অর্থ 'বিশেষভাবে বা স্পষ্টভাবে অথবা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত।' কেউ কেউ মনে করতেন, বাংলা কবিতা দুর্বোধ্য অসুস্থ বকবকানিতে পরিণত হয়েছে। এই অসুস্থতা সারানোর জন্য ছিল *নিরুক্ত*। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদকীয়ের একাংশে এ বিষয়ে বলা হয়েছে :

> সংক্ষেপে বলা যায় যে, বাংলা সাম্প্রতিক কাব্যে এমন কয়েকটি লক্ষণ কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে যা অসুস্থ বিকারেরই পরিচয় বলে আমাদের ধারণা। শুধু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> আমাদের নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও বাংলা কাব্যের এই উন্মার্গযাত্রা যে ব্যথিত ও চিন্তিত করেছে, এই সংখ্যাতেই উদ্ধৃত তাঁর পত্রটি থেকেই তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। এই রুগ্ন কাব্যকে অনায়াসে নীরবে অবজ্ঞা করা চলত যদি না এর মধ্যে সংক্রামকতার বিপদ বর্ত্তমান থাকত। কিন্তু শুধু ভর্ৎসনা বা সমালোচনা এই সংক্রামকতার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিষেধক নয়। কাব্যের সুস্থ আদর্শ অটুট রাখবার চেষ্টাই এই সংক্রামকতা নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করেই 'নিরুক্ত' প্রকাশ করবার এই আয়োজন।[১০]

উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিটির তারিখ ছিল ২২ আগস্ট ১৯৪০, যার শুরুটা ছিল এ রকম :

> তোমরা কয়েকজনে মিলে 'নিরুক্ত' প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছ এ সংবাদে সুখী হয়েছি। কিছুকাল থেকে ভাষার বিকৃতি ছন্দের স্খলন ও ভাবের দুর্বোধ্য অসংলগ্নতা নিয়ে অকবির পথে কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা অবাধে বেড়ে চলেছে।[১১]

এরই মধ্যে যে রকম দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০-এর দশকের ছন্দ-সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিষয়ে অপ্রসন্ন ছিলেন। চল্লিশের দশকের মধ্যে কাব্যিক ভাবনার সহজবোধ্যতা কিংবা দুর্বোধ্যতা বাংলা সাহিত্য মহলে একটা বিরাট বিতর্কিত বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়। *নিরুক্ত* আপাতদৃষ্টিতে এই মূলনীতি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় যে 'ভাবের দুর্বোধ্য অসংলগ্নতা' হচ্ছে অকাব্যিক।

নিরুক্ত বের করার আরেকটা ব্যক্তিগত কারণ ছিল বলে মনে হয়। সেটা হচ্ছে, বুদ্ধদেব বসু ও *কবিতা* পত্রিকার প্রতি অসন্তুষ্টি। সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর আবেগের মাত্রা সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেন :

> 'কবিতা'-পত্রিকা তখন ষ্টালিন শিবির হওয়াতে তিনি [প্রেমেন্দ্র মিত্র] কবিতার সম্পাদকতা ত্যাগ করে পূর্বাশা'র তথাকথিত ট্রটস্কি শিবিরে এসেছিলেন, বাক-যুদ্ধে একনায়ক বুদ্ধদেব বসুকে আক্রমণ করতে। যদিও বুদ্ধদেব কর্তৃক আমি 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যার পরই আক্রান্ত তবুও নিরুক্তের অপ্রধান সম্পাদক হিসাবে বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করিনি। বরং বুদ্ধদেব বসুর কাব্যকৃতির সমালোচনা করে (Re-view) তাঁর অনুরাগী পাঠকের কৃত্য সমাপন করেছি। বুদ্ধদেবই আমায় আক্রমণ করেছিলেন, আমার কবিতার ব্ল্যাক আউট সম্পাদন করে 'কবিতা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় এবং বারোবছর পর কবিতার অন্তিম আশঙ্কা করে বুদ্ধদেবই আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন পুনরায় 'কবিতা' ত্রৈমাসিকে কবিতা পাঠাতে।[১২]

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসুর মধ্যকার ভাঙনটা হয়তো রাজনীতি নিয়ে, তার উৎস হতে পারে খানিকটা কবিতা নিয়ে তাঁদের ভিন্ন মতবাদ; তবে বিরোধটা সম্ভবত কয়েকটা কারণের সমাহার থেকে উৎসারিত। বুদ্ধদেব ও সঞ্জয়ের কলহটা মনে হয় *কবিতা* পত্রিকা প্রকাশনা চালু হওয়ার পর একটা ঘটনা থেকে শুরু হয়েছিল। ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির প্রথম দুটো সংখ্যা ছাপা হয় পূর্বাশা প্রেসে। দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য সত্যপ্রসন্ন দত্ত সম্পাদকের অনুমতি ছাড়াই সঞ্জয়ের একটা কবিতা কম্পোজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে ফেলেছিলেন। ক্ষুব্ধ বুদ্ধদেব সে সংখ্যা থেকে কবিতাটি বাতিল করে দেন এবং তৃতীয় সংখ্যা থেকে *কবিতার* একজন নতুন মুদ্রক আসে।

যে উদ্দেশ্যেই হোক, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বর থেকে তাঁদের চমৎকার কবিতা ত্রৈমাসিকটি বের করতে থাকেন। সঞ্জয় জীবনানন্দ দাশকে এই নতুন প্রকাশনার একজন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কবি হিসেবে বিবেচনা করতেন :

> চল্লিশের দশকের শুরুতেই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে, কবিতাকে অস্বীকার করে বাংলা কবিতায় যে-ধরনের সমাজ-চেতনা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, তাতে মৃত্যুপথযাত্রী রবীন্দ্রনাথই শুধু নন, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ কয়েকজন রবীন্দ্রোত্তর কবিও অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। 'পূবার্শা'-সংস্থা তখন বাংলা কবিতার স্বার্থরক্ষার্থেই জীবনানন্দ দাশের কবি-প্রতিভার শরণ নিয়েছিলেন।[১৩]

সুস্থ, রোমান্টিক, সহজবোধ্য, অকমিউনিস্ট কবিতার জন্য নিবেদিত পত্রিকা *নিরুক্তর* প্রথম সংখ্যায় জীবনানন্দের 'গতিবিধি' ও 'নির্দেশ' নামের দুটো কবিতা ছাপা হয় :

গতিবিধি

সর্বদাই প্রবেশের পথ রয়ে গেছে;
এবং প্রবেশ ক'রে পুনরায় বাহির হবার—
অরণ্যের অন্ধকার থেকে এক প্রান্তরের আলোকের পথে;
প্রান্তরের আলো থেকে পুনরায় রাত্রির আঁধারে;
অথবা গৃহের তৃপ্তি ছেড়ে দিয়ে নারী, ভাঁড়, মক্ষিকার বারে।

এইসব শরীরের বিচরণ।
ঘুমায়ে সে যেতে পারে।
(সচেতন যাত্রার পথ তবু আরো প্রসারিত।
আলো অন্ধকার তার কাছে কিছু নয়।)
উটপাখি সারাদিন দিবারৌদ্রে ফিরে
বালির ভিতরে মাথা রেখে দিয়ে আপনার অন্ধ পরিচয়
হয়তো বা নিয়ে যায়—হয়তো তা পাখির বিনয়।

কোনো এক রমণীকে ভালোবেসে,
কোনো এক মড়কের দেশে গিয়ে জোর পেয়ে,
কোনো এক গ্রন্থ পড়ে প্রিয় সত্য পেয়ে গেছি ভেবে,
অথবা আরেক সত্য সকলকে দিতে গিয়ে অভিভূত হয়ে,
শরতের পরিষ্কার রাত পেয়ে সবচেয়ে পোশাকী, উজ্জ্বল—
চিন্তা তবু বর্ষারাতে দ্বার থেকে দ্বারে
ভিজে কুকুরের মতো গাত্রদাহ ঝাড়ে।
সমাধির ঢের নীচে—নদীর নিকটে সব উঁচু উঁচু গাছের শিকড় গিয়ে নড়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেইখানে দার্শনিকদের দাঁত ক্বাথ পান করে
পরিত্যক্ত মিঠে আলু, মরামাস, ইঁদুরের শবের ভিতরে;—
জেনে নিয়ে আমরা প্রস্তুত করে নিই নিজেদের;
কেননা ভূমিকা ঢের রয়ে গেছে,
বোঝা যাবে (কিছুটা বিনয় যদি থেকে থাকে চোখে)—
সুশ্রী ময়ূরও কেন উটপাখি সৃষ্টি করেছিল
টানাপোড়েনের সুরে—সূর্যের সপ্তকে।[১৪]

নির্দেশ

জীর্ণ শীর্ণ মাকু নিয়ে এখন বাতাসে
তামাশা চালাতে আছে পুনরায় সময় একাকী।
তবুও সে ভোরবেলা হরিয়াল পাখি
ধূসর চিতলমাছে—নির্ঝরের ফাঁসে
খেলা করে কাকে দিয়েছিল তবে ফাঁকি?
বসন্তবউরী দুটো এই বলে হা হা করে হাসে।

সেই হাসি জ্বলে ওঠে নির্ঝরের 'পরে;
গড়ায়ে গড়ায়ে গোল নুড়ি
উজ্জ্বল মাছের সঙ্গে ভোরের নির্ঝরে
সময়ের মাকুটাকে ক'রে দিল উড়ুখুড়ুখুড়ি।
বিরক্ত সময় তাই খুঁজে নিতে গেল কোনো বিষয়ান্তরে
নিজের নিয়মাধীন হৃদয়ের জুড়ি।

আলো যদি নিভে যায় সময়ের ফুঁয়ে
তাহলে কাহার ক্ষতি—তাহলে কাহার ক্ষতি হবে।—
এই কথা ভেবে যায় কালো পাথরের 'পরে নুয়ে
মৈত্রেয়ী—নার্গাজুন—কৌটিল্য নীরবে।[১৫]
তিন হয়, চার হয়, পাঁচ হয় তবুও তো দুয়ে আর দুয়ে।
হেঁয়ালি ও নিরসন নির্ঝরের নিক্কণের মতো বেঁচে রবে।[১৬]

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় কেন এ রকম দুটো অস্পষ্ট কবিতা পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় ছাপলেন, এটা বোঝা দুঃসাধ্য, যেখানে পত্রিকাটির নামের অর্থ হচ্ছে 'বিশেষভাবে ব্যক্ত'। জীবনানন্দের এই শ্রেণীর কবিতাগুলোর বেলায় প্রায়ই দুর্বোধ্য অথবা সহজবোধ্য নয়, এই বিশেষণ প্রয়োগ করা হতো। এই দুটো কবিতার কোনোটিই জীবনানন্দের জীবদ্দশায় প্রকাশিত কোনো গ্রন্থে স্থান পায়নি। এগুলোর একটি সম্পর্কে একমাত্র প্রকাশিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সঞ্জয়ের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে যে 'গতিবিধি' খুব আশাপ্রদ চিত্র উপস্থাপন করে না। কবিতাটির প্রথম চার চরণ উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, খোলা মাঠে এই আলো—যে আলো জীবনের ওপর প্রোজ্জ্বল—তার মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য বা আগ্রহ কবি খুঁজে পান না এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই বলে এর সমাপ্তি টানেন যে জীবনানন্দ বিংশ শতাব্দীর মন তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন (ধারণা করা যায়, বিংশ শতাব্দীর জীবনের জন্যে)।[১৭]

বিএম কলেজের সহকর্মীরা, যাঁদের কেউ কেউ জীবনানন্দের বিপক্ষবাদী সজনীকান্ত দাসের পক্ষপাতী ছিলেন, এই লাজুক ইংরেজির অধ্যাপক ও তাঁর আপাতদৃষ্টিতে কুয়াশাচ্ছন্ন বাংলা কবিতার প্রতি ঠাট্টা প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে সোচ্চার ছিলেন। বাংলার অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তী জীবনানন্দের মৃত্যুর পর স্মৃতিচারণা করে বলেন :

> আজ মনে পড়ে যে 'নীল জলে সিঙিমাছ' নামে একটা ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশ করে তাঁকে আক্রমণ করেছিলাম। প্রথমে তাঁর চোখে ফুটে উঠল একটা সলজ্জ, অপ্রতিভ কাতর ভঙ্গি। তার পর-মুহূর্তেই উৎকট হাস্যের একটা দম্‌কা এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল বিদ্রূপের ধূম্ররাশি। সেই বিদ্রূপযজ্ঞের হোতা ছিলেন অধ্যাপক নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি এখন দমদম মতিঝিল কলেজের অধ্যক্ষ। জীবনানন্দ বাবু তাঁর কবিত্বের বিরূপ সমালোচনায় বড় ব্যথিত হতেন।[১৮] বেত্রাহত বালকের মুখে যে করুণ অসহায়তা, তাই দিয়েই তিনি বিরুদ্ধবাদীকে নিরস্ত করতেন। 'শনিবারের চিঠি'র গাল খেয়ে তিনি রুষ্ট হতেন কিনা জানি না, কিন্তু কৌতূহলী হয়ে উঠতেন খুব। পত্রিকাখানি এসেছে শুনলেই আমার কাছে আসতেন, বন্ধনীর মধ্যে 'জীবানন্দ নহে' পড়তেন।[১৯] তারপর অনন্যসুলভ সেই উচ্চহাস্যটি উপহার দিয়ে নীরবে উঠে যেতেন। তাঁর কবিত্বের স্বপ্নাবরণ যেন কিছুতেই ছিন্ন হ'ত না।[২০]

রসায়নের অধ্যাপক, উৎসাহী রবীন্দ্রভক্ত ও সজনীকান্তের[২১] ব্যক্তিগত বন্ধু রমেশচন্দ্র সেন জীবনানন্দের (এবং সব আধুনিক ও রবীন্দ্রোত্তর কবির) যেসব কবিতাকে দুর্বোধ্য কথাবার্তা বলে ভাবতেন, সেগুলোকে উদ্দেশ করে কিছু ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখেছিলেন।

এই শুধু সান্ত্বনা (?)

অক্ষয় বটে গাঙশালিকের বাসা,
ছাতিমের ফুলে ল্যাদাপোকা ধরিয়াছে।
ঘনসূর্য্যের এলোচুলে শূককীট,
বাঁচিবার সাধ মিটিয়াছে জগতের।

ঠানদিদি ভাজে পচা চিঙড়ির বড়া
বাহিরে সোনালী অন্তরে বিসূচিকা—
মার্কিনী মেয়ে যেন বিচালির ধোঁয়া
লীলায়িত ধূম নীচে কালো কার্ব্বন।

ধূম্রলোচন পেচকেরা সারি সারি
বাতায়ন তলে নীল জিহ্বা মেলিয়াছে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কটাক্ষ নয়, মোহন মালার মালা—
দাও পানিফল হলদে ছানার ডিম।

মঞ্জুবিবরে আধখানা কালোজাম।
পিছল কবির এই শুধু সান্ত্বনা?[২২]

২

বোধহয় জীবনানন্দের 'সহজবোধ্য নয়' বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় আধুনিক কবিতার ভালো পাঁচজন পাঠককে একই কবিতা পড়তে দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে। 'ক্যাম্পে' কবিতার ঘাইহরিণী যদি ১৯৩২ সালে *পরিচয়*-এর সম্পাদকমণ্ডলীকে পীড়িত করে, একই পত্রিকায় ভিন্ন সম্পাদকীয় বোর্ডের হাতে ১৯৩৯ সালে ছাপা 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' সত্যিকার অর্থে একটা ধাঁধা হিসেবে আখ্যা পেতে পারত।

গোধূলিসন্ধির নৃত্য

দরদালানের ভিড়—পৃথিবীর শেষে
যেইখানে প'ড়ে আছে—শব্দহীন—ভাঙা—
সেইখানে উঁচু উঁচু হরিতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল—রাঙা—

চুপে চুপে ডুবে যায়—জ্যোৎস্নায়।
পিপুলের গাছে ব'সে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দেখে; সোনার বলের মতো সূর্য আর
রূপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।

হরিতকী শাখাদের নিচে যেন হীরের স্ফুলিঙ্গ
আর স্ফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস;
নৃমুণ্ডের আবছায়া—নিস্তব্ধতা—
বাদামী পাতার ঘ্রাণ—মধুকূপী ঘাস।

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো;
পুরুষ তাদের : কৃতকর্ম নবীন;
খোঁপার ভিতরে চুলে : নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ।

সেখানে গোপন জল ম্লান হ'য়ে হীরে হয় ফের,
পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই;
তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী—দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে

প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই—এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে—বরুণে

ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরিতকী বনে—জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হয়ে গেছে সব—বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক—কর্কট—তুলা—মীন।[২৩]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে একটা বাংলার আরও উন্নত মানের তবে ক্ষণস্থায়ী সমালোচনা পত্রিকাগুলোর একটি *কবিতা-পরিচয়*-এ কবিতাটির একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিখেছিলেন। তিনি শুরু করেছিলেন প্রকারান্তরে বরং একটা মর্যাদাহানিকর মন্তব্য দিয়ে :

> কয়েকটি সর্বনাশপন্থী নারী কোথাও এক জঙ্গলের মধ্যে সদ্য জ্যোৎস্নায় নাচ শুরু করেছে। তাদের ঘিরে কয়েকটি নবীন পুরুষ। কবিতাটির 'বিষয়' এইটুকুই—আর কিছু নেই—এখন, এরপর নানারকম তত্ত্ব-গবেষণা ও মাথার চুল ছেঁড়া যেতে পারে। কিন্তু কবিতাটি এইটুকুই।[২৪]

তিনি তাঁর মতে যা ছন্দবিভ্রাট মনে হয়েছে, সেসবের দিকে ইঙ্গিত করেন এবং অভিযোগ করেন যে জীবনানন্দ অন্ত্যমিল ও অনুপ্রাসের প্রতি অতি-আসক্ত এবং সে কারণে কেবল ধ্বনিঝংকারের জন্য অর্থহীন অযথার্থ শব্দপ্রয়োগ করেছেন। তার পরও সুনীল কবিতাটির নামকরণ নিয়ে কথা বলেন : জীবনানন্দ যুদ্ধের ভূমিকম্পে কম্পমান সভ্যতার গোধূলি বোঝাতে চেয়েছেন। তারপর কবিতাটি প্রথম স্তবকে গোধূলি থেকে দ্রুত সরে গিয়ে বাকি কবিতাজুড়ে জ্যোৎস্নায় চলে যায়। তাঁর পরামর্শ হচ্ছে, কবিতাটির নাম হওয়া উচিত ছিল কেবলই 'নৃত্য'। চাঁদের আলো আছে বলে, পাঠক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন যে গোধূলি ও যুদ্ধের পর বিশ্ব সম্পূর্ণ আঁধারে ঢেকে যায় না, বরং চাঁদের আভায় আলোকিত থাকে। সবকিছুর এক রকম সমাহারে সুনীল কবিতাটির 'বিষয়' পুনর্ব্যক্ত করেন :

> যেখানে পৃথিবী যুদ্ধের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে—সেখানেও ভেসে যাচ্ছে এই নাচের লহরী। বস্তুত এ-কথাই ঠিক, যুদ্ধে আর পৃথিবীর কিছুই ভাঙতে পারবে না, মানুষের নিজের মধ্যে ধ্বংস শুরু হয়ে গেছে। কবিতার 'বিষয়' এইটুকুই, বাকি সব আবহাওয়া—অর্থাৎ বিষয় বাদ দিয়ে বাকি অংশই কবিতা।[২৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যেমনটি প্রত্যাশিত ছিল, সুনীলের লেখাটি বিতর্কের জন্ম দেয়। দুজন সমালোচক জীবনানন্দের প্রতীয়মান ছন্দপতনকে মিশ্র ছন্দ কিংবা ছাপার ভুল[২৬] বলে ব্যাখ্যা দেন, অথবা তা ছিল কবির স্বাধীনতার প্রকাশ ও পয়ারের শক্তি, যাকে দুভাবেই দেখা যেতে পারে।[২৭] কিন্তু যত দূর দেখা যায়, কয়েকটি বিতর্কের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে: জীবনানন্দের কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে সেটা নিয়ে কোনো দুজন একমত হতে পারেননি। নরেশ গুহ লেখেন:

> সুনীলবাবুর 'ব্যাখ্যা' নিয়ে প্রধান অসুবিধে হচ্ছে এই যে, কোথায় কয়েকটি সর্বনাশপন্থীনারী এক জঙ্গলের মধ্যে সদ্যজ্যোৎস্নায় নাচ শুরু করেছে, তা আমি কবিতাটিতে খুঁজে পাচ্ছি না। আমার তো ধারণা, এটি একটি প্রগাঢ় ঠাট্টার কবিতা।[২৮]

অরুণকুমার সরকার আবার সুনীল ও নরেশ গুহ উভয়ের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন:

> প্রথমজন কবিতাটির মধ্যে একটি মনোরম নাচের ছবি দেখতে পেয়েছেন, তাঁর কাছে 'এ-কবিতায় নৃত্যই প্রধান'। দ্বিতীয়জনের ধারণা, 'এটি একটি প্রগাঢ় ঠাট্টার কবিতা'। উভয়ের মতামতই আমার কাছে খুব মজাদার বলে মনে হল। কেননা আলোচিত কবিতাটি এ-যাবৎ আমার মনে যে-অর্থ বহন করে এসেছে সেটা নাচেরও নয়, ঠাট্টারও নয়, শুনে চমকে উঠবেন না যেন, একটি পরিব্যাপ্ত বিষাদের।[২৯]

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীতুল্য রমণীর মৃত্যুর নৃত্যের ভেতর প্রাণসংশয় দেখতে পান। মানবেন্দ্র আমাদের জানান, দেবী নন কিন্তু দেবীর মতো রমণীরা আসলে বারাঙ্গনা। তাদের প্রগাঢ় চুম্বন পরিণত হয় মৃত্যুচুম্বনে, যেহেতু ব্রিটিশ উপনিবেশ হংকংয়ে যুদ্ধ ও বাণিজ্যের কারণে মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে:

> কেন এদের খোঁপার ভিতরে চুলে নরকের মেঘ জন্ম নিয়েছিল, বুঝতে পাই, কেননা চৈনিক ও নিপ্পনি প্রবচনের অনুষঙ্গ জেগে ওঠে: নারী হচ্ছে নরকের দ্বার, 'Gate of Hell।'[৩০]

তবে মানবেন্দ্র যদিও কবিতাটির বহু উপাদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কর্মকাণ্ডগুলোকে ভৌগোলিকভাবে অধিষ্ঠিত করতে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছে। ভেঙে পড়া দ্বারমণ্ডপগুলো কি জমিদার-প্রাসাদের? তাহলে কবিতাটা হরীতকী আর অশ্বত্থ বৃক্ষসহ বাংলার পটভূমিতেই। অথবা এসব দরদালান কি ব্রিটিশ হংকংয়ের ঔপনিবেশিক স্থাপত্য? সে ক্ষেত্রে উল্লিখিত বৃক্ষগুলো এক ধরনের বিভ্রান্তি।[৩১]

পঞ্চম একজন আলোচক সঞ্জয় ভট্টাচার্য কবিতাটির স্তবক ধরে আলোচনা করেছেন। তিনি 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য'কে জীবনানন্দের সূক্ষ্মতম রচনা বা 'ভিশন' বলে মনে করেন।[৩২] নামটি সঞ্জয়ের কাছে যুদ্ধের কারণে সভ্যতার গোধূলি বলে প্রতিভাত হয় না। কারণ, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে: 'যুদ্ধ আর বেলোয়ারি রৌদ্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিন/শেষ হয়ে গেছে সব...'। শিরোনামের 'সন্ধি' বলতে দিনের সমাপ্তি নয়, বোঝায় যুদ্ধ বন্ধ হওয়া।

> যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, শান্তি উদ্‌যাপিত করতে যুবক-যুবতীরা মিলিত হয়ে নৃত্য করছে। কবির মনে আছে ক্ষণিক শান্তি যা আরেকটি যুদ্ধের বা বিপ্লবেরই ভূমিকা।...
>
> অতীত যুদ্ধ আর ভবিষ্যৎ বিপ্লব যে শান্তির সন্ধিক্ষণে মিশেছে—জীবনানন্দ তাকেই 'গোধূলি' বলতে চেয়েছেন।...প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র Vision আর চিন-বিপ্লবের প্রাক্কালে জীবনানন্দের 'গোধূলিসন্ধির নৃত্যে'র Vision।[৩৩]

যদি ১৯৩০-এর দশকের অপেক্ষাকৃত অরাজনৈতিক জীবনানন্দ সে দশকজুড়ে চিয়াং কাইশেক ও মাও সে তুংয়ের মধ্যে যা ঘটছিল, তার ওপর ভিত্তি করে ১৯৪৫-এর শরতে জাপানের আত্মসমর্পণের মাসখানেকের ভেতর জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টদের মধ্যকার রেষারেষি সম্পর্কে ১৯৩৯ সালেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন, তাহলে যে কেউ সঞ্জয়ের সঙ্গে একমত হবেন যে জীবনানন্দ একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কবি ছিলেন। হতে পারে সঞ্জয় ভুলে গিয়েছিলেন যে 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' ছাপা হয়েছিল ১৯৩৯ সালের প্রথমার্ধে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে নয়। (এটি পরবর্তী সময়ে *সাতটি তারার তিমির* [১৯৪৮] গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, কবিতাটির রচনাকাল সম্পর্কে এটাই সম্ভবত সঞ্জয়ের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছিল। কবিতাটির একটি পাণ্ডুলিপি ডিসেম্বর ১৯৩৭ রচনাকাল-সংবলিত কয়েকটি খাতার মধ্যে একটিতে পাওয়া যায় ন্যাশনাল লাইব্রেরির জীবনানন্দ সংগ্রহে)।

কবিতাটির এই পাঁচ ধরনের পাঠ এ সত্যই প্রতিষ্ঠা করে যে জীবনানন্দের বহু কবিতা চল্লিশের দশক শুরুর আগে থেকেই এক অর্থে কম সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। হয়তো জীবনানন্দ তিনি যেভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন, সেভাবে সভ্যতার স্বরূপ নিয়ে একটা বক্তব্য দিচ্ছেন, কিন্তু তাঁর প্রকাশ রয়ে যাচ্ছে অসম্পূর্ণ ও অনির্বচনীয়। তিনি গদ্যে তাঁর কবিতার কোনো ব্যাখ্যা দেননি ('ক্যাম্পে' কবিতা নিয়ে তাঁর মরণোত্তর প্রকাশিত ব্যাখ্যাটি একমাত্র ব্যতিক্রম), বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠিতেও এসব কিছু আলোচনা করেননি। আর তাই পাঁচজন বাঙালি আলোচক—তাঁদের দুজন তুলনামূলক সাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক এবং চারজনই প্রতিষ্ঠিত কবি—জীবনানন্দের কবিতাকে পাঁচটি ভিন্নভাবে বোঝেন এবং তা পরিপূরকভাবেও নয়।

৩

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় *নিরুক্ত*র পরবর্তী সংখ্যায় জীবনানন্দের ওপর সম্ভবত একটা লেখা দেওয়ার আমন্ত্রণের জবাবে চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে সঞ্জয়ের কাছে লিখেছিলেন :

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> জীবানন্দ [বানান অপরিবর্তিত] দাশকে বুদ্ধদেব আজকাল শ্রেষ্ঠ কবি বলে। আমিও তাঁর লেখা মন দিয়ে পড়ি। গোটা কয়েক কবিতা খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু এখনও তাঁর মূল ছুঁতে পারিনি। যেদিন পারব সেদিন লিখব, কাউকে বলতে হবে না। একদিন এই গ্রীষ্মের ছুটিতে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হয়। তিনি মুখে যা কবিতা সম্বন্ধে বললেন তা আমি গ্রহণ করতে পারিনি। এখনই যদি লিখতে বসতাম তবে মতামতের পার্থক্য আমার উপভোগের অন্তরায় ঘটিয়ে তাঁর কবিতার প্রতি অবিচার করতে আমাকে প্রণোদিত করত। তাই 'তাঁর মতামত' ভুলতে সময় নিচ্ছি। বুঝেছ?[৩৪]

আবু সয়ীদ আইয়ুব জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে বলেছেন, তিনি বাংলার সবচেয়ে বিভ্রান্ত কবি। আইয়ুব তাঁর *বনলতা সেন* গ্রন্থের কবিতাগুলো উপভোগ করেছেন—তিনি মনে করতেন সতীর্থ কোনো কবির চেয়ে সম্ভবত জীবনানন্দের উপলব্ধি ছিল গভীরতর। কিন্তু তিনি জীবনের দর্শন নির্ধারণ করতে গিয়ে নিদারুণ ব্যর্থ হয়ে কোনো কিছু সূত্রায়িত করতে পারেননি। *বনলতা সেন*-এর কবিতাগুলো কবিতা হিসেবে, ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ হিসেবে চমৎকার ছিল। আইয়ুব স্বীকার করেন, এমনকি *বনলতা সেন*-পরবর্তী কিছু সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণও কবিতা হিসেবে সফল। জীবনানন্দ একজন কৃষক বা ভিখারি কিংবা একটা হরিণের মৃত্যুকে একভাবে দেখা এবং একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা ধারণ করেন। তবে আইয়ুব আবারও বলেন, যদি দর্শনটা আদৌ বোধ্য হয়, দার্শনিক কবিতাগুলো ব্যর্থ হয়, যেহেতু দর্শন ব্যর্থ।[৩৫]

নিরুক্তর শেষ সংখ্যায় (জুন ১৯৪৩) সঞ্জয় জীবনানন্দের ওপর একটা প্রবন্ধ লেখেন, যেখানে তিনি তাঁর বন্ধুর কবিতার ক্রমবর্ধমান জটিলতার একটি কারণ নির্দেশ করেন। এখানে জটিলতা হয়ে ওঠে আরও নৈর্ব্যক্তিক, দুর্বোধ্যতার চেয়ে কম ব্যক্তিক রুচিনির্ভর একটা শব্দ। জীবনানন্দ তাঁর লেখা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মূলত ব্যবহার করেছিলেন 'জটিল' শব্দটি, 'দুর্বোধ্য' নয়। সঞ্জয় লেখেন :

> হতে পারে যে একটি জগৎ (অনুভূতির জগৎ) ভেঙে দিয়ে আরেকটি জগতে (বাস্তব জগতে) তাঁকে প্রবেশ করতে হয়েছে বলেই দ্বিতীয় জগতের স্থিরতা সম্বন্ধে মনে তিনি আশ্বাস পাচ্ছেন না। এই সঙ্কট তাঁর মনকে, ভাষাকে অনবরতই জটিল করে তুলছে। কবির নিজের কথায়ই তাঁর ইদানীংকার কবিতা সম্বন্ধে শেষ উক্তি করা যায় : 'সম্প্রতি আমার কবিতা জটিল হয়ে পড়েছে। আমার শেষের দিকের কবিতায় তেমন প্রসাদ নেই। দোষ হোক, গুণ হোক—এ জিনিষ তবু অস্বাভাবিক নয়, এবং কাব্য জীবনের একটি অধ্যায় শুধু; শক্তি, ইচ্ছা ও সৎ অন্তঃকরণ থাকলে ভবিষ্যতের দিকে হয়তো বা নিয়ে যাব কবিতাকে।'[৩৬]

অম্বুজ বসু জীবনানন্দের কবিতার জটিলতা নিয়ে একটা মজার ব্যাখ্যা দেন। আর অম্বুজ বসুর পর্যবেক্ষণ যদিও সম্পূর্ণভাবে সংগত মনে হয় না, তাঁর ধারণাগুলো গভীর বিবেচনার দাবিদার এবং সম্ভবত এমনকি আলোকপাত করতে পারে কেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন কবিতাগুলো কষ্টকরভাবে বোধ্য ছিল। তিনি প্রথমে এসব কবিতার ভাষার দিকে দৃষ্টি নির্দেশ করেন :

> এ ভাষা এমন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি-মনের ভাষা, ব্যক্তির অনুভবের ভাষা, যে ইংরাজীতে পড়েছে, ভেবেছে। ইংরাজী মননে মানুষ হয়েছে এমন এক বাঙালী শিল্পী যেন ইংরাজী কবিতার আশ্চর্য স্বাদু অনুবাদ করেছেন এই মনে হবে প্রায়শ তাঁর কবিতা প'ড়ে।[৩৭]

তিনি আরও বলে যান, জীবনানন্দের বর্ণনাময় গদ্য যেভাবে তাঁর বিভিন্ন লেখায় ব্যবহৃত হয়েছে, তা এক অদ্ভুত ধরনের বাংলা, যাকে সহজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করা যায়। অভিজ্ঞতা থেকে আমি অম্বুজ বসুকে নিশ্চিত করতে চাই যে ব্যাপারটা তা নয়। জীবনানন্দের রচনা বাংলায় পড়তে যেমন, ইংরেজিতে অনুবাদ করাও তেমনই কঠিন। আর একইভাবে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করি যে, এই কবিতা ইংরেজি থেকে অনুবাদের মতো মনে হয়, যদিও সিদ্ধান্তটা চিন্তাবহ : জীবনানন্দ তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতির আলোকে হয়তো ভাবার চেষ্টা করছিলেন। যুদ্ধ ও শান্তি, ভাবী মানবসভ্যতার যেসব ধারণা তিনি আংশিকভাবে বুঝতে পারতেন, সেগুলোকে প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর ভাষার জবরদস্তি ব্যবহার করে তিনি কেবল আংশিক বোধগম্য কবিতা রচনা করেছেন।

নিরুক্ত দ্বিতীয় সংখ্যায় (ডিসেম্বর ১৯৪০) জীবনানন্দের আরও দুটো কবিতা ছাপা হয়, 'ভিখিরি' ও 'রাত্রি', দুটোই প্রারম্ভিক সংখ্যার কবিতাগুলোর চেয়ে অনেক বেশি সহজবোধ্য ছিল।

ভিখিরি

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,
      একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
      তবে আমি হেঁটে চ'লে যাবো মানে মানে।
      —ব'লে সে বাড়ায়ে দিলো অন্ধকারে হাত।
আগাগোড়া শরীরটা নিয়ে এক কানা যেন বুনে যেতে চেয়েছিলো তাঁত;
তবুও তা নুলো শাঁখারীর হাতে হয়েছে করাত।

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি মাঠকোটা ঘুরে,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি পাথুরিয়াঘাটা,
      একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
      তাহ'লে ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা।
      —ব'লে সে বাড়ায়ে দিলো গ্যাসলাইটে মুখ।
ভিড়ের ভিতরে তবু—হ্যারিসন রোডে—আরো গভীর অসুখ
এক পৃথিবীর ভুল; ভিখিরীর ভুলে : এক পৃথিবীর ভুলচুক।[৩৮]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই মর্মভেদী ছোট কবিতাটা দিয়ে মানবতাবাদী জীবনানন্দকে সবচেয়ে ভালোভাবে দেখা যায়। তিনি ভিখারিদের দেখেন বাড়িয়ে দেওয়া হাত, চোখে পড়ার জন্য গলা লম্বা করে দিচ্ছে। অথচ তিনি কল্পনা করেছিলেন বনলতা সেনকে, আর এখন দেখছেন সত্যিকারের মানুষ। শহরটাকেও দেখছেন তিনি। অবশ্য তিনি আগে বহুবার কলকাতায় গেছেন, ছাত্রাবস্থায় ছিলেন চার বছর, আরও ছয় বছর ছিলেন সিটি কলেজের শিক্ষক হিসেবে। আরও বিভিন্ন কারণে তিনি কলকাতায় গেছেন। এখন তিনি শহরকে দেখেন আরও গভীর ও স্পষ্টভাবে—অলীক গম্বুজ ও প্রাসাদের ('নগ্ন নির্জন হাত') কল্পলোককে সাময়িকভাবে অতিক্রম করে যায় ভিক্ষুকে ভর্তি কলকাতার বাস্তব জগৎ।[৩৯]

সঞ্জয় যে রকম বিশ্বাস করতেন, *নিরুক্ত* যদি সে রকম সাহিত্য, রাজনীতি ও ব্যক্তিগত বিষয়ে *কবিতা*র বিরুদ্ধবাদী হতোও, সেই মতপার্থক্য উভয় কাগজে বিনা দ্বিধায় লেখা দিতে জীবনানন্দকে বাধা দেয়নি। ১৯৪০-এর ডিসেম্বরে একই মাসে 'রাত্রি' প্রকাশিত হয় *নিরুক্ত*তে, একই নামে আরেকটা কবিতা ছাপা হয় *কবিতা* পত্রিকায়। দুটোই আলোকপাত করেছে কলকাতার রাতের ওপর।

রাত্রি

ওইখানে কিছু আগে—বিরাট প্রাসাদে—এক কোণে
জ্বলে যেতেছিল ধীরে এক্‌সটেন্‌শন্ লেকচারের আলো।
এখন দেয়ালে রাত—তেমন ততটা কিছু নয়;
পথে পথে গ্যাসলাইটে রয়েছে ঝাঁঝালো
এখনো সূর্যের তেজ উপসংহারের মতো জেগে।
এখনো টঙ্গে চ'ড়ে উপরের শেলফের থেকে
বই কি বিবর্ণ কীট—ধুলো—মাকড়শা বার হবে
দোকানের সেল্‌স্‌ম্যান চুপে ভেবে দেখে।
এখনো নামেনি সেই নির্জন রিক্‌শগুলো—নিয়ন্তার মতো,
সমূহ ভিড়ের চাপে রয়েছে হারায়ে।
অজস্র গলির পথে একটি মানুষ
যুগপৎ রয়েছে দাঁড়ায়ে;
পৃথিবীর সকলের হৃদয়ের প্রতীকের মতো :
এই রাত থেকে আরো অধিক গভীরতর রাতে
কলুটোলা—পাথুরিয়াঘাটা—মির্জাপুরে
এস্‌প্লানেডের ফুটপাতে
মালাঙ্গা লেনের পথে—ক্রিক রো'তে
কক্‌বাণ লেনের ভিতর
একজোড়া শিশু যদি দেখা দেয় লোকটার টাকে—
পরচুলা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে তবে জাদুকর।
এখানে রাত্রির পারে তোমার নিকট থেকে আমি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চলে গেলে
চলে যাব;—
পৃথিবীর কাছ থেকে নয়;—
রাত্রি এই সারারাত জীবনের সকল বিষয়
হয়ে আছে।
তিত্তিরাজ গাছ থেকে শিশির নীরবে
ঝরে যায়;—
ডানার আঘাত যায় কাকদম্পতীর;
হলুদ খড়ের 'পরে ঝরে পড়ে আবার শিশির
হাওয়ার গুঁড়ির মতো।
কোথায় হারায়ে তুমি গিয়েছ কখন।
মাথার উপরে সব নক্ষত্রেরা ছুরির মতন বিচক্ষণ
সময়ের সুতো কেটে—অবিরাম সময়ের সুতো কেটে ফেলে;
আমার চোখের 'পরে রাত্রির প্রাঞ্জলতা ঢেলে;
কোথাও বাতাবী উষ্ণ হয়ে ওঠে—ঘুরে যায় মাকড়শাপোকার লাটিম;
ভাঁড় হাসে,—সম্রাজ্ঞীর অবয়ব হয়ে থাকে হিম;
নদীরা শিশুর মতো—শিশুরা নদীর মতো দূর;
স্বর্গের কিনারে গিয়ে ভিড় আর ভিখিরির নীল আলো করে টিমটিম।
শিশুর কপাল থেকে বেজে ওঠে নরকের বিচিত্র ডিণ্ডিম।[৪০]

রাত্রি

হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল;
অথবা সে হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিলো ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে;
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে

অস্থির পেট্রল ঝেড়ে—সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে।
তিনটি রিক্‌শ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মতো জাদুবলে।

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে গিয়ে—টেরিটিবাজারে;
চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।

মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সঙ্গে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে;
রাজ্য জয় ক'রে গেছে অমর আত্তিলা।

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী;
পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।

ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চলে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার ক'রে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।[৪১]

'ভিখিরী' কবিতাটির মতো জীবনানন্দ 'রাত্রি'তেও কলকাতাকে পর্যবেক্ষণ করেন। দৈবাৎ নয়, দুটো পর্যবেক্ষণই ঘটে রাত্রিবেলায়, যখন দেখলেও অদেখা থেকে যায়। মানবতার সঙ্গে খুব সরাসরি যোগাযোগ থেকে স্বল্পভাষী জীবনানন্দকে আড়াল করে রেখেছে অন্ধকার, আবার একই সঙ্গে নিবিষ্টচিত্তে পর্যবেক্ষণ করতে দিচ্ছে শহুরে পরিবেশের ফুল ও প্রাণিজগৎ। কলুটোলা, পাথুরিয়াঘাটা, মির্জাপুর, এসপ্লানেড, মালাঙ্গা লেন, ক্রিক রো (তিনি শেষ দিকে একটা খবরের কাগজের ক্রিক রো অফিসে কাজ করেছেন), কক-বার্ন লেন, ফিয়ার লেন, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, টেরিটিবাজার—সব জায়গা ও রাস্তা মিলে কলকাতার নগরচিত্র।

১৯৪১ সালে ৮০ বছর বয়সে মারা যান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর মৃত্যুতে বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে আধিপত্য ও প্রভুত্বের প্রভাবের সমাপ্তি সূচিত হয়। তাঁর মৃত্যুর প্রায় আট বছর পর জীবনানন্দ লেখেন, 'আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মতো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কেউ নেই এবং অদূর ভবিষ্যতেও কেউ থাকবেন না, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।'[৪২] তাঁর প্রভাব সম্পর্কে জীবনানন্দ মন্তব্য করেছিলেন :

> সকল দেশের সাহিত্যেই দেখা যায় একজন শ্রেষ্ঠতম কবির কাব্যে তাঁর যুগ এমন মানবীয় পূর্ণতায় প্রতিফলিত হয় যে, সেই যুগের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পথে যে-সব কবি নিজেদের ব্যক্ত করতে চান, ভাবে বা ভাষায়, কবিতার ইঙ্গিতে বা নিহিত অর্থে, সেই মহাকবিকে এড়িয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।[৪৩]

সর্বশ্রদ্ধেয় ও প্রভাবশালী অনবদ্য লেখকেরা তখনো ছিলেন, এখনো আছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধির কাছাকাছি কেউ পৌঁছাতে পারেননি। তিনি শেষ পর্যন্ত ধরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রেখেছিলেন রাজত্ব। আগে যেমনটি বলা হয়েছে, তরুণ লেখকদের আধুনিক উপন্যাসের একটা নমুনা দেখিয়ে দিয়ে ও তাদের ঈর্ষা জাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ *শেষের কবিতা* লেখেন, যখন তাঁর বয়স ষাটের কোঠায়। সত্তরের কোঠায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় গদ্যছন্দ প্রবর্তন করার সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

কবি আজ প্রয়াত। লেখার মাধ্যমে মহৎ লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বহু লেখক। সঞ্জয় ও সত্যপ্রসন্ন তাঁদের সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়া পত্রিকা *পূর্ব্বাশার* বিশেষ সংখ্যা বের করেন, যেখানে দুটো কবিতার মধ্যে একটা ছিল জীবনানন্দ দাশের, 'রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে। *পরিচয়* ১৯৪১-এর নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথের স্মরণে বিশেষ সংখ্যা বের করে, যার জন্য জীবনানন্দ 'রবীন্দ্রনাথ' নামে আরেকটি কবিতা লেখেন। বহু ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার সঙ্গে জড়িত না থাকলেও বিশেষ সংকলন বের করেন। পরের বছরের জুলাই মাসে বাংলাদেশের মফস্বল শহর পাবনা থেকে জনৈক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সংকলিত এ রকম একটা অনিয়মিত কবিতা সংকলন বের হয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন *পঁচিশে বৈশাখ* নামে, সেটিতে জীবনানন্দ 'রবীন্দ্রনাথ' নামে তৃতীয় একটি কবিতা লেখেন। এর আগে একই নামে তিনি আরও একটা কবিতা লিখেছিলেন, তবে সেটা কোথাও ছাপেননি।[৪৪] তারপর আবার, তাঁর জীবনের শেষ বছর জীবনানন্দ 'রবীন্দ্রনাথ' নামে পঞ্চম একটা কবিতা প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ

'মানুষের মনে দীপ্তি আছে,
তাই রোজ নক্ষত্র ও সূর্য মধুর—'
এরকম কথা যেন শোনা যেত কোনো একদিন,
আজ সেই বক্তা ঢের দূর

চলে গেছে মনে হয় তবু;
আমাদের আজকের ইতিহাস হিমে
নিমজ্জিত হয়ে আছে বলে
ওরা ভাবে লীন হয়ে গিয়েছে অন্তিমে

সৃষ্টির প্রথম নাদ—শিব ও সৌন্দর্যের;
তবুও মূল্য ফিরে আসে
নতুন সময়তীরে সার্বভৌম সত্যের মতন
মানুষের চেতনায় আশায় প্রয়াসে।[৪৫]

এর চেয়ে আশাবাদী কবিতা পাওয়া দুষ্কর, এর চেয়ে বড় শ্রদ্ধার্ঘ্য কল্পনা করা দুঃসাধ্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আদি ও বিশ্বজনীন সুরের দৃষ্টান্তে বিশেষায়িত হয়ে ওঠে শিবের সৃষ্টি ও সুন্দরের আদিম নিনাদে। তাঁর দুই সমপদস্থ দেবতা—ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পাশাপাশি বসালে শিবের ভূমিকা প্রলয়কারীর। কিন্তু আলাদাভাবে এই তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেবতা স্রষ্টা, রক্ষক ও বিনাশকর্তা হিসেবে পরিচিত। শিবের পাঁচ ধরনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি হচ্ছে সৃষ্টি। আর এই শিবই শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাঁর এক হাজার আটটি বিশেষণের মধ্যে একটা হচ্ছে, 'সকল শিল্পের প্ররোচক'।[৪৬]

সৌন্দর্য—এখন শীতের থাবায় থাকলেও—নতুন কবিতায় নবজন্ম নেবে। এ রকম বক্তব্য শিল্প ও শৈল্পিক সৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্বজনীন ও অসীমের ব্যক্তিগত পার্থিব প্রকাশ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। তাঁর *গীতাঞ্জলি*তে তিনি গেয়েছেন :

> আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব—
> কত-যে গিরি কত-যে নদী-তীরে
> বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে
> কত-যে তান বাজালে ফিরে ফিরে... ।[৪৭]

১৯১৬-১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এক বক্তৃতা-সফরে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের স্বতন্ত্র মানস হচ্ছে সূত্র, যা এই বৈশ্বিক মানসের ছন্দায়িত স্পন্দনকে অনুভব করে এবং স্থান ও কালের সংগীতের ভেতর দিয়ে তার প্রত্যুত্তর দেয়।...অবশ্যই আমাদের সৃষ্টিগুলো ঈশ্বরের ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যমাত্র।'[৪৮] আরও একবার আশাবাদী জীবনানন্দ বলেন, শিবের সৃষ্টিশীলতার ধ্বনিত নাদ ব্যক্তিগত শিল্পকর্মে বিশেষায়িত হবে। তাঁর কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি চল্লিশের দশকে সঞ্জয়ের উদ্দেশে তাঁর নিজের দেওয়া নিশ্চয়তার প্রতিধ্বনি করেন, 'শক্তি, ইচ্ছা ও সৎ অন্তঃকরণ' দিয়ে তিনি কবিতার অনাগত সমৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। 'রবীন্দ্রনাথ' নামের পঞ্চম কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। সত্যিকার প্রতিভাসম্পন্ন কিছু তাঁর অথবা বাংলা কবিতায় ফিরে আসবে এই কথাটি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারার আগে জীবনানন্দ কবিত্বের একটা পরীক্ষামূলক সময়ের মধ্য দিয়ে পার হয়েছিলেন।

কবিতা পত্রিকায় ১৯৩৮ সালে তাঁর 'কবিতার কথা' ছাপা হওয়ার পর কবিতা প্রসঙ্গে জীবনানন্দ প্রথমবারের মতো তাঁর প্রধান লেখাটি লেখেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর, 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা'। আগের লেখাটিতে জীবনানন্দ তর্ক উত্থাপন করেন, কবি তাঁর নিজের কাজটিই অনুশীলন করবেন, দার্শনিক অথবা সমাজতাত্ত্বিকের কাজ নয় :

> প্রত্যেক মনীষীরই একটি বিশেষ প্রতিভা থাকে—নিজের রাজ্যেই সে সিদ্ধ। কবির সিদ্ধিও তার নিজের জগতে; কাব্যসৃষ্টির ভিতরে। আমরা হয়তো মনে করতে পারি যে যেহেতু সে মনীষী কাজেই অর্থনীতি সম্বন্ধে—সমাজনীতি, রাজনীতি সম্বন্ধে, মননরাজ্যের নানা বিভাগেই, কবির চিন্তার ধারা সিদ্ধ। আমাদের উপলব্ধি করে নিতে হবে যে তা নয়। উপকবির চিন্তার ধারা অবশ্য সব বিভাগেই সিদ্ধ—যেমন উপদার্শনিকের। কিন্তু প্রতিভা যাকে কবি বানিয়েছে কিংবা সঙ্গীত-বা-চিত্র-শিল্পী বানিয়েছে—বুদ্ধির সমীচীনতা নয়, শিল্পের দেশেই সে সিদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> শুধু—অন্য কোথাও নয়। একজন প্রতিভাযুক্ত মানুষের কাছ থেকে আমরা যদি তার শ্রেষ্ঠ দান চাই, কোনো দ্বিতীয় স্তরের দান নয়, তাহলে তা পেতে পারি সেই রাজ্যের পরিধির ভিতরেই শুধু যেখানে তার প্রতিভার প্রণালি ও বিকাশ তর্কাতীত।[৪৯]

জীবনানন্দ সতর্ক করে দেন, এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা এই নয় যে কবিকে বাস্তব, অশৈল্পিক জীবনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে, কবি শিল্পের জগতে অনন্যসাধারণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

১৯৪১ সালের মধ্যে যাঁরা কবিতার অস্ত্র দিয়ে সমাজের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মনস্থ করেন জীবনানন্দ তাঁদের কাছ থেকে হটে আসেন। কোনোভাবেই তিনি তাঁর মত বদলাননি, তবে ১৯৩৮ সালে যে রকম মনে হয়েছিল ('কবিতার কথা'), ১৯৪১ সালে তাঁর কাছে কবিতা ও জীবন খুব আলাদা ('রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা') থাকেনি। জীবনানন্দ স্বীকার করেন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবিতা দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রত্যক্ষ করার দর্শনকে সমন্বিত করেছিলেন :

> আমাদের দেশে যে-সব নতুন কবিরা দিব্যানুভূতিকে ঘৃণা করেন এবং স্থূল ও চিক্কণ সুর মিশিয়ে কবিতা লেখেন—পদ্যে বা গদ্যছন্দে—তাঁদের কবিতা প্রধানত শ্লেষাত্মক এবং বর্তমান কালের সমগ্র পৃথিবীর সমাজ-ব্যবস্থার অন্যায় ও অত্যাচারের মুখোস বার করে ফেলবার জন্যে প্রযুক্ত। রবীন্দ্রনাথও তাই চান, কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন প্রায়শই বিশুদ্ধ কাব্যের আবেগে। কিন্তু এঁদের মনোবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এইজন্যেই বিভিন্ন যে এঁরা সাহিত্যে কল্পনাপ্রতিভার দাবি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে অকাতর ভাবে মননজীবী এবং কবিতায় বিশুদ্ধ রসের কোনোরকম অবতারণার বিরোধী।...কিন্তু সাহিত্যকে যদি যুগের দর্পণ হিসেবেই শুধু স্বীকার করে নেয়া যায়, একটি ক্ষয়িষ্ণু যুদের নির্মম দর্পণ হয়েও সাংবাদিকী ও প্রচারমর্মী রচনার সঙ্গে কবিতার পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত জিনিসগুলোর ভিতর অভিজ্ঞতা-বিশোধিত ভাবনাপ্রতিভার মুক্তি, শুদ্ধি ও সংহতি কিছুই নেই, কবিতায় তা আছে।[৫০]

জীবনানন্দ আসলে স্বীকার করেন না যে সাহিত্য যুগের দর্পণ কিংবা তাই হওয়া উচিত, তবে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে একটা সম্ভাবনা হিসেবে পোষণ করেন।

কবিগুরু আর না থাকলেও বাংলা কবিতা নিশ্চয়ই বেঁচে ছিল, তবে জীবনানন্দ যুগ সম্পর্কে কম প্রত্যয়ী ছিলেন, যে মনোভাব তাঁর কবিতায় আরও বেশিভাবে ফুটে ওঠে। সেপ্টেম্বর ১৯৪১-এর *নিরুক্তর* প্রথম পাতায় তাঁর 'গরিমা' কবিতাটা ছাপা হয় :

গরিমা

সহসা ঝড়ের দিনে লুণ্ঠনের ঊর্দ্ধে উঠে চিল
আমারি এ হৃদয়ের মতো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়তো বা নীলিমাকে চায়।
তবুও দৈত্যের কাছে প্রেমিকেরা হবে পরাহত;
পরিহাস করে যায় বিরক্ত নিখিল?

কখন সে পড়ে গেছে আমাদের পায়ের নিকট
সোনালি, প্রবীণ এক পাখি;
জীবনকে আকৃতির মতো বড়ো মনে করেছিল;
তবুও আজ আকাশের মতো আরো বৃহৎ—একাকী
মৃত; মৃত্যু—প্রিয় আজ আমি তার হাতে আঁকা পটে।

চারিদিকে অবিকল বিকেলের রাঙা সূর্য জ্বলে;
নদীর জলের সুর সন্তর্পণে কান পেতে প্রবাহিত হয়;
আমার হৃদয়ে যেই সুশৃঙ্খলা হয় না গ্রথিত
আকাশ বাতাস নদী তাই নিয়ে তবুও তন্ময়।
এইসব অভিজ্ঞান রয়ে যাবে দু-একটি গরিমার মতো।
অথবা গরিমা-লোক এই শতাব্দীর হাওয়া একগাল
পান করে শেষ হয়ে গেলে
ফাটকা বাজার সব—সেয়ানে সেয়ানে এসে মেলে।[৫১]

নৈরাশ্যের শিকার হয়ে কিছুটা হতবুদ্ধিও ছিলেন জীবনানন্দ : তাঁর কাছে যা লালিত, তাঁর হৃদয়ের মতো চিলও যা ভালোবাসে, 'আকাশ বাতাস নদী'—সেই সবকিছু দানবের হাতে পরাজিত হবে। তিনি আর তাঁর দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন না। কারণ, পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখন আর তাঁর হৃদয়ে 'সুশৃঙ্খলা হয় না গ্রথিত'—'দু-একটি গরিমার মতো' সেসব হয়ে গেছে 'অভিজ্ঞান'। এই কবিতাটি তাঁর 'বোধ' কবিতার বিপরীত তীরে। 'বোধ'-এ জীবনানন্দ আমাদের তাঁর কাব্যিক সৃষ্টিশীলতার প্রণোদনার একান্ত সাক্ষীতে পরিণত করেন। এখানে বিষণ্ন, প্রায় তিক্ত কণ্ঠে তিনি বহু ওপরে ভেসে থাকা চিলের মৃত্যু, তাঁর (ও সব রোমান্টিকের) প্রেরণার বিষয় হিসেবে প্রকৃতির ক্ষতি এবং 'সেয়ানে সেয়ানে'দের হাতে তাঁর নিজস্ব ভুবন বিজয়ের সংবাদ ঘোষণা করেন। তাঁর প্রিয় বাংলার ওস্তাদ শিল্পী না হয়ে তিনি হয়ে যান ক্যানভাসে আঁকা ছবির পটের একটা বাড়তি উপাদান।

'বনলতা সেন'-এ ব্যক্ত ক্লান্তি বয়ে আসে একান্ত ব্যক্তিগত অনুভব থেকে। মৃত্যু বা বি-মানবিক জীবজন্তু ও গাছপালার ভুবনে পুনর্জন্ম জীবনের নিদারুণ অবসাদের চেয়ে শ্রেয়তর বলে মনে হয়। জীবন কিন্তু অশুভ ছিল না, ছিল ক্লান্তিকর। এখন জীবনানন্দ পৃথিবী ও তার সমাজকে এমনভাবে দেখেন, যা নিয়ে বিবাদ করতে হবে। বিশ্রামের ঘুম অথবা মৃত্যু আর সমাধান দিতে পারবে না। *রূপসী বাংলা* ও *বনলতা সেন*-এর নিবিড় অন্তর্মুখী বক্তব্য পরিবর্তন করে মানবজাতির গুরুতর অবস্থা সম্পর্কে কবি নিজে থেকেই মুখ খোলেন।

একই মাসে জীবনানন্দের দুটো কবিতা প্রকাশিত হয় *কবিতা* পত্রিকায়, তার মধ্যে একটির নাম 'ঘাস'। একই নামের একটি কবিতা একই কাগজে ছাপা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল প্রায় ছয় বছর আগে, যেখানে জীবনানন্দ ঘাসের মধ্যেও প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সবুজ, সুবাসিত, রসালো ঘাস তাঁকে অঙ্গীভূত হওয়ার জন্য, ঘাস হিসেবে জন্ম কিংবা পুনর্জন্ম নেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করেছিল। পরের কবিতাটিতে ঘাস মরে গেছে।

ঘাস

মরণ তাহার দেহ কোঁচকায়ে ফেলে গেলো নদীটির পারে।
সফেন আলোক তাকে চেটে গেলো দুপুরবেলায়।
সবুজ বাতাস এসে পৃথিবীতে যাহা কোঁচকায়
তাহাকে নিটোল ক'রে নিতে গেলো নিজের সঞ্চারে।
উৎসাহে আলাপী জল তাহাকে মসৃণ
ক'রে নিতে গেলো—তবু—সময়ের ঋণ
ধীরে ধীরে ডেকে নিয়ে গেলো তাকে কুৎসিত, কাঠ নগ্নতায়।
তখন নরক তার অকৃত্রিম প্রাচীর দুয়ার
খুলে দিতে গেলো দেখে কানসোনা ঘাসের ভিতরে
সহসা লুকায়ে গেলো ঘাসের মতন তার হাড়।
সেই থেকে হাসায় এ পৃথিবীকে[৫২] ঘাস
ছ-মাস গাধাকে, আর মনীষীকে মিহি ছয় মাস।[৫৩]

ঘাস মরে যায়, কিন্তু জীবন আবার জন্মায়। মরা বিশুষ্ক ঘাস নরকে যায় না, জীবন্ত ঘাসের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। ঘাসের প্রতীকে জীবনের মূর্তরূপ এবং নবায়িত জীবনের বর্ষচক্র অধিকার করে সংবেদনশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক মানুষের হৃদয়, আবার একই ঘাস নির্বাক প্রাণীকে জোগায় খাদ্য। 'ঘাস' নামের দ্বিতীয় কবিতাটি প্রথমটির মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য: চেটে যাওয়া আলো, নিটোল করা সবুজ হাওয়া এবং শরীর সিক্ত করে কোমল ও মসৃণ করা উৎসাহী জল। কিন্তু প্রায় পুরো কবিতায় ঘাস মরে যাচ্ছে বা মৃত। উপরন্তু কবি, অর্থাৎ দর্শক, কথা বলছেন দূর থেকে। প্রথম 'ঘাস' কবিতাটিতে কথক পান করতে চেয়েছিলেন এর ঘ্রাণ, নিংড়াতে চেয়েছিলেন এর শরীর, ঘষতে চেয়েছিলেন পালক এবং চেয়েছিলেন একসময় ঘাস হয়ে জন্মাতে; অথচ দ্বিতীয়টিতে কেবল ঘাসকে দেখেন তিনি। ঘাসের ওপর নরত্বারোপ করে তিনি মূর্ত করেন তাকে এবং সেই নরত্বারোপের মধ্য দিয়ে অনুভব করেন ঘাসের অনুভূতিকে, কিন্তু হারিয়ে যান না তার রাজ্যে। সূক্ষ্ম মনীষা পাঠককে জানায় যে মানুষেরও একটা ভুবন আছে, যা কবি চিহ্নিত করেন। প্রথম 'ঘাস' কবিতাটি এবং সে সময়কার অন্য কবিতায় মানুষের ভুবনের এই চেতনাটি অনুপস্থিত ছিল।

জয়শ্রী নামের একটা পত্রিকার বিশেষ রবীন্দ্রনাথ সংখ্যায় (এটাও ১৯৪১-এর সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত) 'আবছায়া' কবিতাটি চারপাশের মনুষ্যভুবন বিষয়ে জীবনানন্দের নবচেতনার চিত্রায়ণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আবছায়া

ভোরের বেলায় আজ একটি কঠিন অবসাদ
বিকেলবেলায়ও আজ একটি কঠিন
বিষণ্ণতা লেগে আছে পৃথিবীর বুকে।
একটি কৃষাণ এসে দু'য়ে দু'য়ে যোগ করে তিন
লিখে যায় সারাদিন মাঠের ভিতরে।
কোথাও ফলন নেই তার।
ঠাণ্ডা কঙ্কালের কাছে সারারাত
গুড়িসুড়ি মেরে শুয়ে থাকে;
কিছুই করে না অস্বীকার।

২

নিমীল জলের ঢেউয়ে নদী চলে যায়।
জল ছাড়া কিছু নেই তার।
কখন সকালবেলা বিকেল হয়েছে
আমাদের চেনা শতাব্দীও চলে গেছে।
চলেছে সে জলপায়রার নীড় খুঁজে।
নদীর কিনারে
বাদামি মাটির পরে ঝ'রে পড়ে পাতা।
এইসব শাদা সাধারণ বিশ্বস্ততা।
আমারো আঙুলে পড়ে থেমে থাকে—যতদিন আছে—
একটি হলুদ পাতা। নিকটের গাছে
কোথাও কোকিল হিম শূন্যতার পানে গান গায়,
পাখিটির ভয়াবহ একাগ্রতার তুলনায়
কেবলি সময়ান্তর এসে পড়ে সভ্য পৃথিবীতে;
বারবার অপরাহ্নের মৃত্যু হয়।
জানে না কি বস্তু নিয়ে তৃপ্ত হতে হবে
পুরাতন খসড়ায়—অথবা বিপ্লবে।[৫৪]

জীবনানন্দ সাধারণ মানুষ তথা কৃষকদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, যারা সামান্য প্রাপ্তির জন্য কিংবা প্রাপ্তিহীনভাবেই কঠোর পরিশ্রম করে। এই বিষণ্ণ দৃশ্য থেকে কবি তাঁর মনোযোগ ফেরান একটা নদীর দিকে। জলের মতো সময় নিরন্তর বয়ে যায় অদৃশ্যভাবে। প্রকৃতি চলতে থাকে, নদী থাকে প্রবহমান, কিন্তু মানবসভ্যতা একটি যুগ শেষ করতে উৎসুক এবং নতুন যুগ শুরু করার জন্য প্রাণপণে উদ্যমী—এমন প্রবণতার প্রমাণ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অসন্তুষ্ট মানুষ মনে হয় যেমন আছে তেমন চলতে দিতে অনীহ। তবে সে কি সত্যিই জানে কীভাবে তৃপ্তি আসে? কমিউনিস্টরা বিপ্লবের পক্ষে যুক্তি দেন। তাতে কি মনুষ্যত্বের শান্তি হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

নাকি পুরোনো ধারণার মধ্যে আছে সমাধান? জীবনানন্দ অনিশ্চিত—মানবতা কীভাবে এগোবে, অথবা কীভাবে এগোনো উচিত। সূক্ষ্মভাবে শিক্ষামূলক কবিতাটিতে একজন কবি হতাশার সঙ্গে অনুভব করেন যে সেই কল্পরাজ্য অত্যাসন্ন নয়। যা-ই ঘটুক না কেন, মানুষ অতৃপ্ত রয়ে যাবে এবং আরেকটি যুগের সমাপ্তি ঘটবে ভবিষ্যৎ কোনো এক সময়ে।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে *নিরুক্ত* পত্রিকায় জীবনানন্দ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ছয় স্তবকের সুষম মিত্রাক্ষরে একটা কবিতা লেখেন, এই ছন্দটি বাংলা কবিতায় প্রবর্তন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তবে জীবনানন্দ এই ছন্দে খুব বেশি লেখেননি। খেলাচ্ছলে হলেও এই ছন্দে বিষয়বস্তু নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা ভালোই জমে—এতে বলা হয়েছে চার ভিক্ষুকের কথা, এক নারী আর তিনজন পুরুষ, তারা লৌকিকতার ভান করে—একজন উজির, একজন রাজা আর তৃতীয়জন কোটাল। তিন ভিখারি আর তাদের মহিলা অতিথির স্থায়ী নিবাস কলকাতার রাস্তার ফুটপাত। এমনকি কবিতাটির শিরোনাম 'লঘু মুহূর্ত' বিদ্রূপাত্মকভাবে প্রথাগত কাব্যিক কাঠামোর বিরোধী এবং হালকাভাবে বলা এবং দারিদ্র্য ও কলকাতার দরিদ্রদের দুর্দশা সম্পর্কে মারাত্মক গুরুগম্ভীর বক্তব্যের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

লঘু মুহূর্ত

এখন দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরীর
অত্যন্ত প্রশান্ত হ'লো মন;
ধূসর বাতাস খেয়ে এক গাল—রাস্তার পাশে
ধূসর বাতাস দিয়ে ক'রে নিল মুখ আচমন।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে রাঙা নদী বলে;
সেইখানে ধোপা আর গাধা এসে জলে
মুখ দেখে পরস্পরের পিঠে চড়ে জাদুবলে।

তবুও যাবার আগে তিনটি ভিখিরী মিলে গিয়ে
গোল হ'য়ে ব'সে গেল তিন মগ চায়ে;
একটি উজির, রাজা, বাকিটি কোটাল,
পরস্পরকে তারা নিল বাৎলায়ে।
তবু এক ভিখিরিনী তিনজন খোঁড়া, খুড়ো, বেয়াইয়ের টানে—
অথবা চায়ের মগে কুটুম হয়েছে এই জ্ঞানে
মিলেমিশে গেল তারা চার জোড়া কানে।

হাইড্র্যান্ট থেকে কিছু জল ঢেলে চায়ের ভিতরে
জীবনকে আরো স্থির, সাধুভাবে তারা
ব্যবহার ক'রে নিতে গেল সোঁদা ফুটপাতে ব'সে;
মাথা নেড়ে দুঃখ ক'রে ব'লে গেল : 'জলিফলি ছাড়া
চেৎলার হাট থেকে টালার জলের কল আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এমন কী হ'তো জাঁহাবাজ?
ভিখিরীকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভাদ্র-বৌ সকলে নারাজ।'

ব'লে তারা রামছাগলের মতো রুখু দাড়ি নেড়ে
একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে
অনুভব ক'রে নিলো এইখানে চায়ের আমেজে
নামায়েছে তারা এক শাঁকচুন্নীকে।
এ-মেয়েটি হাঁস ছিলো একদিন হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁসহাঁস।
দেখে তারা তুড়ি দিয়ে বার ক'রে দিলো তাকে আরেক গেলাস;
'আমাদের সোনা রুপো নেই, তবু আমরা কে কার ক্রীতদাস?'

এ-সব সফেন কথা শুনে এক রাতচরা ডাঁশ
লাফায়ে-লাফায়ে যায় তাহাদের নাকের ডগায়;
নদীর জলের পারে ব'সে যেন, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে
তাহারা গণনা ক'রে গেল এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যায়;
চুলের এঁটিলি মেরে শুনে গেল অন্যায় ন্যায়;
কোথায় ব্যয়িত হয়—কারা করে ব্যয়;
কী কী দেয়া-খোয়া হয়—কারা কাকে দেয়;

কী ক'রে ধর্মের কল ন'ড়ে যায় মিহিন বাতাসে;
মানুষটা ম'রে গেলে যদি তাকে ওষুধের শিশি
কেউ দেয়—বিনি দামে—তবে কার লাভ—
এই নিয়ে চারজনে করে গেল ভীষণ সালিশী।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে উড়ো নদী বলে;
সেইখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে
মুখ দ্যাখে—যতদিন মুখ দেখা চলে।[৫৫]

নিরুক্ত পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের শেষ সংখ্যার (জুন ১৯৪২) প্রথম পৃষ্ঠায় সামাজিক বিষয় নিয়ে জীবনানন্দের আরেকটি কবিতা ছাপা হয় :

ক্ষেতে প্রান্তরে

ঢের সম্রাটের রাজ্যে বাস ক'রে জীব
অবশেষে একদিন দেখেছে দু-তিন ধনু দূরে
কোথাও সম্রাট নেই, তবুও বিপ্লব নেই, চাষা
বলদের নিঃশব্দতা খেতের দুপুরে।
বাংলার প্রান্তরের অপরাহ্ন এসে
নদীর খাড়িতে মিশে ধীরে
বেবিলন লন্ডনের জন্ম, মৃত্যু হ'লে—
তবুও রয়েছে পিছু ফিরে।
বিকেলে এমন ব'লে একটি কামিন এইখানে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেখা দিতে এলো তার কামিনীর কাছে—
মানবের মরণের পরে তার মমির গহ্বর
এক মাইল রৌদ্রে প'ড়ে আছে।

২

আবার বিকেলবেলা নিভে যায় নদীর খাড়িতে;
একটি কৃষক শুধু ক্ষেতের ভিতরে
তার বলদের সাথে সারাদিন কাজ ক'রে গেছে;
শতাব্দী তীক্ষ্ণ হ'য়ে পড়ে।
সমস্ত গাছের দীর্ঘ ছায়া
বাংলার প্রান্তরে পড়েছে;
এ দিকের দিনমান—এ-যুগের মতো শেষ হয়ে গেছে,
না জেনে কৃষক চোত-বোশেখের সন্ধ্যার বিলম্বনে প'ড়ে
চেয়ে দেখে থেমে আছে তবুও বিকাল;
উনিশশো বেয়াল্লিশ ব'লে মনে হয়
তবুও কি উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল।

৩

কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই;
একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে;
সূর্য উদয়ের সঙ্গে এসেছিলো ক্ষেতে;
সূর্যাস্তের সঙ্গে চ'লে গেছে।
সূর্য উঠবে জেনে স্থির হ'য়ে ঘুমায়ে রয়েছে।
আজ রাতে শিশিরের জল
প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি নিয়ে খেলা করে;
কৃষাণের বিবর্ণ লাঙল,
ফালে ওপড়ানো সব অন্ধকার ঢিবি,
পোয়াটাক মাইলের মতন জগৎ
সারাদিন অন্তহীন কাজ ক'রে, নিরুৎকীর্ণ মাঠে
প'ড়ে আছে সৎ কি অসৎ?

৪

অনেক রক্তের ধ্বকে অন্ধ হ'য়ে তারপর জীব
এইখানে তবুও পায়নি কোনো ত্রাণ;
বৈশাখের মাঠের ফাটলে
এখানে পৃথিবী অসমান।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
কেবল খড়ের স্তূপ প'ড়ে আছে দুই-তিন মাইল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তবু তা সোনার মতো নয়;
কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
জলপিপি চ'লে গেলে বিকেলের নদী কান পেতে
নিজের জলের সুর শোনে;
জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ
জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে—
ভ্রান্তিবিলাসে নীল আচ্ছন্ন সাগরে?
চৈত্য, ক্রুশ, নাইন্টিথ্রি ও সোভিয়েট শ্রুতি-প্রতিশ্রুতি
যুগান্তের ইতিহাস, অর্থ দিয়ে কূলহীন সেই মহাসাগরের প্রাণ
চিনে চিনে হয়তো বা নচিকেতা প্রচেতার চেয়ে অনিমেষে
প্রথম ও অন্তিম মানুষের প্রিয় প্রতিমান
হ'য়ে যায় স্বাভাবিক জনমানবের সূর্যালোকে।[৫৬]

জীবনানন্দের ভাবনা যখন মানবসমাজের দিকে এগিয়েছে, তখন বাংলার ওপর নেমে আসছিল দুর্ভিক্ষ। যতটুকু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সেটা আশ্বাসজনক ছিল না। বড় বড় সভ্যতা এসেছে আবার চলে গেছে, কিন্তু সরল কৃষকেরা বেঁচে আছে। কমিউনিস্টরা যে-বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হয়নি, হতোও না। তার পরও নেমে আসে দৈবদুর্বিপাক : সমাপ্তি হয় একটা যুগের। প্রলয়ংকরী দুর্ভিক্ষের বাংলা হচ্ছে মন্বন্তর, অথবা শব্দগতভাবে পৌরাণিক চরিত্র ব্রহ্মার পুত্র মনুর নেতৃত্বে একটি যুগের পরিবর্তন বা সমাপ্তি (অন্তর)। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে বাংলাকে খুব ভারী মাশুল দিতে হয়েছিল।[৫৭] তার ওপর পুরো বিশ্ব ছিল যুদ্ধে লিপ্ত। ধ্বংসাত্মক কামানের সামনে কৃষকের কাস্তে মর্মান্তিকভাবে নিষ্ফল, যদিও এটা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাদের গর্জনের তোড়। বহু রক্ত ঝরে, কিন্তু কারও কোনো উপকারে নয়, কৃষকদের অবস্থা আগে যেমন ছিল এখনো একই রকম খারাপ। প্রকৃতপক্ষে সাগরতল থেকে উদ্ভূত হওয়া অপ্রয়োজনীয় এককোষী প্রাণী থেকে শুরু করে জৈবিক জীবন কি একবিন্দু এগিয়েছে?—এ কি কেবলই এক ভ্রান্তিবিলাস?

বুদ্ধ, যিশুখ্রিষ্ট, ফরাসি বিপ্লব ও রুশ বিপ্লব—লক্ষণার মাধ্যমে 'চৈত্য, ক্রুশ, নাইন্টিথ্রি ও সোভিয়েট শ্রুতি-প্রতিশ্রুতি'—মানবেতিহাসের কিছু বিশাল পরিবর্তনকারী ঘটনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জীবনানন্দের কাছে এগুলো নতুন যুগের প্রারম্ভ নয়, বরং পুরোনো যুগের সমাপ্তি। বৌদ্ধ 'চৈত্য' বা মন্দিরে সাধারণত প্রয়াত বুদ্ধের একটা স্মৃতিচিহ্ন থাকে; ক্রুশ যিশুর জীবনাবসানের প্রতীক। ষোড়শ লুইয়ের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল ১৭৯৩ সালের প্রথম ভাগে; তিরানব্বই সালের পুরো শরৎজুড়ে গর্জাচ্ছিল ত্রাসের রাজত্ব, যখন মারি আঁতোয়ানেৎকে গিলোটিনে দেওয়া হয়। আর কেবলই অনেক 'শ্রুতি-প্রতিশ্রুতি'র বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে রুশ বিপ্লবকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই চার প্রতীক যুগের সমাপ্তি ইঙ্গিত করে। এগুলো কি কোনো আশা দিয়েছিল বিশ্বকে? বুদ্ধের শিক্ষা কিংবা খ্রিষ্টধর্ম কি বিশ্বকে অধিকতর শ্রেয় ভূমিতে পরিণত করেছে? ত্রাসের রাজত্ব কিংবা কমিউনিজম কি 'স্বাভাবিক জনমানবের' জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিয়ে এসেছে? দুর্ভাগ্যজনকভাবে মানুষের কোনো চারিত্রিক বা নৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলে মনে হয় না। বর্তমান সময়ের মতো, বিভিন্ন যুগের সহিংস সমাপ্তি ঘটে চলেছে প্রায়ই : 'নিকটের কাছে/কোথাও কোকিল হিম শূন্যতার পানে গান গায়,/পাখিটির ভয়াবহ একাগ্রতার তুলনায়/কেবলই সময়ান্তর এসে পড়ে সভ্য পৃথিবীতে;' নচিকেতা অগ্নির দেবতা, আর প্রচেতা হচ্ছেন সমুদ্রের প্রভু। আগুনের সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক সর্বগ্রাসী শক্তির কাছে নিয়ে যাওয়া জীবন কোনোভাবে শক্তির নিয়ম উপলব্ধি করেছে বলে মনে হয়। জীবনানন্দের দৃষ্টিতে সেই জীবন প্রচেতাকে প্রত্যাখ্যান করে, যেহেতু শুষ্ক ভূমির দিকে তার বিস্তার, প্রতিপালন করা সমুদ্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নচিকেতা আর আগুনকে উপাস্য করে মানুষ।

তাঁর লেখা শুধু *নিরুক্ত* পত্রিকাতেই ছাপা হচ্ছিল না, *কবিতা*তেও ছাপা হতো, যেটি ১৯৪১ সালের জুন মাস থেকে এককভাবে সম্পাদনা করতেন বুদ্ধদেব বসু। (প্রেমেন্দ্র মিত্র *কবিতা* ছেড়ে গিয়ে সঞ্জয়ের সঙ্গে *নিরুক্ত* সম্পাদনা করছিলেন।) *কবিতা* পত্রিকার মার্চ ১৯৪২ সংখ্যায় জীবনানন্দের কোনো কবিতা ছিল না, তবে 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার একটা ঘোষণা ছিল। তাঁর *বনলতা সেন* পুস্তিকাটি একই বছর একই গ্রন্থমালার প্রকাশনা হিসেবে বের হয়, যেটিতে একই কবির ১৬টি কবিতার মূল্য ছিল চার আনা, অর্থাৎ এক পয়সায় একটি কবিতা।[৫৮]

তাঁর আগেকার কাব্যজগতের একটা নস্টালজিক প্রতিফলন 'স্বভাব' *কবিতায়* ছাপা হয় ১৯৪২-এর জুন সংখ্যায় :

স্বভাব

যদিও আমার চোখে ঢের নদী ছিলো একদিন
পুনরায় আমাদের দেশে ভোর হ'লে,
তবুও একটি নদী দেখা যেতো শুধু তারপর;
কেবল একটি নারী কুয়াশা ফুরোলে
নদীর রেখার পার লক্ষ্য ক'রে চলে।
সূর্যের সমস্ত গোল সোনার ভিতরে
মানুষের শরীরের স্থিরতর মর্যাদার মতো
তার সেই মূর্তি এসে পড়ে;
সূর্যের সম্পূর্ণ বড়ো বিভোর পরিধি
যেন তার নিজের জিনিস।
এতদিন পরে সেইসব ফিরে পেতে
সময়ের কাছে যদি করি সুপারিশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাহ'লে সে স্মৃতি দেবে সহিষ্ণু আলোয়
দু-একটি হেমন্তের রাত্রির প্রথম প্রহরে;
যদিও লক্ষ লোক পৃথিবীতে আজ
আচ্ছন্ন মাছির মতো মরে—
তবুও একটি নারী 'ভোরের নদীর
জলের ভিতরে জল চিরদিন সূর্যের আলোয় গড়াবে'
এ-রকম দু-চারটে ভয়াবহ স্বাভাবিক কথা
ভেবে শেষ হ'য়ে গেছে একদিন সাধারণভাবে।[৫৯]

'দুর্দিন' নামের একই রকম একটা কবিতা ২৩ মে ১৯৪০ তারিখের চিঠির সঙ্গে *বৈজয়ন্তী* পত্রিকায় ছাপানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল জগদীশ ভট্টাচার্যের কাছে। পত্রিকাটি ছয় মাস আগে প্রকাশনা শুরু করলেও সে মাসেই বন্ধ হয়ে যায় এবং 'দুর্দিন'সহ জীবনানন্দের আরও তিনটি অপ্রকাশিত কবিতার পাণ্ডুলিপি জগদীশ ভট্টাচার্যের কাছে রয়ে যায়।

দুর্দিন

যদিও আমার চোখে ঢের নদী জেগে যেত একদিন
পুনরায় আমাদের দেশে ভোর হ'লে,
তবুও একটি নদী দেখা যেত শুধু তারপর;
কেবল একটি নারী খরগোশ কোলে
নদীর রেখার দিক লক্ষ্য ক'রে চলে যায়;—
সূর্যের সমস্ত গোল সোনার ভিতরে
শিল্পীর কাঁচিতে কাটা শাদা কাপড়ের
যেন এক মহিলার মূর্তি এসে পড়ে;
সমস্ত সূর্যের বড়ো বিভোর পরিধি
যেন তার নিজের জিনিস।
এতদিন পরে সেই ছবি ফিরে পেতে
সময়ের কাছে যদি করি সুপারিশ—
তাহ'লে সে স্মৃতি দেবে মোমের আলোকে,
হলুদ কাগজে মোড়া এই ম্লান দেয়ালের ঘরে;—
একটি তরুণী যেন বহুদিন হয়
নিজেকে ছবিতে ছেঁটে—সূর্যের ভিতরে
ঢুকে গেছে;—তারপর বার হ'তে ভুলে গেছে
সে ও তার নিরাবিল শাদা খরগোশ।
নদীরা যে নেই আজ পৃথিবীতে—সূর্য নেই—
সব এই জানুহীন সময়ের দোষ।[৬০]

পঙ্গু, অসাড়—আক্ষরিক অর্থে 'জানুহীন'—সময়ের কারণে সেসব দিন (১৯৪০) আর স্বাভাবিক বর্ণাঢ্য ছিল না। ১৯৪২ সালের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ মরছিল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এবং বিশ্বযুদ্ধে তা অব্যাহত থাকে, আর পরবর্তী সময়ে এক 'যুগান্তের' মন্বন্তরে। কিন্তু এক নারী—হয়তো প্রকৃতি—একবার ভেবেছিল নদীর কথা, মরণের কথা নয়। সেও আর নেই। প্রায় যুগপৎভাবে তাঁর নিজস্ব কাব্যময়তাকে শ্বাসরোধ করে সময়ের কঠিন সত্য কবিতায় জোর করে ঢুকে পড়লে জীবনানন্দের কাব্যিক স্বর ক্ষীণ হয়ে আসে।

৪

১৯৩৪ সালে অবৈধ ঘোষিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) সপ্তম কমিন্টার্নের (১৯৩৫) পর থেকে একটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট, ফ্যাসিবাদবিরোধী পপুলার ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছিল। ১৯৪২ সালের মার্চে ২১ বছরের এক বামপন্থী লেখক সোমেন চন্দ ঢাকায় একটা ফ্যাসিবাদবিরোধী সভায় যোগদানের জন্য তাঁর নেতৃত্বাধীন রেলওয়ে শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়ার সময় ঘাতকের হাতে নিহত হন।[৬১] লেখকদের মধ্যে একতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বামপন্থীরা 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলন'কে পুনরুজ্জীবিত করে 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' নামে নতুন নামকরণ করেন।

> ২৮ মার্চ, ১৯৪২, ভারতীয় সাংবাদিকতার মূল ব্যক্তি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক জনাকীর্ণ জনসভায় সভাপতিত্ব করেন, সেখানে ফ্যাসিবাদের নারকীয় চেহারা এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেখক ও শিল্পীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন বিখ্যাত সাহিত্যযোদ্ধারা। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘকে সংগঠিত করতে একটা কমিটি গঠন করা হয়; এতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত হয়, তাঁদের মধ্যে ছিলেন যামিনী রায়, ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে তাঁর চেয়ে সৃষ্টিশীল আর কেউ ছিলেন না তখন; নেতৃস্থানীয় সমালোচক অতুল গুপ্ত ও আইয়ুব; সম্পাদক সত্যেন মজুমদার, হিরণ সান্যাল ও সজনীকান্ত দাস; কথাসাহিত্যবিশারদ নরেশ সেনগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রম্য রচয়িতা বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী (শান্তিনিকেতন), বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়সহ অন্য কবিরা।[৬২]

শ্রদ্ধাভাজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্ম রামানন্দ তখনো *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ* সম্পাদনা করছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে সব ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শের লেখক-শিল্পী নির্দ্বিধায় ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিলেন।

সোমেন চন্দ-হত্যার প্রতিবাদে কিছুসংখ্যক লেখক মিলে একটা ম্যানিফেস্টো এবং তাঁদের সতীর্থের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত একটা কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করেন।[৬৩]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লেখকদের মধ্যে ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। অমিয় চক্রবর্তীর প্রারম্ভিক কবিতার প্রেরণাময় কোরাস থেকে বইটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'প্রাচীর'... ।[৬৪]

সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঢাকাবাসী কিছু লেখক *প্রতিরোধ* নামে আরেকটা পাক্ষিক প্রকাশনা বের করেন। এই কাগজের একজন যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (বছর চারেক আগে জীবনানন্দ কিরণশঙ্করের কবিতার বই *স্বপ্ন কামনার* ভূমিকা লিখেছিলেন।) ১৯৪২-এর জুন মাসে শুরু হয়ে ১৯৪৩-এর জানুয়ারির মাঝামাঝি বন্ধ হয়ে যাওয়া *প্রতিরোধ*-এর বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, 'ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সম্মেলন' প্রকাশিত একটি 'মার্ক্সবাদী এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী পাক্ষিক সাহিত্য পত্রিকা।' শুধু জীবনানন্দ নন, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো এ রকম রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন মতাদর্শের লেখকেরাও *প্রতিরোধ*-এর ১৯৪২-এর শরৎ সংখ্যায় লেখেন। সে বছরের গ্রীষ্মে চেয়ে নেওয়া জীবনানন্দের কবিতা 'অনুভব' ছাপা হয় এই শরৎ সংখ্যায় :

অনুভব

আমরা আশ্চর্য্য পথে যাবো না কি আর?
কোথাও দেখার মতো রয়ে গেছে কিছু।
আত্রেয়ীর থেকে বঙ্গসাগরের সীমানা বিপুল;
ভোরবেলা পশ্চিমের থেকে যাত্রা ক'রে
সায়াহ্নের বাংলার বদ্বীপের মতো উপকূল;
লবণসমুদ্র তাকে যেমন উজ্জ্বল করে—সূর্য যা সব
রৌদ্র দিয়ে সৃষ্টি করে—
তাছাড়া নীরব।

বাংলার মাঠের শিয়রে বড়ো চাঁদ
ধীরে এসে থেমে দাঁড়াতেই—
প্রকৃতি নিজের মনে যা দেয় তাছাড়া
কোথাও বাড়ন্ত জ্যোৎস্না নেই।
মৃতদার হয়ে গেলে তবু তার ছায়ার মতন
এইসব এইখানে মানুষের মন
অধিকার করে থাকে।

এই দেশ সূর্যের, সাগরের আলো থেকে সেঁচা;
তাম্রকায় মানুষের কাছে কিনে বেচা সব—মূল্যহীন ভাঁড়ারের পেঁচা
না জেনে জ্যোৎস্নায় ওড়ে কী রকম বিভাতির মতো।
আজ কিছু শান্তি নয়—সুখ নয়,
ব্যথা নয়—তবে
ভেদাভেদ লোপ করে দিতে গিয়ে অন্তহীন বি[illegible]
ফুরাতেছে—এরকম শ্রেণীস্বার্থহীন অনুভবে।[৬৫]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথকের সত্যিকার অনুভব ঝাপসা থাকে। তিনি প্রাকৃতিক বাংলা সম্পর্কে ক্ষণিকের ভাবনাকে আলতোভাবে বয়ে যেতে দেন মনের ওপর দিয়ে। যে বোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তা কালের এক ফসল। 'আজ কিছু শান্তি নয়,—সুখ নয়,/ব্যথা নয়—তবে' জীবনানন্দ প্রকৃতপক্ষে একটা সত্যিকার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন না। তার বদলে তিনি তখনকার রাজনৈতিক নৈর্ব্যক্তিক শব্দমালার ওপর নির্ভর করেন। এটা একটা 'শ্রেণীহীন' অনুভব। তবে জীবনানন্দ এখানে মতাদর্শ প্রচারক নন। তিনি শ্রেণীহীনতার সংগ্রামের আংশিক ফলাফল উল্লেখ করেন: সীমাহীন বিভাজন। এসব বিভক্তি যে মুছে যেতে পারে অথবা বলপূর্বক তাকে দূর করা যায় বা অব্যাহত থাকতে পারে—তিনি নিশ্চিতভাবে বলেন (জানেন) না।

আর যখন নানা ধরনের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চলছিল, *নিরুক্ত* ও *কবিতা*সহ আরও বহু পত্রিকায় জীবনানন্দের কবিতা ছাপা হচ্ছিল; বুদ্ধদেব যদিও বলেন, তাঁর প্রতি সঞ্জয়ের বিরূপ মনোভাবের কথা তিনি জানতেন না, *নিরুক্ত* ও *কবিতা* এই ধারণা দেয় যে একজনের সঙ্গে আরেকজনের প্রতিযোগিতা ছিল। দুজনই জীবনানন্দকে সাদরে বরণ করতেন, জীবনানন্দও দুজনকেই লেখা দিয়ে সাহায্য করতেন, কমপক্ষে দুবার দুটো কাগজেই একই শিরোনামে কবিতা দিয়েছিলেন তিনি, ১৯৪০ সালে 'রাত্রি' ও দুই বছর পর 'বিভিন্ন কোরাস' (*নিরুক্ত*, সেপ্টেম্বর ১৯৪২; *কবিতা*, অক্টোবর ১৯৪২)।

বিভিন্ন কোরাস

এক—
আমাদের হৃদয়ের নদীর উপর দিয়ে ধীরে
এখনও যেতেছে চ'লে কয়েকটি শাদা রাজহাঁস;
সহধর্মিণীর সাথে ঢের দিন—আরো ঢের দিন
করেছি শান্তিতে বসবাস;

দেখেছি সন্তানদের ময়দানে আলোর ভিতরে
স্বতই ছড়ায়ে আছে—যেমন শুনেছি টায়-টায়;
অদ্ভুত ভিড়ের দিকে চেয়ে থেকে দেখে গেছি জনতার মাথা
গৃহদেবতাকে দেখে শৃঙ্গ শিলায়।

নগরীর পিতামহদের ছবি দেয়ালে টাঙায়ে—
টাঙায়েছি নগরীর পিতাদের ছবি :
পরিক্রমণে গিয়ে সর্বদাই আমাদের বড়ো নগরীতে
যাহাতে অমৃত হয় সে-রকম অর্থ, বাচক্নবী,[৬৬]

প্রকাশে প্রয়াস পেয়ে গেছি মনে হয়;
আমাদের নেয় যাহা নিয়ে গেছি তুলে;

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নটে গাছ মুড়ে গেছে ব'লে মনে হয়
আমাদের বক্তব্য ফুরুলে।

আবার সবুজ হ'য়ে জুয়ায়ে গিয়েছে
আমাদের সন্তানের—সন্তানের সন্তানের প্রয়োজনমতো।
এ-রকম চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে কাল
সহসা খিঁচড়ে উঠে খচ্চরের মতন ফলত

অন্য কোনো জ্যামিতিক রেখা হ'তে পারে;
অন্য কোনো দার্শনিক মত বিপ্লব;
জেনে তবু মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম এড়ায়ে
স্থির হ'য়ে রবে নাকি সন্ততিরা, সন্ততির সন্ততিরা সব?

যদি তারা টেঁশে যায় করাল কালের স্রোতে ধরা প'ড়ে গিয়ে,
যদি এই অন্ধকার প্রাসাদের ভগ্ন-অবশেষে
শেয়াল প্যাঁচার দিকে চেয়ে কেঁদে যায়,—
তখন স্বপ্নই সত্য; গিয়েছে বস্তুর থেকে ফেঁসে

জীবনের বাস্তবতা সে সময়।
মানুষের শেষ বংশ লোপ পেলে কে ফিরায়ে দেবে
জীবনের বাস্তবতা?—এমন অদ্ভুত স্বপ্ন নিয়ে
মাঝে মাঝে গিয়েছি নাগাড় কথা ভেবে।

দুই—

সময় কীটের মতো কুরে খায় আমাদের দেশ।
আমাদের সন্তানেরা একদিন জ্যেষ্ঠ হ'য়ে যাবে;
স্বতসিদ্ধতায় গিয়ে জীবনের ভিতরে দাঁড়াবে;
এ-রকম ভাবনার কিছু অবলেশ

তাদের হৃদয়ে আছে হয়তো বা;—মাঠে-ময়দানে
কথা ব'লে জীবনের বিষ তারা ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় আজ;
অল্পায়ু হিমের দিন ততোধিক মিহিন কামিজে
কাটাতেছে যেন অগণন গিরেবাজ।

সমুদ্রের রৌদ্র থেকে আমাদের দেশে
নীলাভ ঢেউয়ের মতো দীপ্তি নেমে আসে মনে হয়;
আমাদের পিতামহ পিতারাও প্রবাদের মতো জেনে গেছে;
আমাদেরো ততদূর ভাববিনিময়

একদিন ছিলো,—তবু শোচনীয় কালের বিপাকে
হারায়ে ফেলেছি সেই সান্দ্র বিশ্বাস।
কারু সাথে অন্ধকার মাটিতে ঘুমায়ে
কারু সাথে ভোরবেলা জেগে—বারো মাস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাকেও স্মরণ ক'রে চিনে নিতে হয়
সে কি কাল? সে জীবন? জ্ঞাতিভ্রাতা? গণিকা? গৃহিণী?
মানুষের বংশ এসে সময়ের কিনারে থেমেছে,
একদিন চেনা ছিলো ব'লে আজ ইহাদের চিনি

অন্ধকার সংস্কার হাৎড়ায়ে, মৃদুভাবে হেসে;
তীর্থে তীর্থে বারবার পরীক্ষিত হ'য়ে পরিচয়
বিবর্ণ জ্ঞানের রাজ্যে কাগজের ডাঁইয়ে প'ড়ে আছে;
আমাদের সন্ততিও আমাদের হৃদয়ের নয়।

আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় রয়েছি
একটি পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেছে আমাদের আগে;
আরেকটি পৃথিবীর দাবি
স্থির ক'রে নিতে হ'লে লাগে

সকালের আকাশের মতন বয়স
সে সকাল কখনো আসে না ঘোর, স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে।
পশ্চিমে অস্তের সূর্য ধূলিকণা, জীবাণুর উতরোল মহিমা রটায়ে
পৃথিবীকে রেখে যায় মানবের কাছে জনমানবের ঋণে।

তিন—

সারাদিন ধানের বা কাস্তের শব্দ শোনা যায়।
ধীর পদবিক্ষেপে কৃষকেরা হাঁটে।
তাদের ছায়ার মতো শরীরের ফুঁয়ে
শতাব্দীর ঘোর কাটে-কাটে।

মাঝে মাঝে দু-চারটে প্লেন চ'লে যায়।
একভিড় হরিয়াল পাখি
উড়ে গেলে মনে হয়, দুই পায়ে হেঁটে
কত দূর যেতে পারে মানুষ একাকী।

এ সব ধারণা তবু মনের লঘুতা।
আকাশে রক্তিম হ'য়ে গেছে;
কামানের থেকে নয়, আজো এইখানে
প্রকৃতি রয়েছে।

রাত্রি তার অন্ধকার ঘুমাবার পথে
আবার কুড়ায়ে পায় এক পৃথিবীর মেয়ে ছেলে;
মানুষ ও মনীষীর রৌদ্রের দিন
হৃদয়বিহীনভাবে শূন্য হ'য়ে গেলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেই রাত্রি এসে গেছে; সন্ততিরা জড়ায়ে গিয়েছে
জ্ঞাতকুলশীল আর অজ্ঞাত ঋণে।
পারাবত-পক্ষ-ধ্বনি সায়াহ্নের, সকালের নয়,
মাঝে এই বেহুলা ও কালরাত্রি বিনে।

চার—

এখন অনেক দূরে ইতিহাস-স্বভাবের গতি চলে গেছে।
পশ্চিম সূর্যের দিকে শত্রু ও সুহৃদ তাকায়েছে।
কে তার পাগড়ি খুলে পুব দিকে ফসলের, সূর্যের তরে
অপেক্ষায় অন্ধকার রাত্রির ভিতরে
ডুবে যেতে চেয়েছিলো ব'লে চ'লে গেছে।

আমরা সকলে তবু সময়ের একান্ত সৈকতে
নিজেদের অপরের সবায়ের জনমতামতে
অনেক ডোডোর ভিড়ে ডোডোদের মতো
নেই—তবু র'য়ে গেছি স্বভাববশত।
এই ক্রান্তি জীবন বা মরণের ব'লে মনে হয়।

আকাশের ফিকে রঙ ভোরের, কি সন্ধ্যার আঁধার?
এই দূরত্যয় সিন্ধু কি পার হবার?
আমরা অনেক লোক মিলে তবু এখন একাকী;
বংশ লুপ্ত ক'রে দিয়ে শেষ অবশিষ্ট ডোডো পাখি
হতে গিয়ে পারাবত-পক্ষ-ধ্বনি শুনি,
না কি ডোডোমির অতল ক্রেংকার।[৬৭]

এবং *কবিতা* অক্টোবর ১৯৪২ সংখ্যায় :

বিভিন্ন কোরাস

১

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু
এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান।
হৃদয়কে চোখ ঠার দিয়ে ঘুমে রেখে
হয়তো দুর্যোগে তৃপ্তি পেতে পারে কান;
এ-রকম একদিন মনে হয়েছিল—
অনেক নিকটে তবু সেই ঘোর ঘনায়েছে আজ;
আমাদের উঁচু-নিচু দেয়ালের ভিতরে খোঁড়লে
ততোধিক গুনাগার আপনার কাজ
ক'রে যায়—ঘরের ভিতর থেকে খ'সে গিয়ে [illegible]
বিভীষণ, নৃসিংহের[৬৮] আবেদন পরিপাক ক'রে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভোরের ভিতর থেকে বিকেলের দিকে চ'লে যায়,
রাতকে উপেক্ষা ক'রে পুনরায় ভোরে
ফিরে আসে;—তবুও তাদের কোনো বাসস্থান নেই,
যদিও বিশ্বাসে চোখ বুজে ঘর করেছি নির্মাণ
ঢের আগে একদিন;—গ্রাসাচ্ছাদন নেই তবুও তাদের,
যদিও মাটির দিকে মুখ রেখে পৃথিবীর ধান
রুয়ে গেছি একদিন;—অন্য সব জিনিস হারায়ে,
সমস্ত চিন্তার দেশ ঘুরে তবু তাহাদের মন
অলোকসামান্যভাবে সুচিন্তাকে অধিকার ক'রে
কোথাও সম্মুখে পথ, পশ্চাদ্গমন
হারায়েছে—উতরোল নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমরা তো বহুদিন লক্ষ্য চেয়ে নগরীর পথে
হেঁটে গেছি;—কাজ করে চ'লে গেছি অর্থভোগ করে;
ভোট দিয়ে মিশে গেছি জনমতামতে।
গ্রন্থকে বিশ্বাস ক'রে প'ড়ে গেছি;
সহধর্মীদের সাথে জীবনের আখড়াই, স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা
মনে করে নিয়ে ঢের পাপ ক'রে, পাপকথা উচ্চারণ ক'রে
তবুও বিশ্বাসভ্রষ্ট হ'য়ে গিয়ে জীবনের যৌন একাগ্রতা
হারাইনি—তবুও কোথাও কোনো প্রীতি নেই এতদিন পরে।
নগরীর রাজপথে মোড়ে মোড়ে চিহ্ন প'ড়ে আছে;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।
আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল
ইতস্তত চ'লে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে;
কারু মুখে তবুও দ্বিরুক্তি নেই—পথে নেই ব'লে,
যথাস্থান থেকে খ'সে তবুও সকলি যথাস্থানে
র'য়ে যায়—শতাব্দীর শেষ হ'লে এ-রকম আবিষ্ট নিয়ম
নেমে আসে—বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে;
খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেলোয়ারি।

২

নিকটে মরুর মতো মহাদেশ ছড়ায়ে রয়েছে:
যতদূর চোখ যায়—অনুভব করি;
তবু তাকে সমুদ্রের তিতীর্ষু আলোর মতো মনে ক'রে নিয়ে
আমাদের জানালায় অনেক মানুষ,
চেয়ে আছে দিনমান হেঁয়ালির দিকে।
তাদের মুখের পানে চেয়ে মনে হয়
হয়তো বা সমুদ্রের সুর শোনে তারা,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভীত মুখশ্রীর সাথে এ-রকম অনন্য বিস্ময়
মিশে আছে:—তাহারা অনেক কাল আমাদের দেশে
ঘুরে-ফিরে বেড়িয়েছে শারীরিক জিনিসের মতো;
পুরুষের পরাজয় দেখে গেছে বাস্তব দৈবের সাথে রণে;
হয়তো বক্তার বল জিতে গেছে প্রজ্ঞাবশত;
হয়তো বা দৈবের অজেয় ক্ষমতা—
নিজের ক্ষমতা তার এত বেশি ব'লে
শুনে গেছে ঢের দিন আমাদের মুখের ভণিতা;
তবুও বক্তৃতা শেষ হ'য়ে যায় বেশি করতালি শুরু হ'লে।
এরা তাহা জানে সব।
আমাদের অন্ধকারে পরিত্যক্ত খেতের ফসল
ঝাড়ে-গোছে অপরূপ হয়ে ওঠে তবু
বিচিত্র ছবির মায়াবল।
ঢের দূরে নগরীর নাভির ভিতরে আজ ভোরে
যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে নাই তাহাদের অবিকার মন
শৃঙ্খলায় জেগে উঠে কাজ ক'রে—রাত্রে ঘুমায়
পরিচিতি স্মৃতির মতন।
সেই থেকে কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ,
অন্ধকার সংস্কার, ব্যাজস্তুতি, ভয়, নিরাশার জন্ম হয়।
সমুদ্রের পরপার থেকে তাই স্মিতচক্ষু নাবিকেরা আসে;
ঈশ্বরের চেয়ে স্পর্শময়
আক্ষেপে প্রস্তুত হ'য়ে অর্ধনারীশ্বর
তরাইয়ের থেকে লুব্ধ বঙ্গোপসাগরে
সুকুমার ছায়া ফেলে সূর্যিমামার
নাবিকের লিবিডোকে উদ্‌বোধিত করে।

৩

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস,
অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।
অথবা নদীর নাম মনে ক'রে নিতে গেলে চারিদিকে প্রতিভাত
হ'য়ে ওঠে নদী
দেখা দেয় বিকেল অবধি,
অসংখ্য সূর্যের চোখে তরঙ্গের আনন্দে গড়ায়ে
ডাইনে আর বাঁয়ে
চেয়ে দ্যাখে মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা;
উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে ঠেকে পুনরায় নতুন গরিমা
পেতে চায় ধোঁয়া, রক্ত, অন্ধ আঁধারের খাত বেয়ে;
ঘাসের চেয়েও বেশি মেয়ে;
নদীর চেয়েও বেশি উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, উৎক্রান্ত পুরুষের হাল;

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কামানের ঊর্ধ্বে রৌদ্রে নীলাকাশে অমল মরাল
ভারতসাগর ছেড়ে উড়ে যায় অন্য এক সমুদ্রের পানে—
মেঘের ফোঁটার মতো স্বচ্ছ, গড়ানে;
সুবাতাস কেটে তারা পালকের পাখি তবু;
ওরা এলে সহসা রোদের পথে অনন্ত পারুলে
ইস্পাতের সূচীমুখ ফুটে ওঠে ওদের কাঁধের 'পরে নীলিমার তলে;
অবশেষে জাগরূক জনসাধারণ আজ চলে?
রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়
চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয়?
মহাসাগরের জল কখনও কি সৎবিজ্ঞাতার মতো হয়েছিল স্থির—
নিজের জলের ফেনশির
নীড়কে কি চিনেছিল তনুবাত নীলিমার নিচে?
না হ'লে উচ্ছল সিন্ধু মিছে?
তবুও মিথ্যা নয়: সাগরের বালি পাতালের কালি ঠেলে
সময়সুখ্যাত গুণে অন্ধ হয়ে, পরে আলোকিত হ'য়ে গেলে।[৬৯]

কবিতাদুটো আশঙ্কাজনক বর্তমানের সঙ্গে কথা বলে, গ্রিক নাটকের কোরাসের মতো পাঠককে সরাসরি উদ্দেশ করে তাকে কালের চরিত্র সম্পর্কে সাবধান করে দেয়। নাটকের চরিত্ররা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে, আর কোরাস তার ব্যাখ্যা দেয়।

আরও একবার সেই বক্তব্য: একটি যুগ শেষ হয়, যেমন হয় পরিচিতের। 'পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু/এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান।' আমরা ভেবেছিলাম আমরা একটা পৃথিবী গড়ছি, তৈরি করছি একটা আবাস, ফলাচ্ছি খাদ্য। তবুও আমাদের সন্তানদের জন্য কিছু নেই। তারা অস্থির। আমরা যা দিয়েছি তাতে কুলোয় না। আমরা একটা মিথ্যা জীবন কাটিয়েছি এবং জেনেশুনে; ভালোবাসা নয়, প্রবৃত্তি সমাজকে চলমান রেখেছে। এখন যুগের গোধূলিবেলায় 'জীর্ণ নরনারী/চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে।'

কথকের পারিপার্শ্বিককে জীবন বাঁচিয়ে রাখতে অক্ষম এক জনহীন মরুভূমি বলে মনে হয়। তবুও অন্যরা বিপরীত পারে এক কল্পরাজ্য দেখতে পায়, অস্তগামী সূর্যকে মনে করে সাগরের আলো। সেই আলো মানুষকে সমুদ্র পাড়ি দিতে ইশারা করে, আর সাগর মরণশীল পৃথিবীর প্রতীক, যেখানে মানুষ সংগ্রাম করে, দুঃখ ভোগ করে। সমুদ্র পাড়ি দেওয়া বলতে বোঝায় সংসার থেকে মুক্তি, ১৯৪২ সালের বাস্তবতায় এটা হতে পারে ইউটোপীয় সমাজতান্ত্রিক অথবা কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৌছানো, কিংবা ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি (ভারতীয়রা ব্রিটেনের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে যোগ দেবে না এবং ব্রিটিশদের ভারত থেকে চলে যেতে হবে—১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে এই ঘোষণা দিয়ে মহাত্মা গান্ধী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করেন। সুভাষচন্দ্র বসু পালিয়ে জার্মানি চলে যান এবং ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে গঠন করেন ইন্ডিয়ান

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ন্যাশনাল আর্মি। বার্মায় আইএনএর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করে তিনি জাপানিদের সঙ্গে মিলে ভারতের পূর্ব সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। রেডিও প্রচারের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র তাঁর স্বদেশি ভারতীয়দের সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন, যাতে তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয় ও ত্রাতা হিসেবে জাপানিদের স্বাগত জানায়)। কিন্তু কোরাস জোর দিয়ে বলে, জনগণ অনিশ্চিত, তাদের চেহারায় আতঙ্ক লেখা। আলো, সূর্য (জাপানের প্রতীক) একটা হেঁয়ালি উপস্থাপন করে : অনেকেই অনিশ্চিত, রাতের সমুদ্রের অন্য পারে যদি কিছু থাকেও অপেক্ষা করে আছে কি না।

আমাদের কোরাস-কথক সবুজ ঘাস আর নদীসমেত একটা যুগের কথা শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দেন। মনশ্চক্ষু দিয়ে তিনি দেখেন একটা নদী, এমন নদী যে এখন দেখতে পায় সমসাময়িক মানুষের দুর্দশা। সেই নদী—যা কিনা কালের নদী—অন্ধ তিমিরের, রক্তের, ধোঁয়ার প্রণালি কেটে কি বয়ে যায়? এটা কি নতুন গরিমা? পুরোনো গরিমা ছিল প্রকৃতি নিজেই : 'আকাশ, বাতাস, নদী'। মানুষ যখন এই যুগাবসান ঘটায় আর কামানগুলো বমন করে মৃত্যু, তখন দাগহীন হাঁসেরা (এরোপ্লেন) উড়ে যায়। জীবনের নদী এখন এতই আন্দোলিত যে এসব হাঁস—যারা প্রকৃতি ও বিনাশের দ্বিযোজী প্রতীক—নিচে তাদের আপন জলময় নীড়কেও চিনতে না পেরে উড়ে যেতে থাকে। তবে *কবিতায়* ছাপা হওয়া 'বিভিন্ন কোরাস' ভবিষ্যতের জন্য কিছু অনির্দিষ্ট আশা বহন করে।

*নিরুক্ত*র 'বিভিন্ন কোরাস' শেষ হয় আরও বেশি অনিশ্চয়তার মধ্যে। কোরাস জানতে চায় বর্তমান কি সমাপ্তি, নাকি সূচনা? 'এই দূরত্যয় সিন্ধু কি পার হবার', নাকি নয়? আমরা কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ডোডো পাখির ডাক শুনছি? ১৯৪২ সালের অক্টোবরে জীবনানন্দ আরেকটি কবিতা প্রকাশ করেন, যেখানে মানবজাতির সম্ভাব্য বিপর্যয় বোঝানোর জন্য তিনি ডোডো পাখির উপমা ব্যবহার করেছেন :

আলোসাগরের গান

মানুষের ঘনবসতির ঢেউ নিরুত্তেজ রোদের ভিতরে
ছড়ায়ে রয়েছে প্রাচী, অবাচীর, উদীচীর দিকে।
তাদের ওপারে সূর্য উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে
আজ এই বিকেলের আলোর নিরিখে

চুপে চুপে ডুবে যায়।—উত্তরার ভ্রূণ নষ্ট হলে
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কোনো এক দিন,—
লেনিনের লুপ্তি হলে,—এরকম ডুবে যেতেছিল।
বাংলার সাগরের আকাশ উড্ডীন

কয়েকটি হরিয়াল পথ খুঁজে পশ্চিমের পানে
কমলালেবুর মতো রঙিয়ান মেঘে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ডুবে গেলে মানুষের আজকের চিন্তার উদ্যম
'অল ক্লিয়ারের' মতো অস্পষ্ট আবেগে

তিমির রাত্রির ক্রেংকার।
বাংলার হরিয়াল! পশ্চিমের জাফরান মেঘ!
আমরা মানুষ,—আজো,—জীবিত ও মৃত—সাগরের
আলোয় ভুলেছি ডোডোপাখিদের বিলীন বিবেক।[৭০]

আরও একবার জীবনানন্দ সমুদ্রের ওপর একটা সূর্যাস্ত চিত্রিত করেন, যেটিকে অতিক্রম করা যায় অথবা যায় না। সেই সমুদ্র, তার মানবজাতির তরঙ্গ নিয়ে আমাদের ঘিরে রাখে। তিনি যুগান্তের প্রতি, অস্তগামী সূর্যের সঙ্গে মিলে যাওয়া মৃত্যুর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উত্তরার সন্তান, ছয় মাসের গর্ভের পর মৃতপ্রায় জন্মানো সেই পরীক্ষিতের কথা বলেন তিনি, যাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন কৃষ্ণ।[৭১] *মহাভারত*-এ বর্ণিত যুধিষ্ঠির যখন সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করেন, অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত রাজত্ব গ্রহণ করে কলিযুগের প্রথম রাজা হন। জীবনানন্দ এর আগে বুদ্ধের মৃত্যু ও সোভিয়েত বিপ্লব (এখানে লেনিনের মৃত্যু)—এই দুই রূপক ব্যবহার করে একটি যুগান্তের ইঙ্গিত দেন। এ দুই রূপকের কোনোটিই কোনো আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যদ্বাণী করে না। এ রকম একটা সূর্যাস্তের পর শুরু হয় চারটি যুগের মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন মর্যাদার কলিযুগের, আমরা যে যুগে বাস করছি এখন।[৭২]

পাখিরা যখন উজ্জ্বল বর্ণিল মেঘের ফাঁক দিয়ে আসা আলোর অনুসরণ করে, বোমাবর্ষণ শেষ হওয়ার পর শিথিল এলিয়ে পড়ার মতো মানুষ অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছেড়ে দেয়। নিজের অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সংগ্রাম করার বদলে মানুষ ভেসে যায় রাতের বেসুর বিশৃঙ্খলার ভেতর, কবিতায় ডোডো পাখির ডাককে বেসুর বলে বর্ণনা করা হয়েছে এই প্রজাতিটির বিনাশের ইঙ্গিত দিয়ে। কবি সতর্ক করে দেন যে মানুষ হয়তো ডোডো পাখির পরিণতির মতো তাদের 'বিলীন বিবেক'-এর কথা বিস্মৃত হয়েছে। মানুষ যদি একই রকম ব্যবহার দেখায়, তারাও ডোডো পাখির মতো বিলীন হয়ে যাবে।

৫

প্রকৃতির প্রতি তাঁর সব ভালোবাসা সত্ত্বেও জীবনানন্দকে ঘরে ফিরতে অসক্ষম মনে হয়। যে মানুষ *রূপসী বাংলা* ও 'বনলতা সেন'-এর মতো কবিতা লিখেছেন, তখনকার মতো সেভাবে আর পৃথিবীকে দেখছেন না তিনি। *কবিতা* পত্রিকায় ছাপা 'বিভিন্ন কোরাস' একটি বাক্যের পর এ রকম একটা বক্তব্য দিয়ে শুরু হয় :

হৃদয়কে চোখ ঠার দিয়ে ঘুমে রেখে
হয়তো দুর্যোগে তৃপ্তি পেতে পারে কান;

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ-রকম একদিন মনে হয়েছিল—
অনেক নিকটে তবু সেই ঘোর ঘনায়েছে আজ;

জীবনানন্দ এখন আর তাঁর নৈসর্গিক কল্পিত ভুবনে বাস করেন না, লিখতে পারেন না 'বনলতা সেন'। তবে তিনি অবশ্যই আগের দশকে বিভিন্ন পত্রিকায় যেসব কবিতা ছাপা হয়েছে, সেগুলো নিয়ে একটা পুস্তিকা বের করতে পারতেন। ১৯৪২-এর ডিসেম্বরে *বনলতা সেন* 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৬টি কবিতা আছে বলে মনে হওয়া সিরিজটির নামমাহাত্ম্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এটিতে ছিল ১২টি কবিতা, যার সবই *কবিতা* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে।[৭৩]

*চতুরঙ্গ*র আলোচক আবুল হোসেন তাঁর সিদ্ধান্তে জানান, জীবনানন্দ রাজনৈতিক কবিতা খুব কম লিখেছেন।[৭৪] সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক কবিতার সঙ্গে তুলনা করলে এটা সত্যি যে জীবনানন্দের কবিতা অরাজনৈতিক বলে যে কেউ মেনে নেবেন।[৭৫] তবে *বনলতা সেন* গ্রন্থের কবিতার বিপরীতে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত জীবনানন্দের বহু কবিতায় মূলত রাজনৈতিক রং পরিলক্ষিত হয়। যদিও আগে তিনি বাংলার নৈসর্গিক ও রূপকথার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেতেন। ১৯৪২-এ এই অন্ধকার আরও ঘনিয়ে আসে, গাঢ়তর হয়। সম্ভবত পরিস্থিতির চাপে জীবনানন্দ তাঁর চারপাশের লৌকিক ভুবনে প্রবেশ করেন।

তখনো সাধারণ মানুষের কাছে বিস্তারিতভাবে অপরিচিত জীবনানন্দ সে সময়কার প্রতিষ্ঠিত কবি হিসেবে স্বীকৃত হয়ে ওঠেন, তাঁর লেখা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কাগজে ছাপা হতে থাকে। ১৯৪৩ সালের মে মাসে *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'নিরীহ, ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান', আজকের দিনে সবচেয়ে বহুল পঠিত বাংলা সাময়িকীতে এটাই ছিল তাঁর প্রথম কবিতা।

নিরীহ, ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান

আমরা বিশেষ কিছুই চাই না এবার।
আমাদের অন্ধকার আলো
এনেছে অনেক কিছু অবিশেষ, অকিঞ্চিৎকর।
এমন অনেক দিন কেটেছে এমনভাবে,—তবে
আবার অনেক দিন তবুও কাটাতে চাই এরকমই।
হেমন্তে আশ্চর্য শাঁস ফলে গেছে কালো জলে, পানিফলে, জাউয়ের ভিতরে

অথবা ফলেনি কিছু;
ভাসুর পীড়িত হয়ে অতএব ভাদ্রবৌকে দেখে বকে;
চোখ মেলে, চোখ বুজে দেখেছি অনেকবার সে রকম রুগ্ন দুর্ভিক্ষকে;
সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গেলে অবশেষে ঘরে
চলে গেছি;—হেমন্তের নীরবতা এরকমভাবে
আবার আসুক তবু;—

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আকাশের নক্ষত্রেরা যেমন নিরীহভাবে ঘুরে যায়
বিচ্ছেদ, মরণ, ভয় কলের চাকার মতো তেমনি ঘুরবে
আমাদের সকলকে—আমাদের সকলকে নিয়ে;
তেমনি নীরবে;
শাদাসিদেভাবে।
আমরা জলুশ, জোর, কুকুর বা সিংহের সুরে
বাধা পাই;
পেঁচা যে খড়ের চালে নেমে আসে পৌষের রাত্রির দুপুরে
সেই সুরে শান্তি আছে—শেষ আছে—মৃত্যু আছে জানি,
তবু সেই সুর ভালো।
উনিশতিরিশ থেকে উনিশচল্লিশ সাল তবু ভালো ছিল;
আজ একচল্লিশে পৌষ মাসে কেমন অসাধ যেন।
মশা মেরে, ধান ভেনে, ইঁদুর তাড়িয়ে
মহাজনদের কাছে ঋণ নিয়ে—ঋণ খেয়ে—ঋণ ভুলে গিয়ে,
হাতুড়ের কাছে গিয়ে শিশিরের মতো শাদা শিশি—
যা সবের কাছে যা নেবার আছে—নিয়ে যাব;
যা সবের কাছে যা দেবার আছে দিয়ে যাব;
ক্রমাগত পায়ে হেঁটে আমাদের সন্তান ও সন্তানের সন্তানকে পৃথিবী হাঁটাব।

সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গেলে হস্তেল ঘুঘুদের ঘরে
অথবা ভিটেয় যেই গুণোপেত একটি বা দুটো ঘুঘু চরে—[৭৬]
সেইখানে অসংসর্গ অনুভব ক'রে যাব;—হেমন্তের নীরবতা এরকমভাবে
আবার আসুক তবু।
আকাশের নক্ষত্রেরা যেমন নিরীহভাবে ঘুরে যায়—
বিচ্ছেদ মরণ ভয় কলের চাকার মতো তেমন ঘুরাবে
আমাদের সকলকে—আমাদের সকলকে নিয়ে।

এখানে বিশেষ কিছু হয়নি অনেকদিন।
ক্রমাগত মানুষের মরণ হয়েছে।
গরিব, বেচারা, বুড়ো, বিকলাঙ্গ, মহৎ পার্ষদ সব
কি ক'রে কেবলি খ'সে ধুলোসাৎ হয়ে যায়
দেখেছি উদাস, ক্লান্ত—অন্তরঙ্গভাবে;
দেখে দেখে ঘুরে ফিরে অন্ধকারে বিকল হতাম—
যদি না রাত্রির শেষে ভোর, সূর্য, সময়ের পরিস্রুত হাত
মুছে ফেলে দিয়ে যেত সব।
এইসব ছাড়া
এখানে বিশেষ কিছু হয়নি অনেকদিন।
সমুদ্রের বুদ্বুদের মতো অগণন সমুচ্ছ্বাস
তেমনই প্রবল কিছু চেয়ে গেছে,—পেয়ে গে[illegible]রাত[illegible]
ফিরেছে বিবিক্তভাবে সুত-মিত-রমণীর সম[illegible]
ফেরেনি কি?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরাও ঘুরে গেছি : আমাদের হৃদয়ের রুচি
আমাদের জীবনের উতরোল অপপ্রতিভাকে
ঘাই হরিণীর মতো যে রকম সৃষ্টির জ্যোৎস্নায়
যেমন সহিষ্ণুভাবে ডেকে গেছে,
যেমন নিবিড়ভাবে ডাকে;—
সেই সুরে সাড়া দিয়ে।
কখনো নদীর জলে অদলবদল করে ভেসে গেছে মেঘ, রাজহাঁস;
পুনরপি মেঘগুলো—জলগুলো—আশ্বিনের মাস;
ডুবে গিয়েছিল সব,—নেই ব'লে মনে হয়েছিল :
সুরের ছোঁয়াচে সুর যে রকম হয়ে যেতে চায় অর্থহীনভাবে অনুপ্রাস।
কখনো ধানের ক্ষেতে ধান নেই।
কখনো ধানের ক্ষেতে কৃষাণের হাসি কোলাহল;
গোলায় গোলায় গঞ্জের ইঁদুরের বৌকাঁটকীর মতো কলরব;
বন্দর বেতার তার টের পায় সব।
কখনো পাটের ক্ষেত লক্‌লক্‌ করে ওঠে বাসুকির মতো;
আলকেউটেরা সব কৃষককে কাটে ইতস্তত;
কখনো পাটের জমি চিত্রগুপ্ত বুঝে নিয়ে গেছে;
একটি মূলেও কোনো ভুল নেই, আহা।
তবুও চড়কপূজা, ভাদুপূজা—কত না গাজন গান এল গেল;
কত চাঁদ বড় হয়ে চালার পিছনে রাতে তারপর ছোটো হয়ে এল :
গৃহস্থ, কৃষাণ মিলে ধোঁয়াটে জলের শ্যাম পানফল—
পোষলার পিঠে আর মিঠে তাড়ি খেল।
এ সব উৎসব[৭৭] তবু মৃত ইতিহাস;
এ সব উৎসব কিছু নয়।
সর্বদা উৎকণ্ঠা এক জেগে আছে সকল ঘনায়মান পার্বণের মাঝে,
মৃত্যুর উদ্বেগ ছেপে—আরো বেশি কূট;
যে যার নিজের স্থানে উঠে চলে বসে
কেবলি জীবন, যৌন, নিরাশা, রিরংসা, অর্থ, দশ কথা ভেবে
তবুও একটি কথা ভাবে তারপর
নিজের মনের মুদ্রাদোষে।
প্রৌঢ়েরা এখন আরো বুড়ো,
যুবকেরা প্রৌঢ় হয়ে গেছে,
বালকেরা এখন যুবক;
নারীর দেশের থেকে ঢের নারী হারায়ে যেতেছে;
সকলি ভৃত্যের দেশ।
এইসব স্বাভাবিক—সাধারণ কথা;
এখন মানুষ তবু স্বাভাবিকভাবে কথা ভেবে নিতে গিয়ে
কোথায় পেয়েছে সফলতা?
আজ এই চতুঃসীমানার মুখে আমাদের প্রাণে যদি আত্মপ্রত্যয় থেকে থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ঘাইহরিণীর মতো জীবনের হরিণকে তবে সে জ্যোৎস্নার পানে—
প্রেতজ্যোৎস্নার পানে ডাকে।
ডাকে না কি?
নিতান্তই কোনো কিছু ভয়াবহ ভয় যদি আমাদের দিকে
ক্রমে ক্রমে চলে আসে আজ,
তবুও তা ভয় বলে মনে হতে দেরি—
যত দিন দেরি হয়—তত দিন ভালো।
আমরা সকালবেলা পেয়ে গেছি সূর্যের আলো,
আমরা রাত্রিবেলা পেয়ে গেছি বাতি;
গণেশ যে সব কূট শ্লোক নিয়ে একদিন বিবেচনা করে গিয়েছিল,
সহজ স্ফূর্তির মতো সে সব তোমার প্রাণে জন্মেছিল, ব্যাস,[৭৮]
স্বভাব সুখের মতো রাত্রির ফুটপাতে একদিন অগণন গ্যাস
জ্বলেছিল—মনে হয়েছিল;—
আমরা সকলে
যে যার নিবিষ্ট জন্ম, প্রসন্নতা, মরণের কাজে
অজানিতে ঘুরে গেছি; কথা
বলে বলে হয়রান মলিন জনতা
হয়ে গেছি;
কেউ তবু হাড়ে হাড়ে আমাদের অল্পপ্রাণতাকে
চিনে জেনে নিতে গিয়ে ব্যথিত করেনি।
কী এক সম্পূর্ণ ঈর্ষা কেবলি নিকটে নেমে আসে তবু আজ;
কখনো ধানের ক্ষেতে—কখনো নদীর ভুয়ো জলে
নিরন্ন বছর নামে;
বর্গাদার—মহাজন—প্রজার মহলে
হুলুস্থুল প'ড়ে যায়;
এখানের ভাগচাষ—শহরের হুণ্ডি—ঠিকাদার
ভূশণ্ডির মাঠ—ঘাঁটি—বারভূঞাদের[৭৯] ভূত—ব্যবচ্ছেদাগার —শব—
হাতুড়ে ডাক্তার—
ফিসফিস ষড়যন্ত্র—রাস্তার কানাচ—
এইসব সূর্যের চেয়েও বেশি বালুকার আঁচ;[৮০]
এরা সব হুলুস্থুল ক'রে যায়।
কোনো কোনো প্রৌঢ় এসে অত্যাচার করে;
অগণন যুবকের ভিড়ে কোনো কাজ নেই,—চিন্তার কুশল রয়ে গেছে;
চারিদিকে সর্বগ্রাসী দরিদ্রতা;
জনমানবের মুখে নিজ নিজ শোকাবহ গোপনীয় কথা;
নিজেরি ঘরের জন্যে ঘরন্তী শক্তির নির্মমতা;
মূর্খ দেশ, মেয়ে দেশ, প্রভু দেশ, ভৃত্য দেশ, পাগলের দেশ রয়ে গেছে,
রয়েছে বালির দেশ;
দার্শনিকদের দ্বিধা—মনীষীর হৃদয়ের প্রেম
সে সব বালির 'পরে দাগ কেটে অন্তহীন স্বপ্নসৌধ গড়ে:

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হৃদয়বিহীনভাবে ধূর্ত সমুদ্রের কাছে,
প্লোভারের, পায়রার বিষ্ঠার ভিতরে।
সবেরি স্বতন্ত্র বেদনা র'য়ে গেছে।
এক বেদনার মাইল মাইল জুড়ে তিল
ধারণের স্থান আছে—আছে কিনা অপার ব্যথার?
আমাদের সকলের বেদনা কি মিলেমিশে যেতে চেয়েছিল—
অথবা যে যার প্রাণে চেয়েছে কি—পেয়েছে কি ভীষণ স্বাধীন অন্ধকার?
দেখি না—জানি না—তবু অনুভব করে কোনো সূর্যালোকে অতিমৃত্যু পেলে
পুনরায় উষালোক হয়তো বা জীবনে পেতাম;
আমরা পেতাম নাকি?
তবুও অনেক ঊষা এসে গেছে ইতিহাসে,—ঊষা সব নয়;
জনসাধারণ ভাবে আজ আমাদের একাকী হৃদয়
অনেক জেনেছে,—তবু অমেয় বিপ্লব শুরু শেষ হয়ে গেলে
রুটিনের সৌন্দর্য ও আত্মপ্রত্যয়
মানবজাতির কাছ থেকে চেয়ে নিখিলের মানবেরা পাবে:
না হলে মানুষ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সন্দেহের দিব্যতায় কোথায় দাঁড়াবে?[৮১]

এলোমেলোভাবে জীবনানন্দ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা ও তা থেকে উত্তরণের সম্ভাবনার কথা ভাবেন। কবিতাটির পাণ্ডুলিপির খাতাটি যদিও আমি দেখিনি, আমার সন্দেহ হয় যে কবিতাটির দুই অংশ দুটো আলাদা কবিতা। কবির দেওয়া রচনার তারিখ যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে মনে হয় তিনি কবিতাটির প্রথম অংশ ধারণ করেন অথবা লেখেন ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে; দ্বিতীয় অংশটি প্রকাশের তারিখের অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের এপ্রিলের আরও সমসাময়িক। দুটোই অবশ্য একই বিষয় নিয়ে ভাবিত।

বিভ্রান্তির অদৃষ্টের কাছে হাল ছেড়ে দেওয়া বেদনাবোধহীন মানুষকে গন্তব্যহীন বলে মনে হয়। সামাজিক সম্পর্ক তেতো হয়ে আসে। জেঁকে বসে নৈঃশব্দ্য আর শীতলতা, যখন তার ঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত, ভয়ের প্রভাবে নিরীহভাবে বেঁচে থেকে মানুষ ভেতরের দিকে পশ্চাদপসরণ করে অথবা তার নিজের নিঃসঙ্গ পথে যায়। রাজকীয় সিংহ ও ঘেউ ঘেউ করা কুকুর—দুটোই মানুষকে কোণঠাসা করে রাখে। মৃত্যু একজনের জন্য এসব কিছুর সমাপ্তি ঘটায়, কিন্তু মানবজাতির জন্য কোনো পরিত্রাণ আসে না তাতে; সন্তানেরা ও তাদের সন্তানেরা পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করবে। ১৯৩০-এর দশক ভালো সময় ছিল। জীবনানন্দ তাঁর বাংলার রূপ উপভোগ করতে পেরেছেন। ১৯৪০-এর দশকের শুরুতে অভিঘাত সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপ।

দ্বিতীয় অংশে জীবনানন্দ দশক-প্রাচীন ঘাইহরিণীর উপমা পুনঃপ্রয়োগ করেন। মানুষের হৃদয় সেই ঘাইহরিণী, জীবনের হীন প্রবৃত্তির দিকে মিনতি করে ডাকছে, জীবনের হরিণের কাছে নিরবচ্ছিন্নভাবে ধৈর্যের সঙ্গে প্রণয় ভিক্ষা করছে। 'ক্যাম্পে'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

কবিতায় সে সেসব হরিণকে ডেকেছিল শিকারির বন্দুকের মুখে। এই 'নিরীহ, ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান'-এ অস্থির কদর্য প্রবৃত্তিকে প্রলুব্ধ করে হৃদয়ই খামখেয়ালিপনা ও অলীক কল্পনার কাছে পরাভূত হয়।

...আমাদের হৃদয়ের রুচি
আমাদের জীবনের উতরোল অপপ্রতিভাকে
ঘাইহরিণীর মতো যে রকম সৃষ্টির জ্যোৎস্নায়
যেমন সহিষ্ণুভাবে ডেকে গেছে,
যেমন নিবিড়ভাবে ডাকে,—

অথবা আমাদের হৃদয়ে আজ যদি প্রকৃতপক্ষে সত্যি প্রত্যয় কিংবা আত্মবিশ্বাস থেকে থাকে, তাহলে সেসব হৃদয় সেই হরিণীর মতো জীবনমৃগকে ধৈর্য আর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ডাকুক। যে সাড়া দেবে, সে কোনো অপপ্রতিভা নয়।

আজ এই চতুঃসীমানার মুখে আমাদের প্রাণে যদি আত্মপ্রত্যয় থেকে থাকে
ঘাইহরিণীর মতো জীবনের হরিণকে তবে সে জ্যোৎস্নার পানে—
প্রেতজ্যোৎস্নার পানে ডাকে।

প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস এতই আশ্বাসবাচক একটা গুণ যে, প্রজন্মকে বর্তমান মানবজাতি থেকে তা নেওয়ার জন্য আসতে হবে। জীবনানন্দ ১৯৪০-এর দশকের প্রথম দিকে যা বারবার বলতেন, কবিতাটির শেষ ছয় চরণে সেটাই তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন :

তবুও অনেক উষা এসে গেছে ইতিহাসে—উষা সব নয়;
জনসাধারণ ভাবে আজ আমাদের একাকী হৃদয়
অনেক জেনেছে,—তবু অমেয় বিপ্লব শুরু শেষ হয়ে গেলে
রুটিনের সৌন্দর্য ও আত্মপ্রত্যয়
মানবজাতির কাছ থেকে চেয়ে নিখিলের মানবেরা পাবে;
না হলে মানুষ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সন্দেহের দিব্যতায় কোথায় দাঁড়াবে?

বহু উষা—বহু নবজন্ম—মানবেতিহাসে এসেছে আবার চলে গেছে। বহু বিপ্লব, বহু মহাপ্লাবন মানবজাতির সামনে ঘটে গেছে। কিন্তু একটা নবায়িত প্রারম্ভ তাতেই শেষ হয় না। কারণ, মানবজাতি বিপ্লব কিংবা নতুন যুগের কাছ থেকে কোনো উপকার পায়নি। বিশ্বযুদ্ধ কিংবা অত্যাসন্ন শ্রেণীবিপ্লব মানুষের সমস্যার সমাধান দিতে পারবে না। আগামী বিশ্বের কাছে মানুষের উত্তরাধিকার হচ্ছে তার প্রত্যয় ও নিয়মের সৌন্দর্য। জীবনানন্দ এখানে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন, 'রুটিন', তবে 'বিন্যাস', 'ধারাবাহিকতা' কিংবা 'স্থিতিশীলতা' আর ভালো হতো। কারণ, এখনকার আমেরিকান ইংরেজিতে যেভাবে শব্দটা ব্যবহৃত হয়, সেটা খুবই গতানুগতিক, নীরস। জীবনানন্দ বাতলান যে মানুষ এগোবে নিয়মের ভেতর। কারণ, বিপ্লব কোনো সমাধান দেয় না। একটা উন্নত সমাজ থেকে উদ্ভূত মানবজাতি আমাদের প্রত্যয়ের শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে,

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানুষ গর্বে যার দিকে পেছন ফিরে তাকাবে। সমাজ যখন অসম্পূর্ণ মনে হয়, তখন মানবজাতি আরেকটা বিপ্লব নিয়ে নতুনভাবে শুরু করা চালিয়ে যেতে পারে না। বিপ্লবী তাত্ত্বিকদের দৃষ্ট নতুন সমাজ প্রায়ই অনর্জিত রয়ে যায়।

দার্শনিকদের দ্বিধা-মনীষীর হৃদয়ের প্রেম
সে সব বালির পরে দাগ কেটে অন্তহীন স্বপ্নসৌধ গড়ে
হৃদয়বিহীনভাবে ধূর্ত সমুদ্রের কাছে
প্লোভারের, পায়রার বিষ্ঠার ভিতরে।
সবেরই স্বতন্ত্র বেদনা রয়ে গেছে।

তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের চেয়েও কবিতার কিছু রূপক আরও লক্ষণীয়। বুদ্ধদেব বসু ও আবুল হোসেন আগের কবিতার ওপর তাঁদের আলোচনায় জীবনানন্দের চমৎকার উপমার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা তাঁর কবিতার মূল সুর। মাঠে কৃষককে বলতে শোনা যায়, 'গোলায় গোলায় গঞ্জের ইঁদুরের বৌকাঁটকীর মতো কলরব'। কৃষকের শরীরে একবার এক জায়গায়, তারপর অন্য জায়গায় গোখরোর ছোবলের পর ছোবল মারার মতো বাতাসে দোল খাওয়া পাটগাছের ডগা দেখা যায়। দর্শনের চেয়ে উন্নততর রূপক সৃষ্টি করেছেন জীবনানন্দ। কবি হিসেবে কীভাবে ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনি জীবনকে অবলোকন করেন এবং কীভাবে সে দেখাকে ভাষায় প্রকাশ করেছেন, তার জন্য তিনি পরিচিত থাকেন।

৬

১৯৪৩-এর জুন মাসে পুরো তিন বছর টিকে থেকে ত্রৈমাসিক *নিরুক্তর* অন্তিম সংখ্যাটি বের হয়। জীবনানন্দের কোনো লেখা না থাকলেও এ সংখ্যায় ছিল জীবনানন্দের কবিতার ওপর সঞ্জয়ের একটা প্রবন্ধ, যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৮২] কেবল 'জীবনানন্দ দাশ' নামের প্রবন্ধটি ছিল *প্রগতিতে* তখনকার অপেক্ষাকৃত অপরিচিত কবির ওপর বুদ্ধদেব বসুর দুটো সম্পাদকীয়র (১৯২৭-২৯) পর তাঁর ওপর প্রথম কোনো লেখা। আগে *ধূসর পাণ্ডুলিপি* ও *বনলতা সেন*-এর ওপর আলোচনা ছাপা হয়েছিল অবশ্যই। তবে এ লেখাটি *ঝরা পালক* থেকে *নিরুক্ত* পর্যন্ত জীবনানন্দের কবিতার পর্যালোচনা। লেখাটি ভালোবাসা থেকে উদ্ভূত পরিশ্রমের ফসল। কারণ, সঞ্জয় তাঁর এই সতীর্থ কবির সৃষ্টি সম্পর্কে খুব উচ্চধারণা পোষণ করতেন।[৮৩]

নিরুক্তর অপমৃত্যু বাংলা কবিতাকে স্তালিনীয় অসুস্থতা থেকে বাঁচানোর জন্য সঞ্জয়ের প্রয়াস পরিত্যাগের কোনো ইঙ্গিত দেয় না। তার পরিবর্তে সঞ্জয় আর সত্যপ্রসন্ন মিলে *পূর্বাশার* পুনঃপ্রকাশ করেন ১৯৪৩ সালে এবং *নিরুক্ততে* এই

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অসুস্থতার যা চিকিৎসা করা হচ্ছিল, সেটা অব্যাহত রাখেন। সত্যপ্রসন্নর ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি ও সঞ্জয় এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের বিপরীতে ভারতে জাতীয়তাবাদের সুযোগ আছে—এই সিদ্ধান্তে তাঁরা পৌছান গান্ধীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হওয়ার পর।

১৯৪২ সালের জুনে বৈধ হওয়ার পর (১৯৩৪ থেকে অবৈধ ছিল) ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশদের যুদ্ধকে সমর্থন করে এবং এতে তাদের ওপর আরোপিত হয় সাম্রাজ্যবাদের দালাল চরিত্র। সত্যপ্রসন্নের মতে, কমিউনিস্টরা ভাবত যুদ্ধের পর ভারতে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা হবে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন থেকে উৎসারিত কমিউনিজমবিরোধী মনোভাব থেকে সত্যপ্রসন্ন ও সঞ্জয় বুঝতে পারেন, জাতীয়তাবাদ কমিউনিজমের ওপর টেক্কা দিয়ে টিকে যাবে। সাহিত্যে জাতীয়তাবাদের উন্নতি বিধান ও স্তালিনবাদের বিরোধিতার জন্য *পূর্ব্বাশা*-সম্পাদকেরা কবিতায় রোমান্টিসিজমের পক্ষে তাঁদের সমর্থন পুনর্নিশ্চিত করেন। স্তালিনীয় অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার জন্য বাংলা কবিতায় রক্ত সঞ্চালনের দরকার ছিল, জীবনানন্দের কবিতা ছিল ঠিক ডাক্তার যা পরামর্শ দেন তার মতো।

এরই মধ্যে সঞ্জয় যেটাকে নিঃসন্দেহে শত্রু বলে জ্ঞান করতেন, জীবনানন্দ তার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। আগেই বলা হয়েছে, সঞ্জয় কিছুটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁর কবিতা *নিরুক্ত* আর *পূর্ব্বাশায়* ব্যবহার করে থাকলেও জীবনানন্দ সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়াননি। তবে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে প্রকাশিত একটা সংকলনের জন্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় একটা লেখা চাইলে তা দিতে তিনি অস্বীকৃতি জানাননি। সংগঠনটি অভিপ্রায়ে ছিল অনস্বীকার্যভাবে রাজনৈতিক। এই লেখা চাওয়ার সঙ্গে বাহ্যত বিষ্ণু দে তাঁর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কারণ, জীবনানন্দ তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধুর কাছে লেখাটা পাঠিয়েছিলেন একটি চিঠিসহ।

সর্ব্বানন্দ ভবন
বরিশাল
১৯.১২.৪৩

প্রিয়বরেষু,

অনেকদিন পরে আজ আপনার চিঠি পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। অনেক হারানো কথা মনে পড়ছে। সুভাষ আমাকে কলেজের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিল,—সে চিঠিও ঘুরে আজ এসেছে। কেন লিখি—এ সম্পর্কে এত তাড়াতাড়ি আমি কি যে লিখে দেব ভেবে পাচ্ছিনা। সুভাষ তিনচার পৃষ্ঠার একটা প্রবন্ধ অবিলম্বেই পাঠাতে লিখেছিল। আমি আজকেই খুব তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠা তিনেক লিখে দিলাম। কাল থেকে আর সময় পাবনা,—গোছা গোছা টেষ্ট'এর খাতা দেখতে হবে। প্রবন্ধ আপনার ঠিকানায়ই পাঠালাম। প্রবন্ধ প্রায়ই লিখি না; সুবিধা পেলামনা। আমার হাতের লেখাও অস্পষ্ট, ভালো ক'রে প্রুফ দেখে দেবার নির্দেশ দিলে খুশি হব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি গত গরমের ছুটিতে দু'মাস কলকাতায় ছিলাম। আপনি কি তখন কলকাতায় ছিলেন? জানলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম। পুজোর ছুটিতেও দিন কয়েক কলকাতায় কাটিয়েছি, নানা কাজের ভিড়ে বিশেষ কারু সঙ্গেই দেখা করতে পারিনি। বড় দিনের ছুটিতে যাওয়া হবে না। আপনার ঠিকানা জানা রইল। এরপর কলকাতায় গেলে অবশ্যই আপনার সঙ্গে দেখা করব।

সুভাষের চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। দু একদিনের মধ্যেই দেব।

আশা করি ভাল আছেন। প্রীতি নমস্কার। ইতি

জীবনানন্দ দাশ[৮৪]

জীবনানন্দ তাঁর প্রবন্ধটির নাম দিয়েছিলেন 'লেখা, লেখকের দায়িত্ব' এবং কীভাবে ভালো কবিতা হয়, সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন—ধারণাগুলো তাঁর চেয়ে বেশি রাজনীতিমনস্ক, যে-সতীর্থরা সংকলনটি প্রকাশ করছিলেন তাঁদের সমর্থিত মতাদর্শের বিপক্ষে যায়।

> [কেউ কেউ] মনে করেন, কবিতা যে-কোনো সময়ে সৃষ্ট হতে পারে, কারণ কবিতা সমীচীন গদ্য বা ভূয়োদর্শী সম্পাদকীয় মন্তব্যের মতোই,...তাই দেখেছি সৎ সম্পাদকীয় উক্তিই যেন কবিতা। কিন্তু কবিতা বাস্তবিকই কি তাই? যেকোনো সুস্থ ও সমীচীন মানস অসুস্থ বা অন্যবিধ সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উক্ত রকমের মন্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন,—এবং অহরহ করে যেতে পারেন। এর জন্যে আত্মভ্রষ্ট হৃদয়াবেগ ও কল্পনা-প্রতিভাকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার মতো কোনো বিশেষ সুযোগ বা প্রতীক্ষার দরকার আছে বলে মনে হয় না। কারণ, তাঁদের মতে কাব্য-রচনা সম্পর্কে ভাবনা-প্রতিভা ও হৃদয়াবেগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু এরপর তাঁকে বেশ আত্মরক্ষামূলক বলে মনে হয়েছে:

> শোষিত মানবজীবনের, সেই জীবনোৎসারিত বিপ্লবের ও সেই বিপ্লবের শেষে আশা-ভরসার সমাজের কবিতা ছাড়াও আরো অনেক কিছু নিয়েই কবিতা মহৎ হয়ে ওঠে।[৮৫]

জীবনানন্দ কাব্যিক সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে যা বলেন, তা তিনি আগেও বলেছেন। তবে এখন তাঁর বিপক্ষ মতের কিছু সত্যতা তিনি মেনে নেন। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রকাশিত সংকলনটির সম্ভাব্য পাঠক সম্পর্কে তিনি খুব অজ্ঞাত ছিলেন না। তাঁদের সুবিধার জন্য তিনি কবিতার সীমারেখার উভয় পক্ষের মতামত গ্রহণ করেন বলে মনে হয়: 'শোষিত মানবজীবনের', বিপ্লবের, ভবিষ্যৎ সমাজের কবিতা এখন মহৎ সাহিত্যের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

এতদসত্ত্বেও জীবনানন্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে *কবিতার কথা* (১৯৩৮) ও *রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতায়* (১৯৪১) ব্যক্ত তাঁর আগের মনোভাব বজায় রাখেন। একজন কবির কল্পনা-প্রতিভার চেতনা সম্পর্কে তিনি বলেন:

> তার কল্পনা-প্রতিভার চমৎকার সংহতির মুহূর্তে মানব জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান কথা আবিষ্কার করবার কিম্বা নতুনভাবে প্রচার করবার সুযোগ সে পায়। এই সব সময়ই হচ্ছে কাব্য বা শিল্প-সৃষ্টির সময়।[৮৬]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'কবিতার কথা'য় তিনি বলেছিলেন কবিরা কবি, কারণ :

> ...তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।...এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়,[৮৭]

'লেখা, লেখকের দায়িত্ব' প্রবন্ধে জীবনানন্দ মানবজীবন, এমনকি সামগ্রিকভাবে একটি সমাজকে কাব্যসৃষ্টির উদ্দীপনা হিসেবে অনুমোদন করেন। কিন্তু তাঁর সব প্রবন্ধে—'দায়িত্ব'ও তার ব্যতিক্রম নয়—গুরুত্ব দেওয়া হয় যে অনুপ্রেরণা ছাড়া কবিতা অসম্ভব; এর বদলে কবিতা হয় সাংবাদিকের কড়চা।...এই কড়চা একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন লেখকের হতে পারে, কিন্তু তার ফলাফল হবে *পদ্য* (এখানে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে অবজ্ঞা করে) অথবা *রিপোর্টাজ, কবিতা* নয় :

> আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যা-খচিত—অভিব্যক্ত সৌন্দর্য হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তা হয়েছে।...[তবে] চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মতো লুকিয়ে থাকে যেন।[৮৮]

জীবনানন্দ বলেন, কবিতা অনেক কিছুই করতে পারে, কিন্তু 'মানুষের আধুনিক জীবনকে নিরন্তর ভবিষ্যতের শ্রেয়তর সামাজিক জীবনে'[৮৯] পরিণত করতে পারে না। আর তিনি নিজের প্রত্যয়ে দৃঢ় থেকে মনে করেন, কবিরা কবি, অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নন। বাস্তব বিশ্বে জীবনের উন্নতি ও পুনর্গঠনের জন্য যদি আদৌ ন্যূনপক্ষে কার্যকর হয়, তাঁরা কবিতা লেখেন—ব্যস, এটুকুই। জীবনানন্দ মনে হয় এই বক্তব্যের বিরোধিতা আঁচ করতে পেরেছিলেন, তাই তিনি এই এক বাক্যের অনুচ্ছেদটি সংযোজন করেন : 'এ-রকম উক্তি করতে গিয়ে, আমি সত্যিই আত্মবিস্মৃত কি না, সমসাময়িক কবি বন্ধুরা বিচার করে দেখবেন।'[৯০]

বিষ্ণু দে তাঁর 'কেন লিখি' শীর্ষক লেখায় লেখকদের সামাজিক পরিবর্তনের প্রবর্তক ও পরিবর্তনের প্রবাহপথ, উভয়ের নিয়ন্তা ও অনুঘটক হিসেবে রূপায়িত করেছেন। বিষ্ণু দে বলেন, পরোক্ষ দর্শকের লেখা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৯১] জীবনানন্দ অবশ্য একসময় দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, সমাজবিজ্ঞান কবিদের কাজ নয়। জীবনানন্দ যত দূর মনে করেন, কবিতার গন্তব্য হচ্ছে হৃদয় ও মন, রাষ্ট্রের জনগণ নয়। 'লেখা, লেখকের দায়িত্ব' প্রবন্ধ রচনার প্রায় এক বছর পর, ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি তাঁর ধারণা পুনর্ব্যক্ত করেন—কিছুটা ভিন্নভাবে—যে, কবি রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য কিংবা বিশেষ কারও জন্য লেখেন না :

> ...সেই কবিতা সৃষ্টি করবার সময় উপরোক্ত সামাজিক লাভ-অলাভের প্রশ্ন কবির বস্তু চেতনায় বিশেষ কোনো ছায়াপাতই করে না, তার চৈতন্য ও অনুচেতনা ঐকান্তিক ভাবে সক্রিয় হয়ে থাকে কবিতাটিকে সৎ, সার্থক করে তোলবার জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> এমনকি কাদের জন্যে এ কবিতা লেখা হচ্ছে—এ জিনিস তারা স্বীকার করে নিতে পারবে কিনা—মর্ম না বুঝে ক্ষুণ্ন, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে না তো—এসব প্রশ্ন কবির এই মানসের কাছে বরং অকিঞ্চিৎকর।[৯২]

কেন লিখি প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালের জানুয়ারিতে। জুলাই মাসে সঞ্জয় আর সত্যপ্রসন্ন তাঁদের রোমান্টিসিজম প্রচারণার অংশ হিসেবে প্রকাশ করেন জীবনানন্দের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ *মহাপৃথিবী*। *নিরুক্ত* ও *পূর্বাশা* একই উদ্দেশ্যে কাজ করলেও *নিরুক্তর* তিন বছরের জীবৎকালে প্রকাশিত ১৩টি কবিতার মধ্যে মাত্র একটি ('বিভিন্ন কোরাস'—সেটিও চার পর্বে) *মহাপৃথিবী*তে স্থান পায়। এই গ্রন্থের ৩৫টি কবিতার মধ্যে ৩০টি ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে *কবিতা* পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আবার এই ৩৫টির মধ্যে ১২টি দুই বছরেরও কম সময় আগে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজে *বনলতা সেন* পুস্তিকায় ছাপা হয়েছিল, যার প্রকাশক ছিল বুদ্ধদেব বসুর কবিতাভবন। আরও আশ্চর্যের বিষয়, *মহাপৃথিবী* যখন প্রকাশিত হয়, *বনলতা সেন*-এর কবিতাভবন সংস্করণ তখনো বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল।

সত্যপ্রসন্নের মতে, জীবনানন্দ নিজেই গ্রন্থটির নাম নির্বাচন করেছিলেন। তবে এতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কবিতাগুলো কে বাছাই করেছিলেন—জীবনানন্দ, নাকি সঞ্জয়—সেটা এখনো পরিষ্কার নয়। সঞ্জয়ের কাছে লেখা একটি চিঠিতে জীবনানন্দ আভাস দিয়েছিলেন, ১৯৫১ সালের গ্রীষ্মে তিনি *মহাপৃথিবীর* দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার কথা ভাবছেন। তবে এই গ্রন্থের কবিতা নির্বাচনের জন্য তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন নেই।

১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড
কলকাতা-২৬
১০.৮.৫১

প্রিয়বরেষু,

'মহাপৃথিবী' পূজোর আগে বেরুলে ভালো হয়। অবিলম্বেই বেশ কিছু বিক্রি হবে মনে হয়। এ সংস্করণে কি কি কবিতা থাকবে আপনি নিজে ঠিক ক'রে নিতে পারেন। ছাপার কাজ আজকালই আরম্ভ করলে ঠিক হয় না?

আপনার চিঠি পেলে খুশি হব। আশা করি ভালো আছেন। প্রীতি নমস্কার। ইতি

জীবনানন্দ দাশ[৯৩]

মহাপৃথিবীর প্রথম সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৯২৯ ও ১৯৪২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত কবিতাগুলো, আর উৎসর্গ করা হয়েছিল *নিরুক্তর* দুই যুগ্ম সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে। বইটির বিশিষ্ট কবিতা ছিল *বনলতা সেন* গ্রন্থমালার (কবিতাভবন সংস্করণ) ১২টি ও 'আট বছর আগের একদিন'। বাছাই করা অন্যান্য কবিতার মধ্যে ছিল একটা প্রার্থনাগীতি। এই কবিতার একটা শব্দ নিয়ে বইটির নামকরণ করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

প্রার্থনা

আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও : মরি নাকি মোরা মহাপৃথিবীর তরে?
পিরামিড যারা গড়েছিলো একদিন—আর যারা ভাঙে গড়ে;—
মশাল যাহারা জ্বালায় যেমন জেঙ্গিস যদি হালে
দাঁড়ায় মদির ছায়ার মতন—যত অগণন মগজের কাঁচা মালে;
যে সব ভ্রমণ শুরু হ'ল শুধু মার্কোপোলোর কালে;
আকাশের দিকে তাকায়ে মোরাও বুঝেছি যে সব জ্যোতি
দেশলাইকাঠি নয় শুধু আর—কালপুরুষের গতি;
ডিনামাইট দিয়ে পর্বত কাটা না-হ'লে কী ক'রে চলে,—
আমাদের প্রভু বিরতি দিয়ো না; লাখো লাখো যুগ রতিবিহারের ঘরে
মনোবীজ দাও : পিরামিড গড়ে—পিরামিড ভাঙে গড়ে।[১৪]

আশ্রয়প্রার্থী কবি প্রার্থনা করছেন, আমাদের সৃষ্টি ও ধ্বংসচক্রের উপলব্ধি দাও।[১৫] আমাদের নতুনভাবে ভাবতে দাও, যেহেতু আমরা জৈবিক তাড়নায় সন্তান উৎপাদন করি। মার্কো পোলোর বংশধর মানুষ যখন নক্ষত্রের পথ নির্দেশে দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করে, তাকে উপলব্ধি করতে দাও যে এই তারকামণ্ডল কোনো নির্দোষ ক্ষীণ আলোকরশ্মি নয়, এটি কালপুরুষ (মৃত্যু দেবতা যমের সঙ্গী)। ডিনামাইট সব বাধা ধ্বংস করতে পারে না। শেষাবধি মানবজাতিকে মানুষের মানসের ওপর আস্থা রাখতে হবে।

কবিতা পত্রিকার ডিসেম্বর, ১৯৩৮ সংখ্যায় প্রথম ছাপা এই ছোট কবিতাটিতে দেখা যায়, যে কবি 'বনলতা সেন' (*কবিতা* ডিসেম্বর ১৯৩৫) লিখেছিলেন, তিনি অনেক বদলে গেছেন, এতে তাঁর অস্বচ্ছতার প্রমাণ মেলে, যা যুদ্ধকালীন সময়ে তাঁর কিছু কবিতাকে চিহ্নিত (এবং ক্ষতিগ্রস্ত) করেছিল। যে মহাপৃথিবীর কথা তিনি বলেছেন, সেটা তখন সোজাসুজি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছিল।

বুদ্ধদেব বসু এত তাড়াতাড়ি আবার *বনলতা সেন* প্রকাশ হতে দেখে *কবিতা* পত্রিকার গ্রন্থসমালোচনায় গ্রন্থটি ও কবি সম্পর্কে ক্ষীণ প্রশংসা করে তাঁর বিরক্তি জানান দিয়েছিলেন।

> 'মহাপৃথিবী'র প্রথম কবিতা 'বনলতা সেন' এবং 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্গত 'বনলতা সেনে'র সবগুলি কবিতাই এ-বইয়ে স্থান পেয়েছে। অথচ 'বনলতা সেন' বইখানার প্রচার এখনো বন্ধ হয়নি, কাজেই জীবনানন্দর নতুন কবিতা পড়বার আশায় যাঁরা 'মহাপৃথিবী' খুলবেন তাঁরা রীতিমতো নিরাশ হবেন। এবং একই কারণে সমালোচনা করতে গেলে মোটামুটি সে-কথারই পুনরুক্তি করতে হয়। আমার মতে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশের পর জীবনানন্দ যে-সব কবিতা লিখেছেন ও সাময়িক পত্রে ছাপিয়েছেন তার মধ্যে বিশিষ্টতম কবিতাগুলি নিয়ে 'বনলতা সেন' গ্রথিত হয়েছিলো। 'মহাপৃথিবী'তে কোনো নতুন সুর লাগেনি; বস্তুত এ-বই ভিন্ন নামে 'বনলতা সেনে'রই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

'বনলতা সেনে'র কবিতাগুলি বাদ দিলে এ-বইয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'আট বছর আগের একদিন', যেটি প্রথম বেরিয়েছিলো সাত বছর আগে 'কবিতা'য়, সে-সময়ে কবিতাটি প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, সে-মুগ্ধতা আজো ফিকে হয়নি।

এটুকু ছিল প্রশংসা। তারপর আসে সমালোচনা, জীবনানন্দের স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে নয়, তাঁর স্বকীয়তার অভাব নিয়ে।

'মহাপৃথিবী'র শেষের দিকে যে সব কবিতা আছে, সেগুলি যেন কতগুলি বাঁধাধরা বাক্যের বিচিত্র এক অদ্ভুত সংস্থাপন মাত্র; বাক্যগুলি সুন্দর, কিন্তু সবটা মিলিয়ে কিছু পাওয়া যায় না। একে পুনরুক্তি না বলে নিজের অনুকৃতি বলতে হয় এবং কোনো কবি যখন নিজের অনুকরণ করেন তখন দেবতারা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। মনে হয় জীবনানন্দ স্বরচিত বৃত্তের মধ্যে বন্দী হয়েছেন, প্রার্থনা করি তিনি তা থেকে বেরিয়ে আসুন...।[৯৬]

বুদ্ধদেবের পুনরুক্তির অভিযোগ নিঃসংশয়ে সমর্থন করা যায় *মহাপৃথিবীর* বিশেষ বিশেষ কবিতা চোখের সামনে রাখলে, যেমন 'মুহূর্ত', যা 'ক্যাম্পে'র প্রতিধ্বনি।

মুহূর্ত

আকাশে জ্যোৎস্না—বনের পথে চিতাবাঘের গায়ের ঘ্রাণ;
হৃদয় আমার হরিণ যেন:
রাত্রির এই নীরবতার ভিতর কোন্ দিকে চলেছি!
রূপালি পাতার ছায়া আমার শরীরে,
কোথাও কোনো হরিণ নেই আর;
যত দূর যাই কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
শেষ সোনালি হরিণ-শস্য কেটে নিয়েছে যেন;
তারপর ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে
শত শত মৃগীদের চোখের ঘুমের অন্ধকারের ভিতর।[৯৭]

এই গ্রন্থের অন্য কবিতাগুলো আগের রচনাগুলোর একটা অনুভূতি দেয়, তবে অন্তর্নিহিতভাবে আলাদা। এই পার্থক্যকে হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবে বর্ণনা করেছেন:

প্রথম দৃষ্টান্তটিতে বিশেষভাবে চোখে পড়ে 'কোমল, ধূসর পরিমণ্ডলে'র জীবনানন্দকে—যার আবেদন সাধারণত আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে এবং যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিলম্বিত দোলা-দেয়া সুর। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে যে-পরিবর্তন প্রতিফলিত, তা হচ্ছে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আঘাত না-ক'রে জীবনানন্দ আমাদের বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তিকে ঘা দিতে চাচ্ছেন।[৯৮]

পরের দিকের এই কবিতাটি চিত্রকল্পের ওপর অনেক কম এবং ধারণাগত ভাষায় প্রকাশিত বক্তব্যের ওপর বেশি নির্ভরশীল। তা ছাড়া,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

> ...কখনো-কখনো চিত্রকল্পের উপস্থিতি সত্ত্বেও জীবনানন্দর বক্তব্য বা চিন্তাসূত্র অনুধাবন করার চেষ্টার বিরতি দিয়ে শুধু চিত্রকল্প উপভোগ করার অবকাশ আমাদের থাকে না।[৯৯]

জীবনানন্দ যখন তাঁর একান্ত নিজস্ব শ্যামল বাংলা ও কল্পলোকের নারীদের সঙ্গে অবস্থান কমিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিলতার বাস্তব বিশ্বে বসবাস করা শুরু করেন, তাঁর কাব্যভাষা দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে ইন্দ্রিয় থেকে মস্তিষ্কনির্ভর হয়ে পড়ে। *মহাপৃথিবীর* একটি আত্মসচেতন কবিতায় শব্দচিত্রের অনুরণনে কবি ঘটনাস্থল সুন্দর গ্রামবাংলা থেকে বিষণ্ন কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়টা তন্ময় হয়ে ভাবেন এবং আমাদের তাঁর শারীরিক ও কাব্যিক নির্বাসনের একাকিত্বের যন্ত্রণার দিকে একঝলক দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ দেন।

ফুটপাথে

অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে;
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো
এই-যে ট্র্যামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
অনুভব ক'রে হাঁটছি আমি।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে—কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস;
কোন্ দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকির কথা মনে পড়ে আমার,—
তারা কোথায়?
তারা কি হারিয়ে গেছে?
পায়ের তলে লিকলিকে ট্রামের লাইন,—মাথার ওপরে
                                        অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাসন করছে আমাকে।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস;
এই ঠাণ্ডা বাতাসের মুখে এই কলকাতার শহরে এই গভীর রাতে
        কোনো নীল শিরার বাসাকে কাঁপতে দেখবে না তুমি;
জলপাইয়ের পল্লবে ঘুম ভেঙে গেলো ব'লে কোনো ঘুঘু তার
        কোমল নীলাভ ভাঙা ঘুমের আস্বাদ তোমাকে জানাতে আসবে না।
হলুদ পেঁপের পাতাকে একটা আচমকা পাখি ব'লে ভুল হবে না তোমার,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ নিবিড় হ'য়ে
উঠবে না তোমার!
প্যাঁচা তার ধূসর পাখা আমলকীর ডালে ঘষবে না এখানে,
আমলকীর শাখা থেকে নীল শিশির ঝ'রে পড়বে না,
তার সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খসিয়ে আনবে না এখানে,
রাত্রিকে নীলাভতম ক'রে তুলবে না!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সবুজ ঘাসের ভিতর অসংখ্য দেয়ালি পোকা ম'রে রয়েছে
দেখতে পাবে না তুমি এখানে,
পৃথিবীকে মৃত সবুজ সুন্দর কোমল একটি দেয়ালি পোকার
মতো মনে হবে না তোমার,
জীবনকে মৃত সবুজ সুন্দর শীতল একটি দেয়ালি পোকার মতো
মনে হবে না;
প্যাঁচার সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খসিয়ে আনবে না এখানে,
শিশিরের সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খসিয়ে আনবে না,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ
নিবিড় হ'য়ে উঠবে না তোমার।[১০০]

১৯৪০-এর দশকের প্রথম দিকে *কবিতা* পত্রিকায় জীবনানন্দের কবিতার সংখ্যা কমে যায়। তার একটা কারণ *নিরুক্ত*র আত্মপ্রকাশ ও অন্যান্য পত্রিকার উপস্থিতি, যেমন *চতুরঙ্গ*। সহজ কথায়, কবিতা ছাপানোর মতো বহু জায়গা ছিল তাঁর। তাঁর পরিচিতি এবং *প্রগতি* ও *কবিতা* পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনার কারণে জীবনানন্দের কবিতা আরও ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও পত্রিকা-সম্পাদকদের কাম্য হয়ে উঠেছিল। এমনকি যে *পরিচয়* ১৯৩২ সালে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতাটি ছেপেছিল, সেটিও ১৯৩৯ সালের এক সংখ্যায় জীবনানন্দের তিনটি কবিতা ছাপে ও পরের তিন বছরে ছাপে কমপক্ষে একটি করে কবিতা।

*কবিতা*য় কম লেখার আরেকটা কারণ ছিল নিঃসন্দেহে তাঁর কবিতার ধরন। জীবনানন্দের নিজ ভাষায় :

> 'কল্লোল' 'কালিকলম' ক্রমেই বিস্রস্ত হয়ে যাচ্ছিল। বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' এল নতুন সম্ভাবনা ও উৎসাহ নিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে 'প্রগতি' ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সে কবিতাগুলো হয়তো বুদ্ধদেবের মতে আমার নিজের জগতের এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়; স্পষ্টতাসম্ভবা তারা; অতএব সাহস ও সততা দেখবার সুযোগ লাভ ক'রে চরিতার্থ হ'লাম—বুদ্ধদেববাবুর বিচারশক্তির ও হৃদয়বুদ্ধির; আমার কবিতার জন্য বেশ বড় স্থান দিয়েছিলেন তিনি 'প্রগতি'তে এবং পরে 'কবিতা'য় প্রথম দিক দিয়ে। তারপরে—'বনলতা সেন'-এর পরবর্ত্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও পৃথিবীর বাইরে চ'লে গেছি ব'লে মনে করেন তিনি।
>
> 'নিরুক্ত' ও 'পূর্ব্বাশা'র সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মনে করেন আমার শেষের দিকের কবিতায় আমার পারিপার্শ্বিক-চেতনা প্রৌঢ় পরিণতি লাভ করেছে। এ পারিপার্শ্বিক অবশ্য সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে।[১০১]

তবুও সৃষ্টিশীলতার প্রক্রিয়া নিয়ে জীবনানন্দের ধারণা পরিবর্তিত হয়নি, তাঁর শব্দপ্রয়োগও নয়। চিঠির শেষদিকে তিনি 'ভাবপ্রতিভার সাহায্য' ও 'স্বতন্ত্র আভা'র কথা বলেন, দুটো অভিব্যক্তিই ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর 'কবিতার কথা'য়। কেবল কবিতা নিজস্ব কল্পনাপ্রণোদিত অথবা বাংলার প্রাকৃতিক লোককথাভিত্তিক পরিবেশের চেয়ে বেশি প্রেরণা লাভ করে সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

থেকে। নিজস্ব বিবেচনায় বুদ্ধদেব এই নতুন চেতনাকে জীবনানন্দের কবিতায় খাপছাড়া বলেছিলেন।

১৯৪০-এর দশকের প্রথমার্ধে জীবনানন্দ বরিশালে থাকতেন। মাঝেমধ্যে কলকাতায় এলে থাকতেন তাঁর ভাই অশোকানন্দের সঙ্গে। তাঁর বোন শিক্ষকতা করতেন, তখন তিনি কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তমলুক গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস হয়েছিলেন। বরিশালে জীবনানন্দ, স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে, দাশ সংসারের বাকিদের সঙ্গে থাকতেন সর্বানন্দ ভবনে। তাঁর বাবা সত্যানন্দ মারা যান ১৯৪২ সালে বরিশালে; আর তাঁর মা কুসুমকুমারী স্বামীর মৃত্যুর পর বেশির ভাগ সময় কাটান কলকাতায় ছোট ছেলে আর পুত্রবধূর কাছে, সেখানেই মারা যান তিনি ১৯৪৮ সালে।[১০২]

এই দশকের মাঝামাঝি জীবনানন্দ তাঁর পেশা ও আবাস পরিবর্তনের কথা ভাবেন। ভ্রাতৃবধূ নলিনীর কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানান যে শিক্ষকতা পেশাটা তাঁর আর ভালো লাগছিল না :

> অধ্যাপনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সে সবের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন ঠিকই। তবে অধ্যাপনা জিনিষটা কোনো দিনই আমার তেমন ভালো লাগেনি। যে সব জিনিষ যাদের কাছে যে রকম ভাবে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তাতে আমার বিশেষ আস্থা নেই। এ কাজে মন তেমন জাগে না; তবু সময়-বিশেষে অন্য কোনো কোনো প্রেরণার চেয়ে বেশী জাগে তা' স্বীকার করি। এ বিষয়ে আপনার আনন্দ ও উৎসাহ আমার চেয়ে ঢের বেশী। সেইটেই ভালো, এবং আমি খুব গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি।[১০৩]

এখনো পরিচয় পাওয়া যায়নি এমন একজনের কাছে লেখা এক চিঠিতেও তিনি একই অনুভূতি ব্যক্ত করেন চার বছর পর। যেসব কলেজে তিনি পড়িয়েছেন, তার একটা আংশিক তালিকা দেওয়ার পর তিনি লেখেন, 'এখনও অধ্যাপনাই করতে হচ্ছে। কিন্তু মনে হয় এ পথে আর বেশি দিন থাকা ভালো না। যে জিনিষ যাদের যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সবই অসাড়তার নামান্তর নয় কি? এইবার নতুন পটভূমি নেমে আসুক।'[১০৪]

সাহিত্যের মূলধারা থেকে সদাবিচ্ছিন্ন জীবনানন্দ উপরন্তু ছিলেন বেদনাদায়কভাবে একজন একাকী মানুষ, এই চরিত্রের কিছু বিষয় শিক্ষকতার সঙ্গে খাপ খেত না। বিএম কলেজে তাঁর এক সহকর্মী জানান :

> কবি মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন না। বরিশাল শহরে কারো সঙ্গেই তাঁকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখিনি। নিজেদের ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানও তিনি যেন এড়িয়ে চলতেন। অধ্যাপকদের ও শিল্পরসিকদের কোন আড্ডায় তাঁকে কখনও দেখা যেত না।...মাঠের পাশের বাঁকা পথ ধরে কলেজের পিছন দিক দিয়ে কলেজে যেতেন; ক্লাশে শান্তগম্ভীর ভঙ্গিতে পড়াতেন, অবসরকালে কষ্টি-পাথরের মূর্তিটির মত বিশ্রাম কক্ষের কোণে বসে থাকতেন। তার পর সেই নিরালা পথটি ধরে ফিরতেন নিজের নির্জন গৃহে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ডুরান্ডা [বানান অপরিবর্তিত]-ঘেরা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> দুর্বাশ্যামল প্রাঙ্গণে আনতদৃষ্টিতে দ্রুত পরিক্রমা ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। এমন অনুত্তাপ নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা আমি কদাচিৎ দেখেছি।
>
> ...এমন কি, ক্লাশে ছাত্রছাত্রীর ভিড়েও তাঁর গলা শুকিয়ে যেত। বার বার জিহ্বা দিয়ে বিশুষ্ক ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন না করলে ভাল করে বাক্যস্ফূর্তি হ'ত না। আমি তাঁর কাব্যসমালোচক নই, সুরসিক পাঠকও নই। শুনেছি যে তাঁকে 'নির্জনতম কবি' বলা হচ্ছে।[১০৫] তাঁর কাব্যে মানবীয় সমস্যা যদি প্রাধান্য না পেয়ে থাকে ত বুঝতে হবে যে, এটা তাঁর চারিত্র-বৈশিষ্ট্য।[১০৬]

সতীর্থ কবি ও কল্লোল যুগের সুহৃদ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও জীবনানন্দকে একইভাবে চরিত্রায়িত করেছেন :

> নির্জন নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ ধূসর স্তিমিত অবসন্ন—এমনিধারা বিশেষণে সাজিয়ে এ-ই এত দিন বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে জীবনানন্দ মিশুক নয়, ঠোঁটে আঁকা মৃদু হাসির বাইরে সে হাসতে জানে না, গা ঢেলে আড্ডা দিতে জানে না, রাস্তায় পরিচিত লোক দেখলেই পাশ কাটিয়ে সরে পড়ে।[১০৭]

১৯৪৬ সালের ৬ আগস্ট বিএম কলেজ কাউন্সিলের সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'ধারা ১২(১) মোতাবেক প্রফেসর জে দাশকে ৮-৭-১৯৪৬ তারিখ থেকে ১৪-৯-১৯৪৬ সবেতন ছুটি মঞ্জুর করা হয়।'[১০৮] ছুটির সময়টা তিনি কলকাতায় তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন।[১০৯] সেখানে থাকাকালে সম্ভবত নভেম্বর-ডিসেম্বরের দিকে প্রকাশিতব্য দৈনিক সংবাদপত্র *স্বরাজ*-এ যোগ দেওয়ার জন্য একটা ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।[১১০] কলকাতায় সে সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 'ডাইরেক্ট একশন দিবস' নামে পরিচিত ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ তারিখে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত হয় মারাত্মক দাঙ্গা। এক বছর পর যে দেশভাগ আসন্ন এবং যার সঙ্গে আসবে প্রচুর রক্তপাত, এক পরিপ্রেক্ষিতে সে দাঙ্গা ছিল তার ভবিষ্যসংকেত। সে বছরের জুলাইয়ে 'সম্প্রতি বড় ঝঞ্চাটের ভিতর আছি; লিখবার তাগিদ নেই',[১১১] এমন দাবি সত্ত্বেও জীবনানন্দ কলকাতায় ও তার পরও কবিতা লিখেছিলেন।[১১২] কবিদের রিপোর্টার হওয়া উচিত নয়, তাঁর এই নীতিবাক্যের প্রতি সৎ থেকে হয়তো তিনি দাঙ্গার রক্তে তাঁর কবিতাকে আচ্ছন্ন হতে দেননি।

বিএম কলেজে কাউন্সিলের ২৩ ডিসেম্বরের আরেকটা কার্যবিবরণী ছিল : 'প্রফেসর জে দাশের ছুটির দরখাস্ত। ১১-১১-১৯৪৬ তারিখ থেকে আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি পর্যন্ত তাঁকে বিনা বেতন ছুটি মঞ্জুর করা হলো।' মার্জিনে লেখা ছিল : 'জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে লাইব্রেরির সমস্ত বই ফেরত দিতে বলা হোক।'

বঙ্গ বিভাগের সম্ভাবনার সঙ্গে স্বাধীনতার কথা ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছিল তখন। বিএম কলেজের কিছু হিন্দু শিক্ষক ১৪-১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর কাছাকাছি সময়ে দেশ ত্যাগ করেন।[১১৩] একজন ব্রাহ্ম হলেও তত্ত্বগতভাবে হিন্দু না হওয়া সত্ত্বেও জীবনানন্দ স্বাধীনতা-পরবর্তী বরিশালের পরিস্থিতি সম্পর্কে অনিশ্চিত বোধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে থাকতে পারেন। তাঁর স্ত্রীর ভাষ্যমতে, স্থানীয় বাঙালি মুসলমানরা তাঁদের সাবধান করে দেন যে 'মধ্যদেশীয়' (অর্থাৎ মূলত ভারতের বিহার প্রদেশের) মুসলমানরা পাকিস্তানে চলে আসবে, এবং হিন্দুরা নিরাপদ থাকবে না।[১১৪] এই অনিশ্চয়তার সঙ্গে শিক্ষকতা পেশার প্রতি তাঁর ব্যক্ত অনীহা যুক্ত হয়ে আর ব্যাখ্যাতীত থাকে না, কেন কলকাতায় একটা চাকরির সুযোগ এলে জীবনানন্দ শিক্ষকতা এবং চিরদিনের জন্য বরিশাল ছেড়ে যাওয়া বেছে নিয়েছিলেন।[১১৫]

হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃদ্বয়ের ভেতরকার অন্তর্ঘাতী বিবাদ, উপমহাদেশটির বিভক্তি ও স্বাধীনতার পূর্বাভাস নিয়ে সে সময়গুলো উঠে আসে তাঁর কবিতায়।

১৯৪৬-৪৭

দিনের আলোয় ওই চারিদিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা :
পথে-ঘাটে ট্রাক ট্রামলাইনে ফুটপাতে;
কোথাও পরের বাড়ি এখুনি নিলেম হবে—মনে হয়,
জলের মতন দামে।
সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌছুবে
সকলের আগে সকলেই তাই।

অনেকেরই ঊর্ধ্বশ্বাসে যেতে হয়, তবু
নিলেমের ঘরবাড়ি আসবাব—অথবা যা নিলেমের নয়
সে সব জিনিস
বহুকে বঞ্চিত ক'রে দু-জন কি একজন কিনে নিতে পারে।
পৃথিবীতে সুদ খাটে : সকলের জন্যে নয়।
অনির্বচনীয় হুণ্ডি একজন দু-জনের হাতে।
পৃথিবীর এইসব উঁচু লোকদের দাবি এসে
সবি নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।
বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন
কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়,
অথবা মাটির দিকে—পৃথিবীর কোনো পুনঃপ্রবাহের বীজের ভিতরে
মিশে গিয়ে। পৃথিবীতে ঢের জন্ম নষ্ট হ'য়ে গেছে জেনে, তবু
আবার সূর্যের গন্ধে ফিরে এসে ধুলো ঘাস কুসুমের অমৃতত্বে কবে
পরিচিত জল, আলো আধো অধিকারিণীকে অধিকার ক'রে নিতে হবে :
ভেবে তারা অন্ধকারে লীন হ'য়ে যায়।

লীন হ'য়ে গেলে তারা তখন তো—মৃত।
মৃতেরা এ পৃথিবীতে ফেরে না কখনো
মৃতেরা কোথাও নেই; আছে?
কোনো কোনো অঘ্রানের পথে পায়চারি-করা শান্ত মানুষের
হৃদয়ের পথে ছাড়া মৃতেরা কোথাও নেই ব'লে মনে হয়;

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাহ'লে মৃত্যুর আগে আলো অন্ন আকাশ নারীকে
কিছুটা সুস্থিরভাবে পেলে ভালো হ'তো।

বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।
সূর্য অস্তে চ'লে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার
খোঁপা বেঁধে নিতে আসে—কিন্তু কার হাতে?
আলুলায়িত হ'য়ে চেয়ে থাকে—কিন্তু কার তরে?
হাত নেই—কোথাও মানুষ নেই, বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন
আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্যা, পটলচেরা চোখের মানুষী
হ'তে পেরেছিলো প্রায়; নিভে গেছে সব।

এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনো পেয়েছে;
নতুন চালের রসে রৌদ্রে কতো কাক
এ-পাড়ার বড়ো মেজো...ও-পাড়ার দুলে বোয়েদের
ডাকশাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত;
এখন টুঁ শব্দ নেই সেইসব কাকপাখিদেরও;
মানুষের হাড় খুলি মানুষের গণনার সংখ্যাধীন নয়;
সময়ের হাতে অন্তহীন।

ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হ'তো
ধানের অদ্ভুত রস খেয়ে ফেলে মাঝি-বাগ্‌দির
ঈশ্বরী মেয়ের সাথে
বিবাহের কিছু আগে—বিবাহের কিছু পরে—সন্তানের জন্মাবার আগে।
সে সব সন্তান আজ এ যুগের কুরাষ্ট্রের মূঢ়
ক্লান্ত লোকসমাজের ভিড়ে চাপা প'ড়ে
মৃতপ্রায়; আজকের এইসব গ্রাম্য সন্ততির
প্রপিতামহের দল হেসে খেলে ভালোবেসে—অন্ধকারে জমিদারদের
চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চড়কের গাছে[১১৬] তুলে ঘুমায়ে গিয়েছে।
ওরা খুব বেশি ভালো ছিলো না; তবুও
আজকের মন্বন্তর দাঙ্গা দুঃখ নিরক্ষতায়
অন্ধ শতছিন্ন গ্রাম্য প্রাণীদের চেয়ে
পৃথক আর-এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিলো।

আজকে অস্পষ্ট সব? ভালো ক'রে কথা ভাবা এখন কঠিন;
অন্ধকারে অর্ধসত্য সকলকে জানিয়ে দেবার
নিয়ম এখন আছে; তারপর একা অন্ধকারে
বাকি সত্য আঁচ ক'রে নেওয়ার রেওয়াজ
র'য়ে গেছে; সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে।

সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ।
সৃষ্টির মনের কথা : আমাদেরি আন্তরিকতাতে
আমাদেরি সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খুঁজে আনা। প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল
ঝর্নার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হ'য়ে আছে ব'লে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায়;
মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হ'য়ে বধ ক'রে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে
বধ ক'রে ঘুমাতেছি—তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে
মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল ব্রতী
সকলকে আলো দেবে মনে ক'রে অগ্রসর হ'য়ে
তবুও কোথাও কোনো আলো নেই ব'লে ঘুমাতেছে।

ঘুমাতেছে।
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
ব'লে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
আর তুমি?' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে—রক্তনদী উদ্বেলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে, 'গগন, বিপিন, শশী পাথুরেঘাটার;
মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রীটের, এন্টালির—'
কোথাকার কেবা জানে; জীবনের ইতর শ্রেণীর
মানুষ তো এরা সব; ছেঁড়া জুতো পায়ে
বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে;
সৃষ্টির অপরিক্লান্ত চারণার বেগে
এইসব প্রাণকণা জেগেছিলো—বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে
সহসা সুন্দর ব'লে মনে হয়েছিলো কোনো উজ্জ্বল চোখের
মনীষী লোকের কাছে এইসব অণুর মতন
উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলোকে।
সূর্যের আলোর ঢলে রোমাঞ্চিত রেণুর শরীরে
রেণুর সংঘর্ষে যেই শব্দ জেগে ওঠে
সেখানে সময় তার অনুপম কণ্ঠের সংগীতে
কথা বলে; কাকে বলে? ইয়াসিন মকবুল শশী
সহসা নিকটে এসে কোনো-কিছু বলবার আগে
আধ-খণ্ড অনন্তের অন্তরের থেকে যেন ঢের
কথা ব'লে গিয়েছিল; তবু—
অনন্ত তো খণ্ড নয়; তাই সেই স্বপ্ন, কাজ, কথা
অখণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে;
কেউ নেই, কিছু নেই—সূর্য নিভে গেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ যুগে এখন ঢের কম আলো সব দিকে, তবে।
আমরা এ পৃথিবীর বহুদিনকার
কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার
মর্যাদায় গড়া কাহিনীর মূল্য নিংড়ে এখন
সঞ্চয় করেছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।
মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।
অনেক বিদ্যার দান উত্তরাধিকারে পেয়ে তবু
আমাদের এই শতকের
বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু—বেড়ে যায় শুধু;
তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই ব'লে অর্থময়
জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।

এ-যুগে কোথাও কোনো আলো—কোনো কান্তিময় আলো
চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের; নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার
রাত্রির মায়ের মতো: মানুষের বিহ্বল দেহের
সব দোষ প্রক্ষালিত ক'রে দেয়—মানুষের বিহ্বল আত্মাকে
লোকসমাগমহীন একান্তের অন্ধকারে অন্তঃশীল ক'রে
তাকে আর শুধায় না—অতীতের শুধানো প্রশ্নের
উত্তর চায় না আর—শুধু শব্দহীন মৃত্যুহীন
অন্ধকারে ঘিরে রাখে, সব অপরাধ ক্লান্তি ভয় ভুল পাপ
বীতকাম হয় যাতে—এ জীবন ধীরে ধীরে বীতশোক হয়,
স্নিগ্ধতা হৃদয়ে জাগে; যেন দিকচিহ্নময় সমুদ্রের পারে
কয়েকটি দেবদারু গাছের ভিতরে অবলীন
বাতাসের প্রিয়কণ্ঠ কাছে আসে—মানুষের রক্তাক্ত আত্মায়
সে-হাওয়া অনবচ্ছিন্ন সুগমের—মানুষের জীবন নির্মল।
আজ এই পৃথিবীতে এমন মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকার
নেই আর? সুবাতাস গভীরতা পবিত্রতা নেই?
তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে
অন্ধকার হ'তে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে
যে অনবনমনে চলেছে আজো—তার হৃদয়ের
ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম ক'রে চেতনার
বলয়ের নিজ গুণ র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয়।[১১৭]
এসো জ্ঞান, দীনতা, নির্মেঘ দৃষ্টি, শান্তি, আলো, প্রেম।*

* *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* ১৩৫-৩৯। শেষ পঙ্‌ক্তিটি গ্রন্থভুক্ত মূল কবিতায় পাওয়া যায় না, তবে ক্লিন্টন বি সিলির তথ্যানুসারে সত্যপ্রসন্ন দত্তের কাছে সংরক্ষিত *পূর্বাশা* কার্তিক ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ সংখ্যা, যেখানে কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে এই বাড়তি পঙ্‌ক্তিটি ছিল।—অনুবাদক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তথ্যসূত্র

১. জিন ডি ওভারস্ট্রিট অ্যান্ড মার্শাল উইন্ডমিলার, *কমিউনিজম ইন ইন্ডিয়া* (বার্কলে ও লস অ্যাঞ্জেলেস : ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৫৯), ১৫৭।

২. এআইপিডব্লিউএর ওপর চমৎকার একটা গবেষণার জন্য দ্রষ্টব্য, কার্লো কপোলা, *উর্দু পোয়েট্রি, ১৯৩৫-৭০ : দ্য প্রগ্রেসিভ এপিসোড* (পিএইচডি অভি : দ্য ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো, ১৯৭৫)।

৩. *ট্রিবিউন* (লাহোর), ১৫ এপ্রিল ১৯৩৬, ১৩।

৪. প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, 'পঞ্চম দশক', *আধুনিক কবিতার ইতিহাস,* দাশগুপ্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১০৮।

৫. আবু সয়ীদ আইয়ুব, 'টেনডেনসিজ ইন মডার্ন বেঙ্গলি পোয়েট্রি', *লংম্যানস মিসেলেনি,* ১৯৪৩ (কলকাতা : লংম্যানস, গ্রিন অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৪৩), ৪৬।

৬. সঞ্জয় ও সত্যপ্রসন্ন দুজনই এসেছেন বাংলাদেশের পূর্বাংশের কুমিল্লা থেকে, এখান থেকেই তাঁরা *পূর্ব্বাশা* প্রকাশ শুরু করেছিলেন। তাঁরা পত্রিকাটি নিয়ে কলকাতায় চলে আসার পরও নামটি রয়ে গিয়েছিল।

৭. সঞ্জয়ের মনোভাবটি প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর, ১৯৬৯ সালের জুন মাসে; তাঁর সতীর্থ এক কবির এমন মনোভাব জানতে পেরে বুদ্ধদেব বসু আমার কাছে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

৮. সত্যপ্রসন্ন দত্তের সাক্ষাৎকার।

৯. সত্যপ্রসন্ন দত্তের সাক্ষাৎকার।

১০. *পূর্ব্বাশা,* আষাঢ় ১৩৭৬, ২৬৭-৬৮।

১১. *পূর্ব্বাশায়* পুনর্মুদ্রিত, আষাঢ় ১৩৭৬, ২৬৭।

১২. *পূর্ব্বাশা,* আষাঢ় ১৩৭৬, ২৬৫।

১৩. সঞ্জয় ভট্টাচার্য, *কবি জীবনানন্দ দাশ,* ৭৩।

১৪. *নিরুক্ত,* আশ্বিন, ১৩৪৭।

১৫. মৈত্রেয়ী, এক প্রাচীন মহারানির স্ত্রী, যিনি অমরত্বসন্ধানী ছিলেন; নাগার্জুন ছিলেন বৌদ্ধ শিক্ষক, একজন বোধিসত্ত্ব ও তাত্ত্বিক; কৌটিল্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী ও *অর্থশাস্ত্র* গ্রন্থের রচয়িতা।

১৬. *নিরুক্ত,* আশ্বিন, ১৩৪৭।

১৭. সঞ্জয় ভট্টাচার্য, *আধুনিক কবিতার ভূমিকা,* দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা : পূর্ব্বাশা পাবলিকেশনস, ১৯৬৬), ৪২।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮. নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় এই মন্তব্যের সঙ্গে মতানৈক্য পোষণ করবেন। তিনি নিজেকে জীবনানন্দের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু বলে মনে করতেন—যদিও তিনি স্বীকার করেন, কেউ কখনো জীবনানন্দের খুব কাছাকাছি যাননি।

১৯. বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের নামের অশুদ্ধ বানান ঠিক করে দেওয়ার পর থেকে *শনিবারের চিঠি* সঠিক বানানটাই লিখত, তবে প্রত্যেকবারই বন্ধনীর ভেতর থাকত 'জীবানন্দ নহে'।

২০. হেরম্ব চক্রবর্তী, 'জীবনানন্দকে যেমন দেখেছি', *গার্লস কলেজ ম্যাগাজিন*, হাওড়া, ১৯৫৫, ১৭।

২১. দুজনই কলেজজীবনে একই ছাত্রাবাসে থাকতেন। সজনীকান্ত বরিশালে রমেশ সেনের বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন; দ্রষ্টব্য, সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি*, প্রথম খণ্ড, ১২৮।

২২. *সপ্তক*, [পৌষ ১৩৪৭] বরিশালে প্রকাশিত *সপ্তক* ১৯৩০-এর দশকের শেষ ভাগে প্রকাশনা শুরু করে প্রায় ১০ বছর টিকে ছিল।

২৩. জীবনানন্দ দাশ, *সাতটি তারার তিমির* (কলকাতা : ভারবি, ১৯৬৯), ১৪-১৫; *পরিচয়*, মাঘ ১৩৪৫-আষাঢ়, ১৩৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত।

২৪. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *কবিতা পরিচয়*, নং ৩, পৃষ্ঠাসংখ্যা নেই।

২৫. প্রাগুক্ত।

২৬. নরেশ গুহ, *কবিতা পরিচয়*, নং ৪, ১৫।

২৭. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবিতা পরিচয়*, নং ৫ ও ৬, ২২।

২৮. নরেশ গুহ, *কবিতা পরিচয়*, নং ৪, ১৬।

২৯. অরুণকুমার সরকার, *কবিতা পরিচয়*, নং ৫ ও ৬, ১৯।

৩০. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবিতা পরিচয়*, নং ৫ ও ৬, ২১।

৩১. প্রাগুক্ত, ১৯-২০।

৩২. সঞ্জয় ভট্টাচার্য, *কবি জীবনানন্দ দাশ*, ১১৫-২৬।

৩৩. প্রাগুক্ত, ১১৬ ও ১১৯।

৩৪. কল্যাণকুমার বসুর সৌজন্যে, তাঁর মতে এই চিঠিটি সম্ভবত লেখা হয় *নিরুক্তর* সময়ে, অর্থাৎ ১৯৪০-৪৩ সালে।

৩৫. আবু সয়ীদ আইয়ুবের সাক্ষাৎকার।

৩৬. সঞ্জয় ভট্টাচার্য, *আধুনিক কবিতার ভূমিকা*, ৪৪-৪৫। উদ্ধৃতিটুকু সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা জীবনানন্দের চিঠি থেকে; প্রবন্ধটিও প্রথম প্রকাশিত হয় *নিরুক্ত*, আষাঢ় ১৩৫০ সংখ্যায়।

৩৭. অম্বুজ বসু, *একটি নক্ষত্র আসে*, ২১২।

৩৮. *নিরুক্ত*, পৌষ ১৩৪৭; *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ৬৩। আহিরীটোলা, বাদুড়বাগান ও পাথুরিয়াঘাটা—এসবই কলকাতার বিভিন্ন অংশ, হ্যারিসন রোডের নাম মহাত্মা গান্ধী রোড হিসেবে পরিবর্তিত হলেও ওটা কলকাতারই অংশ।

৩৯. সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় জীবনানন্দের কবিতায় কলকাতার উপস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন; দ্রষ্টব্য, এস গঙ্গোপাধ্যায়, 'কবিতায় কলকাতা : জীবনানন্দ', *কালি ও কলম*, মাঘ ১৩৭৯, ৮৯৩-৯০১।

৪০. *নিরুক্ত*, পৌষ ১৩৪৭।

৪১. *সাতটি তারার তিমির*, ২৫-২৬; *কবিতা*, পৌষ ১৩৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৪২. 'বেঙ্গলি পোয়েট্রি টুডে', *স্টেটসম্যান* (কলকাতা), নভেম্বর ৬, ১৯৪৯।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৩. 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', *কবিতার কথা,* ১৯।

৪৪. পাণ্ডুলিপিটি তাঁর ১৯৩১-৩২ সালের কবিতার নোটবইয়ে পাওয়া যায়, তারপর দেবেশ রায় সম্পাদিত : *জীবনানন্দ সমগ্র*-এ অন্তর্ভুক্ত, ৪৩৬-৩৮।

৪৫. জীবনানন্দ দাশ, *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সম্ভার,* রণেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ : (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি ১৯৭০), ৩৩২; *উষা,* জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৪৬. দ্রষ্টব্য, আনন্দ কে কুমারস্বামী, *দ্য ট্রান্সফরমেশন অব নেচার ইন আর্ট* (নিউইয়র্ক : ডোভার পাবলিকেশনস, ১৯৫৬; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩৪), ১৭৮; এবং হেইনরিখ জিমার, *মিথস অ্যান্ড সিম্বল ইন ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড সিভিলাইজেশন,* জোসেফ ক্যাম্পবেল সম্পাদিত (নিউইয়র্ক অ্যান্ড ইভানস্টন : হার্পার টর্চবুকস; হার্পার অ্যান্ড রো, ১৯৬২), ১৫২।

৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতাঞ্জলি : আ কালেকশন অব প্রোজ ট্রান্সলেশন মেইড বাই দ্য অথার ফ্রম দ্য অরিজিনাল বেঙ্গলি,* ডব্লিউ বি ইয়েটসের ভূমিকাসহ (নিউইয়র্ক : ম্যাকমিলান পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯১৩, পেপারব্যাক সংস্করণ : ১৯৭১), ২৩, প্রথম গান।

৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পারসোনালিটি : লেকচার্স ডেলিভার্ড ইন আমেরিকা* (কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ, লন্ডন : ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯১৭, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭০)।

৪৯. 'অন পোয়েট্রি', *অ্যান অ্যান্থলজি অব বেঙ্গলি রাইটিং,* বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, ১০২।

৫০. 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', *কবিতার কথা,* ২২-২৩।

৫১. *নিরুক্ত,* আশ্বিন, ১৩৪৮।

৫২. এই পঙ্‌ক্তিতে 'পৃথিবী' শব্দটির বিভক্তি বদলে গেছে। *কবিতা* 'পৃথিবীর' থাকলেও *মহাপৃথিবী* গ্রন্থে 'পৃথিবীকে' ছাপা হয়েছে।

৫৩. *মহাপৃথিবী* ৭২; *কবিতা,* আশ্বিন, ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৫৪. *জয়শ্রী,* আশ্বিন, ১৩৪৮।

৫৫. *সাতটি তারার তিমির,* ২৭-২৮, *নিরুক্ত,* পৌষ ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত। বাংলা ছান্দসিক নীলরতন সেনের মতে, জীবনানন্দের প্রকাশিত কবিতার বইগুলোর মধ্যে *ঝরা পালক* (১৯২৮) থেকে *বেলা অবেলা কালবেলা* (১৯৬১) পর্যন্ত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত মোট চারটি কবিতা দেখা যায়। এ চারটির মধ্যে তিনটি *মহাপৃথিবী*তে এবং একটি, 'লঘু মুহূর্ত', *সাতটি তারার তিমির*-এ অন্তর্ভুক্ত হয়। 'লঘু মুহূর্ত'র প্রথম আর তৃতীয় স্তবকের নিপুণ ছন্দ-বিশ্লেষণের পর নীলরতন সেন মেনে নেন যে ছন্দের পরিপ্রেক্ষিতে এই পঙ্‌ক্তিগুলো পাঠকের পক্ষে বোঝা কঠিন। অবশেষে তিনি লেখেন, 'জীবনানন্দের বাকভঙ্গিতে মাত্রাবৃত্ত তেমন খাপ খায় না, কবি সেটা বুঝতে পেরেছেন এবং পরবর্তী কবিতা রচনায় এ-রীতিকে পরিহার করেছেন।' নীলরতন সেন, 'ছন্দকুশলী জীবনানন্দ', *জীবনানন্দ স্মৃতি,* দেবকুমার বসু সম্পাদিত (কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৭১), ২০-২১। [ক্লিন্টন বি সিলিকে লেখা ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১-তে একটি চিঠিতে বাংলাদেশের কবি সাজ্জাদ শরিফ জানান যে, *ঝরা পালক* থেকে *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা* পর্যন্ত মাত্রাবৃত্তে লেখা জীবনানন্দের মোট কবিতার সংখ্যা ১৬। *বেলা অবেলা কালবেলায়* একটিও মাত্রাবৃত্তের কবিতা নেই।—অনুবাদক]

সম্প্রতি (জানুয়ারি ২০১১) প্রবন্ধোপম এক চিঠিতে বাংলাদেশের কবি সাজ্জাদ শরিফ দৃষ্টান্তসহ দেখিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ নন, মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদকর্তারাই আসলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উদ্ভাবক এবং উপরন্তু জীবনানন্দের 'লঘু মুহূর্ত'র ছন্দ মাত্রাবৃত্ত নয়, অক্ষরবৃত্ত। ছান্দসিকদের ভুলের সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে তিনি লেখেন, '..."লঘু মুহূর্ত" কবিতার ছন্দ অক্ষরবৃত্ত, কিন্তু মাত্রাবিন্যাস করতে গিয়ে এতে জীবনানন্দ মাত্রাবৃত্তের কিছু নিয়ম অনুসরণ করেছেন।' (সাজ্জাদ শরিফের সৌজন্যে)

জীবনানন্দের *লঘু মুহূর্ত* অবলম্বনে অ্যালেন গিন্সবার্গ যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেটি এ রকম :

'তিনটি ভিখিরি
ধূসর বাতাসে ধুয়ে হাতমুখ
হাতের আঁজলাতে পান করে ধূসর বাতাস
মধ্য-কলকাতার ডাকঘরের প্রশস্ত গলির কাছে
বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মোড়ে
তিনজন ভিখিরি নর্দমার কয়লার আঁচে
রান্নার হাঁড়ি ঘিরে বসে যায়—
বুড়ি এক কাছে আসে
আগুনের উত্তাপ চেয়ে
আর তারা আলাপে রত হয়
কারা নিয়েছে কলকাতার ঘরবাড়ি
কারা আয় করে, কারা করে ব্যয় সব টাকাকড়ি—'

—অনুবাদ : ফারুক মঈনউদ্দীন

অ্যালেন গিন্সবার্গ, *ইন্ডিয়ান জার্নালস : মার্চ ১৯৬২-মে ১৯৬৩* (সান ফ্রান্সিসকো : ডেভ হ্যাসেলউড বুকস অ্যান্ড সিটি লাইটস বুকস, ১৯৭০), ১১৮-১৯।

৫৬. *সাতটি তারার তিমির*, ৩৩-৩৫; *নিরুক্ত*, আষাঢ় ১৩৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৫৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস *অশনি সংকেত* অবলম্বনে নির্মিত সত্যজিৎ রায়ের ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের ফলাফল চিত্রায়িত করে; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস *মন্বন্তর* একই সময়কার কলকাতার পটভূমিতে রচিত।

৫৮. টাকার তখনকার মান ছিল, চৌষট্টি পয়সায় এক টাকা, সেই হিসাবে চার পয়সায় এক আনা ও ষোলো আনায় এক টাকা।

৫৯. *সাতটি তারার তিমির*, ৪০।

৬০. *কবি ও কবিতা*, মহালয়া, ১৩৭৬।

৬১. লীলা রায়, *আ চ্যালেঞ্জিং ডেকেড : বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দ্য ফোর্টিস* (কলকাতা : ডি এম লাইব্রেরি, ১৯৫৩), ১৬।

৬২. হীরেন মুখোপাধ্যায়, 'বেঙ্গল প্রগ্রেসিভ রাইটার্স গেটিং টুগেদার ফর দ্য পিপল', *অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ট্রাডিশনস অব বেঙ্গল* (কলকাতা : ইন্দো-জিডিআর ফ্রেন্ডশিপ ট্র্যাডিশনস সোসাইটি, ১৯৬৯), ৬৭।

৬৩. প্রমথ চৌধুরী ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ লেখকের প্রশংসা ও তাঁর হত্যার নিন্দা জানিয়ে একটা লেখা লিখেছিলেন; দ্রষ্টব্য, অরুণ বসু ও খোকা রায়, *ইনসাইড বেঙ্গল ১৯৪১-৪৪ : ফরোয়ার্ড ব্লক অ্যান্ড ইটস অ্যালিজ ভার্সাস কমিউনিস্ট পার্টি* (বম্বে : পিপলস পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৫), ৫৬।

৬৪. লীলা রায়, *আ চ্যালেঞ্জিং ডিকেড*, ১৬।

৬৫. *প্রতিরোধ*, শরৎ, ১৯৪২, সরলানন্দ সেনের সৌজন্যে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৬৬. এ-যাবৎ যতজন বাঙালির সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছি, তাঁদের কেউই বাচক্রবী (অন্যত্রে 'বাচক্রবী') শব্দটার অর্থ বুঝতে পারেননি।

৬৭. *মহাপৃথিবী*, ৫০-৫৪; *নিরুক্ত*, আশ্বিন ১৩৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৬৮. সীতাকে তাঁর দাবিদার স্বামী রামের কাছে ফিরিয়ে দিতে রাক্ষসরাজ রাবণকে তাঁর ভাই বিভীষণ উপদেশ দিয়েছিলেন; রাবণ সে উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেন এবং রাম ও তাঁর হনুমান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন। বিষ্ণুর মূর্তরূপ নৃসিংহাবতার দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে দেওয়া আশীর্বাদকে অকেজো করে দিয়ে তার সর্বাঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন।

৬৯. *সাতটি তারার তিমির*, ৩৬-৩৯; *কবিতা*, কার্তিক ১৩৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৭০. *নূতন লেখা*, কার্তিক ১৩৪৯। বরিশালের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। পত্রিকাটির ছয়টি সংখ্যা জীবনানন্দের কাছে ছিল। এ পত্রিকাটি কলকাতা থেকে বের করতেন নীহাররঞ্জন রাহা। ১৯৪১ থেকে প্রকাশিত হতো ত্রৈমাসিকটি।

৭১. *মহাভারত*-এ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে; দ্রষ্টব্য, জে এ বি ভ্যান বুটেনেন অনূদিত ও সম্পাদিত : *দ্য মহাভারত : বুক ১ : দ্য বুক অব দ্য বিগিনিং* (শিকাগো : ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৭৩), ২১৬।

৭২. হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বে ব্রহ্মাণ্ড কালচক্রের মধ্যকার কালচক্রের ভেতর দিয়ে যায়। মূল চক্র হচ্ছে কল্প অথবা ৪৩২ কোটি বছর। প্রত্যেক কল্পে আছে ১৪ *মন্বন্তর*, প্রত্যেক মন্বন্তরে আছে ৭১ মহাযুগ, প্রত্যেক মহাযুগে থাকে চার যুগ : কৃতযুগ (সংস্কৃত শাস্ত্রে যেমন বলে, বাংলায় এ যুগের নাম 'সত্যযুগ'), ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ ও কলি যুগ। চতুর্থ যুগ, অর্থাৎ কলি ঘনিয়ে এলে ঘটে শ্রেণীসংশয়, সকল মূল্যবোধের অবক্ষয়, ধর্মাচারের ব্যত্যয়, প্রতিষ্ঠিত হয় নিষ্ঠুর ও বহিরাগত শাসকের শাসন। তার পরই বন্যা ও আগুনে ধ্বংস হয়ে যায় পৃথিবী। এ এল বাসম, *দ্য ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া* (নিউইয়র্ক : গ্রোভ প্রেস, এভারগ্রিন, ১৯৫৯), ৩২০-২১।

৭৩. ১২টি কবিতা ছিল 'বনলতা সেন', 'কুড়ি বছর পরে', 'হাওয়ার রাত', 'আমি যদি হতাম', 'ঘাস', 'হায় চিল', 'বুনো হাঁস', 'শঙ্খমালা', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'শিকার', 'হরিণেরা' ও 'বিড়াল'।

৭৪. *চতুরঙ্গ*, চৈত্র ১৯৫০, ২১৯-২২২।

৭৫. জীবনানন্দের বিপরীতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক কবিতা প্রায়ই ছিলেন উপদেশমূলক, পাঠকদের এক ধরনের তৎপরতার জন্য আহ্বান জানানো। তাঁর 'সকলের গান' দিয়ে তিনি তাঁর কমরেডদের নতুন যুগের সূচনা করতে, সিদ্ধান্তহীন ত্রিশঙ্কুকে বিশ্বাসীদের মধ্যে টেনে আনতে উদ্বুদ্ধ করেন। (*সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা, ভারবি, ১৯৭০), ১৪। প্রাচীনকালের মহারানি ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের সহায়তায় স্বর্গে ঢোকার সুযোগ লাভ করেছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হন। বিশ্বামিত্র মর্ত্যে তাঁর পতন ঠেকান, কিন্তু ত্রিশঙ্কু হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়ে স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝখানে ঝুলে থাকেন। অন্য অর্থে ত্রিশঙ্কু বলতে বোঝায় অনিশ্চিত অবস্থায় পড়েছে এমন ব্যক্তি।

৭৬. ঘুঘু যখন ব্যক্তি সম্পর্কে বোঝায়, তখন তার অর্থ দাঁড়ায় ধূর্ত, কৌশলী বা ক্ষতিকারক ব্যক্তি। ভিটেয় ঘুঘু চরানো বলতে বোঝায় কাউকে ধ্বংস বা গৃহহীন করা।

৭৭. শিবের পূজার জন্য চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয় বাংলা বছরের শেষে। 'গাজন' উৎসবের একটা অংশ চড়ক পূজা। 'ভাদু' একজন দেবী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৭৮. ব্যসদেব যখন *মহাভারত* রচনা করে লিখিয়ে নিচ্ছিলেন, সে লেখার কাজটি করে শিবের পুত্র হাতীর মস্তকধারী গণেশ, তার দাঁত কেটে নিয়ে তৈরি হয়েছিল কলম।

৭৯. বাংলায় পাঠান যুগের সমাপ্তি ও মোগল রাজত্বের উত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে (১৫৭৫) পূর্বাঞ্চলের স্থানীয় জমিদারেরা প্রায় স্বায়ত্তশাসিত ছোট ছোট রাজার ক্ষমতা ধারণ করেন। এ রকম রাজার সংখ্যা ১২টির বেশি হলেও ইতিহাসে বার ভূঁইয়া নামে স্বাধীন বাঙালি শাসক ছিলেন।

৮০. সূর্যের চেয়ে বালি গরম—এই বাগ্‌ধারা দিয়ে বোঝায় কাছের ছোট সমস্যাগুলো দূরের অনেক বড় সমস্যার চেয়েও বেশি ভোগায়। সূর্য খালি পায়ের নিচের তপ্ত বালির চেয়ে অনেক বেশি গরম হলেও বালিই কষ্টটা বেশি দেয়।

৮১. *দেশ*, ১৭ বৈশাখ ১৩৫০।

৮২. *নিরুক্ত*, আষাঢ়, ১৩৫০, ১৫৩-৬৫।

৮৩. লেখাটি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসুর ওপর প্রবন্ধসহ *তিন জন আধুনিক কবি* (কলকাতা : পূর্ব্বাশা) নামে ১৩৫১ (১৯৪৪-৪৫) সালে মনোগ্রাফ হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে *আধুনিক কবিতার ভূমিকা* শীর্ষক বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৮৪. বিষ্ণু দের সৌজন্যে।

৮৫. *কেন লিখি*তে প্রকাশিত, জানুয়ারি ১৯৪৪। জীবনানন্দের প্রবন্ধটি *অনুক্ত*, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়; গোপালচন্দ্র রায়, *জীবনানন্দ*, ৫৩-৫৬।

৮৬. *অনুক্ত*, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৩।

৮৭. 'অন পোয়েট্রি', *অ্যান অ্যান্থলজি অব বাংলা রাইটিং*, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, ৯৯-১০০।

৮৮. প্রাগুক্ত।

৮৯. 'লেখা, লেখকের দায়িত্ব', *অনুক্ত*, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৩।

৯০. প্রাগুক্ত।

৯১. এর মূল বাংলা ভাষ্য ছাপা হয়েছিল *দৈনিক কবিতা*, শরৎ ১৩৭৬ সংখ্যায়। অনুবাদটি করেছিলেন দীপেন্দু চক্রবর্তী, ছাপা হয়েছিল *পোয়েট্রি বেঙ্গল : বিষ্ণু দে স্পেশাল নাম্বার*-এ, সমীর দাশগুপ্ত, শান্তি লাহিড়ী, স্টেফান এন হে ও পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা : এপ্রিল ১৯৭০), ৭৪-৭৬।

৯২. 'মাত্রাচেতনা', *কবিতার কথা*, ২৭; *প্রভাতী*, পৌষ ১৩৫১ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

৯৩. সত্যপ্রসন্ন দত্তর সৌজন্যে। দুর্গাপূজার সময় উপহারসামগ্রী কেনা হয় এবং বহু পরিবারের মধ্যে সেসব বিনিময় হয়। ফলে এই সময়ে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) বই বিক্রি বেড়ে যায়।

৯৪. *মহাপৃথিবী*, ৪০; *কবিতা*, পৌষ ১৩৪৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৯৫. এ কবিতাটি সম্পর্কে আলোচনা এবং জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে মূল্যবান মতামতের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর কাজী আবদুল মান্নানের কাছে আমি ঋণী।

৯৬. *কবিতা*, চৈত্র ১৩৫১, ৬২।

৯৭. *মহাপৃথিবী*, ২১; *কবিতা*, আষাঢ় ১৩৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৯৮. হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জীবনানন্দ দাশের মহাপৃথিবী', সারস্বত, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫, ১১।

৯৯. প্রাগুক্ত, ১১, ১৬।

১০০. *মহাপৃথিবী*, ৩৮-৩৯; *চতুরঙ্গ*, আশ্বিন ১৩৪৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

১০১. *ময়ূখ*, পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-৬২ সংখ্যায়, ২২৯-৩০, প্রকাশিত ২ জুলাই, ১৯৪৬ তারিখের চিঠি।

১০২. অশোকানন্দ দাশ ১৯৪২-৪৬ সালে কলকাতা অথবা কাছেধারে কোথাও (দমদম, ব্যারাকপুর ও আলীপুর) বদলি হয়েছিলেন, অশোকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। মা-বাবার মৃত্যুর পর জীবনানন্দ তাঁদের দুজনের ওপরই ছোট দুটো লেখা লিখেছিলেন, যা তিনি তাঁদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে পাঠ করেছিলেন। জীবনানন্দের নিজের মৃত্যুর পর সেই লেখা ছাপা হয়েছিল *উত্তরসূরি*, পৌষ-ফাল্গুন ১৩৬১ সংখ্যায়, ৪-১৩, 'আমার মা বাবা' শিরোনামে। অশোকানন্দ দাশ সেই দুটো লেখা থেকে উদ্ধৃত করেন 'আমার দাদা জীবনানন্দ দাশ' শীর্ষক লেখায়, *গার্লস কলেজ ম্যাগাজিন*, হাওড়া, ১৯৫৫, ৩-১৪। সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর পূর্বোল্লিখিত 'কুসুমকুমারী দাশ—সেই ছেলের মা' নিবন্ধে জীবনানন্দের মায়ের জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে ১৯৪০ সালে লেখা কুসুমকুমারী দাশের ডায়েরিও, *দেশ*, ১১ আষাঢ় ১৩৮৯, ১৩-১৪।

১০৩. *ময়ূখ*-এর পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১-৬২ সংখ্যায়, ২৩৩, প্রকাশিত ৩১ অক্টোবর ১৯৪২ তারিখের চিঠি, যা পরে গোপালচন্দ্র রায়, *জীবনানন্দ*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: সাহিত্য সদন, ১৯৭১) পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। নলিনী দাশের কলকাতা বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল হওয়ার কথা ছিল।

১০৪. প্রাগুক্ত, ২২৭।

১০৫. বুদ্ধদেব বসু তাঁকে এই বিশেষণটি দিয়েছিলেন।

১০৬. হেরম্ব চক্রবর্তী, 'জীবনানন্দকে যেমন দেখেছি', ১৭-১৯।

১০৭. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'অন্তরঙ্গ জীবনানন্দ', *ময়ূখ*, পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১-৬২, ১১৮।

১০৮. ১৯৭০ সালে বরিশালে আমার সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে উদার সহায়তার জন্য শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রতি ধন্যবাদ জানাই।

১০৯. অশোকানন্দ দাশের সাক্ষাৎকার।

১১০. *স্বরাজ*-এ কর্মরত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার। পত্রিকাটি পরের বছরের আগে প্রকাশিত হয়নি।

১১১. *ময়ূখ*, পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১ সংখ্যায়, ২২৬, প্রকাশিত ২ জুলাই, ১৯৪৬ তারিখের চিঠি।

১১২. উদাহরণস্বরূপ তাঁর একটা নোটবইয়ের দ্বিতীয় অংশে লেখা আছে 'সংস; কলকাতা, আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬', এতে ছিল ১৪টি গান।

১১৩. হেরম্ব চক্রবর্তী সে বছরের অক্টোবরে চলে যান। নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ঢাকার মুন্সিগঞ্জ কলেজে যোগ দেওয়ার জন্য ১৯৪৯ সালে বিএম কলেজ থেকে চলে আসেন, সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে যান ১৯৫০ সালে। রমেশচন্দ্র সেনও ১৯৫০ সালে দেশত্যাগ করেন, সে বছর ব্যাপক হিন্দু-মুসলিম সহিংসতা ঘটে।

১১৪. লাবণ্য দাশের সাক্ষাৎকার।

১১৫. ভাইয়ের মতে, জীবনানন্দ অন্তত পক্ষে দাপ্তরিকভাবে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বিএম কলেজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক টিকিয়ে রেখেছিলেন, যদিও তিনি আর কখনোই সেখানে শিক্ষকতা করেননি।

১১৬. একজন বা দুজনের পিঠে বড়শি গেঁথে ঝুলিয়ে পাক দেওয়ানো হয়, সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে জমিতে পড়াকে জমির উর্বরা শক্তি বাড়ানোর উপায় বলে গণ্য করা হয়।

১১৭. *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতায়* অন্তর্ভুক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসের আরেকটি প্রয়াস

> 'কলকাতায় পথ কেটে নিতে পারলে, বেশ তাই হোক; এখানে যে আসতেই হবে এমন কিছু নয়। এখানে যে-ভাবের ঘোরে বাইশ-চব্বিশ বছর কেটে গেছে তাঁর, সেটা টেঁসে গেল যেন। নতুন করে এখানে মন বসানো কঠিন। ও-সব মানুষের টনক সহজে নড়ে না, কিন্তু এক বার টলে উঠলে মনের মতন কোনো নতুন আশ্রয় না পেলে মৃত্যুকেও ভাল মনে হয় জীবনের চেয়ে। বেশি বিদারক বিশৃঙ্খল অশান্তিকেও ভাল মনে হয়, জলপাইহাটির বোকা নিরেস শান্তির চেয়ে।'
>
> —জীবনানন্দ দাশ, *জলপাইহাটি*

১

জানুয়ারি ২৬, ১৯৪৭ তারিখে দৈনিক *স্বরাজ* যাত্রা শুরু করে কলকাতায়।[১] নিয়ম হিসেবে বাংলা সংবাদপত্রের রোববারের সংখ্যায় একটা সাহিত্যপাতা থাকে। এই বিভাগটির সম্পাদক হিসেবে জীবনানন্দকে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য।[২] ১৯৪৭-এর জানুয়ারির শেষ দিকে *স্বরাজ*-এ যোগ দেওয়ার জন্য জীবনানন্দ কলকাতায় আসেন।[৩] লাহোরে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভায় (ডিসেম্বর-জানুয়ারি, ১৯২৯-৩০) স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। নেহরু তখন সে মাসের ২৬ তারিখকে পূর্ণ স্বরাজ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। এখনো পর্যন্ত ২৬ জানুয়ারি ভারতের স্বরাজ কিংবা স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।[৪]

স্বরাজ-এর সঙ্গে সম্পৃক্তির কারণে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে জীবনানন্দ রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন। মূলত রাজনীতি থেকে দূরেই ছিলেন তিনি। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে জীবনানন্দের মানসিক গড়ন একজন সংবাদকর্মীর মতো ছিল না। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী স্মরণ করেন, কীভাবে বিকেলের দিকে জীবনানন্দ অস্থির হয়ে উঠতেন। তাঁর টেবিলের সামনে পায়চারি করতে করতে বলতেন, তাঁরা দুজন মিলে *স্বরাজ*-এর অফিস থেকে কয়েক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মিনিটের রাস্তা ক্রিক রোতে *পূর্ব্বাশার* অফিসে সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেন।[৫] নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মন্তব্য করেন, জীবনানন্দ সে পরিবেশে বেমানান ছিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে জীবনানন্দ *স্বরাজ* ছেড়ে দেন।

ছেড়ে না দিলে *স্বরাজ*-এর পূজা সংখ্যার সম্পাদনা করতেন জীবনানন্দই। পত্রিকা ছাড়ার আগে সংখ্যাটি নিয়ে কাজ করছিলেন তিনি। সে সংখ্যায় ছাপা হওয়া লেখাগুলো দেখলে বোঝা যায়, জীবনানন্দ নিজে সেসব লেখা চেয়ে নিয়েছিলেন। প্রথম লেখাটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস, সন্দেহাতীতভাবে জীবনানন্দের ব্যক্তিগত অনুরোধে পাওয়া।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণ করেন, পূজা সংখ্যার জন্য একটা লেখা চেয়ে *স্বরাজ*ই তাঁর কাছে এসেছিল। তিনি একটা গল্প লিখে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু লেখাটা ফেরত আসে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হতবাক হয়ে যান। তিনি বলেন, একটা সময় আসে, যখন একজন লেখকের লেখা আর প্রত্যাখ্যাত হয় না। তিনি ভেবেছিলেন, বেশ আগেই তেমন একটা উচ্চতায় পৌঁছে গেছেন তিনি। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে শুধু 'নারায়ণ' সম্বোধন করে পাঠানো চিরকুটটা যখন তিনি পড়েন, তাঁর বিশ্বাস হতে চায় না যে, তাঁকে *স্বরাজ* অফিসে যেতে বলা হয়েছে। যা-ই হোক, পরামর্শ মান্য করে তিনি যান এবং টেবিলের পেছনে বসা জীবনানন্দকে দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে পড়েন। তাঁরা পরস্পরকে চিনতেন বরিশাল থেকে। সেখানে তরুণ নারায়ণ বিএম কলেজে জীবনানন্দের ছাত্র ছিলেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর জীবনানন্দ জানতে চান, গল্পটা ফেরত পাওয়ার পর তাঁর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল। প্রাক্তন ছাত্রটি ভদ্রভাবে জানান, তিনি তাঁর শিক্ষকের মতামত মেনে নিয়ে লেখাটি প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। জীবনানন্দ 'না, না' বলে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, তিনি লেখাটি অপছন্দ করেননি, তবে পূজা সংখ্যার জন্য কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর একটা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস দরকার। প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে একমাত্র নারায়ণকে জীবনানন্দ এত অল্প সময় বেঁধে দিতে পেরেছিলেন। তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দ্রুত লিখে ফেলেন *বৈতালিক*, যেটি ১৯৪৭ সালে *স্বরাজ*-এর পূজা সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।[৬]

পূজা সংখ্যা ছাড়াও রোববারের সাময়িকীও জীবনানন্দের দায়িত্বের মধ্যে পড়ত। তার একটা নিয়মিত ফিচার কলাম ছিল 'মন-মর্মর' শিরোনামে। জীবনানন্দ তাঁর সতীর্থ ও পরিচিতদের কাছ থেকে সেই কলামের জন্য লেখা চান। লেখা প্রাণবন্ত হলে যেকোনো বিষয়ই চলত। যেমন, নীরেন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক আর ছোটগল্পকারদের আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটা লেখা দিয়েছিলেন।[৭] মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে নীরেন্দ্রনাথের অনুরোধে *আনন্দবাজার পত্রিকার* ১৯54 সালের পূজা সংখ্যার জন্য জীবনানন্দ 'মন-মর্মর' নামে একটা কবিতা দিয়েছিলেন।[৮]

সংবাদপত্রের কাজের সঙ্গে জীবনানন্দ খাপ খাওয়াতে পারেননি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণ করেন, এ রকম একটা কাজের জন্য তিনি কেন শিক্ষকতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছেড়েছিলেন জানতে চাইলে জীবনানন্দ বেতনের কথা উল্লেখ করেন। প্রাক্তন অধ্যাপকের কল্যাণ নিয়ে শঙ্কিত নারায়ণ তাঁকে সাবধান করে বলেছিলেন, প্রকাশনার সাময়িক অস্থিতিশীলতার কারণে যেকোনো সময় তাঁর চাকরি না-ও থাকতে পারে। আর্থিক সংকটে পড়ার আগ পর্যন্ত *স্বরাজ* আরও কয়েক বছর টিকে ছিল। তবে তার অনেক আগে জীবনানন্দ সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন, সম্ভবত ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরের আগ পর্যন্ত ৫০ বছর বয়সে জীবনানন্দের কোনো বেতনভিত্তিক চাকরি ছিল না। এবার যেটা পেলেন, সেটাও কলেজের অধ্যাপক হিসেবে।

এর মধ্যে কলকাতায় চলে আসা তাঁর পরিবার কোনো রকমে টিকে ছিল। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে আরেকবার যখন তিনি বেকার হয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনি ও তাঁর স্ত্রী-কন্যা বরিশালের পৈতৃক বাড়িতে একান্নবর্তী পরিবারে থেকে যেভাবে চলেছেন, কলকাতা সে রকম ছিল না। কলকাতার নিজস্ব আকর্ষণ ছিল, কিন্তু শহরটির প্রতি জীবনানন্দের মনোভাব সব সময় সংযত, এমনকি কখনো বিপরীত দুই প্রান্তে দোদুল্যমান মনে হতো। সম্ভবত তিনি কলকাতা যাওয়ার অনেক আগে ১৯৪৬ সালে লেখা বলে অনুমিত তাঁর একটা ছোটগল্প শুরু হয় এভাবে:

> রোজই যে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে কাটে, তা নয়,—সুখ নেই, শান্তি নেই, স্বাচ্ছন্দ্যও নেই। তবুও কলকাতা ছেড়ে কোথায় আর চ'লে যেতে পারে শান্তিশেখর। যেতে যে ইচ্ছা নেই, তা-ও নয়; কিন্তু ইচ্ছা কার কবে কতদূর পূর্ণ হয়েছে এই পৃথিবীতে?
>
> কলকাতায় থাকতেও তার অনিচ্ছা যে খুব বেশি তা নয়, কিন্তু যে-রকম ঘর-দোর পারিপার্শ্বিক টাকাকড়ির স্বাধীন সচ্ছলতা সে চেয়েছিল, কোথায় সে-সব? এ-সব অনেকেই চায়; কিন্তু ক'জন পায়? অবিশ্যি মনই স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে—শরীর উপস্থাপয়িতা নয় কি শুধু! শরীর ব্যথা পায়, গ্লানি বোধ করে, লাঞ্ছিত হয়, মনে হয় যেন মন লাঞ্ছিত হ'চ্ছে, কিন্তু তবুও মনে কোনো রকম কালিমাপাতই হয় না যেন—এমন লোকও থাকে। এ-রকম লোক শান্তিশেখর দেখেছে বটে। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে সে নিজেও যদি ঠিক সেই রকম হ'ত তা হ'লে ভালোই হ'ত। কিন্তু এখনও হ'য়ে উঠতে পারেনি।[৯]

১৯৪৭ সালের প্রথমার্ধে জীবনানন্দ তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ দক্ষিণ কলকাতার ১৮৩, ল্যান্সডাউন রোডে অশোকানন্দের বাসায় থাকতেন। সে বছরের শেষ দিকে অশোকানন্দ দিল্লিতে বদলি হয়ে গেলেও প্রায় সাত বছর পর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জীবনানন্দ দাশের পরিবার ভালো-মন্দ যেভাবেই হোক সেই ঠিকানাতেই রয়ে যায়।

স্বাধীন ভারতের কাছে ব্রিটিশদের ক্ষমতা হস্তান্তরের ঠিক দুই সপ্তাহ আগে জীবনানন্দ ভারতের মধ্যপ্রদেশের একটা বড় শহর জব্বলপুরে মাসি ও মেসোমশায়ের সঙ্গে ছুটি কাটানো তাঁর ১৬ বছরের মেয়ে মঞ্জুর কাছে একটা পিতৃসুলভ চিঠি লেখেন:

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

183, Lansdowne Road
First Floor
P. O. Kalighat
Calcutta 26
30. 7. 47

মঞ্জু

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। ইতি পূর্বে তোমার জ্বরের খবর পেয়ে চিন্তিত হয়েছিলাম। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছিল হয়তো। এখন খুব সাবধানে থাকবে। বিদেশে অসুখ করলে আমাদের খুব উদ্বেগ।

তোমার চিঠিতে জব্বলপুরের যে সব বর্ণনা দিয়েছ তা' পড়ে খুব আনন্দিত হলাম। ওখানে তো অনেক সুন্দর জিনিষ আছে। যা কিছু দেখার সবই দেখে ফেলেছ হয়তো। জব্বলপুরে আজকাল কি খুব বৃষ্টি? বাড়ীর থেকে বেরোনো হয়তো দুষ্কর। সময় কাটাও কি ক'রে? ওখানে পড়বার বই টই আছে কি অনেক? ছুটু মাসি ও মেসোমশায়ের ও সৃজয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেশ সময় কাটে হয়তো। এখানে আজকাল খুব বৃষ্টি। কয়েকদিন আগে পিসিমণি [সুচরিতা দাশ] ও ননী পিসি এসেছিলো। পিসিমণিরা আবার ঈদের ছুটিতে এখানে আসবে। কাকামণিরা [অশোকানন্দ দাশ] 3rd August এ বাড়ী ছেড়ে শ্বশুর বাড়ীতে চলে যাবে। আমরা August মাসটা এই বাড়ীতেই থাকব। সম্প্রতি অন্য কোথাও বাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি August মাসের শেষের দিকে তো কলকাতায় ফিরতে পার। ছুটু মাসি কি তখন কলকাতায় আসবে? তোমার যদি জব্বলপুরে আর বেশি দিন থাকতে না ইচ্ছা করে তা হ'লে কোনো সঙ্গতি পেলে লিখো। আমি কলকাতায় ফেরার টাকা পাঠিয়ে দেব।

Matric এর result বেরোতে এখনও ঢের দেরী; I.A.র result তো এখনও বেরোল না। আশা করি তোমরা সব ভাল আছ। এখানে সকলে আজ একরকম।

আজ আর না। স্নেহ জানবে তুমি ও সৃজয়, আর সকলকে আমার শুভ কামনা জানাচ্ছি।

বাবা।[১০]

দিল্লিতে বদলি হওয়ার আগে জীবনানন্দের ভাই পরিকল্পনা করেছিলেন কয়েক মিনিটের হাঁটা দূরত্ব ১৭২/৩, রাসবিহারী এভিনিউতে তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়িতে চলে যাবেন। জীবনানন্দের সামর্থ্যের মধ্যে পড়ে, এমন বাড়ির অভাবের কারণে অশোকানন্দ সেখানে থেকে যান। স্বাধীনতার সঙ্গে বাংলার বিভক্তি ঘটে, তার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরাসরি কলকাতায় চলে আসা বাঙালি হিন্দু শরণার্থীদের আগমনের ফলে আবাসন-সমস্যার আরও অবনতি ঘটে। বাড়িওয়ালার সঙ্গে কিছু ঝামেলা এবং তার ওপর একটা মামলার পর জীবনানন্দ ও তাঁর পরিবার শেষ পর্যন্ত দোতলা থেকে ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোডের একতলায় সরে আসে। অশোকানন্দের মতে, বাড়িওয়ালা বাড়িটির একতলা ভাড়া দিতে সম্মত হওয়ায় মামলাটার আপস নিষ্পত্তি হয়েছিল। তবে ব্যাপারটা সেখানেই চুকে গিয়েছিল বলে মনে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের কবিতার খাতার শেষ পাতায় তাঁর নিজ হাতে পেনসিলে লেখা একটা নোট পাওয়া যায় এ রকম :

৭.৭

> ১৯৪৭ সালে মি : জে দাশ যে একতলায় থাকতেন সেটির ভাড়া নির্ধারণ করার মামলায় আমি ছিলাম বাদী আর মি : জে দাশ ছিলেন বিবাদী। আর, সি (রেন্ট কন্ট্রোল) ভাড়া নির্ধারণ করে দেয় ১১০ রুপী। কেস নম্বরটা আমার মনে নেই।[১১]

কলকাতায় আসার পর থেকে বাড়িভাড়া ও চাকরির দুশ্চিন্তা জীবনানন্দকে আমৃত্যু বিপর্যস্ত করে রেখেছিল। ১৯৪৭ সালের শেষদিক থেকে তাঁর কোনো চাকরি ছিল না, পরিবার চালানোর তেমন কোনো উপায়ও ছিল না। কবিতা থেকে যথেষ্ট আয় হতো না নিশ্চয়ই। অশোকানন্দ সাহায্য করতেন, তবে তিনি তাঁর ভাইয়ের ডায়েরি (এখনো অপ্রকাশিত) থেকে জানতে পারেন, তিনি আর্থিক সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করতেন। লাবণ্য দাশ বরিশালে শিক্ষকতা করতেন, কলকাতায়ও তাই করেন; প্রথমে ১৯৪৮-৪৯ সালে কমলা গার্লস স্কুলে, তারপর ১৯৫০-৫১ সালে ডেভিড হেয়ার ইনস্টিটিউশনে পড়ার পর ১৯৫২ সালে কয়েক মাসের জন্য দেশপ্রাণ স্কুলে পড়ান তিনি। ১৯৫২ সালের নভেম্বরে তিনি বিটি ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর যোগ দেন শিশু বিদ্যাপীঠ স্কুলে।[১২]

শিশু বিদ্যাপীঠের (এখন এটির নাম হয়েছে শ্রীমতী জহর নন্দী স্কুল) অবস্থান কলকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে। বিএম কলেজে জীবনানন্দের সহকর্মী রমেশচন্দ্র সেন কলকাতায় চলে আসার পর সে এলাকাতেই থাকতেন। তিনি দৈবাৎ শিশু বিদ্যাপীঠের গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন। রমেশ সেন মনে করতে পারেন, লাবণ্য দাশের একটা চাকরির ব্যাপারে জীবনানন্দ দাশ তাঁর কাছে চিঠি লিখেছিলেন। রমেশ সেন সুপারিশমতো কিছু একটা লিখে দিয়েছিলেন। লাবণ্য দাশের চাকরি হলে জীবনানন্দ তাঁর সাবেক সহকর্মী ও একসময়কার সমালোচকের কাছে একটা ধন্যবাদমূলক চিঠি লেখেন।[১৩] পরে যা সব হয়, তাতে ১৯৪৭ সালের তাৎক্ষণিক সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি।

বাড়িভাড়ার বোঝা লাঘব করতে তিনি তাঁর বাসার একাংশ তিনবার তিনজনের কাছে সাবলেট দিয়েছিলেন। এমন ভাড়াটেদের প্রথমজন ছিলেন মেজর এইচ কে মজুমদার, ননী পিসির বোনের স্বামী। ১৯৪৭-এর আগস্ট থেকে শুরু করে সেই ল্যান্সডাউন রোডের বাসায় ছয়-সাত মাস ছিলেন মেজর মজুমদার। এই সময়ে জীবনানন্দ বিমার পলিসি বিক্রি করার চেষ্টাও করেছিলেন, অন্যান্যের মধ্যে তাঁর ভাড়াটেকে একটা পলিসি কেনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন তিনি।[১৪] প্রাইভেট টিউশনির ছাত্র পড়িয়েও তিনি কিছু টাকা পেতেন। তবুও একটা নিয়মিত চাকরি ছাড়া আয় বুঝে ব্যয় করা কঠিন ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২

বেকার থাকা অবস্থায়, বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের শেষ ভাগে এবং ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে জীবনানন্দ উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে কবিতা লিখে কেউ জীবনধারণ করতে পারে না, কিন্তু সফল ঔপন্যাসিকেরা একটা সম্মানজনক আয় করতে পারেন। আবারও একবার গদ্যে ফেরার ব্যাপারে তাঁর প্রণোদনা আর্থিক হতে পারে (তিনি ১৯৩০-এর দশকের শুরুতে অনেক গল্প ও একটা উপন্যাস লিখেছিলেন, তবে ছাপাননি), কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ কলকাতায় আসা ও সেখানে অর্থকষ্টে পড়ার বহু আগের। ১৯৪৬ সালে তিনি বলেন, 'ছেলেবেলা থেকেই গল্প উপন্যাস—স্বদেশী ও বিদেশী—নেহাৎ কম পড়ি নি। ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোঁচে নি।'[১৫] এ-যাবৎ তাঁর তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে—*মাল্যবান* (১৯৭৩), *সুতীর্থ* (১৯৭৭) ও *জলপাইহাটি* (১৯৮৫)। কাহিনিগুলোকে সে সময়ের প্রেক্ষাপটে বসিয়ে আমরা যত দূর জানতে পারি[১৬] তিনটিই জীবনানন্দ লিখেছিলেন ১৯৪৭-৪৮ সালের দিকে।

তাঁর মৃত্যু ও *মাল্যবান* প্রকাশের সময়ের মধ্যে প্রায় দুই যুগ কেটে গেছে। জীবনানন্দের ভাই—যিনি বইটির সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে কাজ করেছেন—মনে করেন, *মাল্যবান* সূক্ষ্ম ছদ্মবেশে আত্মজীবনীমূলক লেখা।[১৭] ১৯৮১-৮২ সালে *জলপাইহাটির* ধারাবাহিক প্রকাশনার ভূমিকায় অশোকানন্দ লেখাগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে আরও কিছু ব্যাখ্যা দেন :

> জীবনানন্দের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে।...আমার বৌদি কোনো কারণে উপন্যাস প্রকাশ করবার অনুমতি দেন নি। অনেক বৎসর পর যখন তাঁর অনুমতি পাওয়া গেল, তখন প্রথম প্রকাশিত হল 'মাল্যবান'। তারপর 'সুতীর্থ' দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এখন তৃতীয় উপন্যাস 'জলপাইহাটি' প্রকাশিত হচ্ছে 'শিলাদিত্য' পত্রিকায়।[১৮]

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, লাবণ্যর জীবদ্দশায় যে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়, সেটি *মাল্যবান*। এটির মূল বিষয় হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের অসংগতি, যা তিনটি উপন্যাসের মধ্যে লেখকের স্ত্রীর কাছে সবচেয়ে বিব্রতকর মনে হওয়া উচিত ছিল।

নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারে না, কেন জীবনানন্দ তাঁর একটি গল্পও ছাপতে দেননি। বহুভাবে *রূপসী বাংলা* থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সেই সনেটগুলোর মতো তাঁর গদ্য তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করে থাকতে পারে, এসব লেখার চূড়ান্তভাবে ব্যক্তিগত বিষয়গুলো চমকপ্রদ স্থান ও কালের পরাবাস্তব চিত্রকল্প বা রূপকের মতো কাব্যিক অলংকরণেও মেটানো যায়নি। প্রথম দিককার সেই সনেট ও গল্পগুলো আর পরে উপন্যাস—সবগুলোতেই তিনি হয়তো তাঁর অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন কাগজের বুকে, কিন্তু পাঠক সাধারণের খুঁটিয়ে পড়ার জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই জীবনানন্দ আরও বেশি টাকা উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। যত দূর সম্ভব পাওয়া তথ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, তিনি তা করতে চেয়েছিলেন গল্প-উপন্যাস লিখে ও ছাপিয়ে। ১৯৫০-এর মাঝামাঝি তিনি সঞ্জয়কে টাকার জন্য লেখেন :

> বেশি ঠেকে পড়েছি, সে জন্যে বিরক্ত করতে হ'ল আপনাকে। এখুনি চার পাঁচ শো টাকার দরকার; দয়া ক'রে ব্যবস্থা করুন।
>
> এই সঙ্গে পাঁচটি কবিতা পাঠাচ্ছি। পরে প্রবন্ধ ইত্যাদি (এখন কিছু লেখা নেই) পাঠাব। আমার একটা উপন্যাস (আমার নিজের নামে নয়—ছদ্ম নামে) পূর্বাশায় ছাপাতে পারেন; দরকার বোধ করলে পাঠিয়ে দিতে পারি। আমার 'জীবনস্মৃতি' আশ্বিন কিংবা কার্ত্তিক থেকে 'পূর্ব্বাশা'য় মাসে মাসে লিখব।[১৯]

তিনি যে *মাল্যবান*-এর মতো একখানা উপন্যাস লিখেছেন, সেটা লোকের কাছে প্রকাশ না করার যে চূড়ান্ত সংযম—'আমার নিজের নামে নয়—ছদ্ম নামে' বাড়তি কথাটুকু সেটাই প্রমাণ করে সহজে।

তবে জীবনানন্দ তাঁর উপন্যাস প্রকাশের চিন্তা কখনোই বাদ দেননি। একপর্যায়ে তিনি *দেশ* পত্রিকায় তাঁর উপন্যাস প্রকাশের সম্ভাবনা বিষয়ে জানার জন্য সম্পাদকের কাছে গিয়েছিলেন। *দেশ* হচ্ছে অল্প কয়েকটা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের একটি, যেটি লেখার জন্য ঠিকভাবে টাকা-পয়সা দিতে পারত। সম্পাদক সাগরময় ঘোষ জীবনানন্দের লেখা ছাপতে রাজি ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনোই কোনো লেখা দেননি।[২০] জীবনানন্দ বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী প্রতিভা বসুর কাছেও গিয়েছিলেন। প্রতিভা বসু নিজেও প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং তাঁর বই ভালোই বিক্রি হতো। তাঁরা গদ্য লেখা ও সাহিত্যের বেচাবিক্রি নিয়ে কথা বলেছিলেন। একজন অভিজ্ঞতাহীন লেখককে প্রতিভা বসু কোনো উপদেশ দিতে পারেন কি না জীবনানন্দ সে বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন বেশি।[২১] বিশের দশকে *প্রগতি* পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন অজিত দত্ত, পরে তিনি তাঁর নিজের পত্রিকার সম্পাদক হন ও প্রকাশনা সংস্থা খোলেন। তিনি স্মরণ করতে পারেন :

> আমার তখন দিগন্ত পাবলিশার্স নামে পুস্তক প্রকাশের একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। জীবনানন্দ কি ভেবে জানি না, আমাকে সেই সময় একদিন বলেছিলেন—আমার দু একটা উপন্যাস লেখা আছে একদিন একটু দেখবেন ত।—এর কিছু দিন পরেই তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায়, সে উপন্যাস দেখা আর সম্ভব হয় নি।[২২]

টিকে থাকা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চিঠির বাইরে তাঁর গদ্য, বিশেষ করে উপন্যাসগুলো, জীবনানন্দের জীবনের ঘটনাবলির সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল। কিন্তু একটা উপন্যাসকে যখন আত্মজীবনীমূলক বলে মনে হয়, লেখকের জীবন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠক সেটিকে সত্য ঘটনা বলে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। জীবন সম্পর্কে মিথ্যা বলা 'অকপট' আত্মজীবনী লেখকের একটা বিভ্রান্তিকর কৈফিয়ত হতে পারে। আত্মজীবনী ও আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস পেলে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবনীকারকে হতে হয় সংস্কৃত কাব্যের কল্পিত সেই বিখ্যাত রাজহাঁসের মতো, যে জলমিশ্রিত দুধ থেকে মূল্যহীন জলটুকু রেখে দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে কেবল দুধটাই শুষে খেতে পারে। এ রকম রাজহংসসুলভ পাঠক জীবনানন্দের তিনটি উপন্যাসের মধ্যে দুটিতে জীবনীমূলক দুধ খুঁজে পাবেন—সে দুটো হচ্ছে *মাল্যবান* ও *জলপাইহাটি*। আত্মজীবনীমূলক বিষয়ের উৎস হিসেবে এ দুটি উপন্যাস ও এগুলোর মূল চরিত্র—প্রথমটির নামচরিত্রের প্রতিনায়ক ও *জলপাইহাটির* নিশীথ—জীবনানন্দের জীবন সম্পর্কে যাঁরা কিছুটা জানেন, তাঁদের মধ্যে অনুরণন জাগাতে পারে।

মাল্যবান চরিত্রবিচারে বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে একটা মধ্যবিত্ত মধ্যবয়সী দম্পতির মধ্যকার সম্পর্কের বিশ্লেষণ। দাশগুপ্ত পদবির (জীবনানন্দের আদি পদবি) মাল্যবান এবং তাঁর স্ত্রী উৎপলা ও কন্যা মনু (জীবনানন্দের মেয়ে মঞ্জুশ্রীর নামের সঙ্গে ইঙ্গিতবাহী) উত্তর-মধ্য কলকাতার একটা দোতলা বাড়িতে থাকে। উৎপলা ও মনু দিনের আলো ও হাওয়া-সংবলিত দোতলার ঘরের বড় বিছানায় ঘুমায়। ৪২ বছর বয়সের মাল্যবান নির্বাসিত নিচতলার বসার ঘরে, এখানে সে পড়াশোনা করে, লেখে ও ঘুমায়। ২০০ পৃষ্ঠার উপন্যাসে মাল্যবান দোতলার ঘরে উৎপলার সঙ্গে একরাত ছাড়া বাকি সময় এখানেই কাটায়।

তবে উৎপলা সবার সঙ্গে এ রকম শীতল নয়। সে আসলে তাঁর দোতলার ঘরে প্রায়ই সান্ধ্য উৎসবে কাটায়। ওপরতলায় কী ঘটছে, তার খবর রাখলেও তা বাধা দেওয়ার মতো যথেষ্ট সবল মানুষ নয় বলে নিজেকে উপস্থাপিত করে মাল্যবান।

> যারা যাওয়া-আসা করে এ বাড়িতে—কেউ থাকে পনেরো মিনিট, কেউ দু'তিন ঘণ্টা। সটান দোতলায় উৎপলার কাছে চ'লে যায় প্রায় সকলেই তারা; মাল্যবান নিচের ঘরে ব'সে খবরের কাগজ পড়ছে, চুরুট টানছে, দেখে বা না দেখে তারা সবটুকু দেখে নিয়েছে, অনুভব ক'রে কৌতুক বা ক্লান্তি বা কঠিনতা বোধ করে। কিন্তু মাল্যবানের সঙ্গে বিশদ আলাপচারির আবশ্যকতা কেউই বড় একটা বোধ করে না। কেউ-কেউ এ-ও জানে যে, এ-মানুষটিকে এর স্ত্রী একেবারেই গ্রাহ্য করে না।...যারা ওপরে যায়, তাদের পেছনে পেছনে সে ওপরে যায় না কোনো দিন; কাউকেই কিছু বলতে যায় না। যখন দোতলার ঘরে আসর খুব জ'মে উঠেছে, তখনও ওপরে যেতে কেমন দ্বিধা বোধ হয় তার; যখন রাত বেশি, উৎপলার ঘরে লোক কম—দুটি কি একটি—খুব সম্ভব একটি—তখন সে কিছুতেই ওপরে যায় না; মন দিয়ে করেছে, চোখ দিয়ে সকলের জীবনের সব তলানি আবিষ্কার করতে চায় না।[২৩]

যা চলে গেছে তা তো গেছেই মনে করে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মাল্যবান মানুষের আবেগের ওপর বয়সের মাশুল ওঠানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে এই সমস্যার সমাধান করতে মনস্থ করে। আপাতত সে তখন থেকে ২০ বছর পরে তার ও উৎপলার জীবনের কথা কল্পনা করে সামাল দেয়।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তবুও মাঝেমধ্যে বর্তমানের বাস্তবতা অবচেতনে তাকে শারীরিকভাবে অসুস্থ করে ফেলে। একদিন বেশ রাত অবধি উৎপলা ওপর তলায় আতিথেয়তা করছিল আর সে নিচতলায় বসে ঝিমোচ্ছিল, একসময় হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে যায় ওর :

ওপরের ঘর নিথরপাথরের মতো চুপ হয়ে আছে বটে।

মাল্যবান সিঁড়ি ভেঙে ওপরে যাচ্ছিল।

ঠাকুর বললে, 'দিদিমণি আর মা ঘুমিয়েছেন।'

'তাই নাকি? তুমি তো আজ অনেক রাত অব্দি আছ, ঠাকুর। ব্যাপার কী? ওরা খেল না?'

'খেয়েছেন।'

'কখন?'

'দু'টো বাবুর সঙ্গে খেয়ে নিয়েছেন—'

মাল্যবান একটু চুপ থেকে বললে, 'আমার ভাত আছে তো?'

'তা আছে। আপনাকে এখানে এনে দিই?'

'বেশি কিছু দিয়ো না। কেমন গা-বমি-বমি করছে—'

অল্প কয়েক গ্রাস খেয়ে সে উঠল। ঝি এঁটো নিকিয়ে থালা বের ক'রে চ'লে গেল। ঝি, ঠাকুর বাড়ি চ'লে গেল।

মাল্যবানের কেমন উল্‌টে বমি আসছিল। সে দরজা বন্ধ ক'রে কতকগুলো কাগজ পেতে অনেক-ক্ষণ ধ'রে হড়-হড় ক'রে বমি করল, অনেক বমি।

মা'কে মনে পড়ছিল শুধু তার। অবাক হয়ে ভাবছিল : এই ঘরেই আছেন তিনি—এই অন্ধকারের ভেতরেই দাঁড়িয়ে আছেন বোধ করি; হয়তো আমার বিছানার পাশে এসে বসেছেন; গায়ে বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন; দিচ্ছেন হয়তো—

...

আস্তে-আস্তে ক'মে গেল—থেমে গেল বমির চাড় মাল্যবানের।

মাল্যবান একটু ভড়কে গিয়ে তাকিয়ে দেখল, উৎপলা এসে দাঁড়িয়েছে।

'ঠাকুর বাড়ি চ'লে যাবার সময়ে আমাকে বলল, তুমি বমি করছ। বমি হল কেন?'

'কী জানি।'

'কী খেয়েছিলে?'

'কিচ্ছু না, শুধু ভাত।'

'বাজারের খাবার-টাবার?'

'না তো।'

উৎপলা বললে, 'আর বমি হবে ব'লে মনে হচ্ছে?'

'না বোধ হয়।'

'পেটে ব্যথা আছে?'

'না, সে-সব কিছু নেই।'

'আচ্ছা, শোও, শুয়ে পড়। আমি বাতাস করছি।'

মাল্যবান খানিক-ক্ষণ বালিশে মাথা রেখে বাতাস খেয়ে বললে, 'ভালো লাগছে এখন।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণ পর মাল্যবান লক্ষ করে, উৎপলা খুব আগ্রহের সঙ্গে বাতাস করছে না, বরং কাজটির প্রতি ক্রমে অমনোযোগী হয়ে পড়ছে। ওর আন্তরিকতাহীন ক্ষণস্থায়ী উদ্বেগ সরে যাচ্ছিল।

বইয়ের প্রথম দিকে উৎপলার এক আত্মীয় চিঠি লিখে জানায়, সে তার পরিবার নিয়ে বেড়াতে আসছে। মাল্যবান ও উৎপলার পরিকল্পনা ছিল একটা বড় বাসায় চলে যাওয়ার, কিন্তু সে পরিকল্পনা কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি। উৎপলা মাল্যবানকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে, অতিথি যে কদিন থাকবে সে কদিন সে যাতে একটা মেসে গিয়ে ওঠে, এই থাকার স্থায়িত্ব ছিল সাত মাস। মাল্যবানের ক্ষীণ আপত্তিতে কাজ হয় না। সে বাসার কাছে একটা মেসে গিয়ে ওঠে। সেখানকার ব্যবস্থাদিতে অসন্তুষ্ট মাল্যবান একসময় ঘরে ফিরে আসার জন্য উৎপলাকে যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করে, কিন্তু এবারও কোনো ফলোদয় হয় না।

> মাল্যবান অবিশ্যি সেই দিনই অফিশ থেকে ফিরে উৎপলার কাছে গেল। গিয়ে বললে, 'না, মেসে আর না।'
>
> 'কেন?'
>
> 'আমি আজই চ'লে আসছি।'
>
> 'কোথায় থাকবে, শুনি?'
>
> 'যে জায়গায় ছিলাম—নিচের তলা—'
>
> 'সেখানে জায়গা নেই।'
>
> মাল্যবান বললে, 'এ-বাড়ির কোনো ঘাপটিতে প'ড়ে থাকব, সে-জন্যে ভাবতে হবে না—'
>
> 'ক্ষেপেছ?' উৎপলা একটু মেজাজে-মেজাজে বললে, 'আড়ি পাতবার জায়গা নেই বাড়িতে; তুমি বেশ রঙে আছ খুব যা হোক। সঙ্কুলান হবে না, তোমার মেসেই থাকতে হবে; ওদের তো আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না।'
>
> 'কিন্তু, এটা তো আমার বাড়ি।'
>
> 'তা যদি বলো, তা হলে মেজদা'কে নিয়ে আমরা অন্য ফ্ল্যাট ভাড়া করি—'
>
> 'না, না, সে-কথা আমি বলছি না—' একটু বলার বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে অনুভব ক'রে মাল্যবান বললে, 'তুমি চ'লে গেলে এ-বাড়িতে এসে কী হবে আর। সে তো মেসের মতনই হয়।'
>
> একটা কথা বলতে হবে ব'লে মাল্যবান বললে, 'মেসের বিছানায় শুয়ে থেকে এক-এক দিন রাতে বড় ভরসা হারিয়ে ফেলি। আমার মনে হয়, যদি ম'রে যাই, তাহলে তোমার সঙ্গে আর কোনো দিন দেখা—'
>
> উৎপলার মুখের দিকে তাকিয়ে মাল্যবানের জুৎ লাগল না তেমন, যে-কথাটা পেড়েছিল; সেটা শেষ করতে গেল না আর, বললে, 'ঐ যা, আমার লাইফ-ইনসিয়োরেন্‌সের প্রিমিয়ামগুলো দিয়ে দিয়েছ তো। টাকাকড়ি তো তোমার কাছে রেখে গিয়েছিলাম।'[২৫]

উৎপলা কিন্তু প্রিমিয়াম জমা দেয়নি, তার বদলে সে টাকাগুলো নিজের জন্য খরচ করে ফেলেছিল। বিব্রত না হয়ে উৎপলা বলে যে তার ভাই মাল্যবানকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আরেকটা পলিসি করিয়ে নিতে বলেছে—তবে তাদের হাতে অবশ্য কোনো টাকা নেই।

বইটা শেষ হয় একটা দৃশ্যে তাদের অতিথি চলে যাওয়ার বহু পরে। উৎপলার এক পুরুষ-বন্ধু বিদায় নেওয়ার পর মাল্যবান ওপরতলায় যায় স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য। পরিস্থিতি যত এগোতে থাকে, মাল্যবান সান্ধ্য আসরগুলো নিয়ে উৎপলার সঙ্গে যখন একটা ঝগড়ার দিকে যাবে বলে মনে হয়, তখন উৎপলাকে স্বামীর প্রতি কিছুটা নরম মনোভাবাপন্ন দেখা যায়। দুজন তারপর শুয়ে শুয়ে শীতরাত্রিগুলো কত চমৎকার তা নিয়ে কথা বলে—এ রকম রাত কখনো শেষ না হলে কত মজা হয়। মনে হয় তাদের দাম্পত্য জীবনে একটা সত্যিকার পরিবর্তন এসেছে। আমরা যখন জানতে পারি, মাল্যবান খাবার টেবিলে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাদের এতক্ষণের আলাপচারিতা কতটা সত্যি ছিল আর কতটা স্বপ্ন, সেটা অজানা রয়ে যায়। স্পষ্টই বোঝা যায়, কিছুই আসলে বদলায়নি। উৎপলার আত্মীয়রা চলে যাওয়ার পর সে তার ঘরে ফিরে যেতে পারে। মেয়েমানুষের সেসব ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার গুণাবলি—সহানুভূতি আর আশ্রয়, ভালোবাসা আর সাহচর্য মাল্যবানকে কৌশলে এড়িয়ে যেতেই থাকবে।

মাল্যবানের বিপরীতে জীবনানন্দের দ্বিতীয় মরণোত্তর উপন্যাসের সুতীর্থর চরিত্রটা বোঝা শক্ত, আর তার প্রতি দরদ দেখানো আরও কঠিন। জীবনানন্দ এমন একটা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যেটা মাল্যবানের মতো লাজুক নয়, আবার দৃঢ়চেতা কেউও নয়, বরং দুটোর একটা মিশ্রণ, একটা বেমানান অনাকর্ষণীয় চরিত্রায়ণ।

আমরা যখন প্রথম সুতীর্থকে দেখি, একা, কিন্তু একদল বন্ধুভাবাপন্ন মানুষ তাকে সম্ভাষণ জানায়, তাদের মধ্যে আছে কালোবাজারি বিরূপাক্ষও। সুতীর্থ, একসময়ের কবি, তবে আজকাল আর লিখতে পারে না। প্রথম দিকে তাকে দেখা যায় কিছুটা চুপচাপ, একটু খামখেয়ালি হলেও মোটামুটি ভদ্র হিসেবে।

> 'সুতীর্থ, তোমার শ্বশুরবাড়ির খবর কি? শুনেছিলাম তোমার স্ত্রীর খুব কঠিন অসুখ, কী হয়েছিল?'
>
> 'কিছুই হয় নি, বেশ ভালোই আছেন।'
>
> 'ছেলেপুলে সেই দুটিই তো, না আরও হয়েছে?'
>
> 'ওরা তো বলে আর হয়নি।' সুতীর্থ কফি টোস্ট প্যাস্ট্রি বেশ নিজের হাতে ছেনে ছিঁড়ে ঢেলে চিবিয়ে খেতে খেতে বললে।
>
> শুনে বিজন বিরূপাক্ষ অসিত চোখ টেনে একবার তাকিয়ে দেখে নিল সুতীর্থকে। মুখে কেউ কিছু বললে না, কফি খাচ্ছিল, বারবার তৈরি করছিল, ঢালছিল, খাচ্ছিল।

ওর এখনকার হয়রানিটা বাড়ি নিয়ে—সুতীর্থরও একটা মোটামুটি তবে সুবিধাজনক বাসা দরকার—যে বিষয়টা ১৯৪৬ সালে কলকাতায় আসার পর থেকে আমৃত্যু জীবনানন্দকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'কোথায় আছে সুতীর্থ?' বিজন জিজ্ঞেস করল বিরূপাক্ষকে।

'কাছেই লেক রোডে না কি লেক ভিউ রোডে—কোথায় সুতীর্থ?'

'গুলজারটা বাঁচিয়ে ছিলুম তো মন্দ না, কিন্তু এখন তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে।'

'তা তো দেবেই, আজকাল সেলামীর বাজার। দুশো তিনশো টাকায় এদিককার এক একটা ফ্ল্যাট। তুমি কত দিচ্ছ? দু-কুড়ি টাকা। তুমি এক কাজ কর সুতীর্থ—' বলতে বলতে থেমে গেল বিরূপাক্ষ।

'কোথায় আছে পরিবার?'

'পাশগাঁয়ে।'

'কেন আনো নি কলকাতায়? শ্বশুর বড়লোক?'

'এক সময় তালুকদার ছিল বটে, এখন প'ড়ে গেছে।'

তারপর আমরা একটা খামখেয়ালিপনার প্রকাশ দেখি, যা উপন্যাসটিতে আর কখনোই ঘটে না :

'স্ত্রীকে কলকাতায় আনা সম্ভব হবে না। ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসব এক সময়। জান বিরূপাক্ষ আমার স্ত্রী আমাকে কী যে ভালবাসে—' বলে বিরূপাক্ষকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সুতীর্থ।

'লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—'

সুতীর্থের সমস্ত উত্তাল উল্লোল শরীরের কঠিন বাঁধন থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে খুলে নিতে গিয়ে আরো বেশি লটকে প'ড়ে বিরূপাক্ষ, বার বার বলতে লাগল, 'কী আশ্চর্য, তোমার স্ত্রী তো তোমাকে ভালবাসবেই। এর ভেতর মজার কি আছে বলো তো দেখি। তোমার স্ত্রী—অন্য কারু তো নয়। কী মুশকিল ওরকম আছড়ে পিছড়ে গোঁত্তা মারছ কেন হা হা বাঁটের বাছুরের মত হাসছে না কাঁদছে, শোন বলি—দেখ না বিজন অসিত—ছাড়বে না তুমি আমায়, ছাড়বে না, সুতীর্থ! তু—মি—আ—মা—য়—ছা—ড়—ড়—ড়—ছা—ড়—বে—না—আ—আ— আ—' খুব একটা প্রবল ঝটকায় বিরূপাক্ষ ছিটকে পড়ল সমস্ত তেপয় ও কফির পেয়ালা পিরিচ নিয়ে আলমারিটার ওপর;—সুতীর্থ তার মস্ত বড় লম্বা শরীর ও এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলের ফিঙের ঠ্যাং ডানার ঝটপটানি নিয়ে টান হেয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু এক মুহূর্ত। ওদের তিন জনের দিকে তাকিয়ে বিষম শীতে আক্রান্ত মানুষের মত হি হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।[২৬]

নাটুকেপনা বাদ দিলেও কোনো আপাতদৃষ্ট কারণ ছাড়াই নিজের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে তার এসব পরিচিতজন ও বাড়িওয়ালির কাছেও মিথ্যা কথা বলেছিল সুতীর্থ। তার অস্তিত্বহীন পরিবারের সম্পর্কে বলতে গিয়েও সে অসত্য কথা বলা চালিয়ে যায়। উপন্যাসটির তিন-চতুর্থাংশ পর তার বাড়িওয়ালি আবার বিষয়টা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সুতীর্থ স্বীকার করে যে সে কখনোই বিবাহিত ছিল না।

'তুমি বিয়ে করনি?'

'কবে করলুম?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'এতদিন তো বলে আসছ তোমার শ্বশুরবাড়ি পাশগাঁয়ে...'
'পাশগাঁ বলে কোনো জায়গা আছে পৃথিবীতে?'
'নেই?'
'তুমি জান যে তা নেই।'
'নেই? মা, মেয়ে, স্ত্রী নেই?'
'নেই।'[২৭]

সুতীর্থ যে একজন সংশোধনাতীত মিথ্যুক—এই ধারণা দেওয়া ছাড়া তার এই অকারণ মিথ্যাচারের ফলে আর কোনো কিছু ঘটে না এবং ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়ে যায়।

সুতীর্থকে একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন চরিত্র হিসেবে দেখানোর পর চরম দারিদ্র্যের দ্বারপ্রান্তে (উপন্যাসের শেষে ১০ মাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়া) আমরা তাকে দেখি ব্রিটিশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটির অফিসে যেখানে সে উপস্থিত থাকলে বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই কাজ করে, তবে এই উপস্থিতিটা খুব সচরাচর ঘটে না। সেখানে সে তার বেচারা বাঙালি বসের মুখোমুখি হয়ে তাঁকে অপমান করতে উদ্যত হয়। পরে আবারও সুতীর্থ অফিস কামাই করে ফ্যাক্টরির ধর্মঘটি শ্রমিকদের সঙ্গে সত্যাগ্রহ করার জন্য, যাদের সঙ্গে তার কোনো বিষয়ে মিল ছিল না, কেবল ভাবভঙ্গি ছাড়া ছিল না কোনো দায়বোধ, এবং শেষ পর্যন্ত সহজেই সে তাদের পক্ষ ত্যাগ করে। কারখানার ম্যানেজার এক ধর্মঘটি শ্রমিককে খুন করার জন্য ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখালে সুতীর্থ পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে যায়।

শেষে আমরা দেখি, অনুপ্রাণিত সুতীর্থ যেকোনো ভালো কাজ করার অকৃত্রিম ইচ্ছা নিয়ে গ্রামে চলে যাচ্ছে। একই সঙ্গে তার বাড়িওয়ালি ও পাঠকদের বিপদের মধ্যে ফেলে যায় সে। সে বিরূপাক্ষের স্ত্রী জয়তীকে তার সঙ্গে যেতে বলে। সে তখন তার স্বামী ত্যাগ করেছে, কিন্তু কালোবাজারির টাকার ঈর্ষাজনক টাকা-পয়সার ভাগটা ছাড়েনি।

> জয়তী বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'
>
> 'শুধু বেড়াতে যাওয়া নয়, অনেক কঠিন কাজ করতে হবে গ্রামে গিয়ে। শহরে তো অনেক বোকা লোক আছে; তার চেয়ে ঢের বেশি বোকা মানুষ গ্রামে থাকে। কিন্তু বোকা বলে বজ্জাতির কসুর নেই। তাদের ওপরয়ালো আছে, আরো খারাপ। আরো ওপরে—সমস্ত দেশ জুড়েই কেমন একটা নিরেস অর্থহীন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে রয়েছে।'[২৮]

প্রথম দিকে সুতীর্থর সঙ্গে যাবে বলে রাজি হলেও জয়তী শেষ পর্যন্ত তাকে একা চলে যেতে দিয়ে থেকে যায়, সম্ভবত দুনিয়াটাকে ঠিক করার জন্য।

কিছু পরপর উজ্জ্বল সব অংশ, বিশেষ করে ছাপ ফেলে যাওয়া শব্দমালায় গড়া সংলাপ এবং—সমসাময়িককালে লেখা তাঁর কবিতার বিপরীতে—প্রাঞ্জলতা ছাড়াও *সুতীর্থ* উপন্যাসটির অনেক ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যও ছিল। তাঁর সব গল্প-

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসে এই স্পষ্টতা আছে, যা কেবল কবিতা বা প্রবন্ধ-পাঠকদের কাছে প্রায় অচিন্তনীয়। *সুতীর্থ* এক অদ্ভুত কাব্যিক উপন্যাস। এতে বহু গীতিময় অংশ আছে, যেগুলো পাঠককে নিয়ে যায় বাংলাদেশের গ্রামে। ২৬ অধ্যায়ের উপন্যাসটির পঞ্চম পরিচ্ছেদে এক মধ্যদুপুরে দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জে যেখানে সে থাকে, সেখান থেকে বেশ দূরে উত্তর কলকাতায় কোনো কারণ ছাড়াই নিজেকে আবিষ্কার করে সুতীর্থ। ('কি মনে করেই আজ শোভাবাজারে এসে পড়েছিলুম, মধুমঙ্গল। ভূতেই টেনে এনেছে মনে হয়।'[২৯]) সে মধুমঙ্গলের সেলুনে ঢুকেছিল চুল কাটা আর দাড়ি কামানোর জন্য, এখানে নাপিত আবিষ্কার করে যে খদ্দেরটি তার একসময়কার গ্রামার স্কুলের সহপাঠী। পরে সুতীর্থ স্পষ্ট মনে করতে পারে যে সে আর মধুমঙ্গল একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে, কাহিনির বিচারে ফলাফলহীন একটা ঘটনা। কারণ, দুজনের আর দেখা হয়নি। কিন্তু সুতীর্থ যখন সেলুনের চেয়ারে বসে, তার আলাপচারিতা সংক্ষিপ্ত হলেও উপন্যাসটির কাব্যিক বর্ণচ্ছটার কিছু নমুনা দেয় :

> 'বোকা তুমি আমাকে বলতে পার। কিন্তু সম্প্রতি আমি কোনোদিকেই মন দিতে পারছি না। চলো আমাকে নিয়ে কোনো জায়গায়—চলো, আমি টাকা দেব। এখানে চানের সুবিধা আছে?'
>
> 'আছে বই কি।'
>
> 'ভালো সাবান আছে? ক্ষিধেও পেয়েছে। খেয়ে-দেয়ে কোথাও ঢুকে পড়ে দিনটা কাটিয়ে দেওয়া যাক্—রাতটাও। দু তিন দিন থাকতে পারলে তো ভালোই। খুব অন্ধকার চাই—খুব চুপচাপ। যেন জীবনটা একটা শীতের ঘুমটানা রাত ছাড়া আর কিছু নয়—দেশ গাঁয়ের শীতের চারদিকে খেজুর গাছ কুয়াশা পেঁচা; রাত কোনোদিন ফুরুবে না। ঘুমের থেকে অন্য ঘুমের ভেতর চলে যাবার পথে মাঝে মাঝে একটু জেগে ওঠা—এই স্বাদ; এ ছাড়া ঘুমের কোনো শেষ নেই। এই সব—যা চাচ্ছি—কয়েকটা দিনের জন্যে দেবে তুমি আমাকে।'[৩০]

তাঁর অন্য দুটো উপন্যাসের চেয়ে *সুতীর্থ*-এ জীবনানন্দের কবিতা যেন প্রতিধ্বনিত হয়। যেমন '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় আমরা পড়ি :

> ঘুমাতেছে।
> যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হ'য়ে
> ব'লে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
> হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
> আর তুমি?' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
> চোখ তুলে শুধাবে সে—রক্তনদী উদ্বেলিত হ'য়ে
> ব'লে যাবে, 'গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার;
> মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রীটের, এন্টালির—'
> কোথাকার কেবা জানে; জীবনের ইতর শ্রেণীর
> মানুষ তো এরা সব; ছেঁড়া জুতো পায়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে;
> সৃষ্টির অপরিক্লান্ত চারণার বেগে
> এই সব প্রাণকণা জেগেছিল—বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে
> সহসা সুন্দর ব'লে মনে হয়েছিল কোনো উজ্জ্বল চোখের
> মনীষী লোকের কাছে এই সব অণুর মতন
> উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলোকে।

বন্ধ কারখানার সামনে ধর্মঘটিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সুতীর্থ :

> সুতীর্থ দাঁড়িয়ে ছিল—পায়চারি করছিল, একটা মরা গাছের গুঁড়ির ওপর বসল এবার। বসেই তার মনে হল ওরা সব মাটিতে বসেছে—এরকম গুঁড়ির ওপর বসা তার ঠিক হবে না, ওরা হয়তো ভাববে এইটুকুর ভেতরেও সুতীর্থবাবু ভেদাভেদ করছেন। সে মাটিতে গিয়ে বসল একেবারে অনন্ত আর গোলাম মহম্মদের গা ঘেঁষে—
>
> সুতীর্থ বললে, 'হামিদ, ইয়াসিন, মকবুল, বিপিন শোন তোমরা। বঙ্কু বলতে চায় যে ধর্মঘটের অছিলায় আমাদের মতন বাবুরা নাম কিনি।'[৩১]

এখানে হিন্দু (অনন্ত, বিপিন, বঙ্কু) ও মুসলমানদের (গোলাম মহম্মদ, হামিদ, ইয়াসিন, মকবুল)[৩২] মিশ্রণে নামগুলো আলাদা হলেও সবাই শ্রমিক, সবাই 'জীবনের ইতর শ্রেণীর', সবাই একই দুরবস্থায় ভোগা। তবুও ভিন্ন কিছুর প্রতি মানুষের সহজাত ঘৃণার কারণে এসব বাঙালি তাদের পবিত্র ধর্মের নামে একে অন্যকে খুন করতে থাকবে।

অন্য এক দৃশ্যে যখন সুতীর্থ তার বাড়িওয়ালি মণিকার সঙ্গে কথা বলে, গল্পকার কলকাতার আকাশে চিলের ডাকের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

> রোদের ভেতর দূর আকাশে চিলের কান্নাও শোনা গেল। কেমন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠতে চায় মানুষের মন, অথচ প্রকৃতি সুপরিসরের ভেতর সুস্থির, কেমন আশ্চর্য প্রাণবত্তায় সুচালিত; মহানুভব।[৩৩]

এর আগে জীবনানন্দের কবিতায় একই রকম চিলের ডাক শোনা গেছে এক মফস্বলের নদীর ধারে :

> হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
> তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
> তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!

গল্পের আরও পরে যে ধর্মঘটে সুতীর্থ অল্প সময়ের জন্য অংশগ্রহণ করেছিল, বাড়িওয়ালি মণিকা আর সুতীর্থ সেটা নিয়ে মৌখিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তাদের প্রায় পারিবারিক সম্পর্ক তত দিনে একটা অবচেতন যৌন আকর্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক সংযমের মিশেলে পরিণত হয়েছে।

> 'তোমাকে একটা খত লিখে দিতে হবে; তোমা[illegible]ছি আমি।' মণিকা বললে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'কিসের খৎ?'

'তোমার মনিবকে লিখে দেব। লিখে দেব: কুকুরটা এইখানেই থাকবে খাবে—এঁটিলি কামড়াবে—আঁশটে গন্ধ ছড়িয়ে বেড়াবে;—বেড়াক—কোনো চারা নেই।'

'লিখে দিও কুকুরের বাচ্চা পাঠিয়ে দেব সামনের শীতে।'

মণিকা গম্ভীর হয়ে বললে, 'ক্যাশ বাক্সে টাকা আছে। আমাকে দেবে না, ও টাকাটা দিয়ে কি করবে?'

'যাদের দিতে হয় তাদের দেব।'

'ধর্মঘটীদের পরিবারদের? কিন্তু স্ট্রাইক তো ভেঙে গেছে—'

'জেলে গেছে ওরা। কিন্তু ধর্মঘট চালাতে হবে, পরিবারদের খেতে পরতে হবে—' সুতীর্থ কেমন যেন নালার ওপারের চিতেবাঘের মত তাকাল মণিকার দিকে।

নালার এপারের সেয়ানা হরিণীর মত তাকিয়ে মণিকা বললে, 'তা হবে বইকি। কিন্তু আমার খয়রাতের টাকা দিয়ে ওদের খাওয়ানো? আমি তো মুখুয্যের দিকে। আমি কেন টাকা দেব মুখুয্যেকে যারা রুখছে সে সব মিনসে মাগীদের ফ্যানভাতের জন্যে?'—ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠল মণিকার দৃষ্টি; জ্যোৎস্না রাতের নদী বনের ভেতর কালো ডোরাকাটা সোনালী রঙের সুন্দর জিনিস যেন তার প্রিয়কে না দেখে একটা ইতর বাঘকে দেখেছে এমনই নিদারুণ হয়ে উঠল মণিকার ঠোঁট।[৩৪]

প্রথমে জীবনানন্দ উপস্থাপন করেন তাঁর প্রায়ই ব্যবহৃত চিতা আর হরিণের যৌনতা ও শিকারি আকর্ষণের রূপক, যেটা তিনি চমৎকারভাবে গড়ে তুলেছেন 'সুন্দরবনের গল্প' কবিতায়। তারপর একটা সূক্ষ্ম মোচড়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধকাব্য*-এ ব্যবহৃত বিকশিত উপমার বিস্তারে নিয়ে আসেন মেয়েমানুষের পরিপ্রেক্ষিত—সে পরিণত হয় কালো ডোরাকাটা সোনালি শরীরের এক প্রাণীতে। এই মুহূর্তে আমরা জানি না, আগের কবিতার কয়েকটি উপমায় যেমন ছিল এটি সে রকম সুন্দরবনের বহু ডোরাকাটা হরিণীর একটি কি না—আমরা জানি না, যে পর্যন্ত সোনালি এই সুন্দর প্রাণীটি 'ইতর বাঘ'টির দিকে অবজ্ঞামিশ্রিত ঘৃণাভরে না তাকায়; তার পরই আমরা বুঝতে পারি, এটি হরিণী নয়, একটি নারী রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

উপন্যাসটির শেষদিকে জয়তীকে তার সঙ্গে যেতে বলে সুতীর্থ গ্রামে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করে।

'ঠিক করেছ গ্রামে যাবে?'

'আমি কিছু রেখে ঢেকে বলেছি সুতীর্থ?'

'আমাদের সঙ্গে গেলে দু-চারটে শর্ত আছে।'

'বললেই তো।'

'সব শর্তগুলোর কথা কি বলেছি তোমাকে?'

'কেন? বলবার কি দরকার? এটা কি দুপক্ষের ব্যাপার?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'তাহলে বুঝেছ তুমি সব।' খুব বিশ্বাসভরে বললে সুতীর্থ। মানুষের গুলি এড়িয়ে আকাশের অন্তহীন নিরাপদের ভেতর বুনো হাঁস-দম্পতির মত নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল জয়তীর বুকের ভেতর থেকে।[৩৫]

'বুনো হাঁস' ও 'আমি যদি হতাম' কবিতা দুটো 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার মূল 'বনলতা সেন' কবিতার কিছু অংশ তৈরি করেছে। প্রথমটির সমাপনী পঙ্‌ক্তিগুলো এ রকম :

উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক

কল্পনার হাঁস সব—পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।[৩৬]

পরেরটা তার পূর্ণতায় :

আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হতে যদি তুমি,
কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে;

তাহলে আজ এই ফাল্গুনের রাতে
ঝাউয়ের শাখার পেছনে চাঁদ উঠতে দেখে
আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে
আকাশের রূপালি শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দিতাম—
তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখনায় তোমার রক্তের স্পন্দন—
নীল আকাশে খইক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,
শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।
হয়তো গুলির শব্দ :
আমাদের তির্যক গতিস্রোত,
আমাদের পাখায় পিস্‌টনের উল্লাস,
আমাদের কণ্ঠে উত্তর হাওয়ার গান!

হয়তো গুলির শব্দ আবার :
আমাদের স্তব্ধতা,
আমাদের শান্তি।
আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না,
থাকত না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার;
আমি যদি বনহংস হতাম,
বনহংসী হতে যদি তুমি;

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে।[৩৭]

বনলতা সেন-এর মুখোমুখি আমরা দেখি যে জীবনানন্দ তাঁর চরিত্রদের সময় ও দূরত্ব সম্বন্ধে কথা বলতে দেন, যা তিনিও পুরোমাত্রায় করেন সে-গ্রন্থে ও বিশেষ করে 'বনলতা সেন' কবিতায়ও :

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে

আর 'শিকার' কবিতায় :

একটি তারা এখনো আকাশে রয়েছে :
পাড়াগাঁর বাসরঘরে সবচেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো;
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে মুক্তা
আমার নীল মদের গেলাসে রেখেছিল
হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে তেমনি—

এবং 'পথ হাঁটা'তে :

চোখ বুজে একপাশে সরে যাই—গাছ থেকে অনেক বাদামী জীর্ণ পাতা

উড়ে গেছে; বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন; আজো আমি জানি নাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।

সুতীর্থ-এ সুতীর্থ ও মণিকা সময় নিয়ে আলোচনা করে :

সুতীর্থ পুবের দিকের একটা জানালা বন্ধ করবার জন্যে উঠে গেল।

'ওটা আবজে দিলে কেন?'

'বড্ড কড়া রোদ আসছে।'

'তোমার চোখের ওপর?'

'তোমার মুখ টসটস করছে—যেন জ্বর-জ্বালা হল—'

'হল, বেশ হল', মণিকা চোখ বুজে বললে, 'সূর্যের ছ্যাঁকা জ্বর-জ্বালায় আরাম। বেশ ছিল তো—কেন জানালাটা টেনে দিলে বাপু—'

'সব জানালাই খোলা আছে, একটা ছাড়া—' সুতীর্থ নিজের মনের স্বাদে প্রীত, খানিকটা উদ্‌গত ও সমাহিত হয়ে বললে, 'প্রাচীন মিশরীয় মেয়েদের কথা মনে পড়ছে আমার। এও যেন সেই মিশরের নীলিমা। নীল নদের পারে শেষ শীতের রৌদ্রে বসে আছি আমি—' জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থ' হয়ে রইল সুতীর্থ।

'আর আমি?'

'তুমি? তুমিও বসে আছ, সেই গীজের মূর্তির কাছে যেন', ঢোক গিলে বললে সুতীর্থ; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই গলায় মিশর-রোদের ডাকপাখি ডেকে উঠল যেন তার—'কোন এক ভোরের, কোন নীলের বাতাস পাচ্ছি আমি : তিন হাজার বছর যে পাটে চলে গিয়েছিল সেই সূর্য আবার ফিরে এলে যে রকম বাতাস ভেসে আসে; কি গভীর সেই নীল আকাশ, সত্যিই খুব বেশী নীল—সেই সাধ-সংসর্গের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মত রোদ আশ্চর্য নদী ক্ষেত প্রান্তর জন্মমৃত্যুর অনন্ত রক্তপাতের মতন সেই আলো; নীলের অনেক নীচে বড় বড় সহজের কালি ব্যথা উদ্যম নিষ্ফলতার কতশত প্রবঞ্চের ফাঁকে ফাঁকে নীল—ব্যাজন শুনছ না মণিকা? এগুলো কি খেজুর গাছ গান গাইছে? তরতর করে জল চলে যাচ্ছে চারদিকে—'তিন হাজার বছর আগের রোদের সঙ্গে হুড়হুড় করে ছুটে চলেছে আজকের দিনের ভেতর,' সুতীর্থ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল, কলকাতা-পৃথিবীর দিকে।

'তিন হাজার বছর আগের আজকের দিন : বলেছ তুমি', মণিকা বললে, বাইরে অনেক দূরে যেখানে দুজনের দৃষ্টি একটা তিলের মতন বিন্দুতে মিশেছে গিয়ে সেই একাত্মতার ভেতর থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে মণিকা বললে, 'সময় বলে কেউ যে নেই আমারও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়।'

'সময় কেটে যায়, তবুও কাটে না?'

'না, না। তা নয়, আমার মনে হয় সেকালের একালের সব সময়ের সমস্ত ইতিহাসই এক সাময়িক।'

কথাটা শুনে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন, খুব আশ্চর্য লাগল সুতীর্থের—মণিকার দিকে খুব মন দিয়ে তাকিয়ে রইল সে; বললে, 'আমার তো অনেক সময় মনে হয়েছে এরকম। কিন্তু গণিতের হিসেবে এ কি টেকে?'

'গণিত কি বলে জানি না, কিন্তু গাণিতিক তুমি বটে; তার চেয়েও বেশী একটা জিনিস তুমি সুতীর্থ—এই তো বললে তিন হাজার বছর আগের আজকের দিনের ভেতর। তা হলে সব সময় সমসাময়িক। তুমিও তো তাই বললে।'

পরে একই আলাপের মধ্যে মণিকা সুতীর্থকে জিজ্ঞাসা করে :

'কি দেখছ তুমি?'

'এই রোদ নীল আকাশ শহরের মিনার দালান সাদা বিছানা বস্তি ব্যথা জন্ম-মৃত্যু ভেদ করে উজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্ডের দীপ্তি রোজই থাকে। তুমিই তো বলেছিলে একদিন—বেবিলনেও ছিল। বেবিলনে ছিল, আমরাও দেখেছি। কিন্তু তবুও দুজনে মিলে দেখবার সময় বেশী পাই না।'[৩৮]

জলপাইহাটির বিষয়বস্তু ও চরিত্রের ওপর লেখক দৃঢ়তর কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। কারণ সেসব বহুলাংশে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। মূল চরিত্র নিশীথ সেন থাকেন 'পদ্মার পারের দেশে'র এক কল্পিত শহর জলপাইহাটিতে, অর্থাৎ বাংলার পূর্বাঞ্চলে, পাকিস্তানের পূর্ব অংশে, এখনকার বাংলাদেশে (পাণ্ডুলিপিটির কোনো নাম ছিল না। তাই প্রকাশের সময় *রূপসী বাংলার* মতো শহরের অশোকানন্দ নামটিই পছন্দ করেছিলেন। আগের দুটো উপন্যাসের মতো মূল চরিত্রের নামে নামকরণের মতো তিনি *নিশীথ* নামটিও নিতে পারতেন)।

কয়েকজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বকে দিয়ে চরম শক্তিশালী ও তিক্ত উপন্যাস *জলপাইহাটিকে* তিনি মধুর করে তুলেছেন। তবে বইটির মূল রস অথবা আবেগ আসে কিছু মানুষ, শিক্ষকতা পেশা ('...এ-রকম হতভাগ্য দেশে কোনো ইস্কুল কলেজ না থাকাই ভাল। সব পুলিশ হয়ে যাক, সেপাই হয়ে যাক')[৩৯] এবং সমকালীন সমাজব্যবস্থার ('ছেলে, অধ্যাপক, বা গভর্নিং বডিগুলোকে দোষ দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনো লাভ নেই। দোষ বাংলাদেশের বিশ শতকের ভিতরে যে-ধ্বংসের কীট রয়েছে—দিনের পর দিন তার শ্রীবৃদ্ধির')[৪০] প্রতি কলকাতায় একটা মাস্টারির খোঁজে আসা ব্যর্থ এক মাঝবয়সী প্রধান চরিত্রের ক্রুদ্ধ অনুভূতি থেকে। কিন্তু সেই ক্রোধ সত্যিকারভাবে কদাচিৎ দেখা গেছে—কখনোই প্রকাশ্য সহিংস আচরণে প্রকাশ পায়নি—বরং ভেতরে ভেতরে দহন করেছে। এই ক্রোধ জীবনধারণের জন্য নগণ্য আয়ের পথ-বিপর্যস্ত একজন মানুষের হতাশাজাত।

ব্রিটিশ ভারত দুটো আলাদা দেশে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানে হিন্দুদের (আর ভারতে মুসলমানদের) উভয় সংকটের কথাও তুলে আনে উপন্যাসটি। ভারতে চলে যাওয়ার জন্য কারও কি নিজ দেশ ছাড়া উচিত? এ রকম একটা কাজ কি ভীরুতা, নাকি সহজ বুদ্ধি? এ বিষয়ে জীবনানন্দ নিরাসক্ত শিল্পীর চেয়ে আরও বেশি। কারণ কলকাতায় গিয়ে তিনি এরই মধ্যে মনস্থির করে ফেলেছিলেন। তার ওপর তিনি *জলপাইহাটি* লেখেন এমন সময়, যখন এসব উদ্বেগে বহু মানুষের হৃদয় ভারাক্রান্ত।

মফস্বল শহর জলপাইহাটিকে বহুভাবেই বরিশালের মতো মনে হয়। দুটোই নদীর তীরে। দুটোই সরকারি সদর দপ্তরের মর্যাদাসম্পন্ন : জলপাইহাটিতে আছেন একজন কালেক্টর। জলপাইহাটি ও বরিশাল দুই জায়গাতেই আছে হাসপাতাল এবং আরও উল্লেখজনকভাবে দুটো শহরই তাদের স্থানীয় বেসরকারি কলেজ নিয়ে গর্ব করতে পারে। জীবনানন্দ একসময় যে রকম দাশগুপ্ত ছিলেন, নিশীথ সেনের পুরো পদবি হচ্ছে সেনগুপ্ত, জাতের বিচারে বৈদ্য—যেটা ছিল জীবনানন্দেরও জাত।

> 'আপনার নাম আমার মনে আছে।'
>
> 'মনে আছে? এসেছিলাম কয়েক বার আপনার কাছে।'
>
> 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সব মনে আছে আমার', কার্পেটের ওপর থেকে কাগজের একটা শিট কুড়িয়ে এনে পাশে একটা মোড়ের ওপর রেখে দিয়ে জয়নাথ বললে, 'আপনার নাম তো নিশীথ সেনগুপ্ত।'
>
> 'হ্যাঁ, নিশীথ সেন।'
>
> 'সেন? গুপ্তটা কেটে কি বাহাদুরি হল? এমনি সেন তো ছোটকায়েত, শুদ্দুর, সোনার বেনে—'
>
> 'আমি ও-সব জাত-টাত নিয়ে মাথা ঘামাই নে, সবই তো সমান; অন্তত একই রকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত সকলের। মানুষকে ছোট জাত বানিয়ে চেপে রেখে কী হবে?'[৪১]

(প্রসঙ্গত, জীবনানন্দের সব প্রধান চরিত্র ছিল বৈদ্য : মাল্যবান দাশগুপ্ত, সুতীর্থ গুপ্ত—একসময় দাশগুপ্ত ছিল;[৪২] আর এখানে নিশীথ সেন—একসময়কার সেনগুপ্ত)।

নিশীথের বয়স ১৯৪৮ সালে ছিল প্রায় ৫০ বছর, সেই একই বছরে জীবনানন্দের বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। সে জলপাইহাটি কলেজে ইংরেজি পড়ায় এবং চাকরির বেশ কয়েক বছর হয়ে যাওয়ার পর এখনো প্রভাষক, শিক্ষকতা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মর্যাদায় অধ্যাপকের এক ধাপ নিচে। বরিশালের বিএম কলেজে ইংরেজি বিভাগে ১৩ বছরের চাকরিতে আর কখনো না ফেরার জন্য ছুটি নিয়ে জীবনানন্দের কলকাতাবাসের প্রায় বছর খানেক হয়ে গেছে, তখন ১৯৪৮ সাল। তবে বেশ কিছু অসামঞ্জস্য কল্পিত চরিত্র নিশীথ সেনের সঙ্গে জীবনানন্দের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, এমন ধারণা না করার জন্য সতর্ক করে দেয়। তবে তুলনাগুলো আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

সম্পূর্ণভাবে কলকাতার পটভূমিতে অবস্থিত *মাল্যবান* ও *সুতীর্থর* বিপরীতে *জলপাইহাটির* ঘটনাগুলো ঘটে কলকাতা ও জলপাইহাটিতে। সালটা ১৯৪৮ এবং ব্রিটিশ-ভারত-পাকিস্তান ও জীবনানন্দের উপন্যাসে ক্রমাগত যাকে ভারতীয় ইউনিয়ন বা শুধু ইউনিয়ন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে বিভক্তি ঘটে গেছে। উপন্যাসটা যখন শুরু হয়, নিশীথ সবে সেই সন্ধ্যায় জলপাইহাটি থেকে কলকাতায় এসে সরাসরি তার দীর্ঘদিনের বন্ধুর বাড়িতে যায়, যেখান থেকে সে একটা চাকরির খোঁজ করবে। এই উপন্যাস লেখার সময় জীবনানন্দ নিজেও কলকাতার কলেজে এ রকম একটা দুর্লভ চাকরি খুঁজছিলেন।

আমাদের কথক দ্রুত পরিস্থিতিটা বর্ণনা করেন। কলেজের বন্ধু জিতেন দাশগুপ্ত সম্প্রতি সুন্দরী ও আবেদনময়ী নমিতাকে বিয়ে করেছেন, যার রক্তসম্পর্কের মধ্যে আছে মা, যার নাম মাথিন (জিতেন মজা করে ডাকে মার্টিন), বর্মি বাবা আর নরওয়েজিয়ান মায়ের সন্তান। স্বামী জিতেন আজকাল এক ব্রিটিশ কোম্পানির কার্যত বড় কর্তা, যেহেতু কোম্পানির সাবেক কর্তা এবং তাঁর স্বদেশিরা ভারত ছেড়ে চলে গেছে। হঠাৎ করে দাপ্তরিক কাজে শহরের বাইরে যেতে হয় জিতেনকে। কয়েকজন সদাপ্রস্তুত চাকরবাকর ছাড়া নিশীথ নমিতার সঙ্গে বাড়িতে একা। সূক্ষ্ম যৌন চাপের আরকে মেশানো তাদের দুজনকে নিয়ে দৃশ্যটা বেশ সংযমের সঙ্গে তৈরি, এখানে নারীচরিত্রটি ছিল আগ্রাসী।

সন্ধ্যার দিকে নমিতার বাবার বাড়ি থেকে ফোন আসে—জিতেন আর নমিতা থাকে হিন্দু মধ্যবিত্ত লোকের পাড়া বালিগঞ্জে (এখানে সুতীর্থ অথবা বাস্তবে জীবনানন্দ থাকতেন)। ওর বাবার বাড়ি উত্তর দিকে মাইল খানেক অথবা আরেকটু বেশি দূরত্বে পার্ক সার্কাস এলাকায়। হিন্দু ও মুসলমান মেশানো এই পাড়াটা ১৯৪৬-এর আগস্টের সময়কার দাঙ্গায় ও তার পরেও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। নমিতার বাবা পক্ষাঘাতে বেশ কিছুদিন ধরে শয্যাশায়ী। ওর মা সচল থাকলেও একটা পুরোনো সমস্যায় পড়লে তক্ষুনি তার সাহায্য দরকার হয়। সে নিশীথকে বলে যায় যে তার ফিরতে দেরি হবে, অথবা হয়তো বাবার বাড়িতে—অথবা আরেক বন্ধুর বাড়িতে থেকেও যেতে পারে সে (নমিতার বিয়ে হয়ে গেলেও সে তার পুরোনো পরিচিতজনের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দেয়নি)।

নিশীথ রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে ওপরতলায় জিতেনের অফিস হিসেবে ব্যবহার করা কামরাটায় শুয়ে পড়ে। দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে নিশীথ নমিতার ফিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আসার ব্যাপারটা জানতে পারেনি। ঘুম না আসায় গোসল করে নেয় নমিতা। স্নানঘর থেকে বের হয়ে বড় টার্কিশ টাওয়েলটা কাঁধে ফেলে ঝুলিয়ে দেয় ও। তখনো শরীর থেকে পানি ঝরছিল ওর, সে অবস্থায় টাওয়েলটা ছাড়া সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় নিশীথ যে কামরায় ঘুমাচ্ছিল, সেখানে যায় ও। সেখানে এক গ্লাস জল খায়, তাকে এই অবস্থায় সামনে দাঁড়ানো দেখলে নিশীথের অবস্থা কী হবে, সেটা ভেবে মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছিল ওর।

নিশীথের ঘুম ভাঙে না। নমিতা তার ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়ে। ঘুমাতে না পেরে সে আবার উঠে পড়ে, তারপর মিলিটারি বুট জুতাসহ 'উওমেন অক্সিলারি কোরের' পোশাক পরে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল ও। তখনকার পোশাকগুলো পছন্দ হয়ে গেলে দর্জি দিয়ে হুবহু সে রকম পোশাক তৈরি করিয়ে নিয়েছে ও। মন চাইলে যাতে পরতে পারে। এবার পুরো পোশাকে সে আবার নিশীথের ঘরে যায়, নিশীথ তখনো ঘুমাচ্ছিল। পাখা বন্ধ করে দেয় ও, যাতে গুমোট গরমে নিশীথের ঘুম ভেঙে যায়। পাখা বন্ধ করে জানালার দিক থেকে ফিরে আসার সময় তেপয়ের সঙ্গে পায়ের ধাক্কা লাগলে শব্দ হয় আর তাতে চট করে ঘুম ভেঙে যায় নিশীথের। বাকি রাতটা তারা দুজন গল্প করে কাটিয়ে দেয়, তখন নমিতা অনেক কথার মধ্যে জানায়, ওর মা-বাবার সিফিলিস আছে। তার নিজেরও প্রাথমিক সিফিলিসের চিকিৎসা নিতে হয়। ওর জন্মের আগেই রোগটা বাধিয়েছিল ওর বাবা। তারা ছাদে উঠে তারা দেখতে যাওয়ার আগেই ভোর হয়ে যায়। কোনো ঘটনা ছাড়াই কেটে যায় রাতটা। নিশীথের ঘরের মেঝেতে জল জমে থাকার অসামঞ্জস্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না, ব্যাখ্যাও করে না কেউ। নমিতা তার ঘরে ফিরে যায়। কাজের লোকটাকে বলে, দুপুর নাগাদ না উঠলে তাকে যাতে ডেকে দেওয়া হয়, তারপর দরজা বন্ধ করে, জানালার পর্দা টেনে দিয়ে মহিলা বাহিনীর পোশাক ছেড়ে খালি গায়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। নিশীথ এক কাপ চা খেয়ে মাস্টারির খোঁজে একটা নতুন দিনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে।

খোলাখুলি ইন্দ্রিয়নির্ভরতার জন্য এ অধ্যায়টি উল্লেখযোগ্য। যদিও কিছুই ঘটে না, জীবনানন্দ যে সরলতায় নারীশরীর উপস্থাপন করেন, তাতে এই কবি ও ঔপন্যাসিকের আরেকটি চেহারা দেখা যায়, তাঁর কবিতা যাকে ঢেকে রেখেছিল। তার আগের কবিতায় 'স্তন' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়—যেসব কবিতা সজনীকান্তকে এতটা মারমুখী করেছিল—কিন্তু 'শস্যের স্তন' কিংবা এমনকি 'ঘাইহরিণী' সত্যিকার নারীশরীরের উল্লেখ থেকে বহু দূরে। তিনি লাজুক হতে পারেন, কিন্তু অতিবিবেচক কিংবা এমনকি সতর্কও ছিলেন না। তবে এত দিন পর্যন্ত ভাষা ছিল শালীন, এমনকি গুরুগম্ভীর। পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে কোনো চরিত্র বর্ণনার সুবিধার জন্য নির্জলা তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভাষা ব্যবহারে কুণ্ঠা বোধ করতে দেখি না জীবনানন্দকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চাকরির চেষ্টায় সেদিন নিশীথ তার অনেক পুরোনো সহপাঠী ও পরিচিতজনের কাছে গিয়েছিল, যাদের কেউ কেউ ক্ষমতাধর অবস্থানে উঠে গেছে এবং তারা চাইলে জীবনানন্দকে একটা মাস্টারির চাকরি দিতে পারত। কুলদাপ্রসাদ নামের এমন একজনকে দেখানো হয়েছে, যার নৈতিকতা প্রশ্নবিদ্ধ। নিশীথ তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। তার স্ত্রী বাড়িতে নেই। অল্প বয়সী বিধবা শালিটা কুলদার চুলে বিলি কাটছিল, তার ভঙ্গিতে ছেনালিপনা। এই দোতলা বাসাটার ভাড়া মাসে মাত্র ৩০ টাকা, ১৯৪৮ সালে কলকাতার তুলনায় অবিশ্বাস্য রকম কম।[৪৩] তখনও এখনকার মধ্যবিত্ত বাঙালিদের সবচেয়ে লালিত স্বপ্ন যা—সে রকম কুলদার নিজের বাড়িও আছে। তবে নিজের ও পরিবারের পার্থিব আরামের চেয়ে নগদ আয় বেশি দরকার বলে সেটা সে ভাড়া দিয়ে রেখেছে সাড়ে তিন শ টাকায় (সেলামির পাঁচ হাজার টাকাও পেয়েছে সে ভাড়াটের কাছ থেকে)।

কুলদা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল পর্যন্ত উঠে এসেছে। এই পদটির মর্যাদা আছে, বেতনও চলার মতো—চলার মতো বলতে তাকে বাড়তি আয়ের জন্য (সে অবশ্য লোভে পড়ে করে) পরীক্ষার খাতা দেখার মতো একটা বাজে কাজ করতে হয় না। অথচ পরীক্ষার এই নম্বর কত যে গুরুত্বপূর্ণ! নম্বর যোগ করতে একটা ভুল করে ফার্স্ট ক্লাস ও সেকেন্ড ক্লাস কিংবা সেকেন্ড ও থার্ড ক্লাসের তফাত ঘটালে সেই নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীর জীবনে উন্নতি কিংবা সংগ্রাম অথবা ব্যর্থতার মতো বিশাল অদলবদল ঘটিয়ে দিতে পারে। আমরা জানতে পারি, কুলদা এই দায়িত্ব পালনেও শিথিলতা দেখায়। অথচ এর জন্য বাড়তি টাকা নিচ্ছে ও। ওর শালি ঠোঁট ফুলিয়ে লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতে বলে, কয়েকটা খাতার মধ্যে নম্বর যোগে ভুল পেয়েছিল সে।

আলাপের মধ্যে কুলদা তার এদিক-ওদিক লীলা করে বেড়ানোর ক্রিয়া-কৌশল বর্ণনা করে। তার লাল চোখ, জড়ানো কথা ও স্পষ্ট ঝিমুনি থেকে বোঝা যাচ্ছিল, সে গাঁজা টেনেছে আজ।

> কুলদাপ্রসাদ ঘাড় কাত করে কিছুক্ষণ টেনে—এইবারে নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বললে, 'মফস্বলে মাস্টারকে চব্বিশ ঘণ্টা মাস্টারই থাকতে হয়। ঐটে বড় অসুবিধে। পেট ফুলে মরে যেতে হত আমার। কলকাতা একটা মহাদেশ, কোনো ঘুপসি ঘাপটিতে কে কী করছে, কে খোঁজ রাখে তার। নাঃ, মফস্বলে আমার চলত না। সাড়ে পাঁচশ টাকায় সেধেছিল আমাকে।'
>
> 'কোথায়?'
>
> 'একটা প্রিন্সিপালের কাজ নিয়ে সেধেছিল—কোয়ার্টার্স দেবে—হ্যান করবে ত্যান করবে—, গেলুম না আমি। কলকাতা ছেড়ে কে যায়? চব্বিশ ঘণ্টা মাস্টার সেজে টঙে চড়ে বসে থাকব? পাহারা দিতে হবে বুঝি কে কোথায় বজ্জাতি করছে তাকে শায়েস্তা করবার জন্য? ঘি খেলে লোম পড়ে যাবে বুঝি? রেড়ির তেল খেতে হবে, কিন্তু ভদ্দর-অভদ্দর দু-চারটে রাঁড়ি থাকবে না?'
>
> 'রাঁড়ি?'

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'এখানে সে সব বালাই নেই গো; দিনের বেলা কলকাতার উত্তর দিকে জয়হিন্দ বলে ধর্মতলার ম্যাজিনো লাইন পেরিয়ে—ব্যস—কে টের পাবে গান্ধী টুপি জহর কোট পিঠে কোন কলকাতায় তুমি তলিয়ে আছ—'

'ব্ল্যাক মার্কেটিং করতে?'

'সব রকম বাঞ্চোতি।'

'করছ? কত কাল ধরে?'

'চিরটা কাল। কড়ায়া, চীনে টাউন, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট—'

'জুতো বাইরে রেখে মন্দিরে প্রবেশ বুঝি? মাস্টার মশাইয়ের জুতোরও নাগাল পায় না ছেলেরা? ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে, চীনে টাউনে, মোঙ্গল নাক-চোখ ভাল লাগে তোমার?'

'সব ভাল লাগে, সব দেখতে হয়। আমাদের ইউনিভার্সিটির খোদা বক্স সাহেব বলতেন।'

পান নিয়ে ঘরে ঢুকল ললিতা। 'সিক্সটিন ডিফারেন্ট ন্যাশন্যালিটিজ।'

'কী বললে কুলদা, কী ইংরেজি কথাটা বললে?' ললিতা পান বনের বাতাসের মত শাড়িতে শরীরে নির্ঝরিত হয়ে বললে।

বললাম, 'সিক্সটিন ডিফারেন্ট ন্যাশন্যালিটিজ,' চোখ পাকিয়ে গর্জন করে বললে কুলদা।

মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে ললিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খোদা বক্সের ব্যাপারটা ললিতারও জানা আছে তবে?[৪৪]

ভাইস প্রিন্সিপালের মতো একটা 'মর্যাদাসম্পন্ন' দায়িত্বে থেকেও কুলদা শিষ্ট নয়। একজন অশিষ্ট লোকই 'বাঞ্চোতি'র মতো একটা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করতে পারে, যার বাংলা প্রতিশব্দটা আরও অশ্লীল। জীবনানন্দ সেই 'বাঞ্চোতি'—'ভগ্নি-সম্ভোগকারী'—শব্দটাই ব্যবহার করেছেন।

কোনো কোনো বাঙালি দাবি করতে পারেন যে বাংলায় কোনো কটু শব্দ নেই, যা এসেছে তা হিন্দি থেকে।[৪৫] শব্দের উৎস যা-ই হোক, বাংলায় এ রকম কটুকাটব্য থাকলেও ভদ্র পরিবেশে কদাচিৎ শোনা যায়। কুলদার কাণ্ডকীর্তি ও তাঁর ভাষা তাঁকে উপস্থাপন করে একটা স্থুল চরিত্রের মানুষ হিসেবে। এখানে প্রসঙ্গবহির্ভূত না হলেও, সন্দেহ নেই এমন অশ্লীল ভাষা ব্যবহারই সজনীকান্তের মাথায় রক্ত চড়িয়ে দিয়েছিল এবং আমিও ঝুঁকি নিয়ে বলতে পারি যে বিষয়টা ১৯৪৮ সালের বিরাটসংখ্যক বাঙালি পাঠকের নিন্দার বিষয় হতে পারত।[৪৬]

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে জলমেশানো দুধ থেকে শুধু দুধটা শুষে নিতে পারা পরমহংসদের মতো জীবনীকারদের জন্য সূত্র হিসেবে *জলপাইহাটি* জীবনীভিত্তিক দুধের একটি সমৃদ্ধ উৎস হতে পারে। যে আশ্চর্য দুঃসাহসে উপন্যাসটিতে জীবনানন্দ যৌনতা ও নগ্নতাকে উন্মোচন করেন, সেটি বাদ দিলেও চল্লিশের কোঠার শেষে পৌঁছানো একজন মানুষের জীবন ঠিক কেমন হওয়া উচিত, *জলপাইহাটি* তার একটা পূর্ণ জ্ঞান দেয়—ছোট মফস্বল কলেজের স্বল্প বেতনের এক অধ্যাপক যাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

উন্নতির সম্ভাবনা শূন্য, আর সবশেষে এটাই সিদ্ধান্ত দেয় যে তাঁর প্রিয় গ্রামীণ বসবাস ছেড়ে কলকাতায় চলে আসাই সবচেয়ে ভালো।

কলেজের গভর্নিং বোর্ডের সেক্রেটারি হরিলালের ডাকা একটা মিটিংয়ে—সত্যি হোক বা না হোক—আমরা উদ্বেগের আরেকটা বাঁক দেখতে পাই, যেটা মুসলমান-অধ্যুষিত দেশে বসবাসকারী হিন্দুদের পীড়া দিচ্ছিল।

> 'হারামিকা—শিগগির একটা সোফা নিয়ে আয়।' শিবনলাল অন্দরের থেকে সোফা আনতে গেল।
>
> 'সোফা—সেটি তো ছিল চারদিকে; আপনি নিজে কেন উটকো চেয়ারে বসতে গেলেন কালীবাবু?'
>
> 'বড্ড ছারপোকা কামড়াচ্ছে হরিলালবাবু'—হিমাংশু চক্রবর্তী বললে।
>
> 'সত্যি, ছারপোকা হরিলালদা—বসা দায়'—ব্রজমাধব বললেন।
>
> 'ঐ নতুন ভেনেস্তা চেয়ারটায় ছারপোকা নেই। কালীবাবু ঠিকই বসেছেন'—হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা হাসতে লাগলেন।
>
> 'যা ছারপোকা দাদা, কী হবে সোফায় বসে। বেশ আছেন আপনি যা হোক কালীবাবু'—ঘোষমল্লিক স্টেটের উকিল বঙ্কিম দত্ত বললে।
>
> শিবলাল ও পূর্ণ ধরাধরি করে একটা চমৎকার নতুন সোফা হলঘরে এনে বসাতেই সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে গটগট করে হেঁটে সোফাটার উপর ধপাস করে বসে পড়লেন বারের উকিল, কলেজ কমিটির মেম্বার, ওয়াজেদ আলি সাহেব। কালীশঙ্করবাবু নিজের চেয়ার থেকে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন সোফায়। হঠাৎ আলি মিঞাকে চোখে পড়ায় ভেনেস্তায় ফিরে এলেন। সকলে হো হো করে হেসে উঠল।
>
> 'কেন কী হল—হাসবার কী হল'—জিজ্ঞেস করলেন ওয়াজেদ আলি।
>
> 'কিছু হয়নি।'[৪৭]

একজন মুসলমানের সঙ্গে একই সোফায় বসার ব্যাপারে কালীশঙ্করের অনিচ্ছা পরিষ্কারভাবে দেখায় যে স্বাধীনতার পরও পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমানের ভেতরকার উত্তেজনা বজায় ছিল। সভা চলতে থাকে, যদিও আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে একটা স্পর্শকাতর বিষয় উঠে আসে:

> 'মুসলিম লিগ বলছিল কিনা যে শরিয়ত অনুসারে দেশশাসন।'
>
> 'আবার পলিটিকস!' ধমক দিয়ে ফেলেই হরিলালবাবু একটু হকচকিয়ে উঠলেন। শরিয়তের কথা ওয়াজেদ আলিই আরম্ভ করেছিলেন চাপা গলায়—ওয়াজেদের গলা থেকে দু-তিন রকমের সুর বেরোয়। চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন হরিলালবাবু, মনে হয়েছিল তাঁর, যেন ব্রজমাধববাবু শরিয়ত অনুসারে রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারটা নিয়ে উত্তেজিত হবার পূর্বাভাস দেখাচ্ছেন। বেপরোয়া ব্রজমাধব। ব্রজমাধবকে কড়কে দেবার জন্য ধমক দিয়ে চোখ খুলেই দেখলেন, ওয়াজেদ আলি কথা বলতে-বলতে হরিলালকে কঠিন, শাদা বরফের মত দাঁত দেখিয়ে থেমে গেলেন।
>
> 'ব্রজমাধববাবু, আপনি শরিয়তের কথা-টথা বলবেন না। এসব বিষয়ে মুসলিম লিগের নেতারাই ভাল বোঝেন, ঠিক বোঝেন। তাঁরা যদি কিছু বলতে চান, আমরা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শুনব। ওয়াজেদ আলি সাহেব রাষ্ট্রশাসনের কথা বলুন, আমরা শুনি। খুব মন দিয়েই শুনি। কিন্তু ব্রজমাধববাবু, কালীশঙ্করবাবু এঁরা এসব শাসন-শরিয়তের জানেন কী? কেন ফোঁপরদালালি করতে যান'—বললেন হরিলালবাবু বেশ স্থির গলায়, ব্রজমাধববাবুকে ও কালীশঙ্করবাবুকে খুব ধমকে, কড়কে দিয়ে, ওয়াজেদ আলির দিকে আশ্রয়ার্থী জুনিয়র উকিলের মতন আস্তে চোখ মেরে।

হরিলালের এ দৃষ্টির নিস্তব্ধ মাহাত্ম্যকে—সাত-পাঁচ না ভেবে—ভাল জিনিস বলে মনে করলেন ওয়াজেদ। জলের মতন গলে গেলেন তিনি। বললেন, 'না-না, ব্রজমাধববাবু কিছু বলেননি। শরিয়তের কথা আমিই পেড়েছিলাম।'

'রাষ্ট্রশাসন—সরিয়তের কথা আমি তো কিছু বলতে যাইনি হরিলালবাবু'—কালীশঙ্কর বিচলিত হয়ে বললেন, 'আমাকে কেন—'

'কিন্তু কালীশঙ্করের কথাগুলো চিলে খাচ্ছে—খেয়ে যাক—গ্রাহ্য না করে হরিলালবাবু তাজ্জব বনে গেলেন, যেন ওয়াজেদ আলির কথা শুনে 'ওঃ আপনি! আপনি বলছিলেন শরিয়তের কথা। আমি ভেবেছিলুম ঠিক যেন ব্রজমাধববাবুর গলা; নাকি কালীশঙ্করবাবুর। ভাবলুম কলেজের প্রিন্সিপাল, তুমি ছেলেদের নিয়ে থেকো হে, এসব উজির-বাদশার ব্যাপার নিয়ে তোমার কী? ওঃ আপনি বলছিলেন ওয়াজেদ আলি সাহেব! আপনি বলছিলেন কোরান শরিয়ত শাসন-টাসনের কথা! বলুন, বলুন শুনি, আমরা সকলে মিলে শুনি; কেমন একটা আবছা ভাব আছে আমাদের মনের ভিতর, জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যাবে সব'—কথাগুলো হরিলালবাবু পেটের থেকে ওগরাচ্ছেন বলে মনে হল না ওয়াজেদ আলির।

খুশিই হলেন ওয়াজেদ সাহেব। হাত জোড় করে বললেন হরিলালবাবুকে—'আজ থাক। আজ কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে সব, কম্যুনাল হয়ে যাচ্ছে। আর-একদিন হবে। ইমাম হোসেন সাহেব, মুস্তাক সাহেব, রফিক সাহেব ওঁদের সঙ্গে নিয়ে আসব।'

'বেশ তাই হবে। আমাদের জানিয়ে দেবেন কবে আসবেন। আমরা সকলে মিলে শুনব আপনাদের কথা'—হরিলালবাবু বললেন।[৪৮]

পাকিস্তানে কখনোই কঠোর ইসলামি আইন চালু হয়নি, যদিও তখন এবং এখনো পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কট্টরপন্থী লোকজন আইনটি চালু করার পরামর্শ দিচ্ছে। শরিয়া আইনের আক্ষরিক ব্যাখ্যায় হিন্দুদের 'কাফের' বা অবিশ্বাসী বলে গণ্য করা হয়। সেই উদ্বিগ্ন আলাপ-আলোচনা এবং সত্যিকার পরিপূর্ণ ধারণার অভাব চল্লিশের দশকের শেষ দিকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের বরিশাল কিংবা অন্যান্য ছোট শহরে অস্বাভাবিক ছিল না। কলেজের গভর্নিং বডিতেও হিন্দু ও মুসলমান সদস্যের অনুপাতটা লক্ষণীয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা মুসলিমপ্রধান হলেও একমাত্র উচ্চশিক্ষিত ব্যারিস্টার ওয়াজেদ আলী সাহেব ছাড়া সেদিনের সভায় উপস্থিত সবাই ছিলেন হিন্দু (তবে চার-পাঁচজন মুসলমান সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন)।[৪৯] স্বাধীনতার আগে আরবি ও ফার্সি শিক্ষক ছাড়া বিএম কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীর সবাই ছিলেন হিন্দু (অথবা ব্রাহ্ম বা খ্রিষ্টান)।[৫০] এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত, কেবল সংস্কৃত-শিক্ষক ছাড়া আর সবাই মুসলমান। তখনকার চেয়ে এখন বাংলাদেশের জনসংখ্যা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আরও বেশি একপেশে—যার শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান আর হিন্দুদের অনুপাত ১০ শতাংশের চেয়েও কম। নিজ জন্মভূমিতে থাকা হবে কি না—এটা সে অঞ্চলের হিন্দু বাঙালিদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। স্বাভাবিকভাবেই অনেকে এবং প্রায় সবাই পশ্চিমবঙ্গে নতুন জীবন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়, আর তাদের বেশির ভাগই কলকাতায়।

> এখানে জলপাইহাটিতে কেমন একটা অদ্ভুত অনিশ্চয়তার ভেতর নিরবচ্ছিন্ন নিঃস্ব হয়ে ঘুরে ফিরছে সমস্ত অবুঝ ও বুদ্ধিমান। এদের অনেকেই দেশ ছেড়ে চলে গেছে, রোজই যাচ্ছে—এখনো যাচ্ছে। এদের এখানে থাকতে বলেছে হারীত—রোজই একবার তার রোঁদে ঘুরে আসবার সময় এইখানেই এদের থেকে যেতে বলছে। হারীতের কথা শোনবার মত মনের অবস্থা এদের নয়। মন পশ্চিমের দিকে ছুটছে, এখন কি এরা আর পদ্মার পাড়ে পড়ে থাকবে? কি আশ্চর্য অবর্ণন সমৃদ্ধি আছে এই পদ্মা-মেঘনার দেশে, মানুষ যদি আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে একটু সুস্থির ভাবে বুঝে দেখবার চেষ্টা করত, কাজ করতে শুরু করে দিত, এ-দেশের ও দেশের নয়, পৃথিবীর আশ্চর্য মানবধন্য নাট্যটাকে ভালবেসে; কিন্তু এরা আছে কি নেই, সেই হুঙ্কার শুনে, ছিটের ফতুয়া-জামা পরে, দেখ, ডোরাকাটা জেব্রার মত ছিটিয়ে-ছিটকে হাওয়া দিচ্ছে সব। দুরন্ত জেব্রার মত এরাই না, না, সে রকম প্রাণবন্তভাবে ছুটে গিয়েছিল আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার ওজস্বী উপনিবেশীরা, এরা কীটপতঙ্গের মত আগুনের থেকে বড় আগুনের দিকে ঝাঁপিয়ে চলেছে। কলকাতায় বাড়ি নেই, চাকরি নেই, খাদ্য নেই। মৃত্যু আছে—তবুও পেঁচোয় পাওয়া বাচ্চাদের মতো মুখ থুবড়ে পড়ছে গিয়ে কলকাতার অলিতে-গলিতে ফুটপাতে।[৫১]

কলকাতার নিজস্ব বহু সমস্যা ছিল। তার সঙ্গে মেশে পূর্ব-বাংলা থেকে আসা শরণার্থী-সমস্যা। আবাসনব্যয় বেড়ে যায়, বাড়ি পাওয়াও যাচ্ছিল না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে। তবে নবাগতদের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার থাকলেও তারা তা পাচ্ছিল না। *স্বরাজ* পত্রিকায় চাকরি নিয়ে জীবনানন্দ কলকাতায় এলেও ১৯৪৭ সালের শেষে তিনি আবার চাকরি খুঁজতে থাকেন। পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে আসার সিদ্ধান্ত যে সেখানকার নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার জন্য নিতে হয়েছে, সেটা অস্বীকার করে নিশীথের চরিত্র যে-রকমভাবে চাকরি খুঁজছিল, ১৯৪৬ সালের আগে ফাঁকে ফাঁকে জীবনানন্দও হয়তো একটা মাস্টারির চাকরি খুঁজছিলেন।

> কলকাতায় চাকরি কেন চাচ্ছে নিশীথ? জলপাইহাটিতে না হোক, মফস্বলের অন্য কোনো কলেজে কাজের চেষ্টা করলেই পারে; পেয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু না। মফস্বলের প্রকৃতি সে ভালবাসে, লোকজনদেরও ভাল লাগে তার। কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে নানা রকম প্রাণঘনতা ও গহনতার ভিতর অন্তঃপ্রবেশ করতে চায় সে, অনেক দিন একা থেকেছে, এককও থেকেছে, এবার নিজেকে সরিয়ে নিয়ে জনমানুষদের আলোড়ন দেখবে সে, যদি পারে। মর্যাদা দিতে চেষ্টা করবে সে জিনিসটাকে, যেখানে-যেখানে সুযোগ হয়, সম্ভব হয়, যে-জিনিসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

> সহজাত শ্রী ও সম্ভার ও প্রতিভা দেখে নতুন করে হয়তো কিছু শিক্ষা করতে পারবে তার মন।[৫২]

নিশীথের ছেলেটি বাবার মন বোঝে, এমনকি তার বাবা যা করে তার ব্যাখ্যা দিয়ে তার যথার্থতা সমর্থনও করে। পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার পণ করা সুলেখাকে হারীত বলে :

> 'নিশীথবাবু যে পাকিস্তান ছেড়ে ইউনিয়নে চলে গেছেন এটা আমাদের আবিষ্কার, তিনি নিজে জানতেন না যে তিনি ইউনিয়নে গেছেন, তিনি যে পাকিস্তানে ছিলেন সে ধারণাও তাঁর নেই। পাকিস্তান বা ইউনিয়ন বা কোনো পলিটিকস নয়, অন্য জিনিস তাঁকে বায়ুভূত করেছে। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার অনেক আগে গত চার-পাঁচ বছর ধরেই তিনি কলকাতায় কাজের চেষ্টায় আছেন। তাঁর কলেজ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দেয় নি, তাঁর পরিবারও তাঁকে ঠকিয়েছে, এ সব বিষয়ে শেষের দিকে তিনি খুব হদ্দ হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতায় কেউ তাঁর ঢেঁকিকলে পাড় দিতে আসবে না—পড়ে থাকবে ঢেঁকিটা। এখানে বসে আমরা তাঁকে ইউনিয়নের শ্রীখোল মনে করে তবলায় চাঁটি মারছি। এ সব মানুষ আজকের পৃথিবীতে প্রাপ্য তো দূরের কথা কোনো পথই খুঁজে পান না। কী ধারণা ছিল নিজের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে নিশীথবাবুর? দেড়শ টাকা মাইনে পাচ্ছিলেন, দুশ টাকা চাচ্ছিলেন, সাতশ টাকা দাবি করতে পারলেন না? কী দোষ হত তাতে? কিন্তু তবুও পৃথিবীর দেনেওয়ালারা সব সময়েই ভালমানুষ। তাই তাঁকে দেড়শ টাকাই দেওয়া হচ্ছিল তো; ছেলেমানুষি করে এত বড় টাকাটা ফেলে তিনি ইউনিয়নে চলে গেলেন আরো বেশি টাকা পাবার আশায়? না কি কম পেয়ে বেশি মর্যাদা চাইছেন বলে?'[৫৩]

মফস্বল থেকে আসা এক মধ্যবয়সী ইংরেজি অধ্যাপকের পক্ষে ১৯৪৭-৪৮ সালের কলকাতায় একটা চাকরি জোটানো যে কত কঠিন হতে পারে, সেটা আমরা নিশীথের চোখ দিয়েই দেখতে পাই। প্রথম দিকে শুধু নমিতার সঙ্গের অধ্যায়টুকু বাদ দিলে পুরোটাতে আছে কলকাতায় নিশীথের ক্রোধ, হতাশা আর অপমানবোধ। তবুও প্রথম দৃশ্যে নমিতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে একটা নীরব অপমানবোধ দেখা যায়। খাবার খেয়ে এসেছে বলে নিশীথের বিনয়ী অথচ মিথ্যে দাবিকে সত্য ধরে নিয়ে বাড়ির কর্তা এই সচ্ছল তাঁর এককালের সহপাঠী তাঁকে কিছু খেতে সাধে না বলে নিশীথ অপমান বোধ করে। তাই জিতেন শুতে গেলে সে তার ফ্রিজে হানা দিয়ে সকালে যা নাশতা খাওয়ার জন্য রেখেছিল, সব সাবাড় করে ফেলে। পরদিন সকালে তার ফ্রিজ খালি দেখে খালিপেটে অফিসে চলে যায় জিতেন। নিশীথের মধ্যে কোনো অপরাধবোধ জাগে না।

নমিতার সঙ্গে সারা রাত কাটানোর পর সকালে নিশীথের সঙ্গে 'দেখা হয় (একটিমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া) অর্থলোলুপ, অশিষ্ট, নীচ, ছোটমনের লোকজনের সঙ্গে; যারা প্রমাণ করে যে জীবন মূলত ন্যায়বিচারহীন ও মধ্যমমানের লোকেরাই পৃথিবীটা দখল করেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিশীথ যাতে করুণার পাত্র না হয়ে কেবল সৎ ও পরাভূতদের দলে থাকে, সে ব্যাপারে জীবনানন্দ সতর্ক ছিলেন। তার পরও নিশীথের মধ্যে কিছুটা অহেতুক গর্ববোধ ছিল। ছুটির দরখাস্ত করে মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা কম জেনেও কলকাতায় চলে গিয়ে সে জলপাইহাটি কলেজের চাকরিটি বস্তুত ছেড়ে দেয়।

তার ছেলে হারীত, বাবার সঙ্গে কিছু সমস্যা হয়েছিল বলে বেশ কিছুদিন ধরে কলকাতায় বসবাস করছিল এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদের দর্শন অনুশীলন ও সংগঠনকারী কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে তার কর্মকাণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ায় সে ও তার বন্ধুবান্ধব একটা দল তৈরি করে। নামহীন এই দলটি নিয়ে আমাদের কথক কিছুটা ঠাট্টাতামাশা করেন।

> 'তুমি কম্যুনিস্ট হয়ে গেছ হারীত?'
>
> তিন-চারটে জানালা খুলে হাওয়ায় একটু ঢুলছিল হারীত বিছানার এক কোণায়; সব কথা কানে গেল না তার।
>
> 'বলি, ও হারীত। হারীত।'
>
> 'কেন, বল।'
>
> 'শুদোচ্ছিলুম তুমি কি কম্যুনিস্ট হয়ে গেলে?'
>
> 'কম্যুনিস্ট? না। আমাদের আর-এক পার্টি।'
>
> 'কী নাম তার?'
>
> 'কোনো নাম নেই', হারীত বললে, 'বলতে পার সোস্যালিস্ট, কিন্তু কংগ্রেস সোস্যালিস্ট না। আরো আট-দশ রকমের সোস্যালিস্ট পার্টি দেখা দিয়েছে। 'এ'-র থেকে 'জেড' অব্দি ইংরেজি অক্ষর সাবাড় হয়ে গেছে পার্টিগুলোর নাম দিতে-দিতে। কাজে-কাজেই আমরা আর কোনো বর্ণমালা ব্যবহার করব না, কোনো নাম দিচ্ছি না পার্টির—।'[৫৪]

হারীতের বেনামি পার্টি কোনো তাড়াহুড়ো না করে ভারতে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের লক্ষ্যে স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করে যায়। যেদিন নিশীথ কলকাতার উদ্দেশে জলপাইহাটি ছাড়ে, হারীত বাড়ি ফেরে সেদিন। কেউ বলে হারীত প্রথম থেকেই গোপনে জলপাইহাটিতেই ছিল, ওর বাবা চলে যাওয়ার পর উদয় হয়েছে কেবল, হারীত অস্বীকার করে সে কথা।

নিশীথের আরও দুই সন্তান আছে, দুজনই অবিবাহিতা মেয়ে। কেউই বাড়িতে থাকে না। বড়টি রানু, রহস্যজনকভাবে উধাও। এ কথা বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে জলপাইহাটির কুখ্যাত (হিন্দু) লোকজনের কেউ একজন হয় তাকে অপহরণ করেছে অথবা তার সঙ্গে কলকাতা চলে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছে। কেউ জানে না। এ ব্যাপারে থানা-পুলিশ কিছু করা হয়নি। নিশীথ নিজে কিছু খোঁজখবর করেছিল, তাতে কোনো ফল হয়নি। সে ভাবে, শুধু গুজবের ওপর ভিত্তি করে তাকে কলকাতায় খুঁজে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না।

দ্বিতীয় মেয়ে ভানু যক্ষ্মা রোগী। ওকে পাঠানো হয়েছে মামার কাছে। মামা থাকেন স্যানাটোরিয়াম আছে এমন এক শহরে। নিশীথের কলকাতাবাসের প্রথম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দিন সে যখন নমিতার সঙ্গে গল্প করছিল, তখন কাজের লোকটি এসে জানায়, একজন লোক নিশীথ সেনের সঙ্গে দেখা করতে চায়। এক তরুণ ডাক্তার আসে। সে জানায়, সবে কলকাতায় এসেছে ও। নিশীথের শ্যালকের কাছে শুনেছে, কলকাতায় এলে নিশীথ তার বন্ধু জিতেন দাশগুপ্তের বাসায় উঠবে। আমরা জানতে পারি, ভানু স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি হতে পারেনি, বেড খালি নেই। আরও জানা যায়, নিশীথ কখনোই ওর মেয়েকে দেখতে যায়নি। মেয়েটি কেমন আছে জানতে চেয়ে একটা চিঠিও লেখেনি কখনো। এখন তার স্বাস্থ্য ভালোই দেখা গেলেও নিশীথ নিজের অসুস্থতার দোহাই দেয়। তার শ্যালক ভানুকে এত দিন রাখলেও আর রাখতে পারবে না। দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুরে পশ্চিমবঙ্গের আরেকটা বড় যক্ষা হাসপাতাল আছে। সেখানেও কোনো বেড খালি নেই। তবে দয়ালু তরুণ ডাক্তার জানায়, সে ও তার মা অসুস্থ ভানুকে কলকাতায় তাদের বাড়িতে রেখে সাহায্য করতে চায়। নিশীথ আগ্রহের সঙ্গে তার মেয়ের চিকিৎসার ভার এই তরুণ ও সম্ভবত কিছুটা রোমান্টিকভাবে অনুরক্ত ডাক্তারের ওপর ছেড়ে দেয়।

আমরা নিশীথ সম্পর্কে যা-ই ভাবি না কেন, একজন পারিবারিক মানুষ হিসেবে (জীবনানন্দের বিপরীত, যার প্রকৃত পারিবারিক জীবন মাল্যবানের সঙ্গে মেলে, নিশীথের সঙ্গে নয়) আমরা *জলপাইহাটিতে* জীবনধারণের উপায় খোঁজা এক ব্যক্তির দেখা পাই; আমাদের সহানুভূতি না পেলেও একটা অন্যায্য ব্যবস্থা ও অবিচারকে যারা বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদের প্রতি সে যে ক্ষোভ অনুভব করে—অন্তত পক্ষে আমাদের সেটা উপলব্ধি করায়।

প্রথম যে ব্যক্তির সঙ্গে সে দেখা করতে যায়, প্রফেসর ঘোষ, তাঁর বাড়িতে ঢোকার মুখে নৃপেণ নামের এক তরুণের মুখোমুখি হয় নিশীথ। প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে কী কাজ, সেটা জানাতে হবে তাকে ওপরতলায় ঢোকার আগে। খানিকটা হতভম্ব হয়ে নিশীথ একটা চালাকি করে। সে আজ সকালে তার যক্ষাক্রান্ত মেয়ের ব্যাপারে যে ডাক্তার দেখা করতে এসেছিল নিজেকে সে রকম এক চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দেয়। কেরানিবাজ ছোকরাটি বিগলিত হয়ে যায়, এমনকি কিছুটা শ্রদ্ধাশীলও। কিন্তু নিশীথ তার মিথ্যা পরিচয় থেকে সরে আসে। তরুণটিও তার আগের কর্তৃত্বের অবস্থানে ফিরে যায়। প্রফেসরের স্ত্রী মোহিতা দৈবাৎ সেখানে এসে পড়ে এবং গত চার-পাঁচ বছরে কয়েকবার আসা-যাওয়ার কারণে নিশীথকে চিনতে পারে। নিশীথকে আন্তরিকতা নিয়ে আপ্যায়ন করে সে। দুজন গল্প করতে করতে তাকে কলকাতায় একটা শিক্ষকতার চাকরি পাওয়ার ইচ্ছার কথা জানায় নিশীথ। মোহিতা তাকে ভরসা দিয়ে জানায়, কোনো সমস্যা নেই। প্রফেসর ঘোষ তো নৃপেণকে তিনটি কলেজে তিনবার চাকরি দিয়েছেন। অবশ্য তিন জায়গা থেকেই সে চাকরি হারিয়েছে। তবুও তাতে কিছু আসে যায় না। বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রের ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে প্রফেসরের সম্পর্কের কারণে তিনি তাঁর লোকদের চাকরি দিতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

প্রফেসর ঘোষ আক্রোশবশত তাঁর লাইব্রেরির বইগুলো কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরির বদলে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিকে দেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন (বাঙালিরা, বিশেষ করে, কলকাতা ইউনিভার্সিটি তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেয়নি বলে মনে করেন তিনি)। তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে এলে তাঁর স্ত্রী ও নিশীথের মুখোমুখি হন। তাঁরা দুজন স্কটিশ চার্চ কলেজে একসঙ্গে পড়াশোনা করলেও প্রফেসর ঘোষ দেখা হলে সব সময়ই নিশীথকে চিনতে ব্যর্থ হন। এবারও তার ব্যত্যয় ঘটে না। ঘোষপত্নী নিশীথের ব্যাপারটা সুপারিশ করেন, তবে তাঁর স্বামী আপত্তি করেন। কথাচ্ছলে কিছুটা ছদ্মবিনয়ের সঙ্গে বলেন, একজনকে মাস্টারির চাকরি পাইয়ে দেওয়ার মতো তিনি কে। নিশীথ নিজ থেকেই বলে, সে সেকেন্ড ক্লাস এমএ।

> প্রফেসর উঠবার উপক্রম করে বললেন, 'কলেজে কাজ করতে গেলে তো আমাদের ইউনিভার্সিটির ফার্স্টক্লাস ডিগ্রি থাকা চাই-ই, তাছাড়া—'
>
> মোহিতা বাধা দিয়ে প্রফেসরের কথা কেটে ফেলবার চেষ্টা করে বললে, 'কোন ক্লাস পেয়েছে তা দিয়ে টিচারের গুণ যাচাই করবার মত মনে ঢিলেমি তোমার নিশ্চয়ই নেই।'
>
> বাধা দিয়ে প্রফেসর বললেন, 'আছে।'
>
> 'আছে?'
>
> 'হ্যাঁ, আছে।'
>
> মোহিতা বিক্ষুব্ধ হয়ে বললে, 'নিশীথবাবুর পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে কলেজে কাজ করবার—'
>
> প্রফেসর মোহিতার কথা শেষ না-করতে দিয়েই বললেন, 'বেশ ভাল জিনিস, কিন্তু ফার্স্টক্লাস পেলে আরো ভাল হত।'
>
> 'এ কেমন কথা হল? একথা আমাদের কোন দিকে নিয়ে যায়?'
>
> 'ফার্স্টক্লাশ ডিগ্রি থাকলেই ঠিক হত', প্রফেসর বললেন, 'শুধু পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের বিশেষ কোনো দিকে নিয়ে যায় না।'
>
> 'কী মূল্য আছে এ সব ইউনিভার্সিটির ফার্স্টক্লাসের?' মোহিতা যেন সিংহের উপর লাফিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, যেন মহিষাসুর এ সব ইউনিভার্সিটির ফার্স্টক্লাশ ডিগ্রিগুলো।
>
> প্রফেসর হেসে বললেন, 'নেই? সেকেণ্ড ক্লাসের বুঝি বেশি জেল্লা?'
>
> 'মূল্যের কোনো যাচাই হয় না আমাদের দেশে।'
>
> প্রফেসর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার ভিতরে কাজ আছে।'
>
> 'নিশীথবাবুকে তো তুমি কোনো কথা দিলে না।'
>
> 'নিশীথবাবু আর-একটা এম-এ দিন। ইংরেজির টিচার, হ্যাঁ, তবে ইংরেজিতেই দিন। একটা ফার্স্টক্লাশ জোগাড় করুন, ফার্স্ট না হলেও হবে।'
>
> প্রফেসর কারুর দিকে না-তাকিয়ে নিজেরই জ্ঞান-শালীনতার হিম্মতে তৈরি বাড়ির বিচিত্র গালচেগুলোর দিকে, মেঝের ভিত্তিরেখাগুলোর স্বর্গীয় জ্যামিতির দিকে, তাকাতে-তাকাতে বললেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁর অফিসে ঢোকার আগে প্রফেসর ঘোষ পরম বিজ্ঞের মতো তাঁর সতীর্থকে উপদেশ দেন :

> 'আজকাল ইংরেজির দাম কমে যাচ্ছে', প্রফেসর বললেন, 'কয়েক বছরের মধ্যেই ইংরেজির বিশেষ কোনো দরকার থাকবে না। বাংলা তো রাষ্ট্রভাষা হল পশ্চিমবাংলায়, নিশীথবাবু যদি সাহিত্যের টিচার থাকতে চান তা হলে বাংলায় এম-এ দিয়ে ফার্স্টক্লাশ পেলে সুবিধে হবে তাঁর।'[৫৫]

ঘোষপত্নী আদর্শ বাঙালি বউদের চরিত্রের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। অতিথির পক্ষ নিয়ে তিনি সমানে স্বামীর বিরুদ্ধে তর্ক করতে থাকেন। প্রফেসর ঘোষ তাঁর অফিসের দিকে এগিয়ে গেলে তিনি আবার স্বামীর কাছে জানতে চান, নিশীথের ব্যাপারে তাঁর কী ভাবনা। প্রফেসর বলেন :

> 'নিশীথবাবু তো সেকেন্ড ক্লাশ এম-এ।'
>
> 'তুমিও তো সেকেন্ড ক্লাশ এম-এ', মরীয়া হয়ে বললেন মোহিতা।
>
> 'নিশীথবাবু তো সেকেন্ড ক্লাশ এম-এ', প্রফেসর একটু কাঁধ নাচিয়ে হেসে নিজের ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন।[৫৬]

ঘোষদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিশীথ দেখা করতে যায় তার কয়েক বছরের ছোট দীর্ঘদিনের পরিচিত সেই কুলদাপ্রসাদের সঙ্গে। তার সমসাময়িক এই লোকটি যাতে তাকে ছাড়িয়ে যেতে না পারে, সে জন্য নিশীথ জানায়, যে মফস্বল কলেজে সে পড়ায়, সেখানে তার ভাইস প্রিন্সিপাল হয়ে যাওয়ার কথা, বেতন ৩০০ টাকা, তার সঙ্গে মহার্ঘ্য ভাতা হিসেবে ৫০ টাকা—তারপর সরাসরি একটা চাকরি চায় সে।

> 'আমাকে কলকাতার কলেজে একটা কাজ দিতে হবে কুলদা।'
>
> 'এত দিন পরে এ বয়সে কলকাতায় কাজ নিলে সেই প্রথম থেকে শুরু করতে হবে তো তোমাকে নিশীথ। ডুবে মরবে।'
>
> 'প্রথম থেকে কী রকম?'
>
> 'মফস্বলে তো তুমি ভাইস প্রিন্সিপ্যাল।'
>
> 'তা তো আছি।'
>
> 'পাচ্ছ সাড়ে তিনশ। এখানে কত আশা কর তুমি?'
>
> 'কত দেবে?'
>
> 'কোন ক্লাস এম-এ তুমি?'
>
> 'সেকেন্ড ক্লাস।'
>
> কুলদা একটু দমে গিয়ে বললে, 'সেকেন্ড ক্লাস—'
>
> 'তুমিও তো সেকেন্ড ক্লাস কুলদা—'
>
> কুলদা খানিকটা কৌতুক বোধ করে নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার সেকেন্ড ক্লাস নিয়ে চব্বিশ বছর আগে এ কলেজে ঢুকেছি। ফার্স্ট ক্লাসের বাবা তো আমি আজ। কিন্তু তুমি তো সেকেন্ড ক্লাস—'
>
> 'কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসের বাবা হলাম না কেন আমি! আমি তো চব্বিশ বছর কলেজে কাজ করেছি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'তা করেছ, কিন্তু আমাদের কলেজে কর নি তো।'

'ওঃ, তুমি আমির, নিজেদের কলেজে তোমাদের?'

'বুঝেছ তুমি', কুলদা সিগারেটের ধোঁয়া ঘনিয়ে ছাড়তে-ছাড়তে বললে।

'রিপনে না, প্রেসিডেন্সিতে না, স্কটিসে না?'

'ও-সব জায়গায় আলাদা উজির-আমির সব।'

'সেকেন্ড ক্লাস ডিগ্রি নিয়ে?'

'সেকেন্ড ক্লাস—থার্ড ক্লাস—ফার্স্ট ক্লাসও আছে কম না।'

'ও—তা এই রকম বুঝি', নিশীথ বললে, 'এর চেয়ে ঢের ভাল হতে পারত, কিন্তু এ যা হয়েছে এও খুব বেশি খারাপ নয়।'

টিনের থেকে একটা সিগারেট খসিয়ে নিয়ে দেশলাই খুঁজছিল; সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে নিশীথ বললে, 'এ কলেজের ভাসুর ও-কলেজে কাজ নিতে গেলে ও-কলেজের ভাদ্রবৌদের মধ্যে ওরা ভিড়িয়ে দেবে বুঝি তাকে।'

'তাই তো দেবে, মফস্বলের ভাসুরদের একেবারে ন-বৌরা এসে চেপে ধরবে নেবে নাকি কলকাতার কলেজে কাজ?'

'কী রকম মাইনে পাওয়া যাবে?'

'সকালে নেবে, না রাত্তিরে?'

'তার মানে?'

'মানে আমাদের কমার্স ডিপার্টমেন্টের কথা বলছি।'

নিশীথ বিরক্ত হয়ে বললে, 'কমার্স ডিপার্টমেন্টে কেন কাজ করব আমি। এমনি জেনেরাল ডিপার্টমেন্টে চাই।'

কুলদা বাটার থেকে একটা পান তুলে নিয়ে মুখ দিয়ে বললে, 'জেনেরাল ডিপার্টমেন্টে কোনো ভেকেন্সি হয় না। হলেও ফার্স্ট ক্লাস, বিলিতি ডিগ্রি, ডক্টর এ ছাড়া নেওয়া হয় না কাউকে।'

'কলেজের এক্স-স্টুডেন্টদের নেওয়া হয় না?'

'ফার্স্ট ক্লাস না পেলে—'

'গভর্নিং বডির শালা ভায়রা-ভাইদের নেওয়া হয় না?'

'সেকেন্ড ক্লাস পেলে?'

'থার্ড ক্লাস না পেলে?'

'তা নেওয়া হবে বৈকি। নানা রকম কোড আছে কলেজে। কলেজ তো একটা উচ্ছৃঙ্খল জায়গা নয়। তোমাকে এখন দুশ টাকায় আমাদের কলেজে ঢোকালে সেটা বিশৃঙ্খলা হবে।'

'কেন?'

'তুমি তো সেকেন্ড ক্লাস এম-এ নিশীথ।'

'তুমিও তো সেকেন্ড ক্লাস কুলদা।'

'আ মল যা!' কুলদা একটু ঝেঁজে উঠে বললে, 'তোমাকে এত ক্ষণ তা হলে বোঝালুম কী।'

নিশীথ এক খিলি পান তুলে নিয়ে পানের লঙ্গটা খসিয়ে মুখে ফেলে দিয়ে বললে, 'মানে তুমি মাগ-ভাসুর হয়ে গেছ কলেজের আর আমি যমপুকুরের ব্রত করছি—সেই কথাটা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কুলদা পান চিবুতে-চিবুতে একটা চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'সেই কথাটা। তা ছাড়া কলেজের গভর্নিং বডির লাডলি চাটুজ্যে, লর্ড মুখুজ্যে, বোকা বাঁড়ুজ্যের কেউ নও তো তুমি? নাকি, কেউ হও তুমি?'

'ওদের কে আমি?'

'তবে কী করে দুশ টাকায় ঢোকাব তোমাকে?'

'কত টাকায় ঢোকা যেতে পারে?'

'একশ টাকায়।'

'দেবে জেনেরালে?'

'না। নাইটে; কমার্সে। টেম্পরারি হিসেবে।'

নিশীথ একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে থেকে, তারপরে বললে, 'সব জায়গায়ই এই রকম কুলদা? কলকাতার সব কলেজেই?'

'সব কলেজেই। তোমাকে রেখে-ঢেকে কথা বলে ধোঁকা দিয়ে কী লাভ। একই দেশের মানুষ তো আমরা। আমি আজ করে খাচ্ছি কলকাতায়। তুমি গোঁফ চুমড়ে পথ খুঁজছ। কোনো পথ পাবে না কলেজে—একশ টাকায় কমার্সে কাজ নিয়ে মান খোয়াবে তুমি নিশীথ?'

কুলদা পান তুলে নিয়ে চিবুতে লাগল। বেশ পান বানিয়েছে ললিতা। ললিতার দিদি, কুলদার স্ত্রী, গেছে নর্থ ক্যালকাটায় ভাইয়ের বাড়িতে। আজ রাতে ফিরবে না হয়তো। শ্যালিকাকে গল্প শোনাতে হবে আজ বেশি রাত অব্দি। বেশ ছাই জমেছে চুরুটের মুখে : ভারি আমেজ লাগছিল কুলদার।

খবরের কাগজের অফিসে দেখ তুমি নিশীথ। দেড় শ-দু শ পেলে ঢুকে যাও। নাঃ পাকিস্তানে গিয়ে আর কী করবে। কলকাতায় থাকো, কলকাতায় থেকে যাও।[৫৭]

যারা একাডেমিক চক্রের সঙ্গে যোগ দেয়নি, তাদের বিবেচনার বাইরে রাখার জন্য যথাযোগ্য ডিগ্রি চাওয়া হয়। তবে যোগ্য হোক বা না হোক, যখন মান তেমন উন্নত ছিল না, তখন যারা এই চক্রে যোগ দিয়েছিল তাদের বহিষ্কার করার জন্য নয়।

কুলদার বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর নিশীথ মরিয়া হয়ে জয়নাথ নামের এক কলেজ প্রশাসকের সঙ্গে দেখা করে একটা শেষ চেষ্টা করে। গত কয়েক বছরে সে কয়েকবার তার সঙ্গে দেখা করে, প্রত্যেকবারেই একই কারণে এবং একই পরিণতি হয় : হতাশা। জয়নাথ তার বাবা ও কাকাদের সঙ্গে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল। তখন পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের চলে আসার ফলে নতুন সব কলেজ চালু হচ্ছিল এবং যেগুলো চালু ছিল, সেগুলো বড় হচ্ছিল (ভর্তি বেড়ে যায়, তবে জয়নাথ কলেজের শিক্ষকের সংখ্যা অপরিবর্তিত রেখে মুনাফা বাড়াচ্ছিল)। স্কটিশ চার্চ কলেজে নিশীথের তিন বছরের সিনিয়র ছাত্র জয়নাথও ছিল বৈদ্য (নিশীথ ও জীবনানন্দের মতো), ওর বাবাও ব্রাহ্মত্ব গ্রহণ করেছিলেন (জীবনানন্দের ঠাকুরদার মতো)। বহু বছর আগে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার পর নিশীথের ঠাকুরদা জয়নাথের বাবার বন্ধু হয়ে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গয়ানাথবাবু যখন সস্ত্রীক ব্রাহ্ম হলেন তখন হিন্দু সমাজের আত্মীয়েরা তো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল গয়ানাথবাবুকে। পথে বেরুলেই দুয়ো দিত স্বামী-স্ত্রীকে সেকালের হিন্দুরা। কোনো চাকরি নেই বাকরি নেই, এক বস্ত্রে বেরিয়ে যেতে হল। আমার ঠাকুর্দা তখন হালিশহরে চাকরি করতেন; তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন গয়ানাথবাবু, শুনেছি বাবার কাছে। গয়ানাথবাবুর আত্মীয়েরা হালিশহর পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল গয়ানাথবাবুকে, হানাবাড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠাকুর্দার ঘর ক খানা। তেড়িয়ে হয়ে ছুটে এসে আত্মীয়েরা পচা মুর্গির ডিম নাকে-মুখে ছুঁড়ে গয়ানাথবাবুকে নাকাল করত; বলত, বেম্মো হয়েছিস, নে খা হোমাপাখির ডিম খা; একদিন একশটা পচা ডিম দিয়ে গয়ানাথবাবুকে গঙ্গাস্নান করিয়ে দিলে; তিনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সহ্য করলেন সব। ঠাকুর্দা সেদিন বাড়ি ছিলেন না। আশ্চর্য, মহানুভব মানুষ বটে গয়ানাথবাবু। অহিংসা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রচার করেছিলেন গান্ধীজিও! সে কালের ব্রাহ্মরাও নিজেদের জীবনে এসব খুব দেখিয়ে গেলেন বটে।[৫৮]

যাকে কৃতজ্ঞতার ঋণ বলা উচিত, তার কথা মনে করিয়ে দিলে জয়নাথবাবু বিরক্ত হন। গত বছর একটা চাকরির প্রস্তাব সম্পর্কে চাপাচাপি করলে জয়নাথ সমুচিত জবাব দেন :

'সে কাজটা মতিমোহনবাবুর ছেলেকে দিতে হল।'

'মতিমোহনবাবু কে?'

'আমার মাথা আর মুণ্ডু। শোহরাওয়ার্দি মিনিস্ট্রির সময় একটা বড় চাঁই ছিলেন। এখন তো গড়াচ্ছেন। দশ বাঁও জলের নীচে তলিয়ে গেছেন।'

'মতিমোহনবাবুর ছেলেকে রেখেছেন আপনাদের কলেজে?'

'নাঃ। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, পনেরই আগস্টের আগেই স্যাডো মিনিস্ট্রি হতে না-হতেই।'

'তাড়িয়ে দিতে হল!' নিশীথ একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে বললে।

'সেকেণ্ড ক্লাস তো।'

'ঢুকেছিল কি ফার্স্ট ক্লাস ভাঁওতা দিয়ে?'

'চোখ মেলেই ঢুকিয়েছিলুম। কিন্তু স্যাডো মিনিস্ট্রির রাজ্যি; আর-একজন লোককে নিতে হল তার শাশুড়িকে খুশি করবার জন্যে।'

'শাশুড়ি?' নিশীথ জয়নাথকে না বলে নিজেকেই যেন বললে আস্তে—কোনো উত্তর দাবি না করে—'শাশুড়ির সঙ্গে স্যাডো মিনিস্ট্রির কী সম্পর্ক?'

'তা-হলে কি শ্বশুরের সঙ্গে হবে?' জয়নাথ চুরুটে আস্তে টান দিয়ে বললে, 'পিসশ্বশুর তো সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, মাসিশাশুড়ির পেছনে।'[৫৯]

চরমে টেনে আনা রাজনীতি ও পিতৃতন্ত্র! আরও একটু জোরাজুরি করলে জয়নাথ যে অনাগত দুর্দশার আতঙ্ক দিয়ে প্রত্যাঘাত করে, সেটা নিশীথকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে :

'একটা কাজ দিতে হবে আমাকে আপনার কলেজে।'

'আপনি তো সেকেন্ড ক্লাস এম-এ নিশীথবাবু।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> 'কত সেকেন্ড ক্লাস তো কলেজে প্রিন্সিপ্যালি করছে—'
> 'অনেক আগে ঢুকেছিলেন ওঁরা। আমাদের কলেজে কমার্সে কাজ নেবেন?'
> 'কত মাইনে হবে জয়নাথবাবু? দু শ পাওয়া যাবে?'
> 'না, এক শর বেশি দিতে পারব না আমরা; টেম্পরারি বেসিসে। তবে এখন কোনো ভেকেন্সি নেই। পরে হতে পারে, শকুনের বাচ্চারা ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে খোঁজ নেবেন আপনি, আচ্ছা?'[৬০]

ঘটনাস্থল যে কলকাতা থেকে জলপাইহাটি, জলপাইহাটি থেকে কলকাতা আসা-যাওয়া করেছে, জয়নাথের সঙ্গে সাক্ষাতের শেষে উপন্যাসের বাকি অংশে সঠিক জায়গা ফিরে যায় মফস্বল শহরে। শেষ দৃশ্যে স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে নিশীথ বাড়ি ফিরে আসে। সে জানতে পারে, তার মেয়ে ভানুও যক্ষ্মায় ভুগে মারা গেছে। ব্যাপারটা যদিও কখনো আলোচনায় আসেনি, আমরা ধারণা করতে পারি, সে কোনো চাকরি পায়নি। ১৯৪০-এর দশকের শেষ দিকে কলকাতায় আরেকটা শিক্ষকতার চাকরি খুঁজতে এসে নিশীথের মতো একই অবস্থা হয়েছিল, জীবনানন্দের যদিও তাঁর পরিবারকে *জলপাইহাটিতে* উপস্থাপিত নাটকীয়, সদা রোমান্টিক ভাগ্যের উত্থান-পতনের শিকার হতে হয়নি—এটা নিশ্চিত। উপন্যাসটি জোরালোভাবে যা উপস্থাপন করে, সেটা হচ্ছে জীবনানন্দ ও তাঁর মতো অন্যদের একটা সানন্দে গ্রহণীয় দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবস্থায় যা সহ্য করতে হয়েছে। উপরন্তু একসময় জীবনানন্দ সঞ্জয়ের *পূর্ব্বাশায়* যে স্মৃতিচারণা লিখবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, তাঁর জীবনের তথ্য ও স্বাধীনতা-উত্তর পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে উপন্যাসটি তার খুব কাছাকাছি।

কয়েক বছর ধরে তাঁর কবিতায় আমরা যা লক্ষ করছিলাম—বাইরের জগৎকে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর অন্তর্জীবনে কেন্দ্রীভূত হওয়া থেকে সরে যাওয়া—এ-যাবৎ প্রকাশিত তিনটি উপন্যাসে সেটা আমরা আবার দেখতে পাই। তিনি যখন মাল্যবানের মতো একটা চরিত্র সৃষ্টি করেন, যিনি ব্যক্তিত্বে জীবনানন্দের সঙ্গে মিশে যান, উপন্যাসটি সফল হয়ে ওঠে। আর তিনি যখন তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছাড়ার উদ্বেগ এবং একটা চাকরি পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় সম্প্রতি কলকাতায় আসা ইংরেজিতে সেকেন্ড ক্লাস এমএ ডিগ্রি পাওয়া ৪৮ বছর বয়স্ক একজন কলেজশিক্ষকের হতাশার কথা লেখেন, তাঁর উপন্যাসটি হয়ে ওঠে আকর্ষণীয়, বিশ্বাস্য ও শক্তিশালী। এককথায় *সুতীর্থ* জীবনানন্দের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কিছুটা বাইরে কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে না কিংবা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে না। অন্যদিকে বিভিন্নভাবে তাঁর জীবনের বাস্তবতা থেকে সৃষ্ট *মাল্যবান* ও *জলপাইহাটি* চমকপ্রদভাবে উতরে যায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তথ্যসূত্র

১. আতাউর রহমানের সাক্ষাৎকার। এটি কোনো আর্কাইভসে দেওয়া হয়নি বলে এখন আর পাওয়া যায় না।

২. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; এই সূত্র থেকে জানা যায় যে জীবনানন্দের চাকরির পেছনের মূল শক্তি ছিলেন সঞ্জয় (দ্রষ্টব্য, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'সঞ্জয়দা', *দেশ,* ৩ ফাল্গুন ১৩৭৫, ২৯৫-৯৬)। আতাউর রহমান জানান, সঞ্জয়ের সহকর্মী সত্যপ্রসন্ন দত্ত কলকাতায় এসে 'স্বরাজে' চাকরি নেওয়ার জন্য জীবনানন্দকে প্ররোচিত করেছিলেন। তিনি আরও জানান, পত্রিকাটির পরিচালনা বোর্ড জীবনানন্দকে নেওয়ার ব্যাপারে সত্যপ্রসন্নর প্রস্তাবের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, তবে শেষ পর্যন্ত সম্মতি দেয়।

৩. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার।

৪. জগদীশ শরণ শর্মা, *ইন্ডিয়া সিন্স দ্য অ্যাডভেন্ট অব দ্য ব্রিটিশ, আ ডেসক্রিপটিভ ক্রনোলজি ফ্রম ১৬০০ টু অক্টোবর ২, ১৯৬৯* (দিল্লি : এ চান্দ অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৭০), ৩০২-৩।

৫. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'সঞ্জয়দা', ২৯৫-৯৬।

৬. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার। শিক্ষকের প্রতি নিরঙ্কুশ শ্রদ্ধা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সারা জীবন থেকে যায়। এমনকি যদি ছাত্রটি সরকারের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাও হয়ে যায়, তবুও কোথাও দেখা হয়ে গেলে সে প্রাক্তন শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব বজায় রাখবে।

৭. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার। লেখাটি তাঁর স্ত্রী সুষমা রায়ের নামে ৪ ফাল্গুন, ১৩৫৩ (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭) তারিখে ছাপা হয়।

৮. পাণ্ডুলিপিটি ১ আগস্ট, ১৯৫৪ তারিখের একটা চিঠির মধ্যে ছিল। কোনো কারণবশত এটি কোথাও ছাপা হয়নি।

৯. 'বিলাস', *জীবনানন্দ দাশের গল্প,* সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তফী সম্পাদিত।

১০. মঞ্জুশ্রী দাশের সৌজন্যে। ছুটু মাসি, মেসোমশাই, সৃজয়—এরা এন কে ঘোষের পরিবারের। পিসিমণি হচ্ছেন কবির ছোটবোন সুচরিতা দাশ, ননীপিসি আত্মীয় নন, তবে তমলুকে সুচরিতার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

১১. যে নোটবইয়ে এটি পাওয়া যায় তার তিনটি অংশ—নভেম্বর ১৯৫১, জুন ১৯৫২ ও ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫২। ৭.৭ তারিখটি সম্ভবত ৭ জুলাই ১৯৫২। কারণ, এটা যে নোটবইয়ে পাওয়া যায়, সেটার তারিখ সে বছরের। জীবনানন্দ নিশ্চয়ই তাঁর বাড়িওয়ালার লেখা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নোটটি টুকে রেখেছিলেন। আমি রেন্ট কন্ট্রোলের কাগজপত্র ঘেঁটে দেখেছি, তবে জীবনানন্দকে জড়িয়ে কোনো মামলা পাইনি। আমাকে সেসব নথি দেখতে দেওয়ার জন্য আমি রেন্ট কন্ট্রোল আদালতকে ধন্যবাদ জানাই। অশোকানন্দ দাশের মতে ১৯৫২ সালে কোনো মামলা হয়নি। বাড়িওয়ালার সঙ্গে আমি দেখা করলে তিনি এ বিষয়ে কোনো আলাপ করতে চাননি।

১২. লাবণ্য দাশের সাক্ষাৎকার।

১৩. রমেশচন্দ্র সেনের সাক্ষাৎকার।

১৪. মেজর এইচ কে মজুমদারের সাক্ষাৎকার।

১৫. ২ জুলাই, ১৯৪৬ তারিখে লেখা চিঠি; *ময়ূখ*, পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-৬২ সংখ্যায় প্রকাশিত।

১৬. অশোকানন্দ দাশ *মাল্যবান*-এর ভূমিকায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে তিনি উপন্যাসটি লেখেন ১৯৪৮ সালের জুন মাসে চাকরিরত অবস্থায়। যে নোটবইয়ে এটি লিখেছিলেন রচনাকাল সম্ভবত সেটিতেই উল্লিখিত ছিল। তাঁর নোটবইয়ে দেওয়া তারিখগুলো খুব সম্ভবত লেখা শুরুর অথবা শেষের (যদি দুটো তারিখ দেওয়া না থাকে)। অশোকানন্দ আরও উল্লেখ করেন, তিনটি ছাড়া তাঁর আর কোনো উপন্যাস নেই। (এই সুস্পষ্ট দাবিটি ছিল *শিলাদিত্য* পত্রিকায় [১৯৮১-৮২] কবির তৃতীয় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে ছাপা হওয়ার ভূমিকায় এবং প্রথম *জীবনানন্দ রচনাসমগ্র* প্রকাশের সময় সম্পাদক হিসেবে দেবেশ রায় সেটিই উদ্ধৃত করেছিলেন)। আরও একটা উপন্যাস হয়তো আছে, তবে অসমাপ্ত। কবির ভাইয়ের বক্তব্যের বিপরীতে দেবেশ রায়ও মনে করেন, জীবনানন্দের আরেকটি উপন্যাস অপ্রকাশিত আছে। দেবেশ রায় সম্পাদিত *জীবনানন্দ সমগ্র* (প্রথম খণ্ড; কলকাতা : প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস, ১৯৮৫), ৪৫৭।

১৭. তাঁর কোনো উপন্যাসকেই আত্মজীবনী হিসেবে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না, যে আত্মজীবনীটি তিনি লিখবেন বলে কিছু ব্যক্তিকে বলেছিলেন এবং সে বিষয়ে ডায়েরি লিখে রেখেছিলেন। আজ পর্যন্ত দাশ-পরিবারের সদস্য ছাড়া কাউকেই সেই ডায়েরি পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

১৮. দেবেশ রায়ের *জীবনানন্দ সমগ্র*-এ উদ্ধৃত, ৪৫৬।

১৯. সত্যপ্রসন্ন দত্তর সৌজন্যে। তিনি জানান, ১৩ জুন ১৯৫০ তারিখে লেখা এই একই চিঠি সঞ্জয়ের লেখা 'পূর্ব্বাশার [পূর্বাচলের] পানে তাকাই' শীর্ষক একটা লেখায় ছাপা হয়েছিল, *পূর্ব্বাশা*, ফাল্গুন ১৩৭২।

২০. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার। তাঁর মতে আলাপটা হয়েছিল জীবনানন্দের মৃত্যুর বছরখানেক আগে।

২১. প্রতিভা বসুর সাক্ষাৎকার। তিনি মনে করতে পারেন, জীবনানন্দ পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে এসেছিলেন। বুদ্ধদেব তখন দেশে ছিলেন না। যেহেতু বুদ্ধদেব যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৩-৫৪ শিক্ষাবছরে শিক্ষকতায় কাটান। ধরে নেওয়া যায় তাঁদের সাক্ষাৎটা হয়েছিল ১৯৫৩ অথবা ১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে।

২২. গোপালচন্দ্র রায়, *জীবনানন্দ*, ৮৮।

২৩. জীবনানন্দ দাশ, *মাল্যবান* (কলকাতা : নিউ স্ক্রিপ্ট, [১৯৭[illegible] ১০[illegible]১।

২৪. প্রাগুক্ত, ১২৪-২৬।

২৫. প্রাগুক্ত, ১৬৪-৬৫।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৬. জীবনানন্দ দাশ, *সুতীর্থ* (কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৭৭), ৯-১১।

২৭. প্রাগুক্ত, ২৪৩-৪৪।

২৮. প্রাগুক্ত, ২৭৩-৭৪।

২৯. প্রাগুক্ত, ৩০।

৩০. প্রাগুক্ত, ২৮।

৩১. প্রাগুক্ত, ১৫৫।

৩২. সাধারণভাবে বলতে গেলে নাম দিয়ে বাঙালিদের অনেকেরই ধর্ম বোঝা যায়। বেশির ভাগ বাঙালি মুসলমানের নাম হয় আরবি। প্রায় সব বাঙালি হিন্দুর নাম হয় সংস্কৃত। এই অতিসাধারণ হিসাবের বাইরে এমন প্রগতিশীল মুসলমানও আছেন, যাঁরা নামকরণের প্রচলিত প্রথা ত্যাগ করে তাঁদের ছেলেমেয়েদের নাম বাংলায় রেখেছেন, আরবিতে নয়। বাংলা নাম আসলে সংস্কৃত, এই প্রমাণ দেখিয়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শাসকেরা মনে করতেন, বাঙালি মুসলমানরা ধর্মীয়ভাবে নষ্ট হয়ে হিন্দুয়ানি হয়ে গেছে। নামকরণের এই বিষয়টিকে চমৎকারভাবে তুলে এনেছেন আনোয়ার পাশা তাঁর নির্মম উপন্যাস *রাইফেল, রোটি, আওরত* উপন্যাসে। (তিনি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন)। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র সুদীপ্ত চৌধুরী একজন খাঁটি বাঙালি মুসলমান, যাঁর নামের প্রথম অংশ বাংলা।

৩৩. প্রাগুক্ত, ১৪৮।

৩৪. প্রাগুক্ত, ২৩৪-৫।

৩৫. প্রাগুক্ত, ২৭৪।

৩৬. *বনলতা সেন*, ১৭।

৩৭. প্রাগুক্ত, ১৪।

৩৮. *সুতীর্থ*, ১৪৬-১৪৯।

৩৯. জীবনানন্দ দাশ, *জলপাইহাটি, জীবনানন্দ সমগ্র*, ১৮।

৪০. প্রাগুক্ত, ১৭।

৪১. প্রাগুক্ত, ২৮৬-৮৭।

৪২. *সুতীর্থ*, ১৭৪।

৪৩. এ রকম স্বল্প ভাড়ার কারণ ছিল—যুদ্ধ। ১৯৪২ সালের শেষে জাপানিরা কলকাতায় বোমা ফেললে, শারীরিক ক্ষতির চেয়ে মানসিকভাবে চাপে পড়া কলকাতার বহু নাগরিক শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। কলকাতার বাসাবাড়িগুলো তখন ভাড়াটের জন্য হাপিত্যেশ করতে থাকে, এতে বাড়িভাড়া কমে যায়। সে সময় যারা বাড়ি ভাড়া করে সেখানেই থেকে যায়, যুদ্ধ পরেও তারা সেই একই ভাড়া দিয়ে যাচ্ছিল, যা তখনকার বাজার অনুযায়ী ছিল অনেক কম।

৪৪. *জলপাইহাটি*, ২৭৪-৭৫।

৪৫. বাংলায় গালিগালাজগুলো মূলত এসেছে হিন্দি থেকে। ইংরেজি থেকেও এসেছে, যেমন 'মাইরি' দিব্যিটি, মা মেরির নামে দিব্যি কাটা থেকে। তবে এসব ধার করা শব্দ এখন বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, যেমন হয়েছে বহু হিন্দি, ইংরেজি, সংস্কৃত, ফরাসি, ফার্সি ও পর্তুগিজ ভদ্রশব্দ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৬. তাঁর 'বিলাস' গল্পের রচনাকাল যদি ঠিক হয় (*অনুক্ত*-সম্পাদক সুনীলকুমার নন্দী দেখিয়েছেন ১৯৪৬, দ্রষ্টব্য, *অনুক্ত*, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৭) কয়েক বছর আগে, কর্ম নয় ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য এমন শব্দ জীবনানন্দ ব্যবহার করেছিলেন। 'আপনাকে ডেকেছি, ডক্টর সেনের কাছে যেতে হবে, ডক্টর টি বি সেন। টি বি মানে—ইয়ে ওই টিপিক্যাল বাঙ্খোৎটা—।' *জীবনানন্দ দাশের গল্প*, ৭৮।

৪৭. *জলপাইহাটি*, ৯৬।

৪৮. প্রাগুক্ত, ১০১-১০২।

৪৯. প্রাগুক্ত, ১০৩।

৫০. কেবল নামবিচারে *রিপোর্ট অন ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল, ইন্সপেকটেড মার্চ ২৫, ১৯৩৬, ফর ১৯৩৫-৩৬* (সম্ভবত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৫-৩৬ সালের সিন্ডিকেট সভার কার্যবিবরণী) থেকে দেখা যায়, ১৯৩৫ সালে জীবনানন্দ যখন বিএম কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন, তখন মোট ৪২ জন শিক্ষকের মধ্যে আরবি ও ফার্সি বিভাগের মাত্র তিনজন শিক্ষক ছিলেন মুসলমান।

৫১. প্রাগুক্ত, ৩০১।

৫২. প্রাগুক্ত, ২৩৪-৩৫।

৫৩. প্রাগুক্ত, ৩৭৯-৮০।

৫৪. প্রাগুক্ত, ১২১-২২।

৫৫. প্রাগুক্ত, ২৫৯-৬০।

৫৬. প্রাগুক্ত, ২৬২।

৫৭. প্রাগুক্ত, ২৭৮-৮১।

৫৮. প্রাগুক্ত, ২৯২।

৫৯. প্রাগুক্ত, ২৯৫-৯৬।

৬০. প্রাগুক্ত, ২৯৯।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাজনীতির কবিতা

> শুনেছি ইংল্যান্ডে মোটামুটি শিক্ষিত লোকদের কাছে রাজনীতির যে গুরুত্ব ফ্রান্সে সাহিত্যের মর্যাদা অনেকটা সেরকম। কথাটা সত্য কিনা জানি না। খবরের কাগজ প'ড়ে অবিশ্যি মনে হয় অন্যান্য দেশের মত ফ্রান্সেও রাজনীতিসর্ব্বস্বতা ছাড়া বড় একটা কিছু নেই আর। হতে পারে সাহিত্য সেখানে সত্যিই সম্মান পায়—সমসাময়িক সাহিত্যও। ফ্রান্সকে খুব ভালো বলতে হবে তা'হলে।
>
> —জীবনানন্দ দাশ, আনন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লেখা খোলা চিঠি, সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম অধিবেশনে পড়বার জন্য।

১

গদ্য নিয়ে আবিষ্ট থাকলেও ১৯৪৮ সালের শেষদিকে তাঁর পঞ্চম গ্রন্থ *সাতটি তারার তিমির* প্রকাশ করে জীবনানন্দ কবিতার দিকে মনোযোগ ফেরাতে পেরেছিলেন। একটা চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি, ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি থেকেই আরেকটা কবিতার বই প্রকাশ করার চেষ্টা করছিলেন তিনি :

> এ পর্য্যন্ত আমার চারটে কবিতার বই বেরিয়েছে; আমার পঞ্চম কবিতার বই—যার ভিতরে আমার শেষের দিকের অনেক representative কবিতা থাকবে তা' এখনও গ্রন্থাকারে বেরয় নি; সে সবের পাণ্ডুলিপিও আমার কাছে নেই—press-এ আছে; বই বেরুতে বেশ কিছু দেরি হবে।[১]

মধ্য-ছেচল্লিশে সে পাণ্ডুলিপি যার কাছেই থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত 'গুপ্ত, রহমান অ্যান্ড গুপ্ত' নামের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে *সাতটি তারার তিমির* বের করেন আতাউর রহমান।[২] তিনি স্মরণ করতে পারেন, তাঁরা দুজনই *স্বরাজ*-এ কাজ করার সময় তাঁকে (আতাউর রহমান) পাণ্ডুলিপি দিয়ে জীবনানন্দ নিজেই ছাপার কাজ শুরু করেছিলেন। সত্যপ্রসন্ন দত্তও জীবনানন্দের বইটি প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।[৩] সতীর্থ কবি এবং পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসী হওয়ার বদলে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বিপুলসংখ্যক মুসলমানের একজন—হুমায়ুন কবিরকে *সাতটি তারার তিমির* বইটি উৎসর্গ করেছিলেন

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দ। শিরোনামের এই সাতটি তারা প্রায় নিশ্চিতভাবে সপ্তর্ষিমণ্ডলের তারকারাজির পরোক্ষ উল্লেখ। আগেও রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা এক চিঠিতে জীবনানন্দ এই তারকামণ্ডলীর উল্লেখ করেছিলেন।

> পত্রে আপনি যে কথা উল্লেখ করেছেন সেই সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন মনে আসচে। অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হ'য়ে ওঠেন,—পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জ্জর হ'য়ে কখনও তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা এই জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকরা Serenity জিনিষটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরণের সুর আছে সেখানে কাব্য অক্ষুণ্ন হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। দান্তের Divine Comedy-র ভেতর কিম্বা শেলীর ভেতর Serenity বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে ব'লে মনে হয় না।[৪]

'সপ্তর্ষি' কিংবা আরও বিশদে 'সপ্তর্ষিমণ্ডল' বলতে সপ্ত ঋষি ও তারকামণ্ডল দুটোকেই বোঝায়। ১৯৩০ সালে লেখা এই চিঠিতে সপ্তর্ষিরা স্বর্গ ও আলোর একটা অর্থালংকার: 'কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হয়ে ওঠেন।' তারকামণ্ডলীর সঙ্গে আলোকের এই আপাতদৃষ্ট প্রাকৃতিক সহাবস্থান চল্লিশের দশকের শেষ দিকে এখানে পথভ্রষ্ট হয়ে একটা ধাঁধাময় বিরোধাভাসে পরিণত হয়।[৫]

পঞ্চম গ্রন্থটির বিরোধাভাসী শিরোনামের তাৎপর্য নিয়ে বিভিন্ন সমালোচক জল্পনা শুরু করেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জোরালো যুক্তি দিয়ে বলেন, সপ্তর্ষিমণ্ডলের আকৃতি প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো। প্রাচীন ভারতের সাত জ্ঞানী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা প্রতীকীভাবে সৃষ্টি করেন এই প্রশ্নবোধক: মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। নীরেন্দ্রনাথ বলেন, এমনকি এসব পণ্ডিতও সমসাময়িক বিশ্বের হেঁয়ালিময় পরিস্থিতির ওপর কোনো আলোকপাত করতে পারেননি। মূলত *সাতটি তারার তিমির*-এর ৪০টির মধ্যে অনেক কবিতাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা নিয়ে।

সাতটি তারার তিমির ও এর আগের *মহাপৃথিবীর* (১৯৪৪) কবিতাগুলো প্রায় সমসাময়িক কালের: *মহাপৃথিবীর*গুলো ১৯২৯-৪২ সালের সময়কার, আর *সাতটি তারার তিমির*-এরগুলো ১৯২৮-৪৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ের; *মহাপৃথিবীর* বেশির ভাগ কবিতা ছাপা হয়েছে ১৯৪০ সালের আগে, আর *সাতটি তারার তিমির*-এর অধিকাংশ কবিতা ছাপা হয় ১৯৪০-এর দশকে। তবে বই দুটোর মূল বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক: *মহাপৃথিবী* উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপমানির্ভর, তবে শেষদিকে এসে মস্তিষ্কনির্ভর হয়েছে। অন্যদিকে *সাতটি তারার তিমির* গভীরভাবে নির্ভরশীল জীবনানন্দের চারপাশের ভুবনের প্রতি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরে দেখা যায়, *সাতটি তারার তিমির*-এর প্রাক-চল্লিশের কবিতাগুলোতে অন্ধকারের উল্লেখ কমই আছে। যেমন 'আকাশলীনা' (১৯৩৭) :

আকাশলীনা

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি,
বোলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;
দূর থেকে দূরে—আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়ো নাকো আর।

কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে!
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ :
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস :
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।[৬]

সুরঞ্জনা (যখন এ কবিতাটি *কবিতা* পত্রিকায় প্রথমবার প্রকাশিত হয়, তখন ওর নাম ছিল হৈমন্তিকা) আবারও জীবনানন্দের কল্পনার প্রেমিকাদের একজনকে উপস্থাপন করে। তাঁকে ছেড়ে না গিয়ে বাংলার পরিবেশের মধ্যে কল্পনার ভুবনে ফিরে আসার জন্য সেই রমণীর কাছে মিনতি করেন তিনি। কবির কল্পনায় ঘাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে ঘাস, বাতাস বা আকাশের রূপকে সেই রমণীকে তুলনা করা হয় পৃথিবীর সঙ্গে—যেখান থেকে জন্মায় ভালোবাসা, সেই ভালোবাসার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

বইটির শিরোনামের 'তিমির'-এর দখল প্রথম শুরু হয় ১৯৩৮ সালের শেষদিকে প্রকাশিত 'রিস্টওয়াচ' নামের একটা কবিতায়।

রিস্টওয়াচ

কামানের ক্ষোভে চূর্ণ হ'য়ে
আজ রাতে ঢের মেঘ হিম হ'য়ে আছে দিকে দিকে।
পাহাড়ের নিচে—তাহাদের কারু কারু মণিবন্ধে ঘড়ি
সময়ের কাঁটা হয়তো বা ধীরে-ধীরে ঘুরাতেছে;

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চাঁদের আলোর নিচে এইসব অদ্ভুত প্রহরী
কিছুক্ষণ কথা কবে;—
হৃদয়যন্ত্রের যেন প্রীত আকাঙ্খার মতো ন'ড়ে,
সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো গিলে।
জলপাইপল্লবের তলে ঝরা বিন্দু বিন্দু শিশিরের রাশি
দূর সমুদ্রের শব্দ
শাদা চাদরের মতো—জনহীন—বাতাসের ধ্বনি
দু'এক মুহূর্ত আরো ইহাদের গড়িবে জীবনী।
স্তিমিত—স্তিমিত আরো ক'রে দিয়ে ধীরে
ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে।[৭]

মৃত মানুষের মণিবন্ধের ঘড়িগুলোর ঘন্টা-মিনিটের কাঁটা ফসফরাসের অণুপ্রভ আলোয় জ্বলজ্বল করে। সূর্যালোক 'রৌদ্রের...তিমিরে' আবার জাগিয়ে তোলে অবশ্যম্ভাবী ক্ষীয়মাণ আভাকে, ফসফরাসের আলো যেহেতু সূর্যের আলোয় দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় না। কবিতাটি আলোকপাত করে হাতঘড়িগুলোর ওপর, এগুলো যেসব মৃত ব্যক্তির, সম্পূর্ণভাবে না হলেও তারা উপেক্ষিত। সুরঞ্জনা কিংবা হৈমন্তিকার মতো কেবল কল্পনার আবিষ্কার নয়, নামহীন হলেও মৃত মানুষজন বাস্তব।

বর্তমান সময়ের অন্ধকারের ভেতর দিয়ে মানুষের বেয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে জীবনানন্দ নাবিককে ব্যবহার করেন রূপকালংকার হিসেবে। তিনি এই উপমা আগেও আরও ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করেছেন 'বনলতা সেন' কবিতায়: 'অতিদূর সমুদ্রের 'পর/হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা/সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,/তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে;...।' চল্লিশের দশকে নাবিক গ্রহণ করে মানবজাতির বৈশিষ্ট্য। এই সময়ে জীবনানন্দ 'নাবিক' নামের দুটো কবিতা লেখেন ('নাবিক' ও 'নাবিকী' শিরোনামে, প্রথমটি ছাপা হয় ১৯৪০ সালে, দ্বিতীয়টি ১৯৪৪ সালে), দুটোই *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থভুক্ত।[৮] জীবনানন্দ ১৯৪০ সালের কবিতাটি নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করেন:

নাবিক

কোথাও তরণী আজ চ'লে গেছে আকাশ-রেখায়—তবে—এই কথা ভেবে
নিদ্রায় আসক্ত হ'তে গিয়ে তবু বেদনায় জেগে ওঠে পরাস্ত নাবিক;
সূর্য যেন পরম্পরাক্রম আরো—ওই দিকে—সৈকতের পিছে
বন্দরের কোলাহল—পাম সারি—তবু তার পরে স্বাভাবিক

স্বর্গীয় পাখির ডিম সূর্য যেন সোনালি চুলের ধর্মযাজিকার চোখে;
গোধূম-ক্ষেতের ভিড়ে সাধারণ কৃষকের খেলার বিষয়;
তবু তারপরে কোনো অন্ধকার ঘর থেকে অভিভূত নৃমুণ্ডের ভিড়
বল্লমের মতো দীর্ঘ রশ্মির ভিতরে নিরাশ্রয়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্য সোনার দিকে চেয়ে থাকে; নিরন্তর দ্রুত উন্মীলনে
জীবাণুরা উড়ে যায়—চেয়ে দ্যাখে—কোনো এক বিস্ময়ের দেশে।
হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে শুধু?
বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশী থেকে ফেঁসে

অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চ'লে যাও—দুপুরবেলায়;
বৈশালীর থেকে বায়ু—গেৎসিমানি—আলেকজান্দ্রিয়ার
মোমের আলোকগুলো রয়েছে পিছনে প'ড়ে অমায়িক সংকেতের মতো;
তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরো দূর চক্রবাল হৃদয়ে পাবার

প্রয়োজন র'য়ে গেছে—যত দিন স্ফটিক পাখনা মেলে বোলতার ভিড়
উড়ে যায় রাঙা রৌদ্রে; এরোপ্লেনের চেয়ে প্রমিতিতে নিটোল সারস
নীলিমাকে খুলে ফেলে যত দিন; ভুলের বুনুনি থেকে আপনাকে মানবহৃদয়;
উজ্জ্বল সময়-ঘড়ি—নাবিক—অনন্ত নীর অগ্রসর হয়।[৯]

সাতটি তারার তিমির গ্রন্থের পরের 'নাবিকী' কবিতাটিতে নাবিক মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আরও বেশি সর্বজনীন হয়ে ওঠে:

সকলেই আজ এই বিকেলের পরে এক তিমির রাত্রির
সমুদ্রের যাত্রীর মতন
ভালো ভালো নাবিক ও জাহাজের দিগন্তর খুঁজে
পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন নেশনের নিঃসহায় প্রতিভূর মতো
পরস্পরকে বলে, 'হে নাবিক, হে নাবিক তুমি—
সমুদ্র এমন সাধু, নীল হ'য়ে—তবুও মহান মরুভূমি;
আমরাও কেউ নই—'
তাহাদের শ্রেণী যোনি ঋণ রক্ত রিরংসা ও ফাঁকি
উঁচু-নিচু নরনারী নিক্তিনিরপেক্ষ হ'য়ে আজ
মানবের সমাজের মতন একাকী
নিবিড় নাবিক হ'লে ভালো হয়;
হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় নাকি।[১০]

জীবনানন্দ ১৯৪৪ সালে বলেন, তাঁর নিজের অনূদিত আগের কবিতাটিতে যাকে বলেন 'নাবিক আত্মা' ও যা অনুসন্ধানী মানুষের রূপকালংকার—সেই নাবিক-মানুষের সবার সঙ্গে না গিয়ে একাই এগিয়ে যাওয়া উচিত। অন্যত্র *সাতটি তারার তিমির*-এ তিনি আবারও দৃঢ়ভাবে বলেন, একজন কলঙ্কহীন নাবিকের মতো সাধারণ মানুষকেও একাকী এগোতে হবে:

ভাবনা ব্যাহত হ'য়ে বেড়ে যায়—স্থির হয় না কি?
হে সাগর সময়ের,
হে মানুষ,—সময়ের সাগরের নিরঞ্জন-ফাঁকি
চিনে নিয়ে বিমলিন নাবিকের মতন একাকী
হ'লেও সে হ'ত, তবু পৃথিবীর বড়ো রৌদ্রে—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আরো প্রিয়তর জনতায়
'নেই' এই অনুভব জয় ক'রে আনন্দে ছড়ায়ে যেতে চায়।[১১]

একাকী নাবিকের চেয়েও বিরোধাভাসই হচ্ছে বইটির মূল প্রতীক। আগেই বলা হয়েছে শিরোনামটিই বিরোধাভাসী। এই গ্রন্থের কবিতাগুলোতে এ রকম শব্দালংকার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত: 'রৌদ্রের তিমির' (অথবা উল্টো পরিপ্রেক্ষিতে 'রাত্রিকরোজ্জ্বল')।[১২] অবোধ্য মানে সত্যি সত্যিই মানুষের বুদ্ধি-গ্রাহ্যাতীত 'রৌদ্রের তিমির' প্রকৃতিকে অমান্য করে, তাই মানুষ ও তার প্রাকৃতিক ভুবন উভয়ের জন্য ভীতিকর ও শত্রুভাবাপন্ন।

আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'রৌদ্রের তিমির' সরাসরি জাপানি পতাকাকে বোঝায়, যাতে আছে উদীয়মান সূর্য, এই সূর্য নিয়ে এসেছিল যুদ্ধের অন্ধকার। এ রকম পাঠ *সাতটি তারার তিমির*-এর কিছু কবিতা উপলব্ধিকে সহজতর করে। তবে বইটির শিরোনাম ইঙ্গিত করে যে যদিও জাপানি পতাকা প্রথম দিকে এটির বিপরীতার্থকে প্ররোচিত করে, জীবনানন্দ আরও সর্বজনীন বৈপরীত্যপূর্ণ গূঢ়ার্থ তুলে এনে অন্যান্য উপমায় সঞ্চালিত করেন : কেবল সূর্য নয়, তারার আলোও তার মূল বৈশিষ্ট্য আলো হারিয়ে ফেলেছে। আগে যেমনটি বলা হয়েছে, সাতটি তারা যেখানে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও সাত প্রাচীন ভারতীয় ঋষির সঙ্গে সম্পর্কিত, গ্রন্থের শিরোনামটি সে কারণে আরও সমৃদ্ধ গূঢ়ার্থ বহন করে। অজ্ঞতা, সংশয় ও পথভ্রম এখানে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও প্রাচীন সন্তদের সঙ্গে সম্পর্কারোপ করে (যা পথপ্রদর্শক কিংবা নিঃসঙ্গ নাবিককে ধ্রুবতারার সন্ধান দেওয়া উচিত, তবে আজকাল দেয় না)।

বিরোধাভাসী শব্দালংকার জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য বিশ্বের সঙ্গে কবির সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া কিংবা তার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। মূলত *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থে জীবনানন্দের অতি পরিচিত প্রাকৃতিক ও লোককথার বাংলা অনুপস্থিত। ১৯৪০-এর দিকে তাঁর প্রকৃতির ভুবন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে—কারও মতে কমিউনিস্টদের দ্বারা, কারও মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে—তিনি সেই প্রতীয়মান ব্যাখ্যাতীত জগৎকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছিলেন, যার মধ্যে তাঁকে ঢুকতে বাধ্য করা হয়েছিল। ওলটপালট হওয়া জীবনানন্দের বিশ্বে আছে এক হরিণ, যে 'হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে' ('সৃষ্টির তীরে', ১৯৪৩)।

ইতিপূর্বে পরিচিত জগতের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবেন, এই উপলব্ধি জীবনানন্দকে পরিবর্তনকালীন সময়ের কবিতার লাভজনক পুনঃপাঠে প্ররোচিত করে; তখনো তিনি তাঁর নিজস্ব ভুবনে দাঁড়িয়ে, তবে তার সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলছিলেন। *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আকাশলীনা'য় (১৯৩৭) তাঁর সমগ্র নিজস্ব ভুবনসহ কবি তাঁর কল্পলোকের রমণীকে সঙ্গে রাখার চেষ্টা করেন, যখন সুরঞ্জনাকে আহ্বান করেন তিনি : 'ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;/ফিরে এসো হৃদয়ে আমার।' 'সপ্তক' (১৯৩৯) কবিতাটিতে তিনি সরোজিনীর অনিশ্চিত অবস্থান সম্পর্কে লেখেন, 'এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে,—জানি না সে এইখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শুয়ে আছে কিনা।/অনেক হয়েছে শোয়া;—তারপর একদিন চ'লে গেছে কোন্ দূর মেঘে।' জীবনানন্দ কোনো সুরঞ্জনা কিংবা সরোজিনীর চেয়েও নিজের কথা এবং তাঁর পরিপার্শ্ব সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কথা বেশি বলেন। এটা তাঁর ভুবন, যা পরাভূত হয়ে চলে যাচ্ছে 'কোন্ দূর মেঘে'।

তাঁর নতুন ভুবনে জীবনানন্দকে মনে হয় প্রায় ফটোট্রপিক,* মনে হয় আলোর জন্য মিনতি করছেন তিনি। এমনকি কবিতার নামগুলোও এই আবিষ্টতার প্রমাণ দেয়: 'অনুসূর্যের গান', 'তিমিরহননের গান', 'সূর্যকরোজ্জ্বল', 'সূর্যতামসী', 'দীপ্তি' ও 'সূর্যপ্রতিম'। তিনি যে কেবল সূর্যালোক নিয়ে ভেবেছেন তা নয়, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব নিয়েও ভেবেছেন। অনুসূর্য হচ্ছে প্রদক্ষিণের পথে সূর্যের সঙ্গে গ্রহের নিকটতম দূরত্ব। *সাতটি তারার তিমির*-এর পরপর দুটো কবিতার নামও সূর্যের সঙ্গে কথকের দূরত্বের ইঙ্গিতবাহী, 'মকরসংক্রান্তির রাতে' ও পরের কবিতাটি 'উত্তরপ্রবেশ'।

'উত্তরপ্রবেশ' শব্দটি জীবনানন্দের আবিষ্কার। প্রবেশের অর্থ একটি হলেও 'উত্তর'-এর একাধিক অর্থনির্দেশ আছে, সেগুলোর একটি হচ্ছে উত্তর দিক। তাহলে 'উত্তরপ্রবেশ'-এর অর্থ দাঁড়ায় সূর্যের উত্তর গোলার্ধে প্রবেশ। তবে কাজী আবদুল মান্নান বিশ্বাসযোগ্যভাবে যুক্তি দেখান যে 'উত্তর' শব্দটি 'উত্তরপুরুষ'-এর 'উত্তর'-এর সমার্থক।[১৩] তাহলে 'পূর্ব' যে রকম পূর্ববর্তী কিংবা অতীতকে বোঝায়, তেমনি 'উত্তর' বলতে পরবর্তী কিংবা ভবিষ্যৎকে বোঝায়—সে ক্ষেত্রে 'উত্তরপ্রবেশ' বলতে ভবিষ্যতে কিংবা পরবর্তী কোনো স্থান বা কালে, অথবা নতুন কোথাও প্রবেশ বা যাওয়াকে বোঝায়। জীবনানন্দ বোধকরি তাঁর নতুন শব্দ প্রয়োগের এ রকম একটি অতিরিক্ত দ্যোতনা চেয়েছিলেন। তাঁর 'উত্তরপ্রবেশ' কবিতাটি ছাপা হয় ১৯৪৫ সালে। ১৯৪৬ সালে লেখা এক চিঠিতে জীবনানন্দ শব্দটি আবার ব্যবহার করেন:

> সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কেও আমার কবিতা চেতনা হয়তো দেখিয়েছে, আরো বড় চেতনায় উত্তরপ্রবেশ চেয়েছে, কিন্তু সেই জ্ঞানদৃষ্টি কি পেয়েছে যা সমাজকে নতুন পথ দেখাতে পারে?[১৪]

উপরোল্লিখিত শিরোনামের সব কবিতা ছাপা হয়েছিল ১৯৪৩-৪৫ সময়কালের মধ্যে। তত দিনে বিরোধাভাস জীবনানন্দের কাছে বহুব্যবহৃত সাধারণ একটা কাব্যিক রূপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'তিমিরহননের গান'-এ (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৩) তিনি নিন্দা করে লেখেন, 'সেইসব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু—/তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।' 'নাবিকী'তে (১৯৪৪) কবি লেখেন, 'অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার'। 'সূর্যপ্রতিম' কবিতাটি শেষ হয় একই শব্দমালা দিয়ে, তবে কিছুটা ভিন্ন বিন্যাসে, 'নাবিকী'তে যেমন দেখা যায় এবং 'রিস্টওয়াচ' শেষ হয় যেভাবে: 'জেগে ওঠে উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, অনন্তের অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।'

* জীববিজ্ঞানের ভাষায় যে উদ্ভিদ আলোর দিকে ঝুঁকে যায়।—অনুবাদক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

উল্টো রূপক 'রাত্রিকরোজ্জ্বল' ব্যবহার করে জীবনানন্দ 'সূর্যতামসী'তে (১৯৪৪) লেখেন, 'ভোরের বদলে তবু সেইখানে রাত্রিকরোজ্জ্বল/ভিয়েনা, টোকিও, রোম, মিউনিখ—তুমি?' এবং 'রাত্রির কোরাস'-এ '...জেনে/তবু রাত্রিকরোজ্জ্বল সমুদ্রের পাখি।'

বিরোধাভাসী শব্দ প্রায়ই যেমন ব্যবহৃত হয় আধ্যাত্মিক অনির্বচনীয় কিছু প্রকাশ করতে (যেমন 'জ্যান্তে মরা', বাঙালি বাউল সাধকদের কাঙ্ক্ষিত অবস্থা), তেমনই প্রকৃতি ও সমাজের বিশৃঙ্খলা দেখাতেও। জীবনানন্দ এই বিশেষ শব্দালংকার ব্যবহার করেন শেষোক্ত অর্থে, বিশৃঙ্খল বর্তমান সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করে।

রাত্রির অন্ধকার মানবসমাজের বর্তমান ক্ষণস্থায়ী পরিস্থিতিকে প্রতীকায়িত করে। কারণ, ভোর আসবে আর সূর্যালোক ঝেড়ে ফেলবে রাতের অন্ধকারকে। তবে জীবনানন্দ আসন্ন ভোরের আলোর বিষয়ে আশা-নিরাশার মাঝখানে দোদুল্যমান থাকেন, তাঁর 'সূর্যতামসী' সেই অনিশ্চয়তা দেখায় মানুষের নিয়তি হিসেবে :

> কোথাও পাখির শব্দ শুনি;
> কোনো দিকে সমুদ্রের সুর;
> কোথাও ভোরের বেলা র'য়ে গেছে—তবে।
> অগণন মানুষের মৃত্যু হ'লে—অন্ধকারে জীবিত ও মৃতের হৃদয়
> বিস্মিতের মতো চেয়ে আছে;
> এ কোন্ সিন্ধুর সুর :
> মরণের—জীবনের?
> এ কি ভোর?
> অনন্ত রাত্রির মতো মনে হয় তবু।

তাঁর আশাবাদ শক্তি সঞ্চয় করে 'সময়ের কাছে' কবিতায় :

> সময়ের সমুদ্রের পারে
> কালকের ভোরে আর আজকের এই অন্ধকারে
> সাগরের বড়ো শাদা পাখির মতন
> দুইটি ছড়ানো ডানা বুক নিয়ে কেউ
> কোথাও উচ্ছল প্রাণশিখা
> জ্বালায়ে সাহস সাধ স্বপ্ন আছে—ভাবে।
> ভেবে নিক—যৌবনের জীবন্ত প্রতীক : তার জয়!
> প্রৌঢ়তার দিকে তবু পৃথিবীর জ্ঞানের বয়স
> অগ্রসর হ'য়ে কোন্ আলোকের পাখিকে দেখেছে?—
> জয়, তার জয়, যুগে যুগে তার জয়!—
> ডোডো পাখি নয়।

আগেও দেখা গেছে, ডোডো পাখি মানবসভ্যতার বিলোপের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেন জীবনানন্দ। 'সময়ের কাছে' কবিতায় তিনি সরাসরি বলেন, মানুষের বিনাশ আসেনি। তবে তিনি বলেন, তাদের সব প্রয়াস সত্ত্বেও মানুষ এখনো একটা কল্পরাজ্য বানায়নি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে;
> নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে;
> তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
> স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর?

কিন্তু একটি ভোর আসে, তাই, 'জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।' অথবা তিনি যেমন 'এই কি সিন্ধুর হাওয়া' (১৯৪৬) কবিতায় লিখেছেন, 'আলো নেই তবু তার অভিগমনের।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি যত এগিয়ে আসছিল, জীবনানন্দ মনে হয় আবার—অথবা হয়তো প্রথমবারের মতো—তাঁর সঙ্গী মানুষের ওপর আস্থা ফিরে পাচ্ছিলেন।

২

তখনকার বাংলার অন্যতম প্রধান কবিতা পত্রিকা *কবিতা* একটা আলোচনা ছাপে *সাতটি তারার তিমির*-এর ওপর। বুদ্ধদেব বসু নিজে আলোচনাটি না লিখতে মনস্থ করেন। তাঁর পরিবর্তে অশোক মিত্রের আলোচনাটি প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সংখ্যায়, অর্থাৎ গ্রন্থটি প্রকাশের এক বছর পর। কয়েক অনুচ্ছেদে উচ্চপ্রশংসা এবং বিশেষ করে *কবিতা* পত্রিকার প্রথম কয়েক বছরে প্রকাশিত জীবনানন্দের ভালো লাগা কবিতার স্মৃতিচারণা করার পর আলোচক তাঁর স্বর পাল্টে ফেলেন :

> জীবনানন্দের কাব্য, মনে হচ্ছে, কোনো নবতর আত্মাকে আহ্বানপ্রবৃত্ত। বিগত পাঁচ-ছ' বছর ধরে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে তাঁর যে-সব কবিতা প্রকাশিত হ'য়ে আসছে, তাদের অনুধাবনেই অবশ্য ধরা পড়েছিলো যে পায়ের নীচের ঘাস স'রে যাচ্ছে। 'বনলতা সেন' এবং তার পূর্বে ও পরেও কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর কাব্যে পর্যাপ্ত অর্থনির্মলতা ছিলো। সে-প্রসাদ ইদানীং লুপ্যমান: তাঁর কাব্যগঠনে আজকাল প্রায়ই এক বিপজ্জনক দুরূহতা লক্ষ্য করি। 'সাতটি তারার তিমিরে'র অনেক কবিতারই অর্ন্তব্যঞ্জনার সঙ্গে, কিছুটা আত্মকরুণা নিয়েই বলছি, বার-বার নিজেকে সমন্বিত করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পরিশ্রম প্রতিবারই পণ্ডশ্রম। প্রতীকে, শব্দযোজনায়, বাক্যপ্রয়োগে বহুলতই নিজের পুনরুচ্চারণ এখানে তিনি করেছেন, এবং এই পুনরুক্তিতে কোনো অর্থের ব্যাপ্তি নিশ্চয়ই তাঁর অভিপ্রেত, কিন্তু সে-অর্থ, দুঃখের বিষয়, কোনো আপাতদার্শনিক সন্ধাভাষায় অবচ্ছন্ন। ফলত, যা ছিলো তার মোহিনি কুয়াশা, এখানে তা অস্বস্তিকর ধূম্রজালের মতো মনে হয়। পংক্তির অব্যবধান সত্ত্বেও চিন্তা বহুবিচ্ছিন্ন, এমনকি কোথাও কোথাও বাক্যরচনাও দুর্বল। কী বলতে চাইছেন, চিত্রের কোন বিভঙ্গের প্রতি বর্তমানে তাঁর পক্ষপাত, কোন প্রতীকিতার অনুজ্ঞা এখানে তাঁর মান্য, এই সব প্রশ্ন অন্ধ আক্ষেপে মাথা খুঁড়ে মরে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণপন্থী হবার চেষ্টা করছি। জীবনানন্দ আদি অনুভূতির কবি, হৃদয়বেদনার ধূসর পদপাতেই তাঁর কাব্যের স্পন্দন। কখনো বিস্মিত শিশুর সৃষ্টি নিয়ে, কখনো ক্লান্ত পথিকের নিঃসঙ্গতা নিয়ে তিনি জীবনকে দেখে এসেছেন, দেখেছেন প্রকৃতি, পৃথিবী, জীবজগৎ, মানবজীবন। তাঁর ভাষণে ছিলো এক নিষ্পাপ স্পষ্টতা, এক সহজ নির্ভঙ্গিমা, এবং এই শেষোক্ত গুণ তাঁর কাব্যের প্রভাবক্রিয়ার মৌল হেতু। কিন্তু 'সাতটি তারার তিমিরে' বিশুদ্ধ হৃদয়োচ্চারণ স্তব্ধপ্রায়। পক্ষান্তরে, জীবনানন্দ মননমুখাপেক্ষী হয়েছেন, কোনো আত্মদর্শনের জটিলতায় জড়িয়েছেন। এই দর্শনাশ্রয়ের ফলেই, মনে হয়, তাঁর ভাষণে বক্রতা এবং সেই সঙ্গে প্রসাদের অভাব এসেছে। আবেগের সঙ্গে মননের প্রকৃত সমন্বয় ঘটাতে পারলে কথাই ছিলো না, কিন্তু স্পষ্টতই সে-সঙ্গমকাহিনী এখানে শোকান্তিকা। অনেক ক্ষেত্রেই এই গ্রন্থের কবিতা রূপ নিয়েছে নিছক দার্শনিকতায়, এবং সে-দর্শনও অবোধ্য।[১৫]

মহাপৃথিবীর (মার্চ ১৯৪৫) ওপর আগে বুদ্ধদেব বসুর কিছুটা বিরূপ আলোচনার পর জীবনানন্দের কবিতা কদাচিৎ *কবিতা* পত্রিকার পাতা আলোকিত করত। সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সংখ্যা *কবিতায়* জীবনানন্দের একটা কবিতা ছাপা হয়, 'মকরসংক্রান্তির রাতে', পরবর্তী সাড়ে তিন বছর সেখানে তাঁর আর কোনো কবিতা ছাপা হয়নি। *মহাপৃথিবীর* আলোচনা ছাপা হওয়ার পর থেকে জীবনানন্দের অনিয়মিত লেখার কথা জেনে এবং *সাতটি তারার তিমির*-এর আলোচনা পড়ে এখন কেউ ধারণা করতে পারেন যে এবার *কবিতা* পত্রিকা থেকে জীবনানন্দের কবিতা পুরোপুরি উধাও হয়ে যাবে। তবে এ রকম কিছু ঘটেনি। পরের সংখ্যাতেই ছাপা হয় 'অন্ধকার', সঙ্গে ছিল একটা দীর্ঘ মুখবন্ধ :

> 'অন্ধকার' কবিতাটি প্রায় সতেরো বছর আগে (১৩৩৯-৪০এ) লেখা হয়েছিল। খুব সম্ভব ১৩৪২ বা ৪৩এ 'কবিতা'য় দিয়েছিলাম। তখন ছাপানো হয় নি, পরে পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গিয়েছিল। আমার কাছেও কোনো কপি নেই ভেবেছিলাম। পুরোনো খাতা খুঁজতে-খুঁজতে সেদিন বেরিয়ে পড়ল। সতেরো বছর আগের ঠিক সেই মনোস্বভাব এখন নেই আর আমার; এ রকম কবিতা আজ আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।[১৬]

বহু পরে জীবনানন্দ ১৯৩০-এর দশকের গদ্যকবিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কবিতাটিকে *কবিতা* পত্রিকার দ্বিভাষিক সংখ্যার (১৯৫৩) জন্য ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। তবে প্রকাশের আগে বুদ্ধদেব কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়ায় তিনি এক ধরনের সংক্ষিপ্ত জবাব পেয়ে গেছেন। জীবনানন্দ শুধু বিশেষ কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ সম্পর্কে প্রশ্নই তোলেননি, উল্টো সেসব প্রস্তাবের যুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন :

> কলকাতা
>
> ১৪.৭.৫৩
>
> প্রিয়বরেষু,
>
> আপনার চিঠি ও কপি পেয়েছি। আমার [illegible] দের যেমন Lethe ইত্যাদির তাৎপর্য জানতে হয়েছে পশ্চিমের পাঠকদের তেমনি বৈতরণী,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কীর্তিনাশা প্রভৃতির মর্ম ক্রমে ক্রমে জেনে নেওয়া দরকার। কীর্তিনাশার একটি বিশেষ ইঙ্গিত আছে—গঙ্গা যমুনা বা waters of the earthএ সে অর্থ ফুটে ওঠে না। চীনে কবিরা কখনও তাদের বিশেষ কোনো নদী ইত্যাদির ইংরেজি তর্জমা করে বলে মনে হয় না।

পৌষকে December করলে মাঘকে (O Kokil of Magh night) কি January করবেন? পৌষ, মাঘ যে আমাদের শীত ঋতু বিদেশী পাঠকরা তা' জানুক; আমাদের নদী ঋতু নানা জিনিষ ওদের কানে পরিচিত হ'য়ে উঠুক; পরে মনে গেঁথে যাবে। আপাতত ফুটনোট দিলে হয় না?

Planning, aplomb বাদ দিতে পারা যায়। I am too full of sleepকে But I am too full of sleep করলে বেশি logical হয়ে যায় ব'লে মনে হয়। Never see how Never have I known ইত্যাদি একটু বেশি উত্তেজিত শপথের মতো শোনায়, plain statement এর simple ও Direct force থাকে ব'লে মনে হয় না। সে যা হোক, আপনার পরিবর্ত্তন আরও উৎকৃষ্ট হয়তো। আপনি যা-যা প্রস্তাব করেছেন সেই অনুসারে বদলে নিতে পারেন, আমার অমত নেই। একেবারে শেষ Air Mail (মাসের শেষে) ধরবার মুখে কয়েকটি কবিতা উর্ধশ্বাসে অনুবাদ করতে গিয়ে তৃপ্তি পাইনি।

প্রীতি নমস্কার। ইতি—
জীবনানন্দ দাশ[১৭]

পৌষ ও মাঘের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় ডিসেম্বর ও জানুয়ারি; বৈতরণী ও কীর্তিনাশা একবার বর্ণান্তরিত আরেকবার অনূদিত হয়ে উপস্থাপিত হয়—যথাক্রমে *রিভার অব ডেথ* (মৃত্যুর নদী) ও *রিভার অব মিউটেবিলিটি* (পরিবর্তনের নদী)। *আই অ্যাম টু ফুল অব স্লিপ* (গভীর অন্ধকারের ঘুম) যেমন ছিল তা-ই থাকে, আর *নেভার হ্যাভ আই নোন* (চিনিনি কোনো দিন) হয়ে যায় *আই হ্যাভ নেভার নোন*। একটি অনুবাদ যে বেশি 'লজিক্যাল' হয়ে যাবে, জীবনানন্দের এই সতর্কবাণী সেসব পাঠককে নিশ্চয়ই আনন্দ দেবে, যাঁরা তাঁর আরও অস্বচ্ছ কবিতা নিয়ে হিমশিম খেয়েছেন।

অন্ধকার

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার;
তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
যেন কীর্তিনাশার দিকে।

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম—পউষের রাতে—
কোনোদিন আর জাগব না জেনে
কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন জাগব না আর—

হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও,
হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে
রয়েছে যে অগাধ ঘুম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সে আস্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই,
তুমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও—
জানো না কি চাঁদ,
নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
জানো না কি নিশীথ,
আমি অনেক দিন—
অনেক অনেক দিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে
বুঝতে পেরেছি আবার;
ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা;
দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে;
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভরে গিয়েছে;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের
আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে।
হায়, উৎসব!
হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি।
কোনোদিন মানুষ ছিলাম না আমি।
হে নর, হে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনোদিন;
আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই।
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত শত শূকরের চীৎকার সেখানে,
শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর;
এইসব ভয়াবহ আরতি!

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি,
হে হিম হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন?

অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠব না আর;
তাকিয়ে দেখব না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে
অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কীর্তিনাশার দিকে।
ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব—ধীরে—পউষের রাতে—
কোনোদিন জাগব না জেনে—
কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন আর।[১৮]

১৯৫৩ সালে পোস্টকার্ডে লেখা চিঠিটি সত্ত্বেও জীবনানন্দের 'অন্ধকার'-এর প্রারম্ভিক বক্তব্যের শেষ মন্তব্যটি যথেষ্ট নম্রতা প্রদর্শন করে। তিক্ত বা প্রতিশোধপরায়ণ নয়, তিনি সহজভাবে বলেছিলেন যে বুদ্ধদেব বসুকে বিমোহিত করার মতো কবিতা তিনি আর লিখতে পারেন না। তাঁর মানসিক ও আবেগপ্রবণ চরিত্র আগের মতো নেই। পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে একটা অভাবের সুর প্রকাশ পায়। তখন যেমন মনে করতেন তেমনটি অনুভব করতে, যা দেখতেন তেমনভাবে দেখতে এবং যেমনভাবে প্রকাশ করার তেমনভাবে প্রকাশ করতে চাইতেন হয়তো, কিন্তু পারেননি। ১৯৫০-এর দশকের প্রথম দিকে *কবিতা* পত্রিকায় তাঁর ডজনখানেক কবিতা প্রকাশিত হয়, তার প্রায় অর্ধেক মধ্য-তিরিশের দশকের সংশোধিত বলে চিহ্নিত করা যায়।

জীবনানন্দ ১৯৫০-এর দশকের বেশির ভাগজুড়ে তাঁর ওপর *কবিতা* পত্রিকার প্রত্যাশা পূরণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। মধ্য-তিরিশ দশকের বেশ কিছু অপ্রকাশিত কবিতা ছিল তাঁর খাতায়, যেমন হেলায় পড়ে ছিল ষাটটি সনেটসহ পুরো *রূপসী বাংলা*।

৩

বামপন্থীদের দিক থেকে চাপের ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছিল ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিক থেকে। স্মরণ করা যেতে পারে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে ১৯৪০ সালে যখন *নিরুক্ত* বের করেন, তখন সঞ্জয় ভট্টাচার্য এটাকে তাঁর দৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যের ওপর স্তালিনবাদীদের উপদ্রব হিসেবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। তারপর ১৯৪৫ সালে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ রূপান্তরিত হয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে এবং তার ফলে বামপন্থী নয়, এমন অনেক সাহিত্যিককে হারায় এটি।[১৯] ১৯৩০-এর দশকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের চালু করা *পরিচয়* ১৯৪০-এর দশকে প্রগতিশীল লেখকদের, অন্যভাবে বলতে গেলে কমিউনিস্ট লেখকদের মুখপত্রে পরিণত হয়। আবু সয়ীদ আইয়ুব স্মরণ করেন, এই দশক যত শেষ হয়ে আসতে থাকে, সাহিত্যের ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা তত গোঁড়া, কর্কশ ও ভর্ৎসনাকারী হয়ে ওঠে। 'রণদীভে মতবাদ'-এর কারণে ১৯৪৮ থেকে সিপিআই অংশগ্রহণমূলক (পপুলার ফ্রন্ট) সাংগঠনিক নীতির বদলে একটা স্বতন্ত্র বিশুদ্ধ পুরোপুরি কমিউনিস্ট নীতির অনুসরণ করতে থাকে।[২০]

কমিউনিস্টরা ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় নিখিল ভারত পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করে। ভবানী সেন একটা গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন, যেখানে তিনি লক্ষ্য অর্জনের জন্য শক্তি প্রয়োগের কথা বলেন। ইতিহাসবিদ ওভারস্ট্রিট ও উইন্ডমিলার লেখেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> ভাষণটি ১৯৪২ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত পার্টির অনুসৃত জাতীয়তাবাদী নীতির চরম পরিবর্তন; এখন সিপিআই ঘোষণা করলো যে আত্ম-সঙ্কল্পকে অবশ্যই সিদ্ধ করতে হবে, তবে তা পুরো জাতির জনগণকে নিয়ে নয়, শ্রমিক শ্রেণী এবং তার মিত্রদের বিপ্লবী কর্মে।[২১]

এই নতুন রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার জননিরাপত্তা আইনে ১৯৪৮-এর মার্চ মাসে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং তাদের দলীয় কাগজটি বন্ধ করে দেয়।[২২]

পরবর্তী সময়ে একই বছর *মার্ক্সবাদী* নামে একটা প্রায় গোপন পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। গোপন না হলেও (*মার্ক্সবাদী*তে ছাপা হতো *পরিচয়* পত্রিকার একই প্রকাশকের নাম)[২৩] পত্রিকাটিতে সম্পাদকের কোনো নাম থাকত না, লেখকেরা ব্যবহার করতেন ছদ্মনাম। ভবানী সেন নিশ্চিতভাবে পত্রিকাটিতে লিখতেন, যদিও তাঁর নাম দেওয়া হতো না। *মার্ক্সবাদী* ও *পরিচয়* দুটো কাগজেরই ছিল মার্ক্সবাদী অবস্থান, তবে প্রথমটিতে প্রতিফলিত হতো তীব্র সমালোচনামূলক সাহিত্যতত্ত্ব, যে কথা আইয়ুব বলেছিলেন।

অক্টোবর ১৯৪৮ কিংবা তার আশপাশে কোনো এক সময়ে[২৪] প্রকাশিত *মার্ক্সবাদীর* প্রথম সংখ্যায় সাহিত্যবিষয়ক দুটো প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল: 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা', লেখক কোনো এক সত্যজিৎ দাশ, এবং কোনো এক ঊর্মিলা গুহ লিখিত 'সাহিত্য বিচারের মার্ক্সীয় পদ্ধতি'। 'কয়েকটি ধারা' হালকাভাবে হলেও রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে লেখা, যিনি বিরাট ও সব সময়ই একটা প্রিয় লক্ষ্যবস্তু।* সত্যজিৎ দাশ লেখেন, ব্যক্তিবাদ ছিল রবীন্দ্রনাথের মূল সৃষ্টি। এই ব্যক্তিবাদের বিজয় ধনিকদের একটা অস্ত্রে পরিণত হয়েছিল।[২৫] তবে তিনি মেনে নেন যে রবীন্দ্রনাথ (ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) কিছু নির্দিষ্ট সামাজিক কুসংস্কারের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য কিছু করেছিলেন এবং তাঁরা সমাজকে উপকৃত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সত্য আংশিক সত্য।[২৬]

সত্যজিৎ দাশ কয়েকজন জীবিত লেখককে পর্যালোচনার জন্য আলাদা করে নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—দুজনকেই তিরস্কার করা হয় তাঁদের 'নৈরাশ্যবাদ'-এর[২৭] কারণে, যদিও আলোচক স্বীকার করেন যে তারাশঙ্কর ও মানিকের কিছু লেখা কিছুটা সেকেলে হলেও 'প্রগতি সাহিত্য' হিসেবে উত্তীর্ণ। তাঁদের কল্পিত চরিত্রগুলোও নতুন সমাজ সৃষ্টির ক্ষমতারহিত, কেবল পুরোনোকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে সক্ষম।[২৮] কিছু নির্দিষ্ট বিচারে মার্ক্সবাদী হলেও বিষ্ণু দে নিন্দাভাজন হন, কারণ তিনি 'একজন দক্ষ কলাকৌশলবিদ কিন্তু মার্ক্সবাদী নন। তাঁর কলাকৌশল মার্ক্সবাদকেই হত্যা করে।'[২৯]

আমার বই

* ইংরেজিতে অনূদিত উদ্ধৃতির বাংলা তর্জমা।—অনুবাদক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তারপর মার্ক্সবাদী সত্যজিৎ দাশ লেখকদের জন্য কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করেন। তাঁকে অবশ্যই (১) শ্রেণীসংগ্রাম অনুসরণ করতে হবে, (২) কেবল প্রলেতারিয়েতদের ভাষা, চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশ করতে হবে, (৩) আক্রমণ করতে হবে প্রতিক্রিয়াশীলদের, (৪) সাধারণ মানুষকে জাগাতে হবে এবং (৫) সর্বত্র ভাঙাগড়ার চিত্র আঁকতে হবে, পরিবারে, কারও ব্যক্তিগত জীবনে, সংগ্রামে, সারা বিশ্বে, ভালোবাসায়—তাঁকে অবশ্যই দেখাতে হবে কোনটা নতুন আর কোনটা পুরোনো, কোনটা মৃত ও কোনটার জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা আছে... ।[৩০]

ঊর্মিলা গুহর প্রবন্ধটিতে বলা হয়, সাহিত্য জীবনের হুবহু প্রতিলিপি বা অনুকরণ হওয়া উচিত নয়, তার পরোক্ষ সমালোচনাও নয়। সাহিত্য হচ্ছে অথবা তাকে অবশ্যই হতে হবে শত্রুকে আঘাত করার অস্ত্র।[৩১] বুদ্ধদেব বসুর *অ্যান একর্ অব গ্রিন গ্রাস* ও বিষ্ণু দের *সাহিত্য পত্র*, দুটোই লেখিকার আক্রমণের মুখে পড়ে।[৩২] *সাহিত্যপত্র* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮-এর জুলাইয়ে, আর *অ্যান একর অব গ্রিন গ্রাস* বের হয় সে বছরেরই প্রথম দিকে। দুটোই মার্ক্সবাদীদের গোলাবর্ষণের শিকার হলেও এ দুই প্রকাশনায় প্রতিফলিত ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সাহিত্যদর্শন। প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণু দে আমাকে বলেছিলেন, *সাহিত্য পত্র* বের করার একটা প্রণোদনা ছিল যে তিনি নিজেই বুদ্ধদেবের বইয়ের সমালোচনা করার জন্য একটা জায়গা চাইছিলেন।[৩৩]

ইংরেজিতে লেখা *অ্যান একর অব গ্রিন গ্রাস*-এর নামটি নেওয়া হয়েছিল ডব্লিউ বি ইয়েটসের 'অ্যান একর অব গ্রাস' থেকে। বুদ্ধদেব কিছুটা উচ্ছ্বসিতভাবে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জীবনানন্দ এবং তাঁর পরের আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ও অন্যদের সম্পর্কে তিনি যেভাবে তাঁর ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন কিংবা তাঁদের বিচার করেছেন তার জন্য ততটা নয়, বরং রাজনীতি ও সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বক্তব্য বিষ্ণু দে-কে বেশি ক্ষুব্ধ করেছিল। বুদ্ধদেব 'রাজনৈতিক বেসুরো চেঁচামেচি'র কথা বলেছিলেন, কবিরা যার মধ্যে পতিত হয়েছে, তিনি বলেছিলেন 'তোতা-রাজনীতি'র কথাও, যেখানে বারবার অন্যের কথা পুনরুক্তি করা হয় আর দাবি করা হয়, শিল্প রাজনীতির পদসেবা করে। তিনি উল্লেখ করেন, *কল্লোল*-এর লেখকদের সমালোচনা করা হয়, কারণ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাহিত্য নিয়ে খুব সামান্য কিছুই করেছেন তাঁরা। তাঁর ভাষায়, এসব আক্রমণের একটা 'ভণ্ড সারল্য' ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই একই চিন্তাধারা রাজনৈতিক মতবাদের ছদ্মবেশী ভাষার মোড়কে অলক্ষ্য রূপে পুনরাবির্ভূত হয়। বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের চাপ লেখকদের রিপোর্টার কিংবা সম্পাদকীয় পাতার নিবন্ধকারের ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। দুঃখজনক পরিণতি এই যে তথাকথিত সাহিত্যের সাম্প্রতিক কাজগুলো প্রধানত সংবাদপত্রের মসলায় তৈরি, সর্বশেষ ঘটনাবলির বর্ণনা ও সমসাময়িক বিষয়াবলির ওপর মন্তব্যগুলো গল্প কিংবা কবিতা হিসেবে সাজানো, কখনো চকচকে পোশাকি সাজে আর কখনো আলুথালু

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মলিন বেশে।[৩৪] বুদ্ধদেব আরও বলেন, মার্ক্সবাদে দীক্ষা নেওয়ার পর বিষ্ণু দের কবিতাগুলো মনে হয় 'শ্যাম্পেন স্বাদ' হারিয়ে ফেলেছে; উপরন্তু আরও দুঃখজনক যে চরিত্রগতভাবে আমাদের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে নিঃসঙ্গ জীবনানন্দ তাঁর তখনকার লেখাগুলোর মধ্যে যুদ্ধ ও যুদ্ধের সতর্কসংকেত ঠেসে দিচ্ছেন, পাছে কেউ তাঁকে সংশোধনহীন পলায়নবাদী বলে চিহ্নিত করে।[৩৫]

১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারির কোনো এক সময়ে *মার্ক্সবাদীর* দ্বিতীয় সংখ্যা বের হয়, এটির উপশিরোনামে ছিল 'মার্ক্সীয় সংস্কৃতিবিষয়ক সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সংকলন'। এটিতে সত্যজিৎ রায়ের (সিনেমা পরিচালক সত্যজিৎ নন) একটা প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে সংগ্রাম'। এতে পূর্ববর্তী সংখ্যায় ছাপা হওয়া দুটো প্রবন্ধের সাফাই গাওয়া হয়।[৩৬] *মার্ক্সবাদীর* এই সংখ্যায় *পরিচয়* পত্রিকার একটা বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়:

> নতুন সংস্কৃতির মুখপত্র। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ সংগ্রাম চলেছে—মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির, বর্বরতার বিরুদ্ধে মানবতার অপরাজেয় সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে যারা অগ্রগামী, যারা অন্ধকারের বুক চিরে নতুন সকাল এগিয়ে আনছে, পরিচয় তাদেরই সংস্কৃতির মুখপত্র। পৃথিবীর সব দেশের সংগ্রামী সংস্কৃতির কণ্ঠস্বর পরিচয়-এ প্রতিধ্বনিত।

পরিচয় ও *মার্ক্সবাদী* দুটো পত্রিকাই অভিন্ন রাজনৈতিক প্রচারের দায়িত্ব পালন করলেও *মার্ক্সবাদী* এই কাজটা করত আরও উচ্চস্বরে। এর চতুর্থ সংখ্যা বাংলা সাহিত্যের ওপর, আপাতদৃষ্টিতে মূলত রবীন্দ্রনাথের ওপর বিশেষ একটা তিক্ত আক্রমণ চালায়। লেখাটি অন্ততপক্ষে *পরিচয়* ও *মার্ক্সবাদীকে* পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। আবু সয়ীদ আইয়ুব স্মরণ করতে পারেন, ১৯৪৯ সালে নীরেন্দ্রনাথ রায়—যিনি গোপাল হালদারের সঙ্গে *পরিচয়*-এর যুগ্ম সম্পাদক—রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার প্রতিবাদ করেন, যা নীরেন্দ্রনাথ রায়কে পার্টির বিরাগভাজন করেছিল।[৩৭]

সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ বা কাছাকাছি কোনো এক সময়ে প্রকাশিত *মার্ক্সবাদীর* পঞ্চম সংখ্যায় 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন জনৈক রবীন্দ্র গুপ্ত।[৩৮]

> ৪ নং মার্ক্সবাদীতে বাংলা প্রগতি সাহিত্যের যে আত্মসমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে 'পরিচয়' এর সম্পাদকমণ্ডলী এবং প্রধান প্রধান লেখকগণ তীব্র প্রতিবাদ তুলেছেন। এই বাদ প্রতিবাদের মধ্যে দু'টি মূল ধারণার বিরোধ দেখা গিয়েছে।
>
> মার্ক্সবাদীর প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রগতির উৎস খুঁজতে হবে সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি যে গণ-বিদ্রোহ দেখা গিয়েছে তার ভিতর। কয়েকজন লেখক মার্ক্সবাদীতে প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, প্রগতির উৎস খুঁজতে হবে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের ভিতর। উক্ত লেখকগণ সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি গণ-

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> বিদ্রোহের বিপ্লবী ভূমিকা অস্বীকার করেছেন। তাঁরা মন্তব্য করেছেন যে, মার্ক্সবাদীর ঐ চিন্তাধারা 'অতি বামপন্থী' এবং মার্ক্সবাদ বিরোধী। মার্ক্সবাদী ঘোষণা করছে যে, এই লেখকগণের চিন্তাধারা বুর্জোয়া-সংস্কারপন্থী এবং হিন্দু 'রিভাইভালিস্ট'। ৪ নং মার্ক্সবাদীতে প্রকাশ রায় 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'য় যা যা লিখেছেন তার সমস্ত খুঁটিনাটিই যে নির্ভুল তা নয়, কিন্তু তাঁর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সঠিক।[৩৯]

এই রবীন্দ্র গুপ্ত তখন দুজন 'প্রগতিশীল' লেখকের কথা উল্লেখ করেন, কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭৬) ও দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-৭৪)।[৪০] আরেকজন উনিশ শতকের লেখকও প্রগতিশীলদের মধ্যে পড়েন: 'মাইকেল মধুসূদন দত্তও এঁদের মতই বাস্তব ও প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা করে গেছেন।'[৪১] তিনি যুক্তি দেখান যে মধুসূদনের নাটক *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* জমিদারশ্রেণীকে উলঙ্গ করে ছেড়েছে, কাছাকাছি যেমন কালীপ্রসন্ন সম্পন্ন করেছেন *হুতোম প্যাঁচার নকশায়*। তিনি মধুসূদনের কবিতারও উচ্চপ্রশংসা করেন। কারণ, তা দুটো অর্থবহ উপায়ে সংস্কৃত সাহিত্যধারার বিরুদ্ধাচরণ করেছে: প্রথমত, প্রাচীন দেবদেবীকে তিনি আরও মানবীয় ও আধুনিক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং দ্বিতীয়ত, মধুসূদন প্রাচীন সাহিত্যের নিয়মরীতি উপেক্ষা করেছেন, উদ্ভাবন করেছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

> এঁদের সাহিত্যে প্রগতিশীল বুর্জোয়া সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করেছিল বলিষ্ঠভাবে, হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য, স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার এবং বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধাচার—এই ছিল তাঁদের সাহিত্যের বিশেষত্ব।[৪২]

দীর্ঘ এই প্রবন্ধের বাকি অংশ মূলত কেন্দ্রীভূত ছিল *পরিচয়*-এর লেখকদের এ বক্তব্য নাকচ করার মধ্যে যে বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মূলত ছিলেন প্রগতিশীলতার উৎস।

মার্ক্সবাদীর সপ্তম সংখ্যা—সম্ভবত সর্বশেষ সংখ্যা—বের হয় মার্চ ১৯৫০ সালে। এই সংখ্যায় সাহিত্যবিষয়ক কোনো প্রবন্ধ ছাপা হয়নি, তবে এটিতে *পরিচয়* পত্রিকার আরেকটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, যা এই দুই কমিউনিস্ট পত্রিকার মধ্যে মিলনাত্মক সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়।

৪

'সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র' নামের আরেকটি সাহিত্য সংগঠনের জন্ম হওয়ার কারণ ছিল শিল্পের রাজনৈতিকীকরণ। *পরিচয়* পত্রিকার মতো একটা মুখপত্রসহ একটা পরিচিত কমিউনিস্ট সাহিত্যগোষ্ঠীর উপস্থিতিই অকমিউনিস্ট লেখকদের এটির বিরুদ্ধবাদী একটা সাহিত্যগোষ্ঠী গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এ রকম একটা অংশ পরিচিত ব্যক্তিত্ব সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়, যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'শনিচক্র'[৪৩] নামে পরিচিত হয়। ফলে সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র নিজেকে পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় একটা শক্তি বলে বিবেচনা করত (প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ ও শনিচক্র উভয়ের বিপরীতে)।

পশ্চিমবঙ্গের সব ধরনের সাহিত্য আত্মসচেতনভাবে রাজনৈতিক হয়ে যায়নি। *কবিতা* পত্রিকা তখনো শক্তিশালী ছিল, *পূর্বাশা*ও ১৯৪৩ সালে আবার বের হতে শুরু করে; নিয়মিত বেরোচ্ছিল *চতুরঙ্গ*। এই তিনটি সাহিত্যপত্রের তিন সম্পাদক—বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও হুমায়ুন কবির—সবারই ছিল নিজস্ব রাজনৈতিক মত, কিন্তু তাঁদের পত্রিকাগুলোর কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। এতদসত্ত্বেও *মার্ক্সবাদী* ও *পরিচয়* পত্রিকায় দৃষ্টান্তমূলকভাবে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সক্রিয় ও মারমুখী রাজনীতিচর্চা কলকাতার লেখকদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা শেষ পর্যন্ত সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র গঠন পর্যন্ত গড়ায়।

আবু সয়ীদ আইয়ুব আমন্ত্রিত হয়ে *পরিচয়*-এর সম্পাদকীয় বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত হন চল্লিশের দশকে। ১৯৪৮-এর দিকে পদত্যাগ করেন বলে স্মরণ করতে পারেন তিনি। এই শুদ্ধ সমালোচক-লেখককে তাঁদের অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য দলভুক্ত করা যাবে, নিঃসন্দেহে এ আশায় প্রায় একই সময়ে কমিউনিস্টরা সাহিত্য বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে একটা লেখা চান। আইয়ুব এমন একটি বিষয় বেছে নেন, যাকে তিনি বলেন সাহিত্যের 'চূড়ান্ত' ও 'উপকরণ' মূল্য। তিনি দুই ধরনের সাহিত্যকে চিহ্নিত করেন: একটি নিজের মধ্য থেকেই চূড়ান্ত সর্বোচ্চ বিষয়; আরেকটি সমাজ পরিবর্তনের চালক। খাঁটি ও প্রায়োগিক—এ দুই ধরনের সাহিত্য অস্তিত্বশীল, ঠিক যেমন বিজ্ঞানেও আছে এ দুই শাখা, এই যুক্তিবলে তিনি বলেন, বিশুদ্ধ শিল্প হিসেবে প্রায়োগিক সাহিত্যের মূল্য সামান্যই। আইয়ুব উপসংহারে বলেন, কমিউনিস্টরা প্রায়োগিক সাহিত্য রচনা করে, এ রকম সৃষ্টির কোনো চূড়ান্ত সাহিত্যমূল্য নেই। লেখাটি যেহেতু চেয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেটা *পরিচয়*-এ ছাপা হয়। তবে, আইয়ুব স্মরণ করেন, তাঁর লেখাটির পাশাপাশি দুটো যুক্তিখণ্ডনকারী লেখাও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল।

এ রকম সময়ে, কমিউনিস্ট পণ্ডিতেরা উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আইয়ুব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে সাহিত্যে একটা তৃতীয় ধারা থাকা উচিত। আইয়ুবের বক্তব্য অনুযায়ী এই তৃতীয় শক্তিকে আবশ্যিকভাবে তাদের সামাজিক প্রতিবেশ ও সমসাময়িক সমস্যাগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে হবে; তৎসত্ত্বেও তারা লিখবে স্বাধীন একক ব্যক্তি হিসেবে, কমিউনিস্টবিরোধী হিসেবে নয় এবং তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতনতাহীন লেখক হিসেবেও নয়। এই তৃতীয় শক্তির লেখকেরা কমিউনিস্ট ধাঁচের 'প্রায়োগিক' কিংবা 'যান্ত্রিক' সাহিত্য সৃষ্টি করবে না, লিখবে 'চূড়ান্ত' সাহিত্যিক মূল্যবাহী লেখা।[৪৪]

১৯৫০ সালের জুন মাসে *দ্বন্দ্ব* নামের একটা মাসিক পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ শুরু হয়, এটির সম্পাদক হিসেবে নাম ছিল আবু সয়ীদ আইয়ুব, জীবনানন্দ দাশ ও নরেন্দ্রনাথ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মিত্রের।[৪৫] সংখ্যাটির শেষ পৃষ্ঠার আগের পৃষ্ঠায় ছাপা হয় সুহৃদ রুদ্র প্রকাশিত *সমকালীন বাংলা কবিতা সংকলন*-এর একটি বিজ্ঞাপন। তিন বছর আগে *দ্বন্দ্ব* শুরু হয়েছিল বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে এই সুহৃদ রুদ্রের হাতে, দুজনই খাঁটি সমাজতন্ত্রী। সমাজতান্ত্রিক দলের সাংস্কৃতিক কমিটির সেক্রেটারি আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের প্রচেষ্টায়[৪৬] ১৯৫০ সালে *দ্বন্দ্ব* সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রের মুখপত্রে পরিণত হয়।[৪৭]

তবে সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র কিংবা *দ্বন্দ্ব* কোনোটিকেই সমাজতান্ত্রিক দল আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি। এই গোষ্ঠীর বহু সদস্য এমনকি সমাজতান্ত্রিক দলের সঙ্গেই ছিলেন না।[৪৮] আনন্দগোপালের মতে, বিশেষ করে জীবনানন্দ সম্ভবত কেন্দ্রের একজন সদস্য ছিলেন, সমাজতান্ত্রিক দলের নয়। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রের সদস্যরা সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। জীবনানন্দ সমাজতন্ত্রের জন্য কতখানি সংকল্পবদ্ধ ছিলেন, সেটা পরিষ্কার নয়। আইয়ুব নিশ্চিতভাবে স্মরণ করতে পারেন, জীবনানন্দ সাহিত্যে একটা তৃতীয় শক্তির ধারণার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন।[৪৯]

১৯৪৯ সালের শেষ দিকে জীবনানন্দ সমকালীন বাংলা কবিতার পরিস্থিতি আলোচনা করে 'বেঙ্গলি পোয়েট্রি টুডে' শিরোনামে ইংরেজিতে একটা প্রবন্ধ লেখেন। 'মার্ক্সিস্ট' শব্দটি যদিও মাত্র একবার ব্যবহার করা হয় এবং 'কমিউনিস্ট' একবারও নয়, তবুও এটা পরিষ্কার যে কমিউনিস্ট দর্শনের অনমনীয় চরিত্র তাঁকে বিরক্ত করে। তিনি যুক্তি দেখান, একজন সত্যিকার কবি হবেন স্বাধীন। কারণ তিনি সৃষ্টি করেন নিজস্ব দর্শন ও তৈরি করেন নিজস্ব ভুবন। তবে তিনি স্বীকার করেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা যুগের দাবি হিসেবে যা বিশ্বাস করে, তার প্রাঞ্জল স্বীকারোক্তি চাইতে পারে, যার আবার প্রয়োজন হতে পারে নতুন সাহিত্য ও সাহিত্যের প্রতি নতুন মনোভাব। এতদসত্ত্বেও কবিরা যখন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় আবিষ্ট হয়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কাব্যিক সাফল্য গড়তে চান অথবা সে রকম ভাবেন, তখন তাঁরা স্থায়ী মূল্যবোধসম্পন্ন কিছু সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন।[৫০]

জীবনানন্দের প্রবন্ধটি প্রকাশের অল্প কিছুদিন পরই সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়: আবু সয়ীদ আইয়ুব হন সভাপতি, সন্তোষকুমার ঘোষ সাধারণ সম্পাদক ও আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক।[৫১] সাহিত্য কেন্দ্র কেবল সভা করত তা নয়, ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ তারা তাদের মাসিক পত্রিকাও বের করে। আইয়ুবের সভাপতিত্বে এমন একটা সভায় ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রধান নরেন্দ্র দেব ভাষণ দেন। খবরটি সমাজতান্ত্রিক কাগজ *জনতায়* নিম্নোক্ত শিরোনামে ছাপা হয়: 'গণতন্ত্র, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রচার করুন: লেখকদের প্রতি আচার্য নরেন্দ্র দেবের আহ্বান।' সেখানে নরেন্দ্র দেবের ভাষণের সংক্ষিপ্তসার ছাপা হয়, যাতে তিনি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, এটা হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গণতন্ত্র, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের যুগ। সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের লেখকেরা এসব নতুন মূল্যবোধ প্রচার করবেন।[৫২]

জীবনানন্দ সংগঠনের প্রথম সভায় যোগ দিতে সক্ষম হননি।[৫৩] তার পরিবর্তে তিনি রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর কিছু মতামত জানিয়ে আনন্দগোপালের কাছে একটা চিঠি পাঠান, যা এ রকম :

> পৃথিবীর নামকরা সভ্য দেশগুলো সাহিত্য বলতে প্রায়ই অল্পাধিক অতীতের সাহিত্য বোঝে; কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে কি তার মূল্য পরিষ্কার ভাবে বুঝে দেখবার চেষ্টা নেই; সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো কথাই বড় একটা ভাবে চায় না; আজকের সাহিত্যিক যা খুশি ভাবুক লিখুক ষ্টেটের তাতে কিছু এসে যায় না—এমনই অকিঞ্চিৎকর মনে করা হয় সাহিত্যকে। এই হ'ল এক দিককার ছবি। অন্য দিকে দু-একটি বড় রাষ্ট্রে সাহিত্য সম্বন্ধে চেতনার সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে; সে সব জায়গায় রাষ্ট্র সবই চালাচ্ছে—সাহিত্যকেও; সাহিত্যিকের মনন ও ধ্যানের কিছু মাত্র স্বাধীনতা থাকলেও রাষ্ট্রের প্রভুত্ব খর্ব্ব হয়—এই তাদের ধারণা। অসত্য—এবং অন্যায়। সাহিত্যের উচিত স্বাধীনতায় স্টেট বিপদগ্রস্থ হবে, আমার মনে হয়, বাংলা দেশ এভাবে এখনও ভাবতে সুরু করে নি, কিন্তু শীগগিরই করতে পারে। 'সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র' এক দিকে সমাজ ও জনতার বিমূঢ় উপেক্ষা ও অন্য দিকে রাষ্ট্র ইত্যাদির অন্যায় ও অবৈধ কর্ত্তৃত্বের হাত থেকে সাহিত্যকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখবার কাজে ধৈর্য্য, জ্ঞান ও বিনয়ের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন অনুভব ক'রে আমি আনন্দিত হয়েছি। সাহিত্যের উন্নতি ও সার্থকতার জন্যে আপনারা মিলিত হয়েছেন; আপনাদের পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি।
>
> জীবনানন্দ দাশ[৫৪]

কীভাবে প্রগতি ও সাহিত্যবোধ কার্যকর হবে, সমকালীন লেখক কেন্দ্রের ম্যানিফেস্টোতে তার খসড়া উপস্থাপন করা হয়। 'সমকালীন সাহিত্যের পথ' শীর্ষক আবু সয়ীদ আইয়ুবের একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালের জুন সংখ্যা *দ্বন্দ্ব*-এর সম্পাদকীয় ভূমিকা হিসেবে। বহু আগে লেখা ও এরই মধ্যে প্রকাশিত (*দেশ*, ডিসেম্বর ১৯৪৯)[৫৫] প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু কেন্দ্রের সদস্যদের কাছে সুপরিচিত ছিল।

আইয়ুব লেখেন, রেনেসাঁ মনকে চার্চ থেকে মুক্ত করেছে। কিন্তু আজ চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আর একটি নতুন প্রয়াস, 'মধ্যযুগীয় চিত্তবন্ধনের দ্বিতীয় পালা আরম্ভ হচ্ছে।'

> এই রাজনৈতিক ধারার অধিবক্তাদের কাছে শিল্প সাহিত্যের কোনো মূল্য থাকে না যদি সে শিল্প সাহিত্য তাঁদের রাজনৈতিক সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে মূল্যবান না হয়। এঁরা ভুলে যান যে, রাজনৈতিক সংগ্রামের উদ্দেশ্যই হল এমন এক শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে জনসাধারণের জৈব অভাব মোচন করে তাঁদের জীবনকে শিল্পে সাহিত্যে সংস্কৃতিতে নব নব রূপে উন্মুক্ত ও বিকশিত করা সম্ভব হবে।

শৈল্পিক সৃষ্টির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কমিউনিস্ট পার্টির এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সমালোচনার পর *মার্ক্সবাদী*তে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করে আইয়ুব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ ধরনের দর্শনের বহিঃপ্রকাশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রবন্ধটিতে বলা হয়, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে সংস্কৃতি-ধারা চলে আসছে সেটা 'বুর্যোয়া ঐতিহ্যের জঞ্জাল। এর যথোপযুক্ত স্থান ইতিহাসের ডাষ্টবিনে।'(*মার্ক্সবাদী*, সংখ্যা ৪, পৃ.১১৯)।[৫৬]

তাদের ধার করা বক্তব্য সত্ত্বেও আইয়ুব মার্ক্সবাদীদের প্রাপ্য ঠিকই দিয়েছেন :

> মার্ক্সবাদীদের সাহিত্য-নীতির সঙ্গে আমাদের অল্প-বিস্তর মতভেদ আছে বলে আমরা যেন ভুলে না যাই যে, তাঁরা সাহিত্যে এক নতুন সমাজ-চেতনা এনেছেন এবং পূর্ব্বতন সমাজ-চেতনাকে দৃঢ় ও প্রশস্ত করেছেন। এই সমাজ-চেতনার সাহিত্যিক ও সামাজিক মূল্য স্থায়ী।

তিনি উল্লেখ করেন, কিন্তু সমকালীন সাহিত্যের ওপর বিদ্বেষমূলক আক্রমণের ফলে বহু লেখক রাজনীতি পরিহার করে তাঁদের লেখা থেকে সমাজ-সচেতনতার সমিল বিষয় বাদ দিয়েছেন—যে প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক নয় (যেহেতু মানুষ সামাজিক প্রাণী), কাম্যও নয়। আইয়ুব গন্তব্যের কাছাকাছি গিয়ে মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে মিলিত হন, যখন তিনি বলেন :

> বিপ্লবী নেতা ও কর্মীর কাছে সাহিত্যিক পাবেন তাঁর জীবন-দর্শনের আরও ফলিত পরীক্ষিত এবং বাস্তবীকৃত রূপ, কিন্তু সেটাকে চিন্তায় ও কল্পনায় রূপায়িত করবার দায়িত্ব তাঁর একতার, এইখানে তাঁর স্বরাজ, স্বৈরাজ্য সেখানে নৈরাজ্যেরই নামান্তর।

লেখক স্বাধীনভাবে তাঁর স্বকীয়তা প্রকাশ করবেন। সামাজিক সচেতনতা ও রাজনৈতিক দর্শন স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যে উপস্থাপিত হওয়া উচিত। শিল্প শিল্পই থাকা উচিত, রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হওয়া উচিত নয়।[৫৭]

আইয়ুবের মতে, সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র ছিল রাজনৈতিক গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও চূড়ান্ত শৈল্পিক স্বাধীনতার পক্ষে। এ রকম একটা রক্ষণশীল বিষয়সূচি থাকা সত্ত্বেও কেউ নিশ্চয়ই অবাক হবেন, জীবনানন্দ কেন আনন্দগোপালের মাধ্যমে একটা সাবধানী ও সতর্কতামূলক চিঠি পাঠিয়েছিলেন সংগঠনের কাছে। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, বন্ধ করে দেওয়া হয় এটির মুখপত্র। যখন তিনি লেখেন, 'সাহিত্যের উচিত স্বাধীনতায় স্টেট বিপদগ্রস্থ হবে, আমার মনে হয়, বাংলা দেশ এভাবে এখনও ভাবতে সুরু করেনি, কিন্তু শীগগিরই করতে পারে', তখন কি তিনি ভয় পেয়েছিলেন? যখন তিনি নিশ্চয়তার চেয়ে আরও বেশি আশা নিয়ে ঘোষণা করেন, 'সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র এক দিকে সমাজ ও জনতার বিমূঢ় উপেক্ষা এবং অন্য দিকে রাষ্ট্র ইত্যাদির অন্যায় ও অবৈধ কর্তৃত্বের হাত থেকে সাহিত্যকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখার কাজে ধৈর্য্য, জ্ঞান ও বিনয়ের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন অনুভব ক'রে আমি আনন্দিত হয়েছি', তখন কি তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন যে আইয়ুব ও অন্যরা আরও বেশি র‍্যাডিকেল হয়ে উঠতে পারেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যে পত্রিকাটিতে সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম ছিল, সেটিতে খুব কমই লিখেছেন জীবনানন্দ। প্রথম সংখ্যায় 'আশা ভরসা' নামে তাঁর একটা কবিতা ছিল, আর সেপ্টেম্বর ১৯৫০, চতুর্থ সংখ্যায় (পূজা সংখ্যা) ছিল তাঁর প্রবন্ধ 'আধুনিক কবিতা'। এটিতে তিনি তাঁর বিষয়বস্তুকে চিহ্নিত করেন:[৫৮] 'মানুষের মনের চিরপদার্থ কবিতায় বা সাহিত্যে মহৎ লেখকদের হাতে যে বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে তাকেই আধুনিক সাহিত্য বা আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে।'[৫৯] জীবনানন্দ যেভাবে বলেন, তাঁর সংজ্ঞা অনুযায়ী সংস্কৃত ও গ্রিক সাহিত্য থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু মহৎ লেখাকে আধুনিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[৬০] তবে তিনি 'আধুনিক সাহিত্য' শব্দগুচ্ছটির আরও ব্যাপকভাবে গৃহীত আরেকটি অর্থের কথা বলেন, 'প্রথম ধরনের' আধুনিকতা: 'নিজের যুগের স্থূল সব লক্ষণে অতিরিক্ত সংক্রামিত হয়ে প্রথম ধরনের আধুনিক কবিতা, যুগের ভিতরে পর্যবসিত হয়ে, নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'[৬১] রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ধরনের সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যা *কল্লোল*-প্রজন্মকে প্রজ্বলিত করেছিল, তার ফলে এ ধরনের আধুনিক ক্ষণজীবী কবিতার জন্ম হয়েছিল। গদ্যছন্দ নিয়ে ১৯৩০-এর দশকের কাঠামোগত নিরীক্ষা যুগের অংশে পর্যবসিত হয়, এগুলো উপভোগ্য ছিল, কিন্তু সাহিত্যের মূল্যবোধের নিরিখে অবশ্যম্ভাবীভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল না। সাময়িক বিষয়ীভূত ধারণাগুলো সেসব কবিতার বেশির ভাগে ছড়িয়ে ছিল ১৯২০-এর থেকে ১৯৫০-এর দশক অব্দি, তবে এসব সাময়িক কবিতাই প্রথম ধরনের (নিকৃষ্ট) আধুনিক কবিতার উদাহরণ।

তারপর জীবনানন্দ আধুনিক কবিতার প্রত্যয়ের অভাবের কথা উল্লেখ করেন। *মার্ক্সবাদীর* লেখকেরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নৈরাশ্যবাদের কথা উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছিলেন। জীবনানন্দও সেই সাহিত্যের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন, যেখানে কবিদের দৃঢ় ইতিবাচক বিশ্বাস নেই:

> আশা করা যাক আধুনিক বিজ্ঞানের (ফলিত বিজ্ঞানের কথা বলছি না আমি) ফলাফল কেবলই নিরাশাবাদকে প্রশ্রয় দেবে না;...বিজ্ঞানের, বা অন্য কোনো অনুভূতি বা সত্যের, সিদ্ধান্ত কবির নিকটে সৎ মনে হলে যে বিশ্বাসে স্থিত হয়ে কবিতা লেখা সম্ভব তার অভাবেও, ভালো—এমন কি মহৎ, কবিতা রচিত হতে পারে—অবিশ্বাস বা অনিশ্চয়তার ভিতরে বিষয়ের মাহাত্ম্য রয়েছে বলে নয়—কিন্তু যে-কোনো বিষয়—এমন কি অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসও—বিশেষ কবির হাতে শিল্পের সিদ্ধি লাভ করতে পারে বলে। কিন্তু এ রকম কবি ও তার এ ধরনের সম্ভাবনা ও সিদ্ধার্থ সাহিত্যের ইতিহাসে বেশি রয়েছে বলে টের পাইনি।[৬২]

সংগঠনের সভায় প্রদত্ত ভাষণ থেকে সংশোধিত এই প্রবন্ধটি যখন ছাপা হয়,[৬৩] জীবনানন্দ তখন এক মফস্বল কলেজে চাকরি নিয়ে সাময়িকভাবে কলকাতা ছেড়েছেন। 'সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র' নিজেই স্বল্পজীবী বলে পরিগণিত হয়। *দ্বন্দ্ব*-এর তিনটি কিংবা চারটি সংখ্যা বের হওয়ার পর তিন সম্পাদকের মধ্যে দুজনই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কলকাতা ছাড়েন—আবু সয়ীদ আইয়ুব যান শান্তিনিকেতনে,[৬৪] আর জীবনানন্দ কলকাতা থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরে মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরে। *দ্বন্দ্ব* পত্রিকার উপসম্পাদক প্রবন্ধের দায়িত্বে নিয়োজিত অম্লান দত্তকে জীবনানন্দ তাঁর এই প্রধান লেখাটি সম্পর্কে লেখেন :

১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড
কলকাতা-২৬
১৫.৯.৫০

প্রিয়বরেষু,

অম্লান বাবু, আপনাদের নির্দ্দেশমত আশ্বিনের 'দ্বন্দ্বের' জন্যে 'আধুনিক কবিতা' লেখাটি তৈরি ক'রে এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম।

এই লেখাটি আপনি আশ্বিনের সংখ্যায় সম্পাদকীয় হিসেবে ব্যবহার করবার কথা বলেছিলেন; কিন্তু প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে ব্যবহার করলে ঠিক হবে হয়তো।

Final proof আমি একবার অবশ্যই দেখে দিতে চাই। আসছে weekend-এ আমি কলকাতায় আসব কিনা বলতে পারছি না; কিন্তু তার পরে এলেও proof দেখবার সুযোগ পাব আশা করি। প্রীতি নমস্কার। ইতি

জীবনানন্দ দাশ[৬৫]

সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রে তাঁর সদস্য হওয়ার অর্থ ছিল নির্জনতম একান্তচারী এই কবির কোনো রাজনৈতিক ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ হয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা। জীবনানন্দ নিশ্চয়ই ১৯৫০ সালে সমাজতান্ত্রিক পার্টি কিংবা সমাজতন্ত্রের আগ্রহী সমর্থক হয়ে যাননি। তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের পত্রিকায় লিখতেন। যেমন, ১৯৫০-এর অক্টোবরে তাঁর কবিতা 'আজ'[৬৬] ছাপা হয় *নির্ণয়*-এ। এটি ছিল পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কিত একটা সাংস্কৃতিক প্রকাশনা। কংগ্রেসের প্রতি তাঁর কোনো সহানুভূতি আছে, তা নয়। সেখানে লেখার কারণ, সম্পাদক অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন।[৬৭]

আজ

অন্ধ সাগরের বেগে উৎসারিত রাত্রির মতন
আলোড়নে মানুষের প্রিয়তর দিকনির্ণয়ের
পথ আজ প্রতিহত; তবুও কোথাও
নির্মল সন্ততি দেশ সময়ের নব নব তীর—
        পেতে পারে হয়তো বা মানবহৃদয়;
মহাপতনের দিনে আজ অবহিত হয়ে নিতে হয়।
যদিও অধীর লক্ষ্যে অন্ধকারে মানুষ চলেছে
ধ্বংস আশা বেদনায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বন্য মরালের মতো চেতনার নীল কুয়াশায়,—
কুহেলি সরিয়ে তবু মানুষের কাহিনীর পথে
ভাস্বরতা এসে পড়ে মাঝে মাঝে—
স্বচ্ছ ক্রান্তিবলয়ের মতন জগতে।

মনে হয় মহানিশীথের স্তন্যপায়ী
মানুষ তবুও শিশুসূর্যের সন্তান,
স্থিরতর বিষয়ী সে,—
যদিও হৃদয়ে রক্তে আজো ভুল অকূলের গান।[৬৮]

যে প্রত্যয়ের কথা তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন তা দেখাতে সংকল্পবদ্ধ বলে মনে হয় জীবনানন্দকে। নির্ণয়ের (এটি পত্রিকাটিরও নাম) পথ রুদ্ধ হতে পারে অথবা আজ তেমনই মনে হচ্ছে, কিন্তু মধ্য বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অন্ধ সাগরের দূর তীরভূমিতে এখনো বোধকরি পৌছানো যাবে। আপাতদৃষ্টিতে অন্ধকারের এক শিশু, মানবজাতির জন্ম হয়েছে উদীয়মান সূর্য থেকে। এতদসত্ত্বেও নিরাশাবাদ আধিপত্য করে : মানুষ এখনো গায় সেই 'ভুল অকূলের গান'। জীবনানন্দের বিশ্বাস আছে, নতুন তীর পাওয়া যাবে। তাঁর নিজের জীবনের পথও মনে হয় ১৯৫০-এর শরতে অপেক্ষাকৃত ভালো কিছুর জন্য একটা সাময়িক বাঁক নিয়েছিল, যদিও পূর্ববর্তী কিছু চরম হতাশ সময় গেছে তাঁর।

৫

এর আগে ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি জীবনানন্দ তাঁর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে কোনো অন্যায্য উদ্বেগ প্রকাশ করেননি অথবা এ রকম কিছু অন্তত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাছে জানাতে চাননি, যাঁকে তিনি লিখেছিলেন :

১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড
কলকাতা-২৬
১৩.৬.৪৯.

ভাই অচিন্ত্য,

কয়েকদিন হল তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল; অন্য নানা কাজে অকাজেও ব্যস্ত ছিলাম, কাজেই চিঠির উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল।

তোমাকে চিঠি লিখতে লিখতে আমার বরিশালের সেই সব দিনের কথা মনে পড়ছে যখন তোমাদের একটার পর একটা চিঠি হাতে আসত, উত্তর দিতাম, প্রত্যাশা করতাম। তখনকার দিনের বরিশাল আজকের চেয়ে প্রায় সব দিক দিয়েই ভালো ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি তোমাকে ভুল বুঝিনি; ঠিকই আছে সব; এর আগের চিঠিতে তোমাকে লেখেছি, তোমার চিঠিও প'ড়ে দেখেছি—সবই যথাস্থানে আছে—ভালোই আছে।

আমি বিশেষ কোনো কাজ করছিনা আজকাল। লিখে, পড়িয়ে, অল্পস্বল্প রোজগারে চলে যাচ্ছে। একটা চাকরীর জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, reference চেয়েছিল—তার ভেতর তোমার নামও দিয়েছি; ও সব চাকরী হবেনা। সব ছেড়ে দিয়ে শুধু লিখে যেতে পারলে ভালো হত। সেটা অনেকদিন থেকেই সম্ভব হচ্ছে না। কলকাতায় এলে দেখাসাক্ষাৎ হবে। আশা করি ভালো আছ। ভালোবাসা জানাচ্ছি।

তোমার জীবনানন্দ[৬৯]

তাঁর স্ত্রী ১৯৪৮-৪৯ সালে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন, পরের বছর আবার বেকার হয়ে যান। তারপর দাশ পরিবারের বাজেটকে আরও একটু চাপে ফেলে ১৯৫০-৫১ সালে ভর্তি হন ডেভিড হেয়ার টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনে।

অচিন্ত্যকুমারকে লেখার পরের বছর ঠিক একই দিনে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে একটা বরং খেদসূচক চিঠি লেখেন।

১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড
কলকাতা-২৬
১৩.৬.৫০.

প্রিয়বরেষু,

আশা করি ভালো আছেন।

বেশ ঠেকে পড়েছি, সে জন্যে বিরক্ত করতে হ'ল আপনাকে। এখুনি চার পাঁচ শো টাকার দরকার; দয়া ক'রে ব্যবস্থা করুন।

এই সঙ্গে পাঁচটি কবিতা পাঠাচ্ছি। পরে প্রবন্ধ ইত্যাদি (এখন কিছু লেখা নেই) পাঠাব। আমার একটা উপন্যাস (আমার নিজের নামে নয়—ছদ্ম নামে) পূর্ব্বাশায় ছাপাতে পারেন, দরকার বোধ করলে পাঠিয়ে দিতে পারি। আমার 'জীবনস্মৃতি' আশ্বিন কিংবা কার্ত্তিক থেকে পূর্ব্বাশায় মাসে মাসে লিখব। সবই ভবিষ্যতে কিন্তু টাকা এখুনি চাই;—আমাদের মত দুচার জন বিপদগ্রস্থ সাহিত্যিকের এরকম দাবি গ্রাহ্য করবার মত বিচার বিবেচনা অনেক দিন থেকে আপনারা দেখিয়ে আসছেন—সে জন্যে গভীর ধন্যবাদ।

লেখা দিয়ে আপনার সব টাকা শোধ ক'রে দেব,—না হয় ক্যাশে। ক্যাশে শোধ করতে গেলে ছ-সাত মাস (তার বেশি নয়) দেরি হতে পারে। কবিতাগুলোর সবই এক সময়ের লেখা নয়। কবিতা বেছেই পাঠিয়েছি; তবু যদি কিছু অপছন্দ হয় আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। কবিতা আপনার সুবিধামত পূর্ব্বাশায় কিংবা অন্য কোনো ভালো পত্রিকায় (উপযুক্ত টাকা দিলে ও মর্য্যাদা রাখলে)—ছাপাতে পারেন। জরুরি। আজকালই প্রত্যাশা করছি।

প্রীতি নমস্কার। ইতি
জীবনানন্দ দাশ[৭০]

এক মাস পর একটা শিক্ষকতার চাকরি চেয়ে হরপ্রসাদ মিত্রের কাছে একখানা চিঠি লেখেন তিনি :

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড
কলকাতা-২৬
১১.৭.৫০

প্রীতিভাজনেষু,

ইতিপূর্ব্বে আপনাকে লিখেছি। কাগজে দেখলাম শ্রীরামপুর কলেজে একজন ইংরেজির লেকচারার নেয়া হবে। অন্ততঃ দুশো টাকা মাইনে দিলে দরখাস্ত করতে পারি। একটা কিছু স্থায়ী রোজগারের বড্ড দরকার। শ্রীরামপুর কলেজ সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারবেন।

আজকের (ও রবিবারের) অমৃত বাজারে দেখলাম কলকাতার কোন First grade college এ ইংরেজির লেকচারারের পোষ্ট খালি আছে; কোন কলেজ জানায় নি, Box No. দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। এটা Scottish church college নাকি City—বুঝতে পারছি না। Women's College এর খবর কি?

দয়া ক'রে আমার এখানে আজকালই এক দিন এলে খুব খুশি হব। অবশ্যই আসবেন।

আপনার লেখা কতদূর এগোল? আশা করি ভাল আছেন।

প্রীতি নমস্কার
জীবনানন্দ দাশ[৭১]

চিঠিতে উল্লিখিত কলেজগুলোর কোনোটিতেই কিছু বাস্তবায়িত হয়নি। তবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জীবনানন্দ একটা চাকরি পেয়ে যান। ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে নতুন চালু হওয়া (১৯৪৯) ইন্টারমিডিয়েট ডিগ্রি প্রদানকারী খড়গপুর কলেজে ইংরেজি বিভাগে যোগ দেন। খড়গপুর শহরটি কলকাতা থেকে আসা-যাওয়া করার জন্য বেশ দূরে বলে জীবনানন্দকে সেখানেই থাকতে হতো। তবে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে এবং যখনই সম্ভব হতো তিনি কলকাতায় আসতেন। কলেজের কয়েকজন শিক্ষক-কর্মচারী স্মরণ করতে পারেন যে তিনি প্রায়ই কলকাতায় আসতেন। উপরন্তু মাঝেমধ্যে কয়েক দিন তিনি টানা অনুপস্থিত থাকতেন। এতে কখনো কখনো তাঁর ক্লাস নেওয়ায় ব্যাঘাত ঘটত। এ সময় লাবণ্য দাশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। জীবনানন্দকে তাঁর দেখাশোনা করতে হচ্ছিল। সেই কলেজে তিনি মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস ছিলেন, ১৯৫১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।[৭২]

একপর্যায়ে জীবনানন্দ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে যান। ইনি তখন সিটি কলেজে শিক্ষকতা করছিলেন। নারায়ণের মনে হয়েছিল, জীবনানন্দ করুণভাবে তাঁর কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন, এই কলেজে কি তিনি একটা চাকরি পেতে পারেন না, যেখানে তিন দশক আগে তিনি তাঁর চাকরিজীবন শুরু করেছিলেন? তিনি জানতে চান, নারায়ণ বুঝতে পেরেছেন কি না যে তিনি একদিন এই কলেজ থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন। তারপর বলেন, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যকার সহজাত শ্রদ্ধার সম্পর্ক বজায় রাখতে তাঁকে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রের চেয়ে অন্তত পাঁচ টাকা বেশি বেতন পেতে হবে। নারায়ণ প্রতিবাদ করে বলেন, জীবনানন্দের তাঁর কাছ থেকে কমপক্ষে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

১০০ টাকা বেশি বেতন পাওয়া উচিত। তারপর দ্বিধা করে জানতে চান, কলেজের একজন জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে তিনি তাঁর প্রাক্তন অধ্যাপকের জন্য কী সাহায্য করতে পারেন। ব্যাপারটার সেখানেই সমাপ্তি ঘটে।[৭৩]

এ সময়ে (১৯৫০-৫১) জীবনানন্দ তাঁদের ল্যান্সডাউন রোডের বাসাটা সাবলেট দেন তৃতীয় ও শেষবারের মতো।[৭৪] এই ভাড়াটে জীবনানন্দের কাছে একটা বাতিকের মতো হয়ে দাঁড়ায়; তিনি শেষে চেয়েছিলেন, সেই ভাড়াটে মহিলা বাসা ছেড়ে দিক, অথবা তার বদলে তিনি নিজেই ছেড়ে দেবেন। মনে হয়, প্রধান অভিযোগ ছিল যে, তাঁর *মাল্যবান* উপন্যাসের উৎপলা চরিত্রের মতো এই মহিলার কাছে যারা আসত তারা গান গাইত, হাসত ও কথা বলত উচ্চস্বরে—এসব জীবনানন্দের মনোযোগ নষ্ট করত। তিনি চেষ্টা করেছিলেন মহিলা যাতে বাড়ি ছেড়ে দেয়, কিন্তু মহিলাটি বাড়ি ছাড়তে অস্বীকার করে। বহু লোক, এমনকি গত কয়েক বছরে মাত্র পরিচয় হয়েছে, এমন লোকজনকেও জীবনানন্দ অনুরোধ করেছিলেন এ ব্যাপারে কোনো না কোনোভাবে সাহায্য করার জন্য।

এ সময় আবাসন হয়ে দাঁড়ায় তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তার বিষয়। পঞ্চাশের দশকের প্রথমে জীবনানন্দ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কাছে যান। ইনি তখন শরণার্থী সাহায্য ও পুনর্বাসন বিভাগে কর্মরত। জীবনানন্দ তাঁর কাছে একখণ্ড আবাসিক জমি প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। কিরণশঙ্কর যেভাবে ব্যাখ্যা করেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে জীবনানন্দ শরণার্থী হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না। কারণ, তিনি কলকাতা এসেছিলেন ভারত বিভাগের আগে।[৭৫] গত কয়েক বছর তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন সুবোধ রায়, একটা ঘরের কথা জানান, যেটা জীবনানন্দ ভাড়া নিয়েছিলেন ছয় মাসের জন্য। তবে সেটাতে তিনি এক দিনও থাকেননি।[৭৬]

কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে একজন গবেষণা সহকারী পদের জন্য চাকরির বিজ্ঞাপন ছাপা হয় পত্রিকায় ১৯৫১ সালে। জীবনানন্দ দরখাস্ত করেছিলেন। তবে তাঁকে ইন্টারভিউতেও ডাকা হয়নি। আরেকটা বিজ্ঞাপনে কলকাতার চারুচন্দ্র কলেজে ইংরেজির প্রফেসর চাওয়া হয়। জীবনানন্দ সেই কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক (এবং *কবিতা* পত্রিকার সহকারী সম্পাদকও) নরেশ গুহ এবং কবি ও একই কলেজে বাংলার অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব বসুর সঙ্গে দেখা করেন। তবে এতে কিছুই ফলোদয় হয় না। একপর্যায়ে তিনি নিজে কোনো একটা ব্যবসা চালু করার কথাও ভাবেন, এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য চেষ্টা করে থাকতেও পারেন।[৭৭]

জীবনানন্দ তাঁর বিএম কলেজের সহকর্মী নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। ইনি কলকাতার উত্তরে দমদম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপাল। এখানে ইংরেজির অধ্যাপকের পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। কয়েক মাস আগে এনএলজি (বরিশালের দিনগুলো থেকেই তিনি এই নামে পরিচিত) তাঁর ল্যান্সডাউন রোডের বাসায় এসেছিলেন। নরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মরণে আছে যে জীবনানন্দ তখনো বেকার ছিলেন। বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হওয়ার পর চাকরির দরখাস্ত হাতে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিনি সরাসরি নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসায় যান। বেতন খুব কম বলে নরেন্দ্রলাল তাঁকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন। চলে যাওয়ার সময় জীবনানন্দ আঙুল তুলে তাঁকে শাসিয়ে যান, যাতে চাকরিটা তাঁকে দেওয়া হয়। তিনি স্মরণ করতে পারেন যে জীবনানন্দ বলেছিলেন, তিনি আত্মজীবনী লিখছেন, তাতে নরেন্দ্রর নামও থাকবে, যা তাঁকে 'অমর' করে রাখবে।[৭৮] যা-ই হোক, জীবনানন্দকে চাকরিটা দেওয়া হয়নি।

জীবনধারণের জন্য মরিয়া প্রয়াসে ধরনা দিতে গিয়ে তিনি কেবল তাঁর বন্ধু ও পরিচিতজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি, সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনের কাছে লেখা এই চিঠিটি সেটাই প্রমাণ করে :

১৮৩, ল্যান্সডাউন রোড
কলকাতা-২৬
১১.৭.৫০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার নতুন কবিতার বই 'পদধ্বনি' ও চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। পদধ্বনির অনেক কবিতাই আমার ভালো লেগেছে। সব পড়া হয় নি। আর একবার ভালো ক'রে সমস্ত কবিতা পড়ে দেখতে হবে।

বইয়ের রিভিয়ু লেখা আমি অনেক দিন হল ছেড়ে দিয়েছি। ওদিক দিয়ে আমার কোন যোগ্যতা আছে বলে মনে হয় না। যা হোক, আপনার বই আমার কাছে রইল, যদি কিছু লিখে উঠতে পারি নিশ্চয়ই লিখব। কিন্তু আমাকে অনেক সময় দিতে হবে।

আপনার কথাবার্তায় আমি একজন সহৃদয় গুণী মানুষের পরিচয় পেয়ে খুব আনন্দ লাভ করেছি। আপনি কলকাতায় এলে যদি একদিন আমার এখানে আসেন খুব খুশি হব।

আমি আজ কাল বড্ড মুশকিলের ভিতর আছি, কাজ খুঁজছি, কলকাতায় কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কিছু suggest করতে পারেন? কালকের কাগজে দেখলাম Jangipur College (Murshidabad) এ একজন ইংরেজির লেকচারার চায়। আমার বর্ত্তমান অবস্থা এমন হয়েছে যে ও সব জায়গায় এ ধরণের কাজেও যেতে দ্বিধা করলে চলবেনা। আপনি তো মুর্শিদাবাদে আছেন হয়ত কিছু করতে পারেন।

আশা করি ভালো আছেন। প্রীতি নমস্কার। ইতি—

জীবনানন্দ দাশ[৭৯]

একসময় তিনি ব্যাংকে কাজ করার কথাও ভেবেছিলেন। সত্যপ্রসন্ন দত্ত ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে কুমিল্লা ব্যাংকিং কর্পোরেশনের এনসি এবং বিকে দত্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, চারজনই এসেছিলেন কুমিল্লা জেলা থেকে। জীবনানন্দের জন্য একটা চাকরি ঠিক করা হয়েছিল। তবে তিনি আপাতদৃষ্টিতে সেটা নেননি।[৮০] ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতার ঠিক দক্ষিণের শহরতলি বড়িশায় তিনি আরেকটা কলেজ-শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছিলেন। কাজটা প্রথম থেকেই ছিল অস্থায়ী। একটা সূত্রমতে, এক ইংরেজির অধ্যাপক ১৯৫২ সালের শেষ দিকে হঠাৎ করেই চাকরিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইস্তফা দিয়েছিলেন। জীবনানন্দের খুব ভালো বন্ধু ও কলেজটির প্রিন্সিপালের বোন বাণী রায় তাঁর সতীর্থ কবিকে এই চাকরিটা পেতে সাহায্য করেছিলেন, যেটা ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টিকে ছিল।[৮১]

একই বছরের ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে জীবনানন্দ কলকাতা থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে ডায়মন্ড হারবারের ফকিরচাঁদ কলেজের শূন্যপদে একটা চাকরির জন্য আবেদন করেন। গোপালচন্দ্র রায় কলেজের কর্মকর্তাদের কয়েকজনকে চিনতেন এবং দৈবাৎ তাঁদের একজনের দেখা পেয়ে যান। সেই ভদ্রলোক তাঁকে ইন্টারভিউতে যেতে বলেন, ইন্টারভিউ হচ্ছিল কলকাতায়। তিনি তাঁর কাছে উল্লেখ করেন যে যাঁদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে জীবনানন্দও তাঁদের মধ্যে থাকবেন। গোপাল রায় কখনোই জীবনানন্দের সঙ্গে দেখা করেননি। গোপাল রায়ের এক বন্ধু, এক উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন প্রফেসরও সে পদের জন্য আবেদন করেছিলেন। তিনি গোপাল রায়কে অনুরোধ করেন, তিনি যাতে তাঁর জন্য সুপারিশ করেন। গোপাল রায় জানান যে তিনি দেখবেন, যাতে জীবনানন্দ চাকরিটা পান—তিনি তা-ই করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দ সে চাকরিটা ফিরিয়ে দেন এই যুক্তিতে যে কলকাতা থেকে রোজ আসা-যাওয়া করা কঠিন হবে এবং সেখানে কোনো মেসে থাকার—যে রকম খড়্গপুরে থাকতেন তিনি—কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি এটাও বলেন যে তিনি তাঁর প্রাইভেট টিউশনি ছেড়ে দিতে চান না।[৮২]

জীবনানন্দ তৎক্ষণাৎ তাঁর সাম্প্রতিক সবচেয়ে উপকারী ব্যক্তিকে তাঁর জন্য আরেকটা শিক্ষকতার চাকরির খোঁজ করতে অনুরোধ করেন। গোপাল রায় সে অনুরোধে সাড়া দেন। এবার কলকাতা থেকে নদীর অন্য তীরে হাওড়া গার্লস কলেজে। গোপাল রায় কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপাল বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করে গত কয়েক বছরে শিক্ষা বিষয়ে প্রকাশিত জীবনানন্দের কিছু প্রবন্ধ দেখান। জীবনানন্দ প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করতে ভীষণ অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই গোপাল রায়কে বলেন, সবকিছু ব্যবস্থা যাতে তিনিই করেন। শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দ যখন প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করেন, বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে শুধু একটা দরখাস্ত পূরণ করতে বলেন ও জানিয়ে দেন যে তাঁকে নেওয়া হবে। গোপালচন্দ্রের সূত্রে জানা যায়, জীবনানন্দকে অনতিবিলম্বে চার-পাঁচজনকে ডিঙিয়ে বিভাগীয় প্রধান করে দেওয়া হয়। এমনকি তখনকার বিভাগীয় প্রধানকেও সরিয়ে দেওয়া হয়।[৮৩] বছরাধিককাল পরে তাঁর মৃত্যুর সময়, গোপাল রায়ের মতে, জীবনানন্দকে ভাইস প্রিন্সিপাল করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছিল।[৮৪]

স্বাভাবিকভাবে দুজনই যথেষ্ট সন্তুষ্ট থাকার কথা। জীবনানন্দ বাড়ির কাছেই একটা সম্মানজনক চাকরি পেয়েছেন; প্রিন্সিপালও একজন নামী কবিকে তাঁর কলেজের শিক্ষক হিসেবে পেয়ে গর্ব করতে পারেন। কিন্তু ব্যাপারটা অন্তত সোজাসুজি সে রকম ছিল না। গোপাল রায় লেখেন যে জীবনানন্দ হাওড়া গার্লস কলেজে ঢোকার পরপরই একদিন তাঁর সঙ্গে প্রিন্সিপাল ভট্টাচার্যের দেখা হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রিন্সিপাল তাঁর কলেজের নতুন শিক্ষককে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। জীবনানন্দের মনে হয় একটা নির্দিষ্ট ক্লাসে পড়ানোর কথা ছিল। সে সময় কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি অনুপস্থিত থাকেন টানা কয়েক দিন। ফিরে আসার পর তিনি কোথায় ছিলেন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নিরীহভাবে জবাব দেন যে তিনি দিল্লি চলে গিয়েছিলেন। প্রিন্সিপালের অনুরোধে গোপাল রায় জীবনানন্দের এই খোলাখুলি অসতর্ক আচরণের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। জীবনানন্দ তাঁকে বলেন, প্রিন্সিপালকে জানিয়ে দিতে যে এ রকম ঘটনা আর কখনো ঘটবে না। তারপর গোপাল রায় স্মরণ করেন, তিনি হঠাৎ বোকার মতো তাঁর সেই বালসুলভ ও বিব্রত বিশেষ জীবনানন্দীয় হাসি হেসে উঠেছিলেন।[৮৫]

জাগতিক দৈনন্দিন ব্যাপারগুলোর মধ্যে চাকরির সমস্যা ও আবাসনসংকট দুটোই তাঁর মনের ভেতর প্রায় সমান-সমান ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিবার নিয়ে কলকাতায় স্থায়ীভাবে চলে আসার পর প্রথম থেকেই তাঁর সাধ ও সাধ্যের তুলনায় আবাসন বরাবরই তাঁর নাগালের বাইরে থেকে গেছে। বাসার একটা অংশ সাবলেট দিয়ে তাঁর হয়রানি আরও বেড়েছিল। চাকরির ব্যাপারটা স্থায়ী বলে মনে হওয়ার পর ১৯৫৩ সালের পূজার ছুটির অল্প আগে জীবনানন্দ আরও একবার বাসাবদলের প্রস্তুতি নেন। এবার খুবই কাছে সরে যাওয়া হবে। এর আগে তিনি আসন্ন বাড়িবদল নিয়ে সঞ্জয়কে একখানা পোস্টকার্ড লেখেন :

কলকাতা-২৬
১২. ৯. ৫৩

প্রিয়বরেষু,

এ মাসের (সেপ্টেম্বরের) ৩০শে তারিখের পরে আমি ঠিকানা বদলাচ্ছি। আমার নতুন ঠিকানা :

Jibanananda Das
c/o Sri A.N. Chakravarty
172/3, Rashbehari Avenue (First floor)
Calcutta 29.

দয়া ক'রে অন্যদেরও জানিয়ে দেবেন। আতাওয়ার রহমানের ঠিকানা কি? শিগগিরই দেখা করব একদিন আপনার সঙ্গে। আশা করি ভালো আছেন। প্রীতি নমস্কার। ইতি

জীবনানন্দ দাশ[৮৬]

ঠিকানাটা ছিল অশোকানন্দের শ্বশুরের। কোনো কারণে জীবনানন্দ তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং বাসা বদলাননি।

তাঁর সারা জীবনে তিনি অল্প কয়েকবার বাংলার বাইরে গিয়েছিলেন। একবার ১৯৫৩ সালের শরতে পূজার ছুটির সময় তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে দিল্লিতে ভাই অশোকানন্দের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন।[৮৭] এটা হয়তো সেবার অথবা সেই সংক্ষিপ্ত অননুমোদিত যাত্রা, যার কথা গোপাল রায় বলেছিলেন, যেবার জীবনানন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিল্লিতে হুমায়ুন কবির ও আতাউর রহমানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তখনো *চতুরঙ্গ* পত্রিকার নামমাত্র সম্পাদক হুমায়ুন কবির সে সময় ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিজ্ঞানমন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সচিব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আতাউর রহমান স্মরণ করেন, জীবনানন্দ হুমায়ুন কবিরকে একটা চাকরির কথা বলেছিলেন। জীবনানন্দের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে হুমায়ুন কবির দিল্লি কলেজে একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দ কলকাতা ছেড়ে না আসতে মনস্থ করেন।[৮৮] শেষে হুমায়ুন কবির পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন ডিরেক্টর, পাবলিক ইনস্ট্রাকশন পরিমল রায়কে অনুরোধ করেন জীবনানন্দকে একটা শিক্ষকতার চাকরি পেতে সাহায্য করার জন্য। পরিমল রায় কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে একটা চাকরি খুঁজে পান। এবারেও জীবনানন্দ সেই চাকরি নিতে অস্বীকার করেন। কারণ, তিনি কলকাতার ৫০ মাইলেরও বেশি উত্তরের শহর কৃষ্ণনগর যেতে চাননি। জীবনানন্দ হুমায়ুন কবিরকে বারবার অনুরোধ করেন তাঁকে কলকাতার অভিজাত প্রেসিডেন্সি কলেজে একটা চাকরি জোগাড় করে দেওয়ার জন্য। কবির ব্যাপারটা পরিমল রায়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। তবে সেখানে কোনো পোস্ট খালি ছিল না।[৮৯]

এসব প্রচেষ্টা যখন চলছিল, তখন একসময় অধ্যাপক জীবনানন্দ হাওড়া গার্লস কলেজে লোভনীয় চাকরিটা পেয়ে যান। সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সত্যপ্রসন্ন দত্তের কাছে লেখা নিচের চিঠিটি হুমায়ুন কবিরের কাছে তাঁর আগেকার অনুরোধের ইঙ্গিত দেয় :

১৮৩, ল্যান্সডাউন রোড
কলকাতা-২৬
১৭.৫.৫৪

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি ও বৈশাখের 'পূর্ব্বাশা' পেয়েছি, অনেক ধন্যবাদ। 'পদাবলী' পড়লাম। বেশ ভালো লাগল; খুব মৌলিক লেখা মনে হ'ল; আপনার আগেকার লেখার চেয়ে এ কবিতাগুলো একেবারে ভিন্ন। আপনার পাণ্ডিত্য, মনের বিস্তৃতি ও গভীরতা এ সব রচনার নানা জায়গায়ই স্পষ্ট হয়ে আছে।

পূর্ব্বাশার জন্যে [এ সঙ্গে একটি] কবিতা পাঠালাম।...সুযোগ পেলে পরে [একদিন দেখা করতে] পারব আশা করি [...] পূর্ব্বাশাকে আমি ভালোবাসি। কাগজ, ছাপা এবারে বেশ ভালো হয়েছে।

আপনি কি কবির সাহেবকে আমার কথা বলেছিলেন? বাড়ি নিয়েও বড় মুস্কিলে আছি। তারাশঙ্কর বাবুর সঙ্গে দেখা করব? এ সব বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে গিয়ে আলোচনা করতে পারি; কিম্বা আপনি চিঠি লিখেও জানাতে পারেন। খুব জরুরি।

আশা করি ভালো আছেন। প্রীতি নমস্কার। ইতি

জীবনানন্দ দাশ[৯০]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সত্যপ্রসন্ন স্মরণ করেন, কবিরের প্রসঙ্গটি একটা চাকরি-সম্পর্কিত আর তারাশঙ্কর ও জীবনানন্দের বাসার প্রসঙ্গটি সেই মহিলা ভাড়াটে-সম্পর্কিত সমস্যা, যাকে তিনি উচ্ছেদ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন।[৯১]

৬

সিগনেট প্রেস ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে *বনলতা সেন*-এর একটা নতুন ও পরিবর্ধিত সংস্করণ বের করে। এখনকার বিখ্যাত চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় তখন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতেন—তিনিই বইটির প্রচ্ছদ আঁকেন—বহুরৈখিক একটা নারীমুখ।[৯২] জীবনানন্দের আগের বই *সাতটি তারার তিমির*-এর প্রচ্ছদও তিনি করেছিলেন। *বনলতা সেন*-এর এই সংস্করণটিতে ছিল প্রথমত কবিতা ভবন সংস্করণের (১৯৪২) ১২টি কবিতা। এই আদি মূল অংশের সঙ্গে—যা *মহাপৃথিবী*তেও ছিল প্রধান অংশ—যুক্ত হয় আরও ১৮টি কবিতা। এই বাড়তি কবিতাগুলোর বেশির ভাগই লেখা হয়েছিল ১৯৩০-এর দশকে, মূল ১২টার একই সময়ে লেখা। অল্প কয়েকটা আগে বা পরে লেখা। কারণ, জীবনানন্দ বইয়ের প্রথমে উল্লেখ করেছিলেন যে *বনলতা সেন*-এর এই সংস্করণের কবিতাগুলো ১৯২৫ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যকার সময়কে ধরে রেখেছে।

বনলতা সেন-এর (সিগনেট প্রেস) বাড়তি কবিতাগুলোর বেশ কয়েকটা *কবিতা* পত্রিকার পঞ্চদশ ও ষোড়শ বর্ষে (১৯৫০-৫১) ছাপা হয়েছিল। বেশ কয়েকটার সঙ্গে এই মর্মে টীকা ছিল যে, ওগুলো ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত। বাড়তি কবিতাগুলোর মধ্যে একটার শিরোনাম 'সুদর্শনা', 'বনলতা সেন'-এর মতো এক রমণীর নাম :

সুদর্শনা

একদিন ম্লান হেসে আমি
তোমার মতন এক মহিলার কাছে
যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হতে গিয়ে
অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।

সবচেয়ে আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি ভালো;
তবুও সময় স্থির নয়;
আরেক গভীরতর শেষ রূপ চেয়ে
দেখেছে সে তোমার বলয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন
তোমার শরীর; তুমি দান করোনি তো;
সময় তোমাকে সব দান করে মৃতদার বলে
সুদর্শনা, তুমি আজ মৃত।[৯৩]

'সুদর্শনা'র সঙ্গে আছে আরও চার রমণীর উদ্দেশে লেখা কবিতা: 'শ্যামলী', 'সুরঞ্জনা', 'সবিতা' ও 'সুচেতনা'। এই পাঁচ রমণীর কেউই কবিকে বনলতা সেনের মতো দুদণ্ড শান্তি দিতে পারেনি। এখন মৃতা হলেও সুদর্শনাকে এ রকম শান্তিদায়িনী রমণীর সবচেয়ে কাছাকাছি বলে মনে হয়। এটা থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 'বনলতা সেন' ও সে সময়কার কবিতার প্রতি পত্রিকাটির পক্ষপাত থাকায় কেন.জীবনানন্দ কেবল 'সুদর্শনা'কে *কবিতা* পত্রিকায় ছাপতে দিয়েছিলেন।

পরবর্তী রমণীরা বনলতা সেন থেকে ক্রমাগত দূর থেকে দূরে সরে গেছে, যদিও একই ধরনের বহু চিত্রকল্প কবিতাগুলোতে ছড়ানো। 'বনলতা সেন'-এ কবি দীর্ঘ পথে বহুদূর ঘুরেছেন; আর 'সুরঞ্জনা'য় তিনি মহেন্দ্রর (অশোকের পুত্র) সঙ্গে ঘুরেছেন এমন এক সাগরে যেটা 'বনলতা সেন'-এর মালয় ও সিংহল সমুদ্রের মতো:

মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সঙ্গে
উতরোল বড়ো সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে

কবি সবিতাকে বলেন, মানুষ ভূমধ্যসাগরের তীরের সভ্যতা সম্পর্কে জানত। কিন্তু তারা—খ্রিষ্টান জাতিযুদ্ধে লিপ্ত হয় কিংবা হওয়ার উপক্রম করে—রাতের সমুদ্র ও অন্ধকারের জল চেনে। আর আমরা অন্য এবং নতুন পৃথিবীর দিকে আধা পথ অগ্রসর হয়েছি, যুদ্ধের সময় আবার ভেসে পড়েছি কূলহারা সাগরে।

এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে;
কী এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন!

দীপ্তি ত্রিপাঠী বলেন, এই আগুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক আগুনের প্রতীক,[৯৪] কিন্তু যার সঙ্গে কবি কথা বলছেন, সেই রমণীকে দিয়ে বোঝায় আশা—তার মুখমণ্ডল যুদ্ধের অন্ধকারের ভেতর থেকে জেগে ওঠা সূর্যের (সবিতা অর্থ সূর্য) মতো।

'সুচেতনা'র প্রথম দিককার পঙ্‌ক্তিগুলোতে আমরা আবার পাই 'বনলতা সেন'-এর মতো চিত্রকল্প, দারুচিনি দ্বীপ, যেখানে রয়েছে শান্তি:

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কিন্তু কবি দেখেন

> দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত
> ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে;

এটা 'বনলতা সেন'-এর ক্লান্তপ্রাণ কবি নয়, যে নিজের আত্মীয়স্বজনের চেয়েও অন্ধকার চেয়েছিল বেশি। তখন তিনি সুচেতনাকে জীবনমুখী পথের কথা বলেন, যার জন্য প্রয়োজন বহু প্রয়াসের এবং অতিক্রম করতে লাগে বহু বছর :

> সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
> সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ :

পৃথিবীতে পিছুটানে, বোধকরি জীবনের সংগ্রামে শ্রান্ত তিনি আরও একবার 'শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পুলকে আনন্দ করেন। তিনি জানেন, অতীত ও ভবিষ্যৎ অনন্ত রাত্রি ও শাশ্বত সূর্যোদয়ের একটা মিশ্রণ। অধিকন্তু, কবির কাছে জীবন উপস্থাপন করে আশা-নিরাশার মধ্যকার নিরন্তর টানাপোড়েন :

> মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
> না এলেই ভালো হত অনুভব করে;
> এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি
> শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;

'সুচেতনা' ১৯২৫-এর চেয়ে ১৯৪০-এর অনেক কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়ে থাকতে পারে অথবা মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে জীবনানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি যখন আরও দোদুল্যমান, তখন অন্ততপক্ষে ব্যাপকভাবে সংশোধন করা হয়েছিল।

সিগনেট প্রেস সংস্করণের ১৮টি কবিতার মধ্যে একটি ছিল *ধূসর পাণ্ডুলিপির* (১৯৩৬) কবিতাগুলোর মতো তিন চরণের স্তবকযুক্ত সনেট 'পথহাঁটা' :

পথহাঁটা

> কি এক ইশারা যেন মনে রেখে একা একা শহরের পথ থেকে পথে
> অনেক হেঁটেছি আমি; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে;
> তারপর পথ ছেড়ে শান্ত হয়ে চলে যায় তাহাদের ঘুমের জগতে :
>
> সারা রাত গ্যাসলাইট আপনার কাজ বুঝে ভালো করে জ্বলে।
> কেউ ভুল করে নাকো—ইঁট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাদ সব
> চুপ হয়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে।
>
> একা একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে করেছি অনুভব;
> তখন অনেক রাত—তখন অনেক তারা মনুমেন্ট মিনারের মাথা
> নির্জনে ঘিরেছে এসে;—মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব
>
> আর কিছু দেখেছি কি : একরাশ তারা—আর—মনুমেন্ট-ভরা কলকাতা?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চোখ নিচে নেমে যায়—চুরুট নীরবে জ্বলে—বাতাসে অনেক ধুলো খড়;
চোখ বুজে একপাশে সরে যাই—গাছ থেকে অনেক বাদামী জীর্ণ পাতা

উড়ে গেছে; বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন; আজো আমি জানি নাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।[৯৫]

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে থাকার মতো একটা বাসা ও জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে উদ্বেগের আগে এ রকম পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিশের দশকের কলকাতাকে দেখেছেন : 'সহজ...একরাশ তারা—আর—মনুমেন্ট-ভরা কলকাতা।'

৭

বনলতা সেন-এর সিগনেট প্রেস সংস্করণটি জীবনানন্দকে জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি এনে দেয়। বিগত দুই দশক ধরে তাঁর সতীর্থ কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন সুপঠিত, সুপরিচিত ও আলোচিত—শেষেরটা লিখিতভাবে না হলেও অন্তত মৌখিকভাবে কথাবার্তায়। এ সময় থেকে তিনি তাঁর কাব্যকীর্তির জন্য যথাযথ স্বীকৃতি পেতে শুরু করেন।

বনলতা সেন ১৯৫৩ সালে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক সাহিত্য পুরস্কার লাভ করে। ১৯৪৫ সালে শুরু হওয়া এই সম্মেলন ১৯৫০-এর দশকে *দ্বন্দ্ব* পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখকে ঘিরে সম্মেলনের উৎসব চলে সাত দিন ধরে। সে বছরই প্রথমবারের মতো এই সম্মেলন থেকে পুরস্কার ঘোষিত হয় (পরবর্তী সময়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তী এই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন)।[৯৬]

পুরস্কারের মধ্যে ছিল ১০১ টাকা (শূন্য দিয়ে শেষ হওয়া সংখ্যা অশুভ বলে এক টাকা যোগ করা হয়), একটা নারকেল (শুভ প্রতীক) ও একটা শাল।[৯৭] অরুণকুমার সরকারের ছোট ভাই, সম্মেলনের সম্পাদক আলোক সরকার স্মরণ করেন, জীবনানন্দ পুরস্কার পাওয়ার পরই তাঁদের বাড়িতে যান। আলোক শুনেছিলেন বলে মনে করতে পারেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দকে বলেছিলেন, ১০১ টাকার মতো সামান্য পুরস্কার তাঁর মাপের কবির জন্য মানানসই নয়। অরুণ সরকার ও উপস্থিত অন্যরা জীবনানন্দকে বোঝান যে তাঁরা প্রথমে পুরস্কারটা দিতে চেয়েছিলেন কেবল একটা হরীতকী ফল দিয়ে। কারণ, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে জনসমক্ষে সম্মান জানানো। পুরস্কারটা তাঁদের কাছে কোনো ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। শেষে কেবল একটা হরীতকীর পরিবর্তে তাঁরা ১০১ টাকা, একটা নারকেল ও একটা শাল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জীবনানন্দ এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলে মনে হয়।[৯৮]

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয় উন্মুক্ত সভায়। তার ওপর *বনলতা সেন* (সিগনেট সংস্করণ) পাচ্ছিল উচ্চপাঠক-প্রশংসা। কমিউনিস্ট লেখকেরা এটাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিতে চাননি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় *পরিচয়*-এর জুলাই ১৯৫৩ সংখ্যায় বইটির একটা আলোচনা লেখেন। 'নির্জনতম কবি' শিরোনামের প্রবন্ধটিতে সুভাষ মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা দিয়ে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনাবলি বর্ণনা করেন :

> পৃথিবীর দুই গোলার্ধে দু'পা রেখে বিরাট এক ভূখণ্ডের শৃঙ্খলমুক্ত মানুষ উঠে দাঁড়ায়।...জয়ের আশ্বাস নিয়ে দেশে দেশে শৃঙ্খলিত মানুষ জেগে ওঠে। আসমুদ্রহিমাচলে জ্বলে ওঠে সংগ্রামের আগুন।...জয়-পরাজয়, আনন্দ-বেদনার জটিল বিন্যাসে জনতার এই যাত্রাপথ কবির সামনে তুলে ধরে এক জমকালো মহিমান্বিত দৃশ্যপঅট—আজকের মানুষ যা সগর্বে, আর ভবিষ্যতের মানুষ যা সবিস্ময়ে দেখবে।...

এবং সুভাষ বাগাড়ম্বরে জিজ্ঞাসা করেন, 'বনলতা সেন'-এর জীবনানন্দ দাশ ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে আমাদের কী দেখান? তিনি 'বনলতা সেন' কবিতার প্রথম স্তবকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

> জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় তারস্বরে জানিয়ে দেন সময়ের গণ্ডি দিয়ে বাঁধা নন তিনি। তাঁর কাছে 'হাজার বছর শুধু খেলা করে।' সময়কে হাজার বছরের একেকটি গ্রন্থি দিয়ে যিনি মাপেন, দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী দুটি শির্ণ দশক মহাসমুদ্রে বুদ্বুদের মতো তাঁর কাছে মিলিয়ে যাবে, তাতে আশ্চর্য কী?

মানুষ যখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে, এমনকি উৎসর্গ করছে জীবন, সুভাষের সতীর্থ কবি 'ঘন করে' 'বিছিয়ে' দিয়ে 'রহস্যের জাল' গুলিয়ে ফেলেন বাস্তব আর কল্পলোককে। এসব বৈপ্লবিক চিত্রকল্প সন্দেহাতীতভাবে ব্যবহার করে জীবনানন্দকে বলেন 'একজন সুদক্ষ সেনাপতি', যিনি 'প্রতিপক্ষ যেখানে দুর্বল, অপ্রস্তুত ও অসংগঠিত, সেখানে শক্তিশালী আঘাত করেন। মনোযোগ অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত করে পাঠককে পরাস্ত করেন তিনি।'[৯৯]

সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবনানন্দের কবিতার সমালোচনা দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে সীমিত রাখতে মনস্থ করেছিলেন, এটা যুক্তিযুক্তও বটে, যেহেতু *বনলতা সেন* (সিগনেট প্রেস) গ্রন্থের কবিতাগুলো সে সময়েরই। আলোচনার একপর্যায়ে তিনি জীবনানন্দকে পলায়নবাদী হিসেবে চিত্রিত করেন।[১০০] আলোচক যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকে প্রকাশিত লেখাগুলো বিবেচনা করতেন, তাহলে জীবনানন্দকে এই শ্রেণীভুক্ত করার যুক্তি তিনি কমই খুঁজে পেতেন। অবশ্য সুভাষ *বনলতা সেন*-এর কবির যতখানি কুখ্যাতি করতে চেয়েছেন, ততখানি ব্যাখ্যা করতে চাননি জীবনানন্দের কবিতা। জনসাধারণের সাহিত্য রুচির সঠিক উন্নয়ন করতে হলে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন সংকলনটিকে যে সম্মান দিয়েছে, তার বিরুদ্ধাচার করতে হবে। কিন্তু এই মার্ক্সীয় সমালোচনায় জীবনানন্দের কবিখ্যাতির বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি। তিনি পরিপূর্ণ হয়েছিলেন বিশিষ্টতায়, সেই নেতিবাচক সমালোচনাও কিছুটা বিপরীতভাবে হলেও তার সাক্ষ্য বহন করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে এক কবিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনের এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ উল্লেখযোগ্য কবিকে স্বরচিত কবিতা পড়তে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।[১০১] প্রথম দিনের সকালে নিম্নোক্ত খবরটি ছাপা হয় ইংরেজি দৈনিক *অমৃতবাজার পত্রিকায়* :[১০২]

কবি সম্মেলন আজ শুরু হচ্ছে সিনেট হলে

> আধুনিক বাঙালি কবিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা সিনেট হলে আজ (বৃহস্পতিবার) এবং আগামীকাল (শুক্রবার)। এই সম্মেলন আহ্বান করেছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক আবু সয়িদ (ইংরেজি বানানের উচ্চারণ অপরিবর্তিত) এবং শ্রী দিলীপকুমার গুপ্ত।[১০৩] এখানে প্রায় ষাট জনের মতো কবি তাঁদের লেখা কবিতা আবৃত্তি করবেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্য যথাযথ আবৃত্তির মাধ্যমে যোগাযোগের বিশাল ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা। এটির চেয়ে আরো ছোট পরিসরে কবিরা বাছাই করা শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে প্রায়শই তাঁদের কবিতা পাঠ করে থাকেন, কিন্তু আগে কখনোই এতো বড় সম্মেলন করা হয়নি। এই প্রচেষ্টা সফল করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী কবিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্বলিত একটা পুস্তিকা বের করার চেষ্টা করছেন প্রস্তুতি কমিটি। কবিতায় আগ্রহী সকলেই উপস্থিত হতে পারেন, তবে যাঁরা উপস্থিতি নিশ্চিত করতে চান তাঁরা সিগনেট বুক শপ (১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট এবং ১৪২/১, রাসবিহারী এভিনিউ) এবং ১০/২, এলগিন রোডে যোগাযোগ করতে পারেন। যে সব কবিকে কবিতা আবৃত্তি করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন: সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, অজিত দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অশোকবিজয় রাহা, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ।[১০৪]

অনুষ্ঠানে মোট ৬৯ জন কবির নামের তালিকা ছিল—প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সবার শেষে পড়বেন জীবনানন্দ দাশ এবং দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শেষ হবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা দিয়ে। অনুষ্ঠানসূচিতে তাঁর অবস্থান দেখে জীবনানন্দ এটাকে অমর্যাদাকর বলে মনে করেন। তাঁকে যখন বোঝানো হয় যে তাঁর জন্য সংরক্ষিত সর্বশেষ অবস্থান সম্মানজনক এবং বহু দর্শক উপস্থিত থাকবেন শুধু তাঁর কবিতা শোনার জন্য, তখন তাঁকে কেবল শান্ত নয়, তৃপ্ত বলেও প্রতীয়মান হয়।[১০৫]

প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে *অমৃতবাজার পত্রিকায়* রিপোর্ট ছাপা হয় এ রকম :

সিনেট হলে কবি সঙ্ঘের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান
(নিজস্ব সংবাদদাতা)

> বাঙালি কবিদের এক অতি মনোরম সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিনেট হলে। কবিরা আজ সন্ধ্যায় আবার একই জায়গায় মিলিত হবেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রায় ত্রিশজন কবি তাঁদের লেখা কবিতা পাঠ করেন এবং প্রচুর শ্রোতার উপস্থিতিতে পূর্ণ সভাকক্ষ আগ্রহভরে তা উপভোগ করেন। আধুনিক বাংলায় এধরনের উদ্যোগ প্রথম বলে দাবী করে সংগঠকদের পক্ষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> থেকে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে এই সমাবেশের মূল লক্ষ্য রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাধারণ পাঠককে কবি এবং তাঁদের সৃষ্টি সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলা। তাছাড়াও এজাতীয় আসর কবি এবং পাঠককে কাছাকাছি আসতে সাহায্য করবে। তিনি আরো বলেন দেশে আগেকার দিনে বহু সার্বজনীন মজলিশ ছিল যেখানে কবিরা সশরীরে উপস্থিত হয়ে সমঝদার শ্রোতাদের সামনে কবিতা পড়তে পারতেন। কিন্তু বর্তমান আধুনিক সমাজে এসব প্রাচীন নিদর্শন হয়ে উঠছে, বিশেষ করে বাংলাদেশে। হিন্দি, উর্দু এবং তামিল কবিদের মধ্যে এই ধারা এখনো চালু আছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে সংগঠকদের এই প্রয়াস নতুন ভিত্তি স্থাপন করবে। যে সব কবির আবৃত্তি শ্রোতাদের আগ্রহ জাগায় তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রী অজিত দত্ত, শ্রী জীবানন্দ [বানান অপরিবর্তিত] দাশ, শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দীনেশ দত্ত, শ্রী নীরেন চক্রবর্তী, এবং অন্যান্যরা। তরুণদের মধ্যে শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রী দীপক মজুমদার বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সেদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট যাঁরা অনুপস্থিত তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রী বিষ্ণু দে, শ্রী বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রী সমর সেন।[১০৬]

এদিন জীবনানন্দ আবৃত্তি করেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বনলতা সেন'। বাণী রায় স্মরণ করতে পারেন, অভ্যাগতরা কেবল একটি পরিবেশনায় শান্ত হননি, তাই শ্রোতৃমণ্ডলীর সেদিনের আকর্ষণ হিসেবে জীবনানন্দ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগে আরও কয়েকটি কবিতা পড়েছিলেন।[১০৭]

৮

এই একই বছরে প্রকাশিত দুটো গ্রন্থ কবিকে বাড়তি সম্মান এনে দেয়, যিনি শেষ পর্যন্ত বহুদিন পর তাঁর কাব্যপ্রতিভার জন্য সর্বসাধারণ্যে স্বীকৃতি পাচ্ছিলেন। *আধুনিক বাংলা কবিতা* সংকলনের একটা নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালের মার্চে। এবারের সংকলনটি সম্পাদনা করেন বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং। *বাংলা কাব্য পরিচয়* (১৯৩৮) নামে রবীন্দ্রনাথ যে সংকলনটি প্রকাশ করেন, সেটির ব্যাপারে অনেকের সন্দেহ ছিল সম্পাদনাটা আসলে কে করেছেন।[১০৮] এটির প্রত্যুত্তরে 'কবিতা ভবন' অথবা অন্য ভাষায় বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা কবিতার একটা সংকলন প্রকাশ করার দায়িত্ব পালন করেন সম্পাদক হিসেবে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুবকে দিয়ে। *আধুনিক বাংলা কবিতার* প্রথম সংস্করণে (১৯৪০) জীবনানন্দের মাত্র চারটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। অজিত দত্ত ও নজরুল ইসলামের প্রত্যেকের ছিল পাঁচটি করে কবিতা, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দের ছিল সাতটি করে, সমর সেনের আটটি ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ছিল নয়টি কবিতা। সেই সংকলনে রবীন্দ্রনাথের ছিল ১২টি কবিতা। আগেই বলা হয়েছে, জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে আইয়ুবের উচ্চধারণা ছিল না। আগের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংকলনটিতে জীবনানন্দের কবিতাকে উপেক্ষা করা হয়েছে অনুভব করে তার প্রতিবিধান করার জন্য বুদ্ধদেব বসু *আধুনিক বাংলা কবিতার* একটা নতুন সংস্করণ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন।[১০৯]

দ্বিতীয় সংস্করণে জীবনানন্দের ১৫টি কবিতা ছিল, বুদ্ধদেবেরও তা-ই। সংকলনটির এই সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের ১৬টি কবিতা ছিল, সমসংখ্যক কবিতা ছিল অমিয় চক্রবর্তীরও।[১১০] সমর সেনের উপস্থিতি ছিল ১৩টি কবিতা নিয়ে, অজিত দত্ত ও বিষ্ণু দের ছিল আটটি করে, সুধীন দত্তের সাতটি এবং নজরুল ইসলামের এবারও ছিল মাত্র পাঁচটি কবিতা। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু ইতিপূর্বে প্রকাশিত বাংলা কবিতা সংকলনগুলো সম্পর্কে বলেন, সেগুলো ছিল স্কুলের সিলেবাসের জন্য কিংবা বিয়ের উপহারের উদ্দেশ্যে। প্রথম ও বর্তমানটি তিনি সংকলন করেছিলেন সম্পূর্ণভাবে আনন্দের জন্য। তিনি স্বীকার করেন, তাঁর সংস্করণটি আইয়ুব-হীরেন্দ্রনাথের সংকলনের চেয়ে যথেষ্ট আলাদা এবং বলেন, যুগের দাবি অনুযায়ী তিনি বাংলা কবিতার একটা দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করছেন, যা তাঁরা খর্ব করেছিলেন: 'অনুভূতির কবিতা, আবেগের কবিতা উপযুক্ত মর্যাদা পেলো না।'[১১১]

বুদ্ধদেব জীবনানন্দকে দিয়ে ভারসাম্যহীনতাটাকে সংশোধন করেছেন। তাঁর মতে, জীবনানন্দ এখন রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কবিদের তুলনায় নিজের জায়গা করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। অমিয় চক্রবর্তীও তাঁর প্রাপ্য পেয়েছিলেন। পরবর্তী সংকলনগুলোও অবশ্যই এই শতাব্দীর অন্যান্য বাঙালি কবির সঙ্গে জীবনানন্দের একই অবস্থান বজায় রেখেছে।[১১২]

১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে নাভানা প্রকাশ করে জীবনানন্দের সপ্তম ও জীবিতাবস্থায় সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। জীবনানন্দেরটির আগে শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থমালায় মাত্র দুটো সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল, *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা* ও *প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, এটা তাঁর সতীর্থ কবিদের তুলনায় তাঁর অবস্থান নির্ধারণ করা। এই গ্রন্থমালায় বিষ্ণু দেরটা ছিল চতুর্থ।[১১৩] *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতার* বেশির ভাগজুড়ে ছিল ইতিপূর্বে প্রকাশিত বইগুলো থেকে নির্বাচিত কবিতা, আর ছিল এমন কিছু কবিতা, যেগুলো কোনো বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ আগে জীবনানন্দের জনপ্রিয়তার আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায়। আরেকটি কবি-সম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এবারেরটা রেডিওতে, স্বল্পসংখ্যক অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি আর কেউ নন, *কল্লোল*-গোষ্ঠীর পুরোনো প্রধান বিপক্ষবাদী সজনীকান্ত দাস।[১১৪] জীবনানন্দ এসব বিলম্বিত স্বীকৃতির উষ্ণতা উপভোগ করছিলেন, তবে স্বল্প সময়ের জন্য। রেডিওর অনুষ্ঠানটির পরের সন্ধ্যায় একটা ট্রাম তাঁকে ধাক্কা দেয়। তার আট দিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবনানন্দের হাঁটতে যাওয়ার অভ্যাস ছিল, প্রায়ই একা একা। তাঁর ল্যান্সডাউনের বাসার ঠিক দক্ষিণে লেকসহ একটা পার্ক ছিল, এ রকম হাঁটাহাঁটির জন্য উপযুক্ত জায়গা। নিয়তিস্থির সে-সন্ধ্যায় জীবনানন্দ বাড়ি ফিরছিলেন উত্তরমুখো হেঁটে। তাঁর বাসায় পৌঁছানোর শ খানেক গজ আগে রাসবিহারী এভিনিউর প্রধান রাস্তাটি পার হতে হতো। রাসবিহারীর মধ্যখানে দুটো ট্রামলাইন চলে গেছে দুই দিকে। প্রায় ১৬ বছর আগে ঠিক এ রকম ট্রামলাইনের কথা লিখেছিলেন তিনি :

অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে;
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো
এই যে ট্র্যামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
অনুভব ক'রে হাঁটছি আমি।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে—কেমন যেন ঠান্ডা বাতাস
কোন্ দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকির কথা মনে পড়ে আমার,—
তারা কোথায়?
তারা কি হারিয়ে গেছে?
পায়ের তলে লিকলিকে ট্র্যামের লাইন,—মাথার ওপরে
অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাসন করছে আমাকে।

জীবনানন্দ রাস্তা পার হওয়া শুরু করলে পশ্চিম দিক থেকে একটা ট্রাম এসে পড়ে এবং কোনো কারণে অন্যমনস্ক থাকায় তিনি সামনে পড়ে যান। ট্যাক্সিতে করে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে কয়েকটা ভাঙা পাঁজর, চিড় ধরা কণ্ঠাস্থি ও চূর্ণবিচূর্ণ পায়ের চিকিৎসা দেওয়া হয়। হাসপাতালে থাকার সময় তখনকার ডাক্তারির ছাত্র ডা. ভূমেন্দ্র গুহ ও তাঁর কয়েকজন সহপাঠী ছাত্র সার্বক্ষণিকভাবে জীবনানন্দের পাশে ছিলেন। সত্যপ্রসন্ন দত্ত সজনীকান্ত দাসকে টেলিফোন করলে তিনি সত্যিকার গভীর উদ্বেগ দেখিয়ে এমন ব্যবস্থা করেন, যাতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় ব্যক্তিগতভাবে জীবনানন্দের ব্যাপারটা দেখেন। ডা. রায় পরদিন হাসপাতালে এসেছিলেন। তাঁর জীবন রক্ষার সব রকম চেষ্টাই করা হয়েছিল। কিন্তু জীবনানন্দ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন এবং ২২ অক্টোবর ১৯৫৪ তারিখে দুর্ঘটনার আট দিন পর মারা যান। পরদিন দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত কালীঘাট মন্দিরের পাশে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।[১১৫]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তথ্যসূত্র

১. ২ জুলাই ১৯৪৬ তারিখে লেখা চিঠি; *ময়ূখ,* পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১-৬২ সংখ্যায়, ২২৬, প্রকাশিত।

২. গুপ্তদের একজন দিলীপকুমার গুপ্ত সিগনেট প্রেস নামে আরেকটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকে এটি কলকাতার প্রধান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আতাউর রহমানের মতে, জীবনানন্দের বই প্রকাশের জন্য ডি কে গুপ্ত 'গুপ্ত রহমান অ্যান্ড গুপ্ত' নামটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন।

৩. *চতুরঙ্গ* (নামমাত্র সম্পাদক, হুমায়ুন কবির, আর মূল ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ছিলেন আতাউর রহমান) ও *পূর্বাশা* (সম্পাদক: সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং প্রকাশক ও মুদ্রক: সত্যপ্রসন্ন দত্ত)—উভয় পত্রিকার অফিস ছিল একই ভবনে। এ সময়ে সত্যপ্রসন্ন ও আতাউর রহমান দুজনের মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিল।

৪. ১৩৩৭ (ডিসেম্বর ১৯৩০) তারিখে লেখা চিঠি; *ময়ূখ,* পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-৬২ সংখ্যায়, ২১৬-১৭, প্রকাশিত ৩ পৌষ।

৫. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার।

৬. *সাতটি তারার তিমির,* ৯; *কবিতা,* আশ্বিন ১৩৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত; আদি শিরোনাম ছিল 'ও হৈমন্তিকা'।

৭. *সাতটি তারার তিমির,* ১৩; *কবিতা,* পৌষ ১৩৪৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৮. একই নামে তৃতীয় একটি কবিতা, তবে যথেষ্ট আলাদা সুরে *কল্লোল* শ্রাবণ ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, পরে *ঝরা পালক* গ্রন্থভুক্ত হয়।

৯. *সাতটি তারার তিমির,* ২৪; *পরিচয়,* ফাল্গুন ১৩৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত। এটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল *গ্রিন অ্যান্ড গোল্ড*-এ, সম্পাদক: হুমায়ুন কবির, সহসম্পাদক: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র (বম্বে: এশিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৭)। একই কবিতা পরে প্রকাশিত হয়েছিল *পোয়েট্রি* পত্রিকায় (লন্ডন ও নিউইয়র্ক) এবং অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল *বনলতা সেন* গ্রন্থে (কলকাতা: রাইটার্স ওয়ার্কশপ, ১৯৬২)। জীবনানন্দ তাঁর অনুবাদে বেশ কিছু স্বাধীনতা নিয়েছিলেন। যেমন, মূল ভাষ্যের *গেৎসিমানির* জায়গায় *বাইজেনটিয়াম*।

১০. *সাতটি তারার তিমির,* ৬২-৬৩; *বৈশাখী,* বৈশাখ ১৩৫১ সংখ্যায় প্রকাশিত।

১১. *সাতটি তারার তিমির,* 'লোকসামান্য', ৬৬।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১২. হরপ্রসাদ মিত্র *সাতটি তারার তিমির* নিয়ে লিখেছেন 'জীবনানন্দের আলো-অন্ধকার' প্রবন্ধে, *কালি ও কলম,* আশ্বিন ১৩৮০, ১২৫-৩২।

১৩. কাজী আবদুল মান্নানের সাক্ষাৎকার।

১৪. *ময়ূখ,* পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-৬২ সংখ্যায়, ২৩০, প্রকাশিত ২ জুলাই, ১৯৪৬ তারিখের চিঠি।

১৫. *কবিতা,* আশ্বিন-পৌষ ১৩৫৬, ২৯-৩৩।

১৬. *কবিতা,* চৈত্র ১৩৫৬, ৬০।

১৭. বুদ্ধদেব বসুর সৌজন্যে।

১৮. *কবিতা,* জুন ১৯৫৩, ২৩৭-৩৯।

১৯. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন,* দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা: সুন্দর প্রকাশন, ১৯৬২), ১৪০।

২০. আবু সয়ীদ আইয়ুবের সাক্ষাৎকার; আরও দ্রষ্টব্য, কোপোলা, *উর্দু পোয়েট্রি, ১৯৩৫-৭০: দ্য প্রগ্রেসিভ এপিসোড,* ২৭৩-৭৪, ৩৬১, ৩৭০।

২১. ওভারস্ট্রিট অ্যান্ড উইন্ডমিলার, *কমিউনিজম ইন ইন্ডিয়া,* ২৭২।

২২. প্রাগুক্ত, ২৭৭।

২৩. ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত চারটি সংখ্যার (১, ২, ৫, ৭) মধ্যে দ্বিতীয়টি *ন্যাশনাল বুক এজেন্সি,* ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ১২ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল; এই সংখ্যায় *পরিচয়*-এর একটা বিজ্ঞাপন ছিল, যাতে পত্রিকাটির ঠিকানাও ছিল একই। পঞ্চম ও সপ্তম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল *নিউ পাবলিশার্স,* ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট থেকে। সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত *পরিচয়*-এর বিজ্ঞাপনেও ঠিক এই ঠিকানাটিই ছিল।

২৪. ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত *মার্ক্সবাদীর* কয়েকটা সংখ্যায় হাতে লেখা তারিখ দেওয়া ছিল। এটা ঠিক পরিষ্কার নয় যে তারিখগুলো কি প্রকাশকালের, নাকি সংগ্রহের।

২৫. *মার্ক্সবাদী,* সংখ্যা ১, ৭৬-৭৭।

২৬. প্রাগুক্ত, ৭৯।

২৭. তারাশঙ্করের *হাঁসুলিবাঁকের উপকথা* ও মানিকের *পুতুল নাচের ইতিকথা* দুটোই হতাশ নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছে বলে বলা হয়ে থাকে।

২৮. *মার্ক্সবাদী,* সংখ্যা ১, ৮০; এটিতে তারাশঙ্করের *কালিন্দী* ও *মন্বন্তর*-এর উল্লেখ আছে।

২৯. প্রাগুক্ত, ৯৩।

৩০. প্রাগুক্ত, ৯৭।

৩১. প্রাগুক্ত, ১৩৭-৪৭।

৩২. বিষ্ণু দে নন, *সাহিত্যপত্র* সম্পাদনা করতেন চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়। তবে বিষ্ণু দে কাগজটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতেন। এই *সাহিত্যপত্র,* দ্বিতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩৫৫) জীবনানন্দের কবিতা 'এই চেতনা' প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির মুদ্রণে ভুল বানান নিয়ে বিবাদের কারণে বিষ্ণু দের নিজ স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে জীবনানন্দের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

৩৩. বিষ্ণু দের সাক্ষাৎকার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩৪. বুদ্ধদেব বসু, *অ্যান একর অব গ্রিন গ্রাস* (কলকাতা : ওরিয়েন্ট লংম্যানস, ১৯৪৮), ১৩, ১০১, ১০৩।

৩৫. প্রাগুক্ত, ৫৭।

৩৬. *মার্ক্সবাদী*, সংখ্যা ২, ১৬৫-৭০।

৩৭. আবু সয়ীদ আইয়ুবের সাক্ষাৎকার।

৩৮. *মার্ক্সবাদী*, সংখ্যা ৫, ১২৫-৭২।

৩৯. প্রাগুক্ত, ১২৫।

৪০. প্রাগুক্ত, ১২৯। তিনি মধ্য-উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক রচনা *হুতোম প্যাঁচার নকশা* এবং একই সময়ে বিরাজমান স্থানীয় বিচারব্যবস্থা ও ব্রিটিশ নীলকরদের দ্বারা বাঙালি কৃষকদের প্রতি অমানবিক আচরণের বর্ণনাসম্পন্ন *নীল দর্পণ*-এর কথা উল্লেখ করেন।

৪১. *মার্ক্সবাদী*, সংখ্যা ৫, ১৩২।

৪২. প্রাগুক্ত।

৪৩. আইয়ুব সজনীকান্তকে একজন কমিউনিস্টবিরোধী বলে উল্লেখ করেছিলেন; সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রের একজন অর্থনীতিবিদ অম্লান দত্ত ইঙ্গিত দিয়েছেন যে শনিচক্র রাজনৈতিকভাবে কংগ্রেসের পক্ষাবলম্বী। আইয়ুব অথবা অম্লান দত্ত কেউই দেখাননি যে শনিচক্রের কোনো সুস্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ আছে।

৪৪. আবু সয়ীদ আইয়ুবের সাক্ষাৎকার।

৪৫. প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় সম্পাদকদের নাম এই বিন্যাসেই ছাপা হয়েছিল। আইয়ুব স্মরণ করেন যে নিজের নাম দ্বিতীয় স্থানে থাকায় জীবনানন্দ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তৃতীয় সংখ্যা থেকে নামের বিন্যাস হয়েছিল : জীবনানন্দ দাশ, আবু সয়ীদ আইয়ুব, নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

৪৬. আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার।

৪৭. আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের সম্পাদনায় *সমকালীন* নামে একটা পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়েছিল ১৯৫৩ সালের এপ্রিল থেকে; তবে তার সঙ্গে সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

৪৮. অম্লান দত্তের সাক্ষাৎকার।

৪৯. আবু সয়ীদ আইয়ুবের সাক্ষাৎকার।

৫০. জীবনানন্দ দাশ, 'বেঙ্গলি পোয়েট্রি টুডে', *স্টেটসম্যান* (কলকাতা), ৬ নভেম্বর, ১৯৪৯, *সানডে সেকশন*, ১১।

৫১. আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার।

৫২. *জনতা* (বম্বে), ৯ জুলাই, ১৯৫০, ২০।

৫৩. আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার। আইয়ুব উল্লেখ করেন, জীবনানন্দ কখনোই তাঁর (আইয়ুব) বাড়িতে অনুষ্ঠিত সভায় যোগ দেননি এবং নামমাত্র একজন সম্পাদক হওয়া সত্ত্বেও পত্রিকাটির জন্য খুব বেশি কিছু করতেন না।

৫৪. আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের সৌজন্যে। চিঠিটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা[redacted]হীন।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫৫. আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের মতে, প্রবন্ধটি *সত্যযুগ* পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছিল। এই দৈনিকটি *স্বরাজ*-এর মতোই ছিল। যাঁরা জীবনানন্দের সঙ্গে *স্বরাজ* পত্রিকায় কাজ করতেন, তাঁরা অনেকেই ১৯৫০ সালে *সত্যযুগ*-এও কাজ করতেন। ১৯৪৭ সালে *স্বরাজ*-এর সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার *সত্যযুগ* সম্পাদনা করতেন। জীবনানন্দের কবিতা 'পৃথিবী আজ' ১৯৫০ সালে *সত্যযুগ*-এর পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি সম্পাদনা করেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গৌরকিশোর ঘোষ ও উমারঞ্জন চক্রবর্তী। প্রথম দুজন *স্বরাজ*-এ কাজ করতেন এবং *দ্বন্দ্ব* পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন; নীরেন *দ্বন্দ্বর* কবিতা বিভাগের সম্পাদক ছিলেন।

৫৬. *দ্বন্দ্ব*, আষাঢ় ১৩৭৫, ১।

৫৭. প্রাগুক্ত।

৫৮. আমার জানা মতে, জীবনানন্দের আর একটি মাত্র লেখা সম্ভবত *দ্বন্দ্ব*-এ ছাপা হয়েছিল, কবিতাটির নাম 'মাঘসংক্রান্তির রাতে'। *ময়ূখ* (পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-৬২) পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জিতে কবিতাটির নাম আছে বলে বোঝা যায় যে কবিতাটি *দ্বন্দ্ব* পত্রিকায় ছাপা হয়ে থাকতে পারে। তবে সেই গ্রন্থপঞ্জিতে কোনো প্রকাশকাল দেওয়া হয়নি। আমি কেবল *দ্বন্দ্ব*-এর প্রথম ছয়টি সংখ্যা দেখেছি এবং তাই *ময়ূখ*-এর গ্রন্থপঞ্জির তালিকাটি নিশ্চিত করতে পারিনি। কবিতাটি দুই খণ্ডে জীবনানন্দের মরণোত্তর সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ছিল *বেলা অবেলা কালবেলায়* (কলকাতা : নিউ স্ক্রিপ্ট, ১৯৬১) এবং *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতার* পরবর্তী সংস্করণে। একই কবিতা পাওয়া যায় 'পোয়েট্রি, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬, বরিশাল' লেখা জীবনানন্দের নোটবইয়ে।

৫৯. 'কবিতার কথা', ১০১; *দ্বন্দ্ব*, আশ্বিন ১৩৫৭ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৬০. প্রাগুক্ত।

৬১. প্রাগুক্ত, ১০৫।

৬২. প্রাগুক্ত, ১০৭।

৬৩. অম্লান দত্তের সাক্ষাৎকার। অরুণ দাশগুপ্ত স্মরণ করেন যে তিনি সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রের একটা সভায় যোগ দিয়েছিলেন, যেখানে জীবনানন্দ একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

৬৪. আবু সয়ীদ আইয়ুবের সাক্ষাৎকার।

৬৫. অম্লান দত্তের সৌজন্যে।

৬৬. জীবনানন্দ 'আজ' শিরোনামে চারটি কবিতা লিখেছিলেন।

৬৭. অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে *নির্ণয়* প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৩ (১৯৪৬-৪৭) থেকে রাজনৈতিক সাপ্তাহিক হিসেবে, প্রকাশক ছিলেন অতুল্য ঘোষ। তারপর ১৯৫০-এর অক্টোবর থেকে এটির সম্পাদনার দায়িত্বে আসেন অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পরবর্তী ছয় মাস এই দায়িত্বে ছিলেন তিনি। সে সময় কাগজটি মাসিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়।

৬৮. *নির্ণয়*, কার্তিক, ১৩৫৭।

৬৯. ১৩ জুন ১৯৪৯ তারিখে লেখা চিঠি; *ময়ূখ*, পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-৬২, ১২৪, সংখ্যায় প্রকাশিত।

৭০. সত্যপ্রসন্ন দত্তের সৌজন্যে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৭১. হরপ্রসাদ মিত্রের সৌজন্যে। চিঠিটি তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল হুগলি মহসীন কলেজ, চুঁচুড়ায়, যেখানে পড়াতেন তিনি। অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে হরপ্রসাদ শ্রীরামপুর থেকে বের করেছিলেন *নতুন কবিতা* নামের একটা পুস্তিকা। অনুমান করা যায়, জীবনানন্দ ভেবেছিলেন, শ্রীরামপুর কলেজের ওপর হরপ্রসাদ মিত্রের বিশেষ প্রভাব থাকতে পারে। মহিলা কলেজের বিষয়ে জীবনানন্দ আগে হরপ্রসাদকে অনুরোধ করেছিলেন।

৭২. চাকরির তারিখটা আমার জন্য প্রিন্সিপালের একজন প্রশাসনিক সহকারী জোগাড় করে দিয়েছিলেন। বাকি সব তথ্য কলেজের কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পাওয়া। গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন, লাবণ্য দাশের অসুস্থতার কারণে জীবনানন্দ খড়্গপুর কলেজের কাজ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন (*জীবনানন্দ* ৬১-৬২)।

৭৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার।

৭৪. মেজর মজুমদার ১৯৪৭-৪৮ সালে ছয় থেকে সাত মাস সাবলেট ছিলেন। সাবলেট নেওয়া তৃতীয় একজন ১৯৫০ বা ১৯৫১ সালের আগে সে-ব্যাসায় ওঠেননি। এর মধ্যে অমল দত্ত নামের একজন জীবনানন্দের ল্যান্সডাউন রোডের ফ্ল্যাটের একাংশের ভাড়াটে ছিলেন। অমল দত্ত *উষা* জীবনানন্দ সংখ্যায় একটা ছোট লেখা লিখেছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর ও জীবনানন্দের মধ্যকার সম্পর্কের বর্ণনা দিয়েছিলেন। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে *নিরুক্ত*র মাধ্যমে তাঁদের পরিচয় ঘটেছিল।

৭৫. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার।

৭৬. সুবোধ ঘোষ, 'আমার চোখে কবি জীবনানন্দ', *উষা*, কার্তিক, ১৩৬১, ২০।

৭৭. গোপালচন্দ্র রায়, *জীবনানন্দ*, ৬২-৬৫।

৭৮. নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার।

৭৯. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সৌজন্যে। এই চিঠিটি ছাপা হয়েছিল *সংহিতায়* (টালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সম্পাদক ছিলেন ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অমিতাভ গুপ্ত)। এটি লেখা হয়েছিল অনিল বিশ্বাসের কাছে, কিরণশঙ্করের মতে, যিনি সে সময় মুর্শিদাবাদের জেলা কর্মকর্তা ছিলেন।

৮০. গোপালচন্দ্র রায় লেখেন, সঞ্জয় জীবনানন্দকে ব্যাংকে চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তারপর দত্তদের সঙ্গে কথা বলে সবকিছু ঠিক করে ফেলেছিলেন; জীবনানন্দ ব্যাংকে ঢোকার আগে আরেকটা শিক্ষকতার চাকরি হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি ব্যাংকের চাকরিটা আর নেননি (*জীবনানন্দ*, ৬৫)। সত্যপ্রসন্ন দত্ত স্মরণ করতে পারেন, জীবনানন্দ তাঁকে ব্যাংকের চাকরিটা ঠিক করে দেওয়ার জন্য বলেছিলেন, তবে তিনি সেখানে যোগ দেননি।

৮১. প্রাগুক্ত, ৬৬।

৮২. প্রাগুক্ত, ১৫৭-৬০।

৮৩. *হাওড়া গার্লস কলেজ ম্যাগাজিন* ১৯৫৪ সালে জীবনানন্দকে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দেখিয়েছিল।

৮৪. গোপালচন্দ্র রায়, *জীবনানন্দ*, ১৬১-৬৪, ১৭০।

৮৫. প্রাগুক্ত, ১৬৯-৭০।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৮৬. সত্যপ্রসন্ন দত্তের সৌজন্যে।

৮৭. অশোকানন্দ দাশের সাক্ষাৎকার।

৮৮. আতাউর রহমানের মতে, এটা ঘটেছিল ১৯৫৩ বা ১৯৫৪ সালে। তবে তিনি ভেবেছিলেন, এটা হাওড়া গার্লস কলেজে চাকরি পাওয়ার আগের সময়ের।

৮৯. আতাউর রহমানের সাক্ষাৎকার।

৯০. সঞ্জয় ভট্টাচার্যের *কবি জীবনানন্দ দাশ*-এ উদ্ধৃত, ১৪১।

৯১. প্রাগুক্ত, ১৪৬। গোপালচন্দ্র রায় চিঠিটির সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, জীবনানন্দ হুমায়ুন কবির ও তারাশঙ্করের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছেন তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা* যাতে নতুন চালু হওয়া সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারটি পায়, সে ব্যাপারটি দেখার জন্য, *জীবনানন্দ*, ১০৫-৭। আবদুল মান্নান সৈয়দ একইভাবে এই চিঠির মধ্যে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে জীবনানন্দের একটা প্রয়াস দেখতে পান, *শুদ্ধতম কবি*, ২২৪।

৯২. জীবনানন্দ যে *বনলতা সেন* গ্রন্থের প্রচ্ছদের ছবিটি পছন্দ করেননি, সেটা কলকাতার বহুশ্রুত কাহিনি। দ্রষ্টব্য, গোপালচন্দ্র রায়, *জীবনানন্দ*, ১৬৫।

৯৩. *বনলতা সেন*, ২৫; *কবিতা*, আষাঢ় ১৩৫৮ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৯৪. দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*, ১৭২।

৯৫. *বনলতা সেন*, ৪৭।

৯৬. আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার।

৯৭. অরুণকুমার সরকারের সাক্ষাৎকার। গোপালচন্দ্র রায় পুরস্কার পাওয়ার পরের দিন জীবনানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনাটি স্মরণ করতে পারেন। তাঁর তথ্যানুযায়ী, পুরস্কারের মধ্যে ছিল ১০১ টাকা ও এক ঝুড়ি ফল : 'আপেল, বেদানা, একটা নারকেল, পাকা পেঁপে প্রভৃতি।' *জীবনানন্দ*, ১৬৬।

৯৮. আলোক সরকারের সাক্ষাৎকার।

৯৯. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'নির্জনতম কবি', *পরিচয়*, শ্রাবণ ১৩৬০, ৫১-৫৫।

১০০. প্রাগুক্ত, ৫৪।

১০১. বাংলা কবিতার দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব অনুপস্থিত ছিলেন। সে সময় বুদ্ধদেব বসু যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষকতা ও বক্তৃতায় ব্যস্ত, আর অমিয় চক্রবর্তীও যুক্তরাষ্ট্রের একটা কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীতে।

১০২. এই বিখ্যাত পত্রিকাটি ১৮৬৮ সালে যাত্রা শুরু করে বাংলা পত্রিকা হিসেবে। তারপর ১৮৭৮ সালে লর্ড লিটনের কুখ্যাত 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট'-এর থাবা এড়ানোর জন্য রাতারাতি পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি পত্রিকায় পরিণত হয়। স্মরজিৎ চক্রবর্তী, *দ্য বেঙ্গলি প্রেস (১৮১৮-১৮৬৮)*, ১৭৭।

১০৩. সিগনেট প্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডি কে গুপ্ত। এখান থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল জীবনানন্দের *বনলতা সেন*।

১০৪. *অমৃতবাজার পত্রিকা*, ২৮ জানুয়ারি ১৯৫৪, ৫।

১০৫. তরুণ মিত্র ও শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১০৬. *অমৃতবাজার পত্রিকা,* ২৯ জানুয়ারি ১৯৫৪, ১০।

১০৭. বাণী রায়, *নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ* (কলকাতা : মুখার্জি বুক হাউস, ১৯৬১), ৯।

১০৮. যদিও রবীন্দ্রনাথের নাম ছাপা ছিল শিরোনামের পাতায়। অনেকেই ভেবেছিলেন (বুদ্ধদেব বসুসহ, যেমন তিনি এটির আলোচনায় উল্লেখ করেছিলেন), যেসব কবিতা সংকলিত হয়েছিল, সেগুলো এমন একজন বাছাই করেছিলেন, যিনি তেমন প্রতিভাসম্পন্ন কেউ নন।

১০৯. বুদ্ধদেব বসু ও আবু সয়ীদ আইয়ুবের সাক্ষাৎকার।

১১০. প্রথম সংস্করণে অমিয় চক্রবর্তীর মাত্র চারটি কবিতা ছিল।

১১১. বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *আধুনিক বাংলা কবিতা,* দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা, এমসি সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৫৬), ভূমিকা ৫-৬।

১১২. বিষ্ণু দে সম্পাদিত সংকলন *একালের কবিতা* (কলকাতা: সম্বোধি পাবলিকেশনস, ১৯৬৩)। এতে ছিল রবীন্দ্রনাথের ১৫টি কবিতা, জীবনানন্দের ১৪টি, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের আটটি করে ও বুদ্ধদেব বসুর ছয়টি কবিতা। বিষ্ণু দে সংকলনের সব শেষে নিজের পাঁচটি কবিতা দিয়েছিলেন।

১১৩. বিরাম মুখোপাধ্যায় এই '*শ্রেষ্ঠ* কবিতা' সিরিজগুলোর পরিকল্পনা করেছিলেন। জীবনানন্দের ভূমিকা অনুসারে তিনি জীবনানন্দের কবিতা বাছাইয়ের কাজটিও করেছিলেন।

১১৪. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৩ অক্টোবর ১৯৫৪, ৩।

১১৫. দ্রষ্টব্য, নরেশ গুহ, *কবিতা,* পৌষ ১৩৬১, ১৫০; সঞ্জয় ভট্টাচার্য, *কবি জীবনানন্দ দাশ,* ১৪৭ ও গোপালচন্দ্র রায়, *জীবনানন্দ,* ১০০-১০১।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মরণোত্তর জীবনানন্দ

তাঁর ৫০তম বছরে রাসবিহারী এভিনিউয়ে ট্রামকারের ধাক্কায় নিহত একজন কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলা সাহিত্যের ধারায় যা সংযোজন করে গিয়েছিলেন, ভারতের জন্য তা হতো আধুনিক মানস—তিক্ততা, আত্ম-অবিশ্বাস, যৌনতা, রাস্তার ভাষা, ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি, অকপটতা, কলকাতার ভিখারি ইত্যাদি।

—অ্যালেন গিন্সবার্গ, *সিটি লাইটস জার্নাল*, দ্বিতীয় সংখ্যা

কলকাতার তিনটি বাংলা দৈনিক, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, *যুগান্তর* ও *বসুমতী* জীবনানন্দের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করে।[১] এবং এক সপ্তাহ পর *আনন্দবাজার পত্রিকা* রোববার, ৩১ অক্টোবর সংখ্যায় অজিত দত্তের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপে।[২] তার সঙ্গে ছাপা হয় জীবনানন্দের একটা কবিতা, যার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ছিল সমাধিফলকে লেখার উপযুক্ত।

আজ

কেবলি আরেক পথ খোঁজো তুমি; আমি আজ খুঁজি নাকো আর;
পেয়েছি অপার শূন্যে ধরবার মতো কিছু শেষে
আমারি হৃদয়ে মনে : বাংলার ত্রস্ত নীলিমার
নিচে ছোটো খোড়ো ঘর—বনঝিরি নদী চলে ভেসে

তার পাশে; ঘোলা ফর্সা ঘূর্ণিজল অবিরল চেনা পরিজনের মতন;
কখনো বা হয়ে আসে স্থির;
মাঠ ধান পানবন মাছরাঙাদের আলোড়ন
আলিঙ্গন ক'রে বিছিয়েছে তার নারীর শরীর।

ঘরে কোনো লোক নেই—কয়েকটি গ্রন্থ তবু আছে;
রয়েছে পরম ছবি—চারজন পাঁচজন একান্ত শিল্পীর :
ফ্রান্সের ইটালির বাংলার কাঙড়ার;—নিম জাম নাগেশ্বর গাছে
রয়েছে অগণ্য সব পাখিদের নীড়।

তবুও মনকে ঘিরে মহাজাগতিক আলোড়ন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর এই পৃথিবীর অন্তহীন দ্বিধা দ্বেষ প্রেম সংগ্রাম
আমাদেরো রক্ত দিয়ে আদি রক্তবীজের নিধন
চেয়েছে, মিটিয়ে দেবে ষোলো আনা দাম।

এই শতকের দিন ক্ষয় হ'য়ে এল প্রায় আজ;
নবীন আশার বার্তা নীল নিরালম্ব শূন্যে ভেসে
মানুষ যা চেয়েছিল সেই নারী সেই সূর্য আর সে সমাজ
দেবে—তার আত্মঘাতী রণাঙ্গন একদিন স্তব্ধ হ'লে শেষে।[৩]

এমনকি সুদূর বম্বে থেকে *টাইমস অব ইন্ডিয়া* কবির মৃত্যুর সংবাদ ছেপেছিল :

> একটা দুর্ঘটনার পর মি. জীবানন্দ [বানান অপরিবর্তিত] দাশের অকালমৃত্যু বাংলার সাহিত্যভূমি থেকে তুলে নিয়ে যায় একজন কবিকে, যিনি কখনোই প্রচার ও জনপ্রিয়তার পাদপ্রদীপে না থেকে তাঁর গদ্যকবিতা ও মুক্তছন্দের কবিতা দিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন।
>
> ১৮৯৮ [তথ্য অপরিবর্তিত] সালে জন্মগ্রহণ করা জীবানন্দ [বানান অপরিবর্তিত] ছিলেন বরিশালের এক শিক্ষকের সন্তান। তাঁর পিতার পেশা গ্রহণ করে তিনি ছিলেন কলকাতার একটা কলেজে ইংরেজির শিক্ষক। তবে খুব বেশি দিনের জন্য নয়। তাঁর নিজস্ব রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুর স্বকীয়তা ছিল চলমান ধারা থেকে ভিন্ন এবং এই ভিন্নপথে যাত্রার বিষয়ে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের কারণে সহসাই চাকরি হারান তিনি।...জীবানন্দ [বানান অপরিবর্তিত] দাশ কবিতায় তাঁর সাহসী কল্পনাশক্তি ও চিত্রকল্পের মূর্ততার জন্য যতখানি পরিচিত ছিলেন, সামাজিক বিষয়বস্তুর জন্য ততখানি ছিলেন না। ঠাকুরের সাহিত্যকীর্তিতে উদ্ভাসিত একটা সাহিত্যজগতে তার প্রতিফলনে ম্লান না করে দাশ দেখিয়েছেন কীভাবে কবিবৃত্তির প্রতি সৎ থাকা যায়।[৪]

তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা ও বাংলা কবিতায় তাঁর অবদানের প্রশংসা করার জন্য বেশ কয়েকটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয় অশোকানন্দের ১৭২/৩, রাসবিহারী এভিনিউর বাসায় ৩১ অক্টোবর সকাল আটটায়। আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বন্ধু ও সতীর্থ লেখকেরা। একই রোববার সন্ধ্যায় জীবনানন্দের স্মৃতিতর্পণের জন্য আরেকটি সভার আয়োজন করে 'চলোর্মি সংস্কৃতি কেন্দ্র'। জীবনানন্দের সতীর্থ কবিদের একজন ও বন্ধু গোপাল ভৌমিক ছিলেন এটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক। জীবনানন্দের কবিতার ওপর আলোচনা, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বাণী রায়, নরেশ গুহ ও রানা বসুর আবৃত্তির ঘোষণা ছিল বিজ্ঞাপনে। আগের মঙ্গলবার ২৬ অক্টোবর 'আমাদের দল'-এর অফিসে জীবনানন্দ স্মরণে একটা সভার খবর ছাপা হয় *আনন্দবাজার পত্রিকার* ২৮ অক্টোবর, ১৯৫৪ তারিখের সংখ্যায়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন *পাণ্ডুলিপি* পত্রিকার সম্পাদক প্রতাপ মুখোপাধ্যায় (এমএ); রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল নামের একজন জীবনানন্দ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন এবং তাঁর কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন রামশঙ্কর পাত্র, রামনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তরুণকুমার দত্ত।[৫]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কয়েকটি সাহিত্য-পত্রিকা জীবনানন্দকে উৎসর্গীকৃত বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে সর্বপ্রথম বের হয় *উষা,* (সম্পাদক সুধীর সরকার ও প্রাণ সেন)। তারপর কবি ও তাঁর কবিতা সম্পর্কে প্রবন্ধ এবং জীবনানন্দের সবসুদ্ধ আটটি কবিতা, যার মধ্যে সাতটি দুটি কবিতার খাতা থেকে সংগ্রহ করা ও ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত—এসব নিয়ে *কবিতা* পত্রিকা ডিসেম্বরে বের করে বিশেষ জীবনানন্দ সংখ্যা।[৬] *উত্তরসূরি* নামের এক অপেক্ষাকৃত নতুন পত্রিকা (সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য) তার দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪-৫৫) উৎসর্গ করে জীবনানন্দকে, তাঁর ওপর বিভিন্ন লেখকের লেখা, জীবনানন্দের একটি কবিতা, একটি প্রবন্ধ আর একটি চিঠিও ছাপা হয় এতে। সে সময়কার আরেকটি নতুন পত্রিকা *ময়ূখ* (স্নেহাকর ভট্টাচার্য, সমর চক্রবর্তী ও জগদিন্দ্র মণ্ডল সম্পাদিত) একটি খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও চমৎকার জীবনানন্দ সংখ্যা (ডিসেম্বর-মে, ১৯৫৪-৫৫) বের করে। এতে শুধু পত্রপত্রিকায় ছাপা হওয়া জীবনানন্দের প্রায় ২০০টি কবিতার পঞ্জি ছাপা হয়। *একক* (শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত) জীবনানন্দ ও সম্প্রতি প্রয়াত আরেক কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের স্মরণে বের করে একটা যৌথ সংখ্যা। আর হাওড়া গার্লস কলেজ—মৃত্যুর সময় জীবনানন্দ যেখানে কর্মরত ছিলেন—তার অষ্টম বার্ষিক ম্যাগাজিন (১৯৫৪-৫৫) উৎসর্গ করে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)। এটিতে ছিল শিক্ষক ও সহকর্মী জীবনানন্দের ওপর বিভিন্ন রচনা।

অগণিত সাময়িকী জীবনানন্দের নিজের কিংবা তাঁর ওপর লেখা কবিতা প্রকাশ করে। আরও বহু পত্রিকা কবি ও তাঁর কর্মের ওপর প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এমনকি *শনিবারের চিঠির* সজনীকান্তও তাঁর পত্রিকার 'সংবাদ-সাহিত্য' বিভাগে প্রয়াত কবি সম্পর্কে কিছু না লিখে পারেননি। একই কাগজের একই বিভাগ ১৯২০-এর দশকের শেষে এবং ১৯৩০-এর দশকে জীবনানন্দ দাশের ওপর তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ বহু লেখা ছেপেছিল। কিছুটা নিরীহভাবে সজনীকান্ত আগেকার নেতিবাচক সমালোচনার বাড়াবাড়ির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন :

> কবি জীবনানন্দের কাব্যের প্রতি আমরা যৌবনে যথেষ্ট বিরূপতা দেখাইয়াছি, তাঁহার দুর্বোধ্যতাকে ব্যঙ্গ করিয়া বহু পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টা করিতেও ছাড়ি নাই। তিনি প্রধানত 'কল্লোল'-'প্রগতি'-গোষ্ঠীর লেখক ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে বিপক্ষ দলে ফেলিয়া লড়াইয়ের ধর্ম অনুযায়ী আক্রমণেই আমাদের আনন্দ ছিল। আজ কালধর্মে আমাদের মতি ও বুদ্ধির পরিবর্তন হইয়াছে, তিনিও সকল নিন্দা প্রশংসার ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছেন। পুরাতন যাবতীয় অশোভন বিরূপতা সত্ত্বেও এ কথা আজ স্বীকার করা কর্তব্য মনে করিতেছি যে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা-কাব্যসাহিত্যের তিনি অন্যতম গৌরব ছিলেন, তিনি অকপটে সুদৃঢ়তম নিষ্ঠার সহিত কাব্য-সরস্বতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রকাশভঙ্গিতে অস্পষ্টতা থাকিলেও সাধনায় বিন্দুমাত্র ফাঁকি ছিল না।...সহৃদয় ব্যক্তিরা তাঁহার বক্তব্যের চাবিকাঠি খুঁজিয়া পাইয়া আনন্দলাভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

> করিতেন, যাঁহারা তাহা পাইতেন না তাঁহারাই বিমুখ হইতেন। আমরা এই শেষোক্তদের দলে ছিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া কবি জীবনানন্দের কাব্যসম্পদ কিছু বাতিল হইয়া যায় নাই। আমরাই বরং সহৃদয়তার সাধনা করিয়া তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।[৭]

তবুও জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করার মতো নিজের যথেষ্ট দক্ষতা তখনো হয়নি বলে মনে করে সজনীকান্ত *শনিবারের চিঠির* সেই লেখার প্রায় অর্ধেকজুড়ে *আনন্দবাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত অজিত দত্তের প্রবন্ধের উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছিলেন।[৮]

জীবনানন্দের মৃত্যুর পরের বছর তাঁর কাব্যগ্রন্থ *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা* সদ্য প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য আকাদেমির বাংলা ভাষায় প্রথম পুরস্কার লাভ করে। ১২ মার্চ, ১৯৫৪ সালে আকাদেমির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এর উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি এস রাধাকৃষ্ণন : 'আকাদেমির উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহিত্য সংস্কৃতিতে অবদান রাখা ব্যক্তিবর্গকে স্বীকৃতি দেওয়া, সাহিত্য সংস্কৃতিতে প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তিবর্গকে উৎসাহ দেওয়া, মানুষের রুচিকে শিক্ষিত করা এবং সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনার মান উন্নয়ন করা।'[৯] আকাদেমির স্বীকৃতিতে ছিল সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার উল্লেখযোগ্য বইকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের জন্য এই পুরস্কার প্রথমবারের মতো দেওয়া হয় ১৯৫৫ সালে। আর বাংলা ভাষায় প্রথম পুরস্কারটি পান (প্রয়াত) জীবনানন্দ দাশ তাঁর বই *শ্রেষ্ঠ কবিতার* জন্য, অবশ্য বিনা বিরোধিতায় নয়।[১০]

বনলতা সেন-এর (সিগনেট প্রেস) জন্য নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন পুরস্কারের চেয়ে বেশি গণস্বীকৃতি বহন করে আনে জীবনানন্দ দাশকে দেওয়া সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। আগেরবারের মতো মার্ক্সীয় সাহিত্য সমালোচকেরা জীবনানন্দের কবিতার এই স্বীকৃতিকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেন না। *পরিচয়* পত্রিকায় মণীন্দ্র রায় একটা প্রবন্ধ লেখেন, তাতে তিনি যা করেন, *বনলতা সেন*-এর (সিগনেট প্রেস) আলোচনায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও তা করেননি, অর্থাৎ জীবনানন্দের সব কবিতার বইগুলো ঘাঁটা।[১১] তাঁর সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য কত ধরনের ছিল এবং কেন, তা বোঝানোর জন্য মণীন্দ্র রায় *শ্রেষ্ঠ কবিতার* ভূমিকা থেকে জীবনানন্দ দাশকে উদ্ধৃত করেন :

> আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কেউ বলেছেন এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার; অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। কিন্তু কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুইই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার; কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এত তারতম্য।[১২]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যের অন্য মাধ্যমের চেয়ে গীতিকবিতায় ব্যক্তিমানসের আশা ও আকাঙ্ক্ষা অধিক উচ্চারিত—এ কথা স্বীকার করে মণীন্দ্র রায় আংশিকভাবে একমত হন। কিন্তু তিনি যুক্তি দেখান যে তাঁর ভাষায় ব্যক্তিমানস ও সামাজিক মানসের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটে। তিনি উপসংহারে বলেন, কালের সামাজিক পটভূমিতে কবির সৃষ্টিকে তুলে ধরেই চূড়ান্ত বিচার করা উচিত।১৩

সমালোচনার মতবাদ ঘোষণা করে মণীন্দ্র রায় জীবনানন্দের বইগুলোর বাণীকে বিবেচনায় রেখে এবং আলোচিত সময়ের সঙ্গে সে বাণীর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা ও প্রত্যেকটি বই যে সামাজিক পটভূমিতে রচিত হয়েছিল, তার বিচারে উদ্যোগী হন। *ঝরা পালক* থেকে *মহাপৃথিবী* পর্যন্ত বইগুলো একটা প্রাসঙ্গিক বাণীর অভাব কিংবা কাব্যিক শক্তি, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপলব্ধির সঙ্গে কিছু মৌলিক বিশ্বাসকে সমন্বিত করতে কবির অক্ষমতার কারণে ব্যর্থ বলে বিবেচিত হয়।১৪

মণীন্দ্র রায়ের মতে, জীবনানন্দের একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থ ছিল বেশ সফল, *সাতটি তারার তিমির* শেষ পর্যন্ত সামাজিক পরিবেশ নিয়ে কথা বলেছে:

> সমাজ বাস্তবের দিকে জীবনানন্দ সচেতন হয়েছেন আরো অনেক পরে—যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগের পটভূমিতে—'চল্লিশের যুগে'। এই কবিতাগুলি মোটামুটি 'সাতটি তারার তিমির'-এ স্থান পেয়েছে। আর বক্তব্যের দিক থেকে এই গ্রন্থই জীবনানন্দের উজ্জ্বলতম রচনা।১৫

মণীন্দ্র রায় উপসংহারে বলেন, ১৯৪০-এর দশক ছিল জীবনানন্দের বেড়ে ওঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা সময়। তবে তাঁর বিশেষ পরিস্থিতি ছিল অতি ক্ষুদ্র ও অতিবিলম্বিত। জীবনানন্দ কাব্যিক মাধ্যমের সঙ্গে বাণীকে কার্যকরভাবে সমন্বিত করতে পারেননি।

> রচনার দিক দিয়ে জীবনানন্দের সবচেয়ে বড় গুণ নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা। আর এ গুণ কবির প্রথম দিকের কবিতাগুলিতেই বেশি বর্তমান। 'চল্লিশের যুগে' যখন তিনি পরিপার্শ্বের প্রভাবে বাস্তব জগতের দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য হলেন, তখন তাঁর পূর্বতন ক্ষমতাকে তিনি নতুন উপলব্ধির মাটিতে পুনর্বসতি দিতে পারেন নি। মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁর অপূর্ব প্রয়াসে আমরা মুগ্ধ হয়েছি; কিন্তু সংহতির চর্চা তিনি কোনো দিনই সজ্ঞানে করেন নি বলে বেশির ভাগ গোটা কবিতাই একটি অখণ্ড সত্তার মতো একাগ্র হয়ে উঠতে পারেনি।১৬

মণীন্দ্র রায় বিশ্বাস করেন, আরও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকলে জীবনানন্দ সত্যিকার একজন মহান কবি হতে পারতেন।১৭

মণীন্দ্র রায়ের বিশ্লেষণ যথেষ্ট সূক্ষ্মদর্শনশক্তিময় ও সারবত্তায় সঠিক হলেও তাঁর সূত্র ও সিদ্ধান্ত বিতর্কের দাবিদার। মণীন্দ্র রায়ের মতামতের বিপরীতে জীবনানন্দ সত্যিকার একজন বড় কবি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর সবচেয়ে বড় কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। এই স্বীকৃতি তিনি পেয়েছিলেন অন্যান্য কারণের মধ্যে তাঁর সূক্ষ্ম বোধের উপলব্ধিকে কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতার জন্য। মহৎ শিল্প

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সামাজিক বাস্তবতার কিছু বাণী বহন করতে বাধ্য, মণীন্দ্র রায়ের এই যুক্তি পরবর্তী সময়ের বাঙালি আলোচকেরা স্বীকার করেননি। তবে *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থে জীবনানন্দ তাঁর কাব্যিক ক্ষমতাকে তাঁর নবলব্ধ সামাজিক চেতনার সঙ্গে সমন্বিত করতে কিংবা তার মধ্যে 'পুনর্বসতি' দিতে পারেননি, তাঁর এই পর্যবেক্ষণ যুক্তিযুক্ত। এ কারণে *সাতটি তারার তিমির*-এর কিছু কবিতা দুর্বল। কিন্তু *ধূসর পাণ্ডুলিপি* ও *বনলতা সেন* সম্পর্কে মণীন্দ্র রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিন্দাবাদ অন্যায্য; এ দুই গ্রন্থের কবিতাগুলোতে সামাজিক বক্তব্যের অভাব থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্য হিসেবে আজ পর্যন্ত এগুলো কালের বিচারে উতরে গেছে।

পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধে মার্ক্সীয় সমালোচকেরা জীবনানন্দের ওপর আক্রমণ বন্ধ করেন। এই পিছু হটার পেছনে দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, জীবনানন্দ আর বেঁচে নেই। যদিও তাঁর কবিতা পত্রপত্রিকায় ও গ্রন্থাকারে মরণোত্তর প্রকাশিত হচ্ছিল, তবু তিনি বেঁচে নেই—শুধু এই বিবেচনায় মার্ক্সীয় সমালোচকেরা এই প্রয়াত কবির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়তে পারেন। দ্বিতীয়ত, বিশ্বের কাছে জোসেফ স্তালিনের নিপীড়নের কথা ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন তথ্য প্রকাশ করে দেয়, তখন কমিউনিস্ট সাহিত্যিকদের কারও কারও মোহভঙ্গ হয়। আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতে, স্তালিনের ভাবমূর্তি এভাবে ভূলুণ্ঠিত হওয়ার পর বহু বামপন্থী কবির বিশ্বাস মারাত্মকভাবে টলে যায়।[১৮] ১৯৫০-এর দশকে আক্রমণের দমকটা কাটলে জীবনানন্দ এত দিনকার ধরে রাখা প্রশংসা লাভ করেন। যদিও কিছু সমালোচক ১৯৪০-এর ও ১৯৫০-এর দশকের বিভিন্ন কবিতার এখান-ওখান থেকে কিছু পঙ্‌ক্তি তুলে ধরে প্রশংসা করেন। বেশির ভাগ প্রশংসা ও মনোযোগ ছিল জীবনানন্দের ১৯২০-এর ও ১৯৩০-এর দশকের কবিতাগুলোর প্রতি, যখন 'বোধ', 'বনলতা সেন' ও 'আট বছর আগের একদিন'-এর মতো কবিতা লেখা ও ছাপা হচ্ছিল।

আজ জীবনানন্দ কেবল একজন সম্মানিত কবিই নন, তিনি বাংলার সবচেয়ে প্রভাবশালী কবিদের একজন। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বলেছিলেন, সে শতাব্দীর প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ যে রকম বিপজ্জনক রকম প্রভাবশালী ছিলেন, জীবনানন্দ এখনকার কবিদের কাছে সে রকম বিপজ্জনকভাবে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন। জীবনানন্দের সমসাময়িক কবিরা মনে করতেন, তাঁদের সদা সতর্ক থাকতে হতো, পাছে তাঁরা ওস্তাদ কবির (রবীন্দ্রনাথ) প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে তাঁদের নিজস্বতা হারিয়ে ফেলেন। অলোকরঞ্জনের মতে, আজ কবিদের সতর্ক থাকতে হয়, যাতে তাঁরা জীবনানন্দের শৈলীর কাছে আত্মসমর্পণ না করে স্রষ্টার বদলে অনুকারকে পরিণত না হন।[১৯] কলকাতার সিনেট হলে অনুষ্ঠিত ১৯৫৪ সালের কবি-সম্মেলনে প্রায় ৬০ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন; জীবনানন্দের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বাণী রায় সে কবি-সম্মেলনের উল্লেখ করে লেখেন, 'জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহুল পঠিত রচনা। আজ তরুণ কবিদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শতকরা আশিজন জীবনানন্দের অননুকরণীয় ভঙ্গিতে কবিতা লিখবার চেষ্টা করছেন।'[২০] প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত লেখেন, 'কিন্তু চল্লিশে যাঁরা প্রেরণাস্থল ছিলেন, সেই বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, আজকের কবিদের কাছে তাঁরাই (বিশেষত, জীবনানন্দ) প্রেরণার উৎস।'[২১] শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় এতে সম্মতি দিয়ে জীবনানন্দ সম্পর্কে ইতিবাচক মূল্যায়নকে আরও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যান :

> জীবনানন্দ দাশের প্রভাবমুক্ত হয়ে এখন কবিতা লিখছেন, এমন নীরোগ একজন কবিও নেই বাংলাদেশে—আমার ধারণা। কেউ কেউ স্বীকার করবেন না হয়ত, তার কারণ 'প্রভাব' শব্দটা মানুষকে হীন করে দেয়, আত্মাভিমানী আমরা প্রভাবিত হতে চাই না। কিছুকাল আগে এক ঘরোয়া আসরে এই প্রসংগ তুলতেই প্রবল আপত্তির ঝড় উঠতে দেখলাম। বরং 'আলোকিত' বলা ভালো, কারণ জীবনানন্দের প্রভাব প্রায় চাঁদের আলোর মতোই পীতাভ, তাঁর রচনা আমাদের বিষণ্ণতা, একাকিত্ব, অসহায়তা ইত্যাদি বোধের অভিধান। এক কথায় জীবনানন্দ এই দশকের নিয়তি।[২২]

অথচ জীবনানন্দীয় প্রভাবের বেশ কিছুটা সূক্ষ্মভাবে 'আলোকিত' করতে পারে, তেমন কিছু গুণ একটি কবিতায় সরাসরি জ্বলজ্বল করে ওঠে, যেমন কৃষ্ণ ধরের 'হাইকু ধরনে' কবিতাটি :

(১)

জ্যোৎস্না রাত
ঝরণা জল
        ঘাই হরিণ।

(২)

গভীর বন
বাঘের চোখ
        অন্তরীণ ॥[২৩]

যদিও কৃষ্ণ ধর একটা পুরুষ হরিণকে (ঘাইহরিণ) চিত্রিত করেছেন—জীবনানন্দের হরিণ ছিল স্ত্রী (ঘাইহরিণী)—*ধূসর পাণ্ডুলিপির* 'ক্যাম্পে' কবিতার প্রভাব একেবারে স্পষ্ট।

'এই কলকাতা আর আমার নিঃসঙ্গ বিছানা'য় শামশের আনোয়ার যখন পরিতাপ করে বলেন, 'কোনো বিদর্ভ নগরী আমার স্বপ্নের ভেতর জেগে ওঠে না,/ ...বীতশোক অশোক বা টায়ার সমুদ্র পারে কোনো প্রাসাদের খবর আমার জানা নেই/আমার বিছানার পাশে বনলতা সেন নয়...' তখন তিনি 'বনলতা সেন' ও 'নগ্ন নির্জন হাত'-এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। জীবনানন্দের লাজুক আচরণ অবলম্বন করে তিনি ধ্যান করেন, 'শস্তা তেলের দুর্গন্ধে বিদিশার নিশা খুঁজতে গিয়েই আমি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অপ্রতিভ হেসে ফেলি।'২৪ ১৯৬০-এর দশকে 'হাংরি জেনারেশন' নামে রাগী তরুণ কবিদের প্রাচীন ধ্যান-ধারণাবিধ্বংসী সংগঠন জীবনানন্দকে গুরুপিতা হিসেবে আখ্যা দেয়। একজন 'হাংরি', মলয় রায়চৌধুরী তাঁর নিন্দাজ্ঞাপনমূলক 'শিল্পের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে'* কবিতায় সরাসরি জীবনানন্দের উল্লেখ করেন:

শিল্পের স্বাধীনতা যে চায় সে মূর্খ
আমি শিল্পীর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে
শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের কেনা চাকররাই স্বাধীন কেননা তারা শিল্পী নয়,
তারা মিথ্যাবাদী চুরিবিশারদ আর মরা রোবোট
উন্মাদ সংস্কৃতিগুলোই কেবল শিল্পীকে চায়
শিল্প হল ভবিষ্যবাণী কেননা সর্বনাশের আগে দরকার অমঙ্গলের পূর্বাভাস
বিবেকী সভ্যতার জন্যে চাই লোকসংস্কৃতি যা আসলে প্রকৃতি,
তা মোটেই শিল্প নয়
কোনো বিবেকী সরকারের আবির্ভাব এখনও হয়নি
কোনো শিল্পীর পক্ষে সমঝোতা করা সম্ভব নয় কেননা সে আসলে তিনি
শিল্প হল আঘাতের উপশম
আমি মানবতার আঘাতপ্রাপ্তি চাই না কেননা আমি সর্বনাশের বিরুদ্ধে
শিল্পীকে একা যুঝতে হবে কেননা সে-ই তো উপশম আনে
শিল্পীকে নিজের পথ নিজে তৈরি করতে হবে
স্বাধীনতার জন্যে সে ভিক্ষা চাইবে না বা দরদস্তুর করবে না
বাইরে থেকে স্বাধীনতা পাবার জন্যে সে দুর্বলের কান্না কাঁদবে না
মিশর বয়ে চলে গেছে নীল নদের জলে
'লোহার দেয়াল' ভেঙেছেন ভ্যান গঘ যা তিনি একটি চিঠিতে বলেছিলেন
কলকাতাও মিশে যাবে ধূলায়
কিন্তু জীবনানন্দ দাশ বেঁচে থাকবেন চিরকাল আমার আর তোমার ভেতর
আমি শিল্পের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে
অসুস্থ নৃশংস ব্যবস্থায় শিল্পীর অস্তিত্ব অসম্ভব
মানবতার বেদীতে শিল্প হল আত্মাহুতি
তাই আমি বলি শিল্পীর জন্যে চাই জিঞ্জির
তাকে ঘিরে উঠুক পাতালের নীলাভ বিষবাষ্প
তাকে বসাও বিদ্যুৎবাহী চেয়ারে
তার জন্যে চাই ফাঁসিকাঠ
জীবন্ত পোড়াও তাকে
তাকে পাঠাও অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘেমো জেলখানায়
তার জন্যে পাগলাগারদ
কেননা ফ্রাংকো আর সালাজারের কবর হয়ে উঠবে ভবিষ্যতের গোরস্থান

আমার বই

* কবিতাটির মূল বাংলা ভাষ্য পাওয়া যায়নি বলে ইংরেজি অনুবাদ দেখে মলয় রায়চৌধুরী কবিতাটি নতুন করে লিখে দিয়েছেন। পুনর্লিখন সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'কিছু কিছু স্মৃতির রিনরিন ধরেছি মনে হয়, যা মেজাজ আনার জন্যে দরকার ছিল।'—অনুবাদক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবিনশ্বরতায় পাস্তেরনাকের পাশে ঘুমাবেন লোরকা আর আমিও থাকব সেখানে
আমি কারোর কাছে স্বাধীনতার গ্যারেন্টি চাই না
আমার যেমন ইচ্ছে হবে তেমন লিখব
যেখানেই থাকি না কেন যা ভাল লাগবে তা-ই লিখব
চন্দ্রালোকের মহাপ্লাবনে ওঠা আমার রক্তের জোয়ারধ্বনি আমি শুনতে পাই
আমি কারোর কাছে আমার স্বাধীনতা দাবী করি না
অজস্র সরকার উড়ে যাবে কবিতার ফুঁয়ে
শিল্পীর সামনে তাবৎ উন্মাদ সভ্যতা হাঁটু গেড়ে গোঙাবে
সময় যার আরেক নাম কবিতা তার সুষমাকে কোনো আণবিক বিস্ফোরণ দমাতে পারবে না।২৫

তাঁর সতীর্থ হাংরিরা ১৯৬৮ সালে যেবার খালাসিটোলার 'সেইলরস বার'-এ জীবনানন্দের জন্মদিন পালন করে, পাটনাবাসী মলয় তাতে সম্ভবত যোগ দেননি :

কবিদের পানশালা

গত সোমবার (১৯শে ফেব্রুয়ারি) কলকাতার হাংরি জেনারেশনের 'বিদ্রোহী' তরুণ কবিদের জন্য ছিল এক মহান দিন। সেদিন তাদের 'গুরু ও প্রেরণাদাতা' জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন, যাঁর সঙ্গে অবশ্য তাদের কখনোই যোগাযোগ ঘটেনি। উদ্‌যাপনটা ছিল চিরাচরিত বার্ষিকীর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, এটির সংগঠকরা তেমনিভাবেই পরিকল্পনা করেছিলেন। নগরীর কোনো সাংস্কৃতিক সদন নয়, অনুষ্ঠানের স্থানটি ছিল মধ্য-কলকাতার এক জনপ্রিয় কোলাহলময় দেশি মদের ঠেক। সেখানে বিশেষ আমন্ত্রিত কেউ ছিলেন না। জীবনানন্দের অদৃশ্য ও পরিব্যাপ্ত আত্মা ছিল সেদিনের প্রধান অতিথি।

হাংরি জেনারেশনের সদস্যরা—স্নেহভরে এ-নামেই তাদের ডাকা হয়—স্খলিতচরণে কোনার দিকের একটা টেবিল দখল করে বসার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে এক মিনিটের স্মারক নীরবতা, যা ভেঙে যাচ্ছিল শ্রোতৃমণ্ডলীর কানফাটানো উচ্চহাস্যে। তারপর সতীর্থদের কাছে 'উদীয়মান কবি' হিসেবে পরিচিত শৈলেশ্বর ঘোষ বক্তৃতা দেন, কেন উদ্‌যাপনটা এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার ব্যাখ্যা দিয়ে। 'শুধুমাত্র এই কারণে যে এই সেই জায়গা যেখানে জীবনানন্দ দিনের পর দিন অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তাই আমরা তাঁর আরব্ধ কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।' লিকলিকে চশমাপরা কবি তখন তাঁর সর্বশেষ কবিতা 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' পাঠ করা শুরু করেন, বিষয়টা এমন বিচিত্র, এ-যেন সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে রন্ধনশিল্পের আলোচনা। এবারেও শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর প্রতি সদয় হন না। অবিরাম কোলাহলের মাঝে কবির কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায়।

তারপর আসেন হাংরি জেনারেশনের আরেক কবি, ইনি তাঁর দলভুক্তদের দুঃখদুর্দশার কথা বলে পরিতাপ করেন। 'আমরা নিঃস্ব, আমাদের লেখা ছাপা হয় না; এবং আমাদের বন্ধুদের পেছনে অজানা কারণে লাগাতার লেগে থাকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকজন।' একসময় হঠাৎ ক্ষেপে ওঠেন তিনি, 'যে সমস্ত কবিরা ভাবে আমরা লিখতে পারি না তাদের নিকুচি করি। আমাদের স্বাধীনতা আছে। আমাদের মন সবকিছু কল্পনা করতে পারে, আর আমাদের কলম লিখতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> যেকোনো কিছু।' তিনি শেষে বলেন, 'একদিন সমস্ত বাঙালি জনগণ আমাদের লেখা পড়বে।' স্বাভাবিকভাবে, অনুষ্ঠান যখন শেষ হয় ততক্ষণে ডজনখানেক বোতল আর গ্লাস ভাঙা হয়ে গেছে।২৬

নিশ্চিতভাবে জীবনানন্দ কখনোই খালাসিটোলার ভেতরটা দেখেননি। আরও নিশ্চিত যে রাতের পর রাত সেখানে মদও খাননি তিনি। জীবনানন্দ সারা জীবনে কখনো একটুও মদ খেয়েছিলেন কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে ওপরের খবরটি প্রমাণ করে যে তিনি সর্বস্তরের কবিদের বহু ও বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত করে গেছেন।২৭

মলয় রায়চৌধুরীর 'হাংরি' কবিতা থেকে 'জীবনানন্দ' শীর্ষক আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতাটি আরও বিনম্র, বাংলার বহু কবি আজ যা ভাবেন যে জীবনানন্দ মূলত বাংলার দৃশ্যপটের স্পষ্ট ও সদা অস্তিত্বশীল একটা অংশ—রূপকালংকারে তা দেখানো হয়েছে কবিতাটিতে :

> জীবননান্দকে মাঝে-মাঝে দেখি রাস্তায়।
> বলিষ্ঠ শরীর, আধময়লা পাঞ্জাবি, আধময়লা ধুতি
> হাঁটুর নিচ অবদি লেগে রয়েছে, পায়ে অস্পষ্ট স্যান্ডেল
> কি মোকাসিন, শুধু দু-চোখে তাঁর
> আমার ছেলেবেলার হারিয়ে-ফেলা সবুজ প্রিজম
> দু টুকরো হ'য়ে জ্বলছে।
> গ্রীন রোডের মাথায় দেখেছি একদিন,
> একদিন ষ্টেডিয়ামের দোতলায় বই-এর দোকানে
> ওঠার সময় সিঁড়িতে আমার পাশ দিয়ে দ্রুত নেমে গেলেন
> একদিন দেখি লেকের ধারে হেঁটে চলেছেন
> গভীর আত্মনিমগ্ন,
> আর একদিন মাছের গোল বাজারে চক্কর খেতে খেতে।
> উৎসুক হয়ে তাঁকে দেখতে-না-দেখতে
> ভিড়ের ভিতরে মিশে যান তিনি,
> জনশূন্যতার ভিতরে মিশে যান।
> শুধু একদিন পাশ দিয়ে যাবার সময়
> আমার দিকে এক-পলক উদাসীন তাকিয়ে
> যেন স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণে
> 'এতোদিন কোথায় ছিলেন?'
> ব'লে, কোনো জবাবের জন্যে দেরি না করে
> নির্মোহতার ভিতরে মিশে যান।
> একদিন সন্ধেবেলা দেখি তাঁকে
> ধরা-পড়া নক্ষত্রের মতো লজ্জিত
> দাঁড়িয়ে আছেন ঢাকার সবচেয়ে নির্জন মাঠের উপরে—
> আমি মাঠের পাশ দিয়ে রিকশায় যাচ্ছিলাম—
> দেখি তাঁর চুলে রাত্রি থেমে আছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চোখের সবুজ প্রিজমের ভিতর থেকে লাফিয়ে পড়ছে ফড়িং,
হেমন্তের শিশিরের সুঁই ঘিরে ধরেছে তাঁর পদযুগ
কোনো আদিম দেবতার কাছে নতজানু
ধূসর মানুষের মতো,
দেখি তাঁর ধুতি-পাঞ্জাবি কুয়াশার সুতোয় বোনা
দেখি তাঁর বিড়বিড় স্বগত-উচ্চারণ থেকে
বেরিয়ে আসছে সন্ধেবেলার সবগুলো তারা,
দেখি তাঁর পাঞ্জাবির ঢোলা পকেটে উঁকি দিচ্ছে চাঁদ।
তারপরেই জীবনানন্দ হাঁটতে শুরু করলেন
উদ্দেশ্যহীনের মতো কোনো একদিকে
আমার জীবন বেদনা থেকে দূরে—দূরতরে ॥[২৮]

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বহু সাময়িকী বের হয়, যেগুলোর নাম জীবনানন্দের সঙ্গে একটা সম্পর্ক নির্দেশ করে, যেমন 'ধানসিড়ি' জীবনানন্দের বেশ কয়েকটি কবিতায় ব্যবহৃত নদীর নাম, 'বিভিন্ন কোরাস' ও 'সিন্ধু সারস' জীবনানন্দের কবিতার নাম, 'বেলা অবেলা' জীবনানন্দের মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *বেলা অবেলা কালবেলার* খুব কাছাকাছি। জীবনানন্দের ওপর লেখা একটা বইয়ে এ রকম প্রায় ৩০টি নামের তালিকা আছে, যেগুলোর নাম জীবনানন্দ-সম্পর্কিত, এর মধ্যে একটা পাক্ষিকের নামই *জীবনানন্দ*।[২৯] এই ক্ষীণকায় প্রকাশনাটির সম্পাদক ব্যাখ্যা দেন, 'জীবন-আনন্দের আরেক নাম কবিতা।'[৩০] বাংলাদেশ থেকে ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে একটা ছোট পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বের হয়, *পরম্পরা*, এটিতে ছিল কেবল জীবনানন্দকে উৎসর্গীকৃত কবিতা ও তাঁর কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ। বহু লেখক জীবনানন্দের কবিতা থেকে নেওয়া চরিত্র, শব্দ ও পটভূমি নিয়ে সচেতনভাবে খেলা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বের হয় জীবনানন্দের সাহিত্য ও পাণ্ডিত্যের প্রতি সমর্পিত অনিয়মিত প্রকাশনা *জীবনানন্দ আকাদেমি পত্রিকা*।

সংবাদপত্রের 'সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠি' বিভাগে প্রস্তাব আসে যে কলকাতার একটা রাস্তার নাম জীবনানন্দের স্মরণে পরিবর্তন করে রাখা উচিত :

> ...আমরা দক্ষিণ কলকাতার সাদার্ন এভিন্যুকে 'জীবনানন্দ এভিন্যু' করার পক্ষপাতী। বিগত তিনটি দশকের সবচেয়ে প্রতাপান্বিত কবির ঐ ধরণের কোনও স্মারক কলকাতা শহরে আমরা এখনও করে উঠতে পারিনি,...সাদার্ন এভিন্যু এবং তৎসংলগ্ন রবীন্দ্র সরোবরের সাথে জীবনানন্দের যোগসূত্র আবিষ্কার করা কঠিন নয়।[৩১]

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় প্রত্যেক বাঙালি সমালোচক কোনো না কোনোভাবে জীবনানন্দকে রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবি বলে স্বীকার করেছেন। বাণী রায় জীবনানন্দকে 'আধুনিক কবিতার জনক'[৩২] বলে উল্লেখ করেন, 'আধুনিক কবিতা' বলতে সংজ্ঞায়িত করা হয় সেই সব বাংলা কবিতাকে, যেগুলো দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে লেখা হয়েছে।[৩৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আগে যেমনটি বলা হয়েছে, টি এস এলিয়ট কবিদের ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছিলেন :

> কথোপকথনের সঙ্গে কবিতার নৈকট্য এমন কোনো বিষয় নয় যে তার ওপর আমরা সঠিক কোনো আইন আরোপ করতে পারি। কবিতার প্রতিটি বিপ্লব সংগতভাবে কখনো প্রচারমাফিক সাধারণ কথ্য ভাষায় প্রত্যাবর্তন।...একটা বিপ্লবের অনুসারীরা যেকোনো একমুখো নতুন বাগ্‌বিধি সৃষ্টি করেন; সেসব তাঁরা ঘষেমেজে নিখুঁত করে তোলেন। এর মধ্যে কথ্য ভাষা পরিবর্তিত হতে থাকে, এবং কাব্যিক বাগ্‌বিধি পুরোনো হয়ে যায়।[৩৪]

কবিরা যে ভাষা ব্যবহার করেন কবিতায় বাংলা আধুনিকতা বোঝার জন্য আমরা তার দিকে দৃষ্টি দিই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, কবিতার এ বিষয়টি অনুবাদে খুব কম দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। বুদ্ধদেব বসু আগে জীবনানন্দকে চরিত্রায়িত করেছিলেন এভাবে, 'তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি আলাদা ভাষা তৈরি করে দিতে পেরেছেন।' জীবনানন্দের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিনি লিখেছেন :

> এ-কথা সত্য যে গম্ভীর ভাবের কবিতায় দেশজ ও বিদেশী শব্দের এমন স্বচ্ছন্দ, সংগত ও প্রচুর ব্যবহার জীবনানন্দের আগে অন্য কোনো বাঙালি কবি করেননি।...এই উদাহরণ [জীবনানন্দর কবিতা থেকে] আমাদেরও রচনার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিলো।[৩৫]

বুদ্ধদেবের আগের ও পরের মন্তব্য থেকে দেখা যায় যে তিনি জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে কথোপকথনের নৈকট্য কিংবা সাধারণ বাকপ্রণালিতে ফেরার বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ করেননি। দীপ্তি ত্রিপাঠী এটাকে কিছুটা ভিন্নভাবে দেখেন :

> বলা বাহুল্য, আধুনিক কবিদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মুখের ভাষা এবং কাব্যের ভাষার ব্যবধান বিলোপ। মৌখিক ভাষার ইডিয়ম অর্থাৎ বিশিষ্ট দেশজ রীতি ব্যবহারে কবিতাকে স্বাভাবিক ও সহজ ক'রে তোলবার প্রচেষ্টা তাঁরা সকলেই করেছেন। তবে জীবনানন্দের মতো এমন স্বচ্ছন্দ ও প্রচুর ব্যবহার আর কেউই করতে পারেননি।[৩৬]

যদিও দীপ্তি ত্রিপাঠীর মন্তব্য বুদ্ধদেবের পর্যবেক্ষণের কিছুটা পুনরুক্তি। তিনি মুখের ভাষাকে কবিতায় ব্যবহারে জীবনানন্দের সাফল্যকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। এটার অবশ্য সীমাবদ্ধতা আছে। কারণ, বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছিলেন যে জীবনানন্দ তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য একটা আলাদা ভাষা তৈরি করেছেন।

অম্বুজ বসু লেখেন, 'জীবনানন্দের কবিতার ভাষা বাংলার সার্বজনীন কবি-ভাষা তো নয়ই, এমনকি তাঁর নিজের মুখের ভাষাও নয়।'[৩৭] শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় জীবনানন্দ সম্পর্কে বলেন, তিনি 'সাধু এবং কথ্যভাষা মিশিয়ে অনেক কবিতাকে ইচ্ছে করে অস্বস্তিকর তৈরী করেছেন।' তারপর তিনি একটু বাঁকা সুরে বলেন, 'অবশ্য আমাদের সৌজন্য—পড়তে পড়তে মানিয়ে নিয়েছি, মন্দ লাগেনি, হয়ত কবির অন্যতম বৈশিষ্ট্যের মত মনে হচ্ছে এখন।' তিনি আরও বলেন :

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> সাধু ও কথ্য ভাষার মেশামেশি হয়ে লাইনটি শুনতে খারাপ লাগছে কি? পাঠকের কাছে এই রকম সুবিধে তিনি একাই নিতে পেরেছেন, পরবর্তিকালে কোনো কোনো কবি চেষ্টা করেননি এমন নয়, তবে পাঠক তাঁদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি। জীবনানন্দ ছন্দপতন ঘটিয়েছেন অনেক জায়গায়, 'ছড়াতেছে' জাতীয় অপ্রচলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন, 'ভাঁড়,' 'গুণচট,' 'হাইড্রান্ট,' 'বেফাঁস' প্রভৃতি শব্দের ধাতব ধ্বনি আমদানী করেছেন অভিভূত পাঠককে বিরক্ত করার জন্যে—তিনি নিষ্ঠুরের মতো অত্যাচার চালিয়ে গেছেন পাঠকের ওপর!...হঠাৎ চমকে জেগে উঠে দেখছি তিনি অন্তর্হিত, তাঁর অমোঘ কবিতাগুলি দীর্ঘকাল আমাদের জর্জরিত করার জন্য বসে রয়েছে।[৩৮]

আমরা ওপরে লক্ষ করি, এ-জাতীয় ভাষা নিয়ে সজনীকান্তের মতো পাঠকেরা কতখানি ক্ষিপ্ত ছিলেন।

তবে জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বড় কবির পাশে স্থান পাবেন শুধু এই কারণে নয় যে তিনি ইচ্ছে না করেও এমনি বাংলা কবিতায় একটা বিপ্লব করে ফেলেছেন, যেখানে কবির অভিধানকে এক নতুন ধরনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। এমনকি বাংলা পড়তে না পারলেও 'হাংরি'দের সঙ্গে কথা বলার সময় জীবনানন্দের অবদান ধরতে পেরেছেন অ্যালেন গিন্সবার্গ: 'তিক্ততা, আত্ম-অবিশ্বাস, যৌনতা, রাস্তার ভাষা, ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি, অকপটতা, কলকাতার ভিখিরির দল।' গিন্সবার্গ স্বয়ং ও ডিলান টমাস যেমন আধুনিক ইংরেজি কবিতায় টি এস এলিয়টের কাছ থেকে আবার আলাদা হয়ে দাঁড়ান, একইভাবে বলা যায় জীবনানন্দও খুব সম্ভব বাংলায় একা আবার রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে দাঁড়ান।

নিজের মতো করে ভাষার শক্তিশালী ব্যবহার, তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্প, নিজস্ব আবিষ্কারের সাহসী প্রকাশ, বিশ্লেষণাতীত সংশয় ও নিরাপত্তাহীনতা—এই ছিল জীবনানন্দের কবিতার উপাদান ও তাঁর মহত্ত্ব। সতীর্থ কবিরা ও অনুসারীরা জীবনানন্দের শিল্পের দীর্ঘস্থায়ী মূল্যের প্রমাণ দিতে গিয়ে তাঁর অভিনব ও অভূতপূর্ব ভাষার ব্যবহার ও গ্রামনির্ভর কবিতাগুলোর যে চমৎকার গুণের কথা বলেন, তা মূলত তাঁর একাকিত্ব ও হতাশা এবং প্রকৃতির মধ্যে অণুর মতো তাঁর নিমগ্নতা; এটিই বাংলাভাষী জগতের সীমানার বাইরের মানুষের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে তাঁর জীবনানন্দত্ব। তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতা*র ভূমিকায় তিনি যেমন লিখেছেন, 'কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুইই শেষপর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার।' ভাষার বাধা সত্ত্বেও জীবনানন্দের কবিতার এমন ক্ষমতা রয়েছে, যা আমাদের সবাইকে বুঝিয়ে দিতে পারে, সূক্ষ্মভাবে জড়িত আবেগমথিত কল্পনাশক্তি কেমন জিনিস। যাঁর এমন কল্পনাশক্তি, তিনি সাধারণ মানুষ, আবার অসাধারণ কবি, এবং সাধারণ কবিদের চেয়ে পৃথকও বটে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তথ্যসূত্র

১. রবিবাসরীয় *আনন্দবাজার পত্রিকা* অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তখনকার বেশির ভাগ উল্লেখযোগ্য কবির সমাগম নিয়ে স্টাফ রিপোর্টারের একটা খবর ছেপেছিল, এতে জীবনানন্দের জীবনীভিত্তিক কিছু তথ্যও সংযোজিত হয়েছিল। *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২৪ অক্টোবর ১৯৫৪, ৫।

২. 'কবি জীবনানন্দ', *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৩১ অক্টোবর, ১৯৫৪, ৯। পরের সপ্তাহে তাঁর বন্ধু এবং একসময়কার *স্বরাজ* পত্রিকার সহকর্মীর লেখা একটা নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল; দ্রষ্টব্য, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'জীবনানন্দের কবিতা', *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৬ নভেম্বর ১৯৫৪, ৮।

৩. জীবনানন্দ দাশ, *সুদর্শনা,* গোপালচন্দ্র রায় সম্পাদিত (কলকাতা : সাহিত্য সদন, ১৯৭৩), ২৫; *আনন্দবাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত, ৩১ অক্টোবর, ১৯৫৪।

৪. *টাইমস অব ইন্ডিয়া* (বম্বে), ১ নভেম্বর, ১৯৫৪, ৬।

৫. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২৮ অক্টোবর, ১৯৫৪, ২।

৬. একটি নোটবইয়ের তারিখ ছিল নভেম্বর ১৯৫১-জানুয়ারি ১৯৫২ এবং আরেকটির তারিখ ছিল মে-জুন, ১৯৫৪।

৭. *শনিবারের চিঠি,* কার্তিক, ১৩৬১, ১০১-২।

৮. প্রাগুক্ত, ১০৩-৭।

৯. বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৬৮ : সাহিত্য আকাদেমি, চতুর্থ প্রচ্ছদ।

১০. প্রাগুক্ত, ৩৮। *ময়ূখ*-এর সম্পাদকীয় কর্মীদের কাছ থেকে আমাদের জানানো হয়, জীবনানন্দকে প্রথম পুরস্কার দেওয়ার বিরুদ্ধে কিছুটা বিরোধিতা হয়েছিল। দ্রষ্টব্য, *ময়ূখ,* পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১-৬২, ২৬৮-৬৯।

১১. মণীন্দ্র রায়, 'কবি জীবনানন্দ দাশ', *পরিচয়,* শ্রাবণ ১৩৬২, ১-১১।

১২. *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* ভূমিকা।

১৩. মণীন্দ্র রায়ের লেখাটি দেবকুমার বসুর *জীবনানন্দ স্মৃতি*-তে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। 'প্রায় এক বছর আগে' বাক্যাংশটির পরিবর্তে 'প্রায় সতেরো বছর আগে'—এই ছোট পরিবর্তনটি ছাড়া আমার মতে দুটো লেখাই অভিন্ন। প্রাগুক্ত, ১২১-২২।

১৪. প্রাগুক্ত, ১২৩-২৭।

১৫. প্রাগুক্ত, ১২৭।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৬. প্রাগুক্ত, ১৩০।

১৭. মণীন্দ্র রায়ের সাক্ষাৎকার।

১৮. আবু সয়ীদ আইয়ুবের সাক্ষাৎকার।

১৯. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার।

২০. বাণী রায়, 'নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ', *ময়ূখ*, পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১-৬২, ১৬৪।

২১. প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*-এর 'পঞ্চম দশক', দাশগুপ্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১০৮।

২২. শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, 'জীবনানন্দের প্রভাব', *দৈনিক কবিতা*, ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ৪।

২৩. *পত্রাণু*, চৈত্র ১৩৭৬, ৬।

২৪. শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত ও সুদেষ্ণা চক্রবর্তী সম্পাদিত ও অনূদিত: *বেঙ্গলি পোয়েমস অন ক্যালকাটা* (কলকাতা : রাইটার্স ওয়ার্কশপ, ১৯৭২), ১২১-২২।

২৫. *সল্টেড ফেদারস*, মার্চ, ১৯৬৭ (ডিক বাকেন ও লি অল্টম্যান কর্তৃক পোর্টল্যান্ড, অরেগন থেকে প্রকাশিত)। মলয় রায়চৌধুরী তাঁর কবিতা 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-এর জন্য ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরের শেষে ভারতীয় পেনাল কোডের ২৯২ ধারা (অশ্লীলতা আইন) লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, এতে তাঁর এক মাসের কারাবাস অথবা ২০০ রুপি জরিমানা হয়েছিল।

২৬. *স্টেটসম্যান* (কলকাতা), ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮, ১০।

২৭. যাঁরা হাংরি জেনারেশনের কবি এবং জীবনানন্দ ও তাঁর কবিতা সম্পর্কে তাঁদের কিছুটা একচোখা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য দ্রষ্টব্য, *সিটি লাইটস জার্নাল*, সংখ্যা ১, ২ ও ৩ (সানফ্রান্সিসকো : সিটি লাইটস বুকস, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫)।

২৮. আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত *জীবনানন্দ* (ঢাকা : চারিত্র, ১৯৮৪), ৭১-৭২।

২৯. সন্দীপ দত্ত, *জীবনানন্দ প্রাসঙ্গিকী*, ১৭৩।

৩০. *জীবনানন্দ*, বৈশাখ ১৩৭৭।

৩১. জীবনানন্দ সাদার্ন এভিনিউ ও রবীন্দ্র সরোবরের পার্কের মধ্যে হাঁটতেন। চিঠিটি ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ তারিখের *আনন্দবাজার পত্রিকায়* লিখেছিলেন শোভন মিত্র, রাজা চট্টোপাধ্যায় ও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩২. বাণী রায়, 'মডার্ন ট্রেন্ড ইন বেঙ্গলি লিটারেচার', *সেমিনার অব অল ইন্ডিয়া উওমেন রাইটার্স : স্যুভেনির*, এবং বাণী রায়, 'আ সার্ভে অব বেঙ্গলি পোয়েট্রি' (নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, শ্রীনগরে [১৯৬৯/১৯৭০] প্রদত্ত বক্তৃতার নির্বাচিত অংশ)।

৩৩. দ্রষ্টব্য, বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা : বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ', *চতুরঙ্গ*, আশ্বিন, ১৩৫৭, ২৯।

৩৪. টি এস এলিয়ট, *দ্য মিউজিক অব পোয়েট্রি*, ১১১-১২।

৩৫. বুদ্ধদেব বসু, 'জীবনানন্দ দাশ', *কবিতা*, পৌষ ১৩৬১, ৬৯-৭০।

৩৬. দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*, ২০৩।

৩৭. অম্বুজ বসু, *একটি নক্ষত্র আসে*, ১১১।

৩৮. শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, 'জীবনানন্দের প্রভাব', ৪।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্ঘণ্ট

অক্সফোর্ড মিশন : কলকাতায় জীবনানন্দের আবাস, ৩২
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ৫৬; এবং কবি সম্মেলন, ৩১৮; জীবনানন্দের চিঠি, ৩০৪; জীবনানন্দের চরিত্রচিত্রণ, ২২৯; তাঁর সম্পর্কে জীবনানন্দ, ৫৬; এবং *নিরুক্ত*, ১৭৬; এবং বিচিত্রা ভবন সম্মেলন, ৭২; এবং *মহাকাল*, ৮২, ৮৩; সিটি কলেজ থেকে জীবনানন্দের চাকরিচ্যুতি, ৮৭
অজিত দত্ত : *আধুনিক বাংলা কবিতায়*, ৩১৯; এবং কবি সম্মেলন, ৩১৮; জীবনানন্দ স্মরণে, ৩২৯; জীবনানন্দকে নিয়ে প্রবন্ধ, ৩২৮; জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাস প্রসঙ্গে, ২৪৭; জীবনানন্দের বিয়েতে যোগদান, ৯১; *প্রগতি*তে জীবনানন্দের কবিতা প্রসঙ্গে, ৫৭
অতুল গুপ্ত : ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ২০২
অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : *ধূসর পাণ্ডুলিপির* প্রচ্ছদকার, ১৩৪
'অন্ধকার' : জীবনানন্দের মন্তব্য, ২৯০, ২৯৩
অন্নদাশঙ্কর রায় : এবং কবি সম্মেলন, ৩১৭
অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় : *নির্ণয়*-এর সম্পাদক, ৩০৩
অমিয় চক্রবর্তী : *আধুনিক বাংলা কবিতা*, ৩১৯; নবীন লেখকদের অনুপ্রেরণা, ৩৩৪; নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন পুরস্কার, ৩১৫; ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ২০২; সোমেন চন্দ হত্যার প্রতিবাদ, ২০৩
অমৃতলাল গুপ্ত : লাবণ্য দাশের অভিভাবক জ্যাঠামশাই, ৯০, ৯১
অম্বুজ বসু : জীবনানন্দের কবিতা প্রসঙ্গে, ১৮৫, ১৮৬, ৩৩৯
অম্লান দত্ত : জীবনানন্দের চিঠি, ৩০৩
অরুণকুমার সরকার : 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' সম্পর্কে, ১৮৩; নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন পুরস্কার, ৩১৫
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : জীবনানন্দের প্রভাব সম্পর্কে, ৩৩৩
অশোকবিজয় রাহা : এবং কবি সম্মেলন, ৩১৭
অশোক মিত্র : সম্ভ্রান্ত সাহিত্যিক মহলে জীবনানন্দের অগ্রহণযোগ্যতা, ১২০; *সাতটি তারার তিমির*-এর আলোচনা, ২৮৯
অশোকানন্দ দাশ : ঠাকুরমা সম্পর্কে, ২২; জীবনানন্দের উপন্যাস প্রকাশনা প্রসঙ্গে, ২৪৬; জীবনানন্দের দিল্লি ভ্রমণ প্রসঙ্গে, ৩১০; জীবনানন্দের মরণোত্তর বইয়ের নামকরণ, ২৫৯; জীবনানন্দের সঙ্গে একই বাসায় থাকা, ২৪৩; 'দেশবন্ধু প্রয়াণে' সম্পর্কে, ৫১; *ধূসর পাণ্ডুলিপির* দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, ১৩৫; বরিশালের শিকারি মুনিরুদ্দীন সম্পর্কে, ১২৪; *রূপসী বাংলা* প্রসঙ্গে, ১০৭, ১১৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অশ্বিনীকুমার দত্ত : উচ্চ নৈতিকতাবোধ, ৮৮; এবং জাতীয় শিক্ষা, ২৮; বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলন, ২৮, ২৯; এবং বিএম ইনস্টিটিউশন, ২৪, ৩১; সরকারের সঙ্গে বিরোধ, ২৭;
অশ্রুকণা সান্যাল, ১৫৩
অশ্লীলতা : এবং জীবনানন্দ দাশের 'ক্যাম্পে', ৮৭, ১২৭; এবং জীবনানন্দের চাকরিচ্যুতি, ৮৭; এবং সজনীকান্ত দাস, ৬৪, ৬৫, ৮২

'আট বছর আগের একদিন', ১৬৪-৬৫, ১৬৭; এবং বুদ্ধ, ১৫৯-৬০; *মহাপৃথিবীর* অন্তর্ভুক্ত, ২২৩
আতাউর রহমান, ৩১১; *সাতটি তারার তিমির*-এর প্রকাশনা, ২৮১
আধুনিক বাংলা কবিতা, ১৪৭, ৩১৮; রবীন্দ্রনাথের *বাংলা কাব্য পরিচয়*-এর বিপরীতে প্রকাশিত, ৩১৯
আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত : জীবনানন্দের চিঠি, ৩০০; এবং *দ্বন্দ্ব*, ২৯৯; সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্রের সাংগঠনিক সম্পাদক, ২৯৯
আনন্দমঠ, ৫৯
আবদুল মান্নান সৈয়দ : কবিতা 'জীবনানন্দ', ৩৩৭
আবুল হোসেন : *বনলতা সেন*-এর আলোচনা, ২১৩
আবু সয়ীদ আইয়ুব : *আধুনিক বাংলা কবিতার* যৌথ সম্পাদনা, ৩১৮; এবং কবি সম্মেলন, ৩১৭; *দ্বন্দ্ব* পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক, ২৯৮; এবং পরিচয়, ২৯৮; ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ২৯৩; এবং বনলতা সেন, ১৮৫; বামপন্থী সাহিত্য প্রসঙ্গে, ১৭৫; সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্রের ঘোষণাপত্র, ২৯৯; সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্রের সভাপতিত্ব, ২৯৯
'আমার সোনার বাংলা' : বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত, ১৭, ৪১, ৫৯, ৯২

আলোক সরকার : নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন, ৩১৫; *রূপসী বাংলার* সমালোচনা, ১১৭
অ্যান একর্ অব গ্রিন গ্রাস : রাজনৈতিক কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা, ২৯৫
অ্যানি বেসান্ট, ৮৬
অ্যালেন গিন্সবার্গ : জীবনানন্দ সম্পর্কে, ৩৪০

ইংরেজি : জীবনানন্দের কবিতার ভাষা, ১৮৬; বাংলার ওপর প্রভাব, ৪০; শিক্ষার মাধ্যম, ৩৯-৪১
ইমেজিস্ট ম্যানিফেস্টো, ১৪৭

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী : *মুকুল* পত্রিকায় লেখা, ২৫

এইচ কে মজুমদার : কলকাতায় জীবনানন্দের বাসায় সাবলেট, ২৪৫
এক পয়সায় একটি : কবিতা গ্রন্থমালা, ২০০; আরও দেখুন *বনলতা সেন*
এজরা পাউন্ড : এবং ইমেজিস্ট ম্যানিফেস্টো, ১৪৭; এবং রবীন্দ্রনাথ, ৪২

কঙ্কাবতী: বুদ্ধদেব বসুর কাব্যগ্রন্থ জীবনানন্দের আলোচনা, ১২৯; লোককথার চরিত্র, ১৩২
কথ্য, ৭৯, ৯৯; কাব্যিক শব্দপ্রয়োগ, ৩৩৯
কবিতা, ৮৩; গদ্যকবিতার ওপর সম্পাদকীয়, ১৪৬-৪৭; জীবনানন্দের প্রতিক্রিয়া, ১৩৯; এবং *নিরুক্ত*, ২০৪; বিশেষ জীবনানন্দ সংখ্যা, ১২১; বুদ্ধদেব বসুর বর্ণনা, ১২৯, ১৩১
কবিতা ভবন : বুদ্ধদেব বসুর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, ৩১২
কবিতার ভাষা : এবং জীবনানন্দ, ৩৩৯; এবং টি এস এলিয়ট, ৩৩৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : জীবনানন্দের আবাস, ৫৬
কল্লোল: জীবনানন্দের 'নীলিমা' প্রকাশ, ৫৪, প্রকাশনা বন্ধ, ৮৩; সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ৮৩; ৫৬
কল্লোল যুগ, ৫৬, ৬১, ৬২, ৮১; এবং অচিন্ত্যকুমার, ৮৭
কাজী আবদুল মান্নান : এবং জীবনানন্দের 'উত্তরপ্রবেশ' ২৮৭
কাজী নজরুল ইসলাম : *আধুনিক বাংলা কবিতা*, ৩১৮-১৯; এবং 'কামাল পাশা', ৫৩; জীবনানন্দের ওপর প্রভাব, ৫১; এবং 'বিদ্রোহী' ৫১; রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, ৫১; *শনিবারের চিঠি*র আক্রমণ, ৫৭
কামাল আতাতুর্ক, ৫৩
কালি কলম: ১৯২০-এর দশকের অগ্রণী সাময়িকী, ৫৬, ৮৩; এবং কল্লোল, ৫৭
কালিদাস, ১৮
কালীপ্রসন্ন সিংহ : *মার্ক্সবাদী*র কাছে প্রগতিশীল, ২৯৭
কিং লিয়ার, ১২৭
কিটস : জীবনানন্দের ওপর প্রভাব, ১৩৭
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : এবং কলকাতায় জীবনানন্দের আবাসন সমস্যা, ৩০৭; জীবনানন্দের লেখা *স্বপ্ন কামনা*র ভূমিকা, ১৩১; এবং *প্রতিরোধ*, ২০৩
কীর্তিনাশা, ২১, ২২, ১১৩, ২৯১
কুসুমকুমারী দাশ, ২১, ২৪; 'আদর্শ ছেলে', ২৫; পুত্রের প্রতি উপদেশ, ৫২; পুত্রের জীবন রক্ষা, ২৭; প্রকাশনা, ৩৩; এবং *প্রবাসী*, ২৬; এবং *ব্রহ্মবাদী*, ২৬
কুসুমকুমারী রায়চৌধুরী : সম্ভবত প্রথম বাঙালি মহিলা ঔপন্যাসিক, ১৪১
কৃষ্ণ ধর, *হাইকু ধরনে*, ৩৩৪
'ক্যাম্পে' : এবং কৃষ্ণ ধরের কবিতা, ৩৩৪; জীবনানন্দের আত্মপক্ষ সমর্থন, ১২৭; পরবর্তীকালের কবিতার সঙ্গে তুলনা, ২১৭; এবং পরিচয়, ৮৯; প্রকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১২০, ১২২, ১৩৮; সজনীকান্ত দাসের সমালোচনা, ১২৭

খড়্গপুর কলেজ : শিক্ষকমণ্ডলীতে জীবনানন্দ, ৩০৬
খেলাফত, ৫৩

গদ্যকবিতা, ১৪৬-৪৭; এবং রবীন্দ্রনাথ, ১৪৭; সজনীকান্তের উপহাস, ৬১
গদ্যছন্দ : দেখুন ছন্দ
গীতাঞ্জলি, ৪২; এবং নোবেল পুরস্কার, ৪২
গুরুচণ্ডালী দোষ, ৬৩
গুরুদেব, ৪২, ৭২
গোকুলচন্দ্র নাগ : *কল্লোল*-এর সহ-সম্পাদক, ৫৪
'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' : বিভিন্নজনের আলোচনা, ১৮৩
গোপালচন্দ্র রায় : এবং হাওড়া গার্লস কলেজে জীবনানন্দের চাকরি, ৩০৯-১০
গোপাল ভৌমিক : এবং জীবনানন্দ স্মরণে, ৩২৯
গোপাল হালদার : *পরিচয়*-এর যুগ্ম সম্পাদক, ২৯৬

ঘাইহরিণী, শব্দার্থ সম্পর্কে, ১২০

চণ্ডীদাস, ৩৫, ১১৩
চণ্ডীমঙ্গল : জীবনানন্দের কবিতায় পরোক্ষ উল্লেখ, ৩৭, ১১৩
চতুরঙ্গ, ২৯৮; এবং *নিরুক্ত*র আত্মপ্রকাশ, ২২৭; *বনলতা সেন*-এর আলোচনা, ২১৩; এবং হুমায়ুন কবির, ৩১১
চর্যাপদ, ৩৪
চিত্তরঞ্জন দাশ : জীবনানন্দের কবিতা রচনা, ২৮, ১১৩; মৃত্যুতে জীবনানন্দের প্রতিক্রিয়া, ৫০
চিত্রকল্প : ঐতিহাসিক—ভৌগোলিক, ১৪৪; মধ্যপ্রাচ্যীয়, ১৪৩-৪৫, ১৫১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছন্দ : অমিত্রাক্ষর, ২৯৭; গদ্যছন্দ, ১৪৭, ১৯০; পয়ার, ১০৮, ১৪৩; মাত্রাবৃত্ত, ১৯৬; আরও দেখুন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জগদীশ ভট্টাচার্য, ২০১
জগদীশ মুখোপাধ্যায় : বিএম ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক, ৩০, ৩১ জীবনানন্দের ওপর প্রভাব, ৩১
জর্জ অরওয়েল, ৫৪
জাতীয় শিক্ষা, ২৮, ৩১; এবং বিএম ইনস্টিটিউশন, ২৯, ৩১
জাবেজ টি স্যান্ডারল্যান্ড : তাঁর বই *ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজ*, ৮২
জালিয়ানওয়ালাবাগ : হত্যাকাণ্ড, ২৮
জীবনস্মৃতি : জীবনানন্দের অপ্রকাশিত (সম্ভবত অলিখিত) আত্মজীবনী, ২৪৭, ৩০৫
জীবনানন্দ দাশ : আত্মজীবনী (অপ্রকাশিত), ২৪৭, ৩০৫; 'আধুনিক কবিতার জনক' খ্যাতি, ৩৪৮; *আধুনিক বাংলা কবিতা*, ১৪৭, ৩১৮-১৯; কন্যার কাছে লেখা চিঠি, ২৪৪; এবং কবি সম্মেলন, ৩১৭-১৮; কবিতা ও জীবন সম্পর্কে, ১৩১-৩২; কমিউনিস্ট দর্শনের অনমনীয় চরিত্রে বিরক্তি, ২৯৯; কলকাতায় আবাসন সমস্যা, ২৪৪-৪৫; কাব্যিক অনুপ্রেরণা, ৭৭, ৭৮; চাকরি, ২৪৫, ২৬১, ২৬৭; জন্ম, ২১; তরুণ লেখকদের ওপর প্রভাব, ৩৩৩-৩৪; এবং তাঁর মা, ২৬, ৩৩, ৩৪; তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ১৮০, ২২৮-২৯; তাঁর শব্দচয়ন, ৮০, ৮১, ৩৩৯-৪০; দুর্বোধ্য কবিতা, ১৮০-৮১; *দ্বন্দ্ব* পত্রিকার সহসম্পাদক, ২৯৮; নিজের কবিতা বিষয়ে মন্তব্য, ৫৭, ১১৭, ১২৭, ২২৯, ৩৩১; 'নির্জনতম কবি', ২২৯, ৩১৬; পারিবারিক পটভূমি, ২১-৩১; পুরস্কারপ্রাপ্তি, ৩১৫, ৩৩১; 'প্রকৃতির কবি', ১৩৭; এবং বিরোধাভাস, ২৮২, ২৮৬-৮৮; এবং ব্রাহ্মসমাজ, ৪৯, ২২৮; মৃত্যু, ৩১৯-২০; মৃত্যুচিন্তা, ১৩২-৩৩, ১৬১, ১৬৩, ১৬৭; লাবণ্য দাশের সঙ্গে দেখা, ৯১; শিক্ষা, ২৭, ৩১, ৩২; সমকালীন লেখককেন্দ্র, ৩০০, ৩০১, ৩০৩; স্মারক প্রকাশনা, ৩২৯, ৩৩১
জীবনানন্দ দাশ : (কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ) : 'অনুভব', ২০৩; 'অন্ধকার', ২৯১; 'আকাশলীনা', ২৮৩; 'আজ', ৩০৩; 'আট বছর আগের একদিন', ১৫৬; 'আবছায়া' ১৯৫; আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে, ১১২; আমি যতই নতুন কবিতা আবিষ্কার করি না কেন, ১১৮; 'আমি যদি হতাম', ২৫৭; 'আলোসাগরের গান', ২১১; '১৯৪৬-৪৭', ২৩০; এই ডাঙা ছেড়ে হায়, ১১১; এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে, ১১০; এই শুধু সান্ত্বনা, ১৮০; একদিন পৃথিবীর পথে আমি ফলিয়াছি, ১৪৯; একদিন কুয়াশার এই মাঠে, ১৬৫; এখানে প্রাণের স্রোত আসে যায়, ১৬৬; এসব কবিতা আমি যখন লিখেছি বসে, ১৫৫; 'কমলালেবু', ৬৯; 'ক্যাম্পে', ১২২; 'খেতে প্রান্তরে', ১৯৭; 'গতিবিধি', ১৭৮; 'গরিমা', ১৯২; 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য', ১৮১; 'ঘাস', ১৫৩, ১৯৪; ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন, ১১৬; তোমার বুকের থেকে একদিন চলে যাবে, ১১৪; 'দুর্দিন', ২০১; 'নগ্ন নির্জন হাত', ১৪৭; 'নদীরা', ১৩৬; 'নাবিক', ২৮৪; 'নির্দেশ', ১৭৯; 'নিরীহ, ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান', ২১৩; 'নীলিমা', ৫৪; 'পথ হাঁটা', ৩১৪; 'পাখি', ১৬৪; 'পিপাসার গান', ৬৫; 'প্রার্থনা', ২২৪; 'ফুটপাতে', ২২৬, ৩২০; 'বনলতা সেন', ১৪০; 'বর্ষ আবাহন', ৩৩; 'বলিল অশ্বত্থ সেই', ১৬০; 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি', ৩৭; 'বিভিন্ন কোরাস', ২০৪, ২০৭; 'বুনো হাঁস', ২৫৭; 'বৈতরণী, ১৩৫;

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'বোধ', ৭৪; 'ভিখিরি', ১৮৬; ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ-দুপুর, ১৫৬; 'মুহূর্ত', ২২৫; 'মৃত্যুর আগে', ১২৯; যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে, ১১৫; 'রবীন্দ্রনাথ', ১৯০; 'রাত্রি', ১৮৭, ১৮৮; 'রিস্টওয়াচ', ২৮৩; 'শকুন', ১৩৪; 'শঙ্খমালা', ১৫৪; 'শিকার', ১৫০; 'স্বভাব', ২০০; 'সুদর্শনা', ৩১২; 'সুন্দরবনের গল্প', ১৫১; 'সেদিন এ ধরণীর', ৫৯; 'হাওয়ার রাত', ১৪৫; 'হাজার বছর শুধু খেলা করে', ১৪৩; 'হায় চিল' ১৫৫; হায় পাখি, একদিন কালীদহে ছিলে নাকি, ১১৩; I have felt the breath of autumn wind, ১০৮

—কবিতার উদ্ধৃতি ও উল্লেখ : 'অনুসূর্যের গান', ২৮৭; 'অবসরের গান', ৮৩; 'আকাশলীনা', ১৫৩, ২৮৬; 'আট বছর আগের একদিন', ১১৭, ১৫৯-১৬১, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ২২৩, ২২৫, ৩৩৩; 'আবছায়া', ১৫, ১৯৫; আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে, ৭০, ১৫৯; 'আশা ভরসা', ৩০২; 'উত্তরপ্রবেশ', ২৮৭; '১৯৪৬-৪৭', ২৫৪; 'এই কি সিন্ধুর হাওয়া', ১৫, ২৮৯; 'ঘাস', ৭০, ১৫৯, ১৯৩, ১৯৪; তবু তাহা ভুল জানি—রাজবল্লভের কীর্তি ভাঙে কীর্তিনাশা, ২২; 'তিমিরহননের গান', ২৮৭; '১৩৩৩', ১০০; 'দীপ্তি', ২৮৭; 'দেশবন্ধু প্রয়াণে', ৫০, ৫১; 'নগ্ন নির্জন হাত', ১৪, ১৪৯, ১৮৭, ৩৩৪; 'নাবিকী', ২৮৪, ২৮৫, ২৮৭; 'পথ হাঁটা', ২৫৮; 'পাখিরা', ৮০; 'পিরামিড', ৫৮; 'ফুটপাতে', ৩২০; 'বনলতা সেন', ১৪, ১১৭, ১১৮, ১৩৯, ১৪১-১৪৫, ১৪৮ 'বর্ষ আবাহন', ৩৩, ১০৯; 'বিভিন্ন কোরাস', ২১১, ২১২, ২২৩, ৩৩৮; 'বুনো হাঁস', ১৫৩, ২৫৭; 'বৈতরণী', ১৩৫; 'বোধ', ৭৭-৭৯, ১১৭, ১৬৩, ১৯৩, ৩৩৩; 'মকরসংক্রান্তির রাতে', ২৮৭, ২৯০; 'মন-মর্মর', ২৪২; 'রবীন্দ্রনাথ', ১৯০-৯১; 'রাত্রির কোরাস', ২৮৮; 'রিস্টওয়াচ', ২৮৭; 'শিকার', ১২৪, ২৫৮; 'শ্যামলী', ৩১৩; 'সপ্তক', ২৮৬; 'সবিতা', ৩১৩; 'সময়ের কাছে', ২৮৮; 'সুচেতনা', ৩১৩; 'সুন্দরবনের গল্প', ২৫৬; 'সুরঞ্জনা', ৩১৩; 'সূর্যকরোজ্জ্বল', ২৮৭; 'সূর্যতামসী', ২৮৭; 'সূর্যপ্রতিম', ২৮৭; 'সৃষ্টির তীরে', ২৮৬; 'সে', ১২১; 'হরিণেরা', ১৫৩; 'হায় চিল', ১৫৫-৫৬; 'হিন্দু মুসলমান', ৫৩

—গল্প-উপন্যাস : 'গ্রাম ও শহরের গল্প', ১০৩-১০৫; 'ছায়ানট', ১০১-১০৩; *জলপাইহাটি*, ২৪১, ২৪৬, ২৫৯-৭৬; 'বিলাস', ২৪৩; *মাল্যবান*, ২৪৮-৫০; 'সঙ্গ, নিঃসঙ্গ', ১০৫-১০৭; *সুতীর্থ*, ২৫১-৫৯

—প্রবন্ধ : 'আধুনিক কবিতা', ৩০২; 'কবিতার কথা', ৭৮, ১২৯-৩১, ১৯১-৯২, ২২১-২২, ২২৭; *বেঙ্গলি পোয়েট্রি টুডে*, ২৯৯; 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', ১৯১-৯২, ২২১; 'লেখা, লেখকের দায়িত্ব', ২২১-২২; *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ৫৭, ১৪৩, ৩১৯; এবং সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ৩৩১

জোসেফ স্তালিন, ৩৩৩

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, ১৯০

ঝরা পালক, ৫৭; *কল্লোল*-এ প্রকাশিত আলোচনা, ৫৯; জীবনানন্দের মতামত, ৫৭; মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকল্প, ৫৮, ১৪৩; সজনীকান্তের বিরোধিতা, ৬০;

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব, ১৩৭; সমালোচনামূলক মন্তব্য, ৫৯

টি এস এলিয়ট : কথ্য ভাষা এবং কবিতা প্রসঙ্গে, ৭৯, ৩৩৯

ডব্লিউ বি ইয়েটস, ৪২
ডিলান টমাস, ৩৪০
ডোডো: মানবজাতির বিপর্যয়ের রূপক, ২১১-১২, ২৮৮

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ২০২; *মার্ক্সবাদী* পত্রিকার সমালোচনা, ২৯৪, ৩০২
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : *স্বর্ণলতা,* ১৪১

দত্ত-ব্র্যাডলি মতবাদ, ১৭৫
দান্তে : তিন পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট কবিতা, ১৩৪; জীবনানন্দের চিঠি, ২৮২; মাইকেল মধুসূদন দত্তের সনেট, ১০৮
দাশগুপ্ত : জীবনানন্দের পদবি পরিবর্তন, ৬০
দিলীপকুমার গুপ্ত : এবং কবি সম্মেলন, ৩১৭
দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ, ৮৬
দীনবন্ধু মিত্র : *মার্ক্সবাদীর* দৃষ্টিতে প্রগতিশীল, ২৯৭
দীনেশচন্দ্র সেন : *শনিবারের চিঠির* আক্রমণ, ৮৩
দীনেশ দত্ত : এবং কবি সম্মেলন, ৩১৮
দীনেশরঞ্জন দাশ : *কল্লোল*-এর সহসম্পাদক, ৫৪; এবং ফোর আর্টস ক্লাব, ৫৪
দীপক মজুমদার : এবং কবি সম্মেলন, ৩১৮
দীপ্তি ত্রিপাঠী : জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে, ১৪১, ১৬৩, ৩১৩, ৩৩৯
দেশ, ৮৭, ২১৩, ২৪৬, ২৪৭
দেশবন্ধু, ২৮, ৫০-৫৩, ১১৩
দ্বন্দ্ব, ২৯৮; এবং অম্লান দত্ত, ৩০৩; আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রবন্ধ, ৩০০; এবং নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন, ৩১৫; সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্রের মুখপত্র, ২৯৯; সহসম্পাদক জীবনানন্দ, ২৯৮

ধূপছায়া, জীবনানন্দের প্রথম দিকের কিছু কবিতা, ১৩৪
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে, ১৮৪
ধূসর পাণ্ডুলিপি, ৯৯, ১৩৪, ১৩৭; ঘোষণা, ১৩৩; জীবনানন্দের ভূমিকা, ১৩৪; দ্বিতীয় সংস্করণে অশোকানন্দ দাশের ভূমিকা, ৯, ১৩৫; প্রকাশিত সনেট, ১০৮, ৩১৪; *বনলতা সেন*-এর সঙ্গে তুলনা, ১৫৩; এবং *রূপসী বাংলা,* ১০৭-১০৮; সমালোচনামূলক মন্তব্য, ৩৩৩

নরেন্দ্র দেব : ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রধান, ২৯৯
নরেন্দ্রনাথ মিত্র : *দ্বন্দ্ব*-এর যুগ্ম সম্পাদক, ২৯৮
নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় : এবং জীবনানন্দের আত্মজীবনী, ৩০৮; জীবনানন্দের সমালোচনা, ১৮০; শিক্ষকতার চাকরির জন্য জীবনানন্দের অনুরোধ, ৩০৭-৮
নরেশ গুহ : 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' সম্পর্কে, ১৮৩; জীবনানন্দ স্মরণে, ৩২৯; শিক্ষকতার চাকরির জন্য জীবনানন্দের অনুরোধ, ৩০৭
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত : এবং ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ২০২; *শনিবারের চিঠির* আক্রমণ, ৮৩; সজনীকান্তের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার হুমকি, ৮২
নলিনী দাশ : শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে জীবনানন্দের চিঠি, ২২৮
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ৩০৬; জীবনানন্দের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনুরোধে *স্বরাজ*-এ দেওয়া উপন্যাস, ২৪২
নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন, ৩১৫-১৬, ৩৩১
নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলন, ১৭৫, ২০২
নীরদ সি চৌধুরী : *অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান*, ৮৮; এবং ব্রাহ্ম মানসিকতা, ৮৯
নিরুক্ত: আত্মপ্রকাশ, ১৭৬-৭৭; এবং *কবিতা*, ২০৪; প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদকীয়, ১৭৬; জীবনানন্দকে নিয়ে লেখা, ১৮৫-৮৫; রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ১৭৭
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : এবং কবি সম্মেলন, ৩১৮; জীবনানন্দের নিয়মিত কলাম 'মন-মর্মর'-এ লেখা, ২৪২; *সাতটি তারার তিমির*-এর গূঢ়ার্থ প্রসঙ্গে, ২৮২; *স্বরাজ*-এ জীবনানন্দের সহকর্মী, ২৪১-৪২
নীরেন্দ্রনাথ রায় : *পরিচয়*-এর যুগ্ম সম্পাদক, ২৯৬
নীহাররঞ্জন রায় : এবং কবি সম্মেলন, ৩১৭

পঁচিশে বৈশাখ: অনিয়মিত কবিতা সংকলন, ১৯০; জীবনানন্দের কবিতা 'রবীন্দ্রনাথ', ১৯০
পথের দাবী, ৫৪
পরিচয়, ১১৯-২০; এবং 'ক্যাম্পে', ৮১, ১২০, ২২৭; এবং 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য', ১৮১; এবং জীবনানন্দ, ১১৯-২০; *ধূসর পাণ্ডুলিপির* আলোচনা, ১৩৮, ১৭৪; বামপন্থী লেখকদের মুখপত্র, ২৯৩; এবং *মার্ক্সবাদী*, ২৯৪; এবং 'রবীন্দ্রনাথ', ১৯০
পরিমল রায় : এবং জীবনানন্দের শিক্ষকতা, ৩১১
পয়ার, দেখুন ছন্দ
পার্সি বিসি শেলি : পাঁচ পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট সনেট, ১৩৪; 'হৃদয়ের বোন'-এর জন্য জীবনানন্দের ঋণ, ১২৮
পাশ্চাত্য প্রভাব, ৬৫
পুনর্জন্ম : জীবনানন্দের কবিতায়, ৭০, ১৯৩-৯৪
পূর্বাশা: প্রকাশনা পুনরারম্ভ, ১৭৬, ২১৯; প্রকাশনা বন্ধ, ১৭৬; বিশেষ সংখ্যা, ১৯০; সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১৭৫
পেত্রার্কীয় সনেট, দেখুন সনেট
পোয়েট্রি (শিকাগো) : *গীতাঞ্জলি*র কবিতা প্রকাশ, ৪২
প্রগতি: ১৯২০ দশকের অগ্রণী সাহিত্য সাময়িকী, ৫৬, ৫৭, ৭৩; *শনিবারের চিঠি*র ব্যঙ্গ, ৬৪
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত : চল্লিশ দশকের কবিদের সম্পর্কে, ৩৩৪; জীবনানন্দের প্রভাব সম্পর্কে, ১৭৫
প্রতিভা বসু : জীবনানন্দের সাহায্যপ্রার্থনা, ২৪৭
প্রতিরোধ: এবং ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সম্মেলন, ২০৩; এবং সোমেন চন্দের মৃত্যু, ২০৩
প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ : শিক্ষকমণ্ডলীতে জীবনানন্দ, ৮৯
প্রবাসী: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ২৬, ৫৪, ৬০, ৭১, ৮৬, ২০২; এবং বই বাজেয়াপ্ত, ৮২; এবং সিটি কলেজের সরস্বতী পূজা, ৮৬
প্রভাসচন্দ্র ঘোষ : রামযশ কলেজে জীবনানন্দের সহকর্মী, ৯০
প্রমথ চৌধুরী : তিন পঙ্‌ক্তির স্তবক-সংবলিত কবিতা, ১৩৪; *শনিবারের চিঠি*র আক্রমণ, ৬৪, ৮৩; *সবুজ পত্র* সম্পাদনা, ৬৩
প্রসন্নকুমারী দাশ, [illegible]কারের গল্প, ১২৫
প্রাক-রাফায়েল গোষ্ঠী : জীবনানন্দের ওপর প্রভাব, ১৩৭
প্রাচীর : সোমেন চন্দ, ২০৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রেমচন্দ : নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের সভাপতি, ১৭৪
প্রেমেন্দ্র মিত্র : এবং *কবিতা*, ৮৩, ১২৮; এবং কবি সম্মেলন, ৩১৭; এবং *কালি কলম*, ৫৬; এবং *নিরুক্ত*, ১৭৬; এবং 'নীলিমা', ৫৬; *মহাপৃথিবী* উৎসর্গ, ২২৩; শ্রেষ্ঠ কবিতা সিরিজ, ৩১৯
প্রেসিডেন্সি কলেজ : জীবনানন্দের চাকরি প্রার্থনা, ৩১১; জীবনানন্দের পড়াশোনা, ৩২
প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং : কলকাতায় জীবনানন্দের আবাস, ৫৬

ফজলুর রহমান খান, ২০
ফোর আর্টস ক্লাব : কল্লোলের অগ্রদূত, ৫৪
ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ২০২, ২৯৩

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : উনিশ শতাব্দীর বাঙালি লেখকদের দুরবস্থা প্রসঙ্গে, ৪০; বন্দে মাতরম, ৫৯; *মার্ক্সবাদী* পত্রিকায়, ২৯৬; শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা বনাম ইংরেজি, ৪০
বড়িশা কলেজ, ৩০৮
'বনলতা সেন', ৯৯, ১৪০-৪২; অন্য কবির কবিতায় উল্লেখ, ১৪৩; কবি সম্মেলনে জীবনানন্দের পাঠ, ৩১৮; কবিতার আলোচনা, ১৮৫; নামকরণ, ১৪২
বনলতা সেন: 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালা (কবিতা ভবন সংস্করণ), ২০০, ২১৩, ২২৩-২৪, ২৫৭; নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য পুরস্কার লাভ, ৩১৫; পরের কবিতার সঙ্গে তুলনা, ১৯৩; সমালোচনামূলক মন্তব্য, ৩৩৩; সিগনেট প্রেস সংস্করণ, ১৪৩, ৩১২, ৩১৪-১৬, ৩৩১
'বন্দে মাতরম', ৫৯, ৮৪
বরিশাল : এবং ব্রাহ্মসমাজ, ২৫, ২৬, ৪৯; ভূপ্রকৃতি, ২১; *জলপাইহাটি*র সঙ্গে সাযুজ্য, ১০৫, ২৬০; জাতীয় শিক্ষা, ৩০; জীবনানন্দের আকর্ষণ, ৯৯, ২৪২, ৩০৪; জীবনানন্দের বরিশাল ত্যাগ, ২৩০; সম্মেলন, ৪১; সর্বানন্দ ভবন, ৯১; এবং সাম্প্রদায়িকতা, ২৬৬
বাউল, ২৮৮
বাংলা : অসাহিত্যিক শব্দপ্রয়োগ, ৬৫; গুরুচণ্ডালী দোষ, ৬৩; বছর গণনা, ১৮; এবং সংস্কৃত, ৭৩, ৭৪, ৭৯; সাধু ও চলিত, ৬৩, ৭৯, ৮০, ৩৩৯; সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ৩৫-৪২
বাংলা কাব্য পরিচয়: গদ্যকবিতা বাদ, ১৪৭; বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা, ১৪৭; রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনা, ৩১৮
বাংলাদেশ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ২০, ২১; জাতীয় সংগীত, ১৭, ৪১
বাগেরহাট, ৯৯
বাগেরহাট কলেজ, দেখুন প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ
বাণী রায় : এবং জীবনানন্দ স্মরণে, ৩১৮, ৩২৯; জীবনানন্দের প্রভাব সম্পর্কে, ৩৩৩; এবং বড়িশা কলেজে জীবনানন্দের চাকরি, ৩০৯
বায়রন, ৯২
বার্মিজ ডেজ, ৫৪
বিএম ইনস্টিটিউশন : এবং জাতীয় শিক্ষা, ২৮, ৩০; জীবনানন্দের পিতার শিক্ষকতা, ২৭, ৩০; জীবনানন্দের শিক্ষা, ২৭; সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ২৯-৩১
বিএম কলেজ : জীবনানন্দের পদত্যাগ, ২২৯-৩০; জীবনানন্দের পড়াশোনা, ৩১, ৩২; জীবনানন্দের সহকর্মীরা, ১৮০, ২২৮; জীবনানন্দের যোগদান, ১০০; জীবনানন্দের স্ত্রীর বিএ ডিগ্রি লাভ, ৯২
বিচিত্রা, ৭১
বিচিত্রা ভবন সম্মেলন, ৭২, ৮৭
বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য : হাওড়া গার্লস কলেজের প্রিন্সিপাল, ৩০৯
বিধানচন্দ্র রায় : মুখ্যমন্ত্রী, হাসপাতালে জীবনানন্দের সহায়তাকারী, ৩২০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় : সিটি কলেজের সরস্বতী পূজা, ৮৫
বিবেকানন্দ, ৫২; *মার্ক্সবাদী*তে প্রকাশিত লেখায়, ২৯৬-৯৭
বিমলচন্দ্র ঘোষ : এবং কবি সম্মেলন, ৩১৭
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য : *ছন্দ* পত্রিকার সহসম্পাদক, ২৯৯
বিষ্ণু দে : *আধুনিক বাংলা কবিতায়*, ৩১৮; এবং কবি সম্মেলন, ৩১৭-১৮; এবং *কেন লিখি*, ২২৩; জীবনানন্দের ইংরেজি কবিতা প্রসঙ্গে, ১০৯; জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' প্রসঙ্গে, ১২০, ১২২; নবীন কবিদের অনুপ্রেরণা, ৩৩৪; এবং *পরিচয়*, ১১৯, ১৩৮; ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ২০২; বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা, ২৯৬; এবং *মহাকাল*, ৮২; *মার্ক্সবাদীর* সমালোচনা, ২৯৫; এবং রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮; এবং *শ্রেষ্ঠ* কবিতা সিরিজ, ৩১৯; এবং *সাহিত্য পত্র*, ২৯৫; সোমেন চন্দ হত্যার প্রতিবাদ, ২০৩
বুদ্ধ : এবং 'আট বছর আগের একদিন', ১৫৯-৬০; এবং 'বোধ', ৭৭
বুদ্ধদেব বসু : এবং *আধুনিক বাংলা কবিতা*, ৩১৮; এবং *অ্যান একর্ অব গ্রিন গ্রাস*, ২৯৫; এবং *কবিতা*, ১২৮-২৯, ২৮৯-৯০; এবং কবিতা ভবন, ২২৩; *কবিতা* সম্পর্কে জীবনানন্দের চিঠি, ১৩৯; 'কোকিল, ও কোকিল' কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দের মন্তব্য, ১৩৯; জীবনানন্দ স্মরণে, ৩২৯; জীবনানন্দের কবিতা প্রসঙ্গে, ৪৯, ৫৭, ৭৩, ৭৪, ৭৯, ৮০, ২১৯, ২২৭, ২৯৫; এবং জীবনানন্দের করা 'অন্ধকার' কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে, ২৯০-৯১; এবং জীবনানন্দ কর্তৃক *কঙ্কাবতী*র আলোচনা, ১২৯; এবং জীবনানন্দের *ধূসর পাণ্ডুলিপি*, ১৩৭; জীবনানন্দের বিয়েতে উপস্থিতি, ৯১; জীবনানন্দের সমাধিফলক, ১৩; নবীন কবিদের জন্য অনুপ্রেরণা, ৩৩৪; এবং *পরিচয়*, ১১৯; এবং *প্রতিরোধ*, ২০৩; এবং ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ২০২; এবং *মহাকাল*, ৮২; এবং *মহাপৃথিবী*, ২২৪-২৫, ২৯০; রবীন্দ্রনাথের *বাংলা কাব্য পরিচয়*-এর সমালোচনা, ১৪৭; রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা* প্রসঙ্গে, ৭২; রাজনৈতিক কবিতার সমালোচনা, ২৯৫; এবং *শ্রেষ্ঠ* কবিতা সিরিজ, ৩১৯; এবং সঞ্জয়ের বিরূপ মনোভাব, ২০৪; সিটি কলেজ থেকে জীবনানন্দের চাকরিচ্যুতি প্রসঙ্গে, ৮৭, ৮৯; সোমেন চন্দ হত্যার প্রতিবাদ, ২০৩
বেগম রোকেয়া, ২০
বেথুন কলেজ : জীবনানন্দের মায়ের পড়াশোনা, ২৫
বেক্ষ : 'ব্রাহ্ম' শব্দের বিকৃত রূপ, ২৩, ৮৮
বৈদ্য : এবং গৈলা গ্রাম, ২৪; জীবনানন্দের উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, ২৬০, ২৭৪; এবং দাশগুপ্ত পদবি, ২২; এবং ব্রাহ্ম, ৯০
'বোধ' : 'আট বছর আগের একদিন'-এর সঙ্গে তুলনা, ১৬৩; 'গরিমা'র সঙ্গে তুলনা, ১৯৩
ব্রজসুন্দর রায় : বরিশাল থেকে আসা সিটি কলেজের অধ্যাপক, ৮৫
ব্রহ্মবাদী : জীবনানন্দের একমাত্র লেখা, ৩৩; জীবনানন্দের পিতার সম্পাদনা, ২৬; জীবনানন্দের মায়ের কবিতা, ২৬; প্রথম প্রকাশ, ২৬
ব্রাহ্মসমাজ : এবং জাত, ২২; জীবনানন্দের বাবার বেড়ে ওঠা, ৪৯; জীবনানন্দের পিতামহের ব্রাহ্মত্ব গ্রহণ, ২৩; এবং নৈতিকতা, ৮৮, ৮৯; পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচরণ, ৮৪; এবং বরিশাল, ৪৯; সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ২২, ২৩; এবং সিটি কলেজ, [illegible] ৮৫
[illegible]ম্ম-হিন্দু [illegible]র্ক, [illegible]৪-৮৭, ২৭৫-৭[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভবানী সেন : নিখিল ভারত পার্টি কংগ্রেসে ভাষণ, ২৯৩
ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, ১৭৪; নিষিদ্ধ (১৯৩৪), ২০২; পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ (১৯৪৮), ২৯৪, ৩০১; বৈধতা (১৯৪২), ২২০
ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক দল : এবং সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্র, ২৯৯
ভূমেন্দ্র গুহ : হাসপাতালে জীবনানন্দের শয্যাপার্শ্বে, ৩২০

মঞ্জুশ্রী দাশ : বাবার চিঠি, ২৪৪
মডার্ন রিভিউ, ২০২; এবং সিটি কলেজে সরস্বতী পূজা, ৮৬
মণিমুক্তা : *শনিবারের চিঠির* নিয়মিত কলাম, ৬৩, ৬৪
মণীন্দ্র রায় : জীবনানন্দের কবিতা প্রসঙ্গে, ৩৩১-৩৩
মন-মর্মর : *স্বরাজ* পত্রিকায় জীবনানন্দের কলাম, ২৪২
মনমোহন চক্রবর্তী : জীবনানন্দের বিয়ে পরিচালনা, ৯১; *ব্রহ্মবাদীর* সহসম্পাদক, ২৬
মনসামঙ্গল: এবং *রূপসী বাংলা*, ৩৭, ১১৩
মলয় রায়চৌধুরী : 'শিল্পের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে', ৩৩৫
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : তাঁর সম্পর্কে লেখার জন্য মায়ের উপদেশ, ৫২
মহাকাল: *শনিবারের চিঠির* বিরুদ্ধে প্রকাশিত পত্রিকা, ৮২, ৮৩
মহাপৃথিবী, ১৪৩, ১৫৩, ২২৩-২৬; এবং রোমান্টিসিজম, ১৭৬; সমালোচনামূলক মন্তব্য, ২২৪; *সাতটি তারার তিমির*-এর সঙ্গে তুলনা, ২৮২
মহাভারত, ১১৩, ২১২
মাইকেল মধুসূদন দত্ত : ইংরেজি এবং বাংলায় লেখা, ৪০; খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বন, ২৩; 'প্রগতিশীল' বলে *মার্ক্সবাদীর* মন্তব্য, ২৯৭; 'বঙ্গভূমির প্রতি', ৯২; এবং *মেঘনাদবধকাব্য*, ৪০, ২৫৬; এবং সনেট, ১০৮
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' সম্পর্কে, ১৮৩
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ২০২; *মার্ক্সবাদী* পত্রিকার সমালোচনা, ২৯৪, ৩০২
মারিয়া মন্টেসরি, ৩১
মার্ক্সবাদ : এবং বাংলা সাহিত্য, ১৭৪
মার্ক্সবাদী (পত্রিকা) : মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং দীনবন্ধু মিত্রের প্রশংসা, ২৯৭; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা, ২৯৪; রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত লেখকদের সমালোচনা, ৩০১; সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ২৯৪-৯৭
মার্ক্সবাদী : জীবনানন্দের ওপর আক্রমণ বন্ধ, ৩৩৩
মুকুল: জীবনানন্দের মায়ের প্রকাশনা, ২৫
মুনিরুদ্দীন : বরিশালের শিকারী, ১২৪
মেঘদূত, ১৮
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী : এবং জাতীয় শিক্ষা, ২৮; দেশবন্ধুর সৎকারযজ্ঞে অংশগ্রহণ, ৫০; ব্রিটিশদের প্রতি অসহযোগিতা, ২৮; এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, ২১০;
মোহিতলাল মজুমদার : জীবনানন্দের ওপর প্রভাব, ৫৯; এবং রবীন্দ্রনাথ, ১০৮; *শনিবারের চিঠির* তাত্ত্বিক, ৬০

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : এবং কবি সম্মেলন, ৩১৭
যদুনাথ সরকার : এবং সিটি কলেজের সরস্বতী পূজা, ৮৫
যামিনী রায় : এবং ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ২০২

রনদীভে মতবাদ : এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, ২৯৩
রবার্ট ব্রাউনিং, ১২৮, ১৩৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবিবারের লাঠি: শনিবারের চিঠির বিরোধিতা করে প্রকাশিত পত্রিকা, ৮৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *আধুনিক বাংলা কবিতা* সংকলনে, ৩১৮-১৯; এআইপিডব্লিউএ-এর সম্মেলনে সভাপতিত্ব (১৯৩৮), ১৭৫; এবং *কবিতা,* ১২৯; এবং কাজী নজরুল ইসলাম, ৫১; এবং গদ্যকবিতা, ১৪৭; এবং জীবনানন্দ, ৩৩, ৬০, ১৩৯, ১৯০, ২৮২, ৩২৯, ৩৪০; জীবনানন্দকে লেখা চিঠি, ৩৩; এবং *ঝরা পালক,* ৬০; ত্রিশের দশকের কবিতা, ১৭৭; নাইট খেতাব ফিরিয়ে দেওয়া, ২৮; এবং নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন, ৩১৫; এবং *নিরুক্ত,* ১৭৭; নোবেল প্রাইজ, ৪২; এবং *পরিচয়,* ১৯০; পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে, ৬২; বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান, ২৮; *বাংলা কাব্য পরিচয়,* ৩১৮; বিচিত্রা ভবন সম্মেলন, ৭২, ৮৭; এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, ১৯৬; *মার্ক্সবাদী*র আক্রমণ, ২৯৪, ২৯৬, ৩০১; এবং *মুকুল,* ২৫; মৃত্যু, ১৮৯; 'মৃত্যুর আগে' প্রসঙ্গে, ১৩৩; এবং *শনিবারের চিঠি,* ৬৩, ৭১, ৭২; শিক্ষিত বাঙালিদের গুরু, ১৩৩; শৈল্পিক সৃষ্টি সম্পর্কে, ১৯১; সজনীকান্তের প্রতি বিরক্তি, ৬৩; এবং সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষকে সমর্থন, ৮৬; এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ১২১
রচনা (উদ্ধৃত কিংবা প্রসঙ্গ) : 'আমার সোনার বাংলা', ১৭; *গীতাঞ্জলি,* ৪২, ১৯১; 'নষ্টনীড়', ১৪১; *পুনশ্চ,* ১৪৬; *বলাকা,* ১৮৪; শেষের *কবিতা,* ৭২; 'সাহিত্যধর্ম', ৭১; 'সাহিত্যে নবত্ব', ৭১
রবীন্দ্রনাথ সামন্ত : 'আট বছর আগের একদিন' সম্পর্কে, ১৬৩
রমেশচন্দ্র সেন : 'এই শুধু সান্ত্বনা(?)', ১৮০; কলকাতায় জীবনানন্দের প্রতি সহায়তা, ২৪৫; ব্যঙ্গাত্মক কবিতা, ১৮০
রস ৭৩, ৭৪
রানা বসু : জীবনানন্দের স্মরণে, ৩২৯
রামদাস, ৫২
রামপ্রসাদ : 'মা মা বলে আর ডাকব না', ৩৬, ৩৭
রামমোহন রায় : তাঁর সম্পর্কে লেখার জন্য মায়ের উপদেশ, ৫২; ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, ৩৮; মার্ক্সবাদীদের অবমূল্যায়ন, ৩০১;
রামমোহন রায় হোস্টেল : এবং সিটি কলেজ, ৮৫
রামযশ কলেজ : শিক্ষকমণ্ডলীতে জীবনানন্দ, ৮৯, ৯০, ১৪২
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : এবং জীবনানন্দের মা, ২৬; *প্রবাসী*র প্রতিষ্ঠা, ২৬; ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ২০২; সিটি কলেজের পক্ষাবলম্বন, ৮৬; এবং স্যান্ডারল্যান্ডের *ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজ,* ৮২
রুশ বিপ্লব, ১৯৯
রূপসী বাংলা, ১০৭-১৯; অশোকানন্দের ভূমিকা, ১০৭; ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক চিত্রকল্প, ১৪৫; জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত, ১১০, ১১৯, ১৩৬, ২৯৩; জীবনানন্দের অন্য কবিতা, ১১৭-১৮, ১৪১-৪২, ১৫৫, ১৯৩, ২১২; জীবনানন্দের উপন্যাস, ২৪৬; পাঠকগোষ্ঠীর গ্রহণযোগ্যতা, ১১৬-১৭; এবং মৃত্যু, ১৬১
রোমান্টিসিজম : এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ১৭৬
রোহিণীকুমার গুপ্ত : লাবণ্য দাশের বাবা, ৯০

লাবণ্য দাশ, ৯০, ২৪৩; জীবনানন্দের সঙ্গে বিবাহ, ১০৭; টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যয়ন, ২৪৫; বিএ ডিগ্রি লাভ, ৯২; স্কুলে শিক্ষকতা, [illegible]
লুই কান, [illegible]

শঙ্খমালা, ১১১, [illegible]৫৩-৫৪
শনিচক্র, ২৯৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শনিবারের চিঠি, ৫৭, ৬১, ৬২; জীবনানন্দের কৌতূহল, ১৮০; 'সাহিত্যের গুন্ডা', ৬০
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় : এবং জীবনানন্দের কাব্যিক শব্দচয়ন, ৩৩৯; জীবনানন্দের প্রভাব সম্পর্কে, ৩৩৪
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫৪; *মার্ক্সবাদীর* সমালোচনা, ২৯৪; *শনিবারের চিঠির* আক্রমণ, ৮৩
শামশের আনোয়ার : *বনলতা সেন*-এর প্রসঙ্গ, ৩৩৪
শালিবাহন, ১৮
শিবনাথ শাস্ত্রী : দাশ পরিবারের বন্ধু, ২৫; *মুকুল*-এর সম্পাদক, ২৫
শিবাজি, ৫২
শিশিরকুমার দাশ : বাংলা সনেট প্রসঙ্গে, ১০৮
শুদ্ধসত্ব বসু : শিক্ষকতা চাকরির জন্য জীবনানন্দের অনুরোধ, ৩০৭

সংস্কৃত : এবং বাংলা, ৭৯; এবং কাব্যের রাজহাঁস, ২৪৮, ২৬৪; মধুসূদনের ভাষাশিক্ষা, ৪০; সমার্থক শব্দ যথাসম্ভব পরিহার, ৭৪, ১৪৭; সাহিত্য, ৭৩
সজনীকান্ত দাস : অন্যদের মতামত, ৫৭; অশ্লীলতার অভিযোগ, ৮১; আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি, ৮২; গদ্যকবিতার প্রতি উপহাস, ৬১; জীবনানন্দের কবিতার সমালোচনা, ৬৯, ১২৬-২৭; জীবনানন্দের মৃত্যুর পর লেখা, ৩৩০-৩১; *ঝরা পালক*-এর আলোচনা ছাপার বিরোধিতা, ৬০; এবং নজরুল, ৫৭; নিজের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, ৬৫; ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ২০২; এবং বিএম কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী, ১৮০; ব্যঙ্গরচনা 'নকুড় ঠাকুরের আশ্রম', ৮১; এবং *মহাকাল*, ৮২, ৮৩; এবং রবীন্দ্রনাথ, ৬২, ৬৩; রাজদ্রোহের অভিযোগ, ৮২; রেডিওতে জীবনানন্দের সঙ্গে কবিতা পাঠ, ৩১৯; এবং শনিচক্র, ২৯৭, ২৯৮; *শনিবারের চিঠি* সম্পাদনা, ৫৭; এবং সিটি কলেজের সরস্বতী পূজা, ৮৬; হাসপাতালে জীবনানন্দকে সহায়তা, ৩২০
সঞ্জয় ভট্টাচার্য : *কবিতা* এবং বুদ্ধদেব বসুর মতামত, ১৭৬-৭৭; কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দের বক্তব্য, ৩১১; কবিতায় কমিউনিজম ও স্তালিনবাদ, ২২০; কলকাতায় জীবনানন্দের প্রতি সহায়তা, ২৪১, ২৪৭, ৩০৫, ৩০৮, ৩১০; 'জীবনানন্দ দাশ' শীর্ষক প্রবন্ধ, ২১৯; জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে, ১১৭-১৮, ১৭৪, ১৮৩-৮৫; জীবনানন্দ স্মরণে, ৩২৯; *নিরুক্ত*তে জীবনানন্দকে নিয়ে লেখা, ১৭৮; *নিরুক্ত*-এর যুগ্ম সম্পাদক, ২২৩; এবং *পূর্ব্বাশা*, ১৭৬, ১৯০; এবং *প্রতিরোধ*, ২০৩; বুদ্ধদেবের সঙ্গে বিবাদ, ১৭৭; *মহাপৃথিবী* সম্পর্কে, ২২৩; এবং রোমান্টিকতা, ১৭৬; এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ১২০-২১
সত্যজিৎ রায় : *বনলতা সেন*-এর প্রচ্ছদ, ৩১২
সত্যপ্রসন্ন দত্ত : কলকাতায় জীবনানন্দকে সহায়তা প্রসঙ্গে, ৩০৮; এবং জীবনানন্দের চিঠি, ৩১১; এবং জীবনানন্দের *সাতটি তারার তিমির*, ২৮১; এবং *পূর্ব্বাশা*, ১৭৫; এবং *মহাপৃথিবী*, ১৭৬; হাসপাতালে জীবনানন্দকে সহায়তা, ৩২০
সত্যানন্দ দাশ, ২১-২৪; ২২৮; ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ৩০; জীবনানন্দের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক আদর্শ, ৩০; বিএম ইনস্টিটিউশন ত্যাগ (১৯২১), ৩০; বিএম ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা, ২৭; *ব্রহ্মবাদী*র যুক্তপ্রতিষ্ঠাতা, ২৬; ব্রাহ্মত্ব গ্রহণ, ২৩
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : জীবনানন্দের নেতিবাচক মনোভাব, ১৩৭; এবং বাংলা কবিতার ছন্দ, ১৩৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ২০; এবং *পরিচয়,* ১১৯
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার : এবং ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ২০২
সনেট : পেত্রার্কীয়, ১০৯, ১১৮-১৯;
সন্তোষকুমার ঘোষ : সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক, ২৯৯
সবুজ পত্র : বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রথম ব্যবহার, ৬৩; সজনীকান্তের লেখায় পরোক্ষ ইঙ্গিত, ৬৪
সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্র : আবু সয়ীদ আইয়ুবকৃত গঠনতন্ত্র, ৩০০; জীবনানন্দের সম্ভাব্য সদস্যপদ, ৩০০; *ছন্দ* পত্রিকার যৌথ সম্পাদক জীবনানন্দ, ২৯৮; এবং ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ২৯৯; সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ২৯৭-৩০১
সমর সেন : *আধুনিক বাংলা কবিতা,* ৩১৮-১৯; এবং *কবিতা,* ১২৮-২৯; এবং কবি সম্মেলন, ৩১৭; জীবনানন্দের চিঠিতে, ১৩৯; সোমেন চন্দ হত্যার প্রতিবাদ, ২০৩
সমরানন্দ দাশ, ৯২
সম্রাট আকবর, ১৮
সরস্বতী পূজা : এবং সিটি কলেজ, ৮৪-৮৬; এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, ৮৪
সরোজেন্দ্রনাথ রায় : *ঝরা পালক*-এর ওপর লেখা তাঁর আলোচনা, ৬০; সিটি কলেজ থেকে জীবনানন্দের চাকরিচ্যুতি প্রসঙ্গে, ৮৮, ৮৯
সর্বানন্দ দাশ : ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা, ২৪
সর্বানন্দ ভবন, ৯১
সাইমন কমিশন, ৮৪
সাগরময় ঘোষ : *দেশ* সম্পাদক, ২৪৭
সাতটি তারার তিমির, ২৮১; এবং 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য', ১৮৪; সমালোচনা, ৩৩২-৩৩
সাম্প্রদায়িকতা : আরও দেখুন ব্রাহ্ম-হিন্দু সম্পর্ক, দেখুন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক
সাহিত্য আকাদেমি : এবং *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* ৩৩১; বাংলা ভাষায় প্রথম পুরস্কার, ৩৩১; সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ৩৩১
সাহিত্য পত্র: বুদ্ধদেবের বইয়ের সমালোচনা, ২৯৫; *মার্ক্সবাদীর* আক্রমণের শিকার, ২৯৫
'সাহিত্যের আদর্শ', ৬০
'সাহিত্যের ধর্ম', ৭১
সিটি কলেজ : এবং জীবনানন্দের বাবা, ২৪; জীবনানন্দের শিক্ষকতা, ৪৯, ৮৫-৮৭; এবং বরিশাল, ৪৯; এবং ব্রাহ্মসমাজ, ২৪, ৪৯, ৮৪-৮৭; এবং সরস্বতী পূজা, ৮৪-৮৭
সিটি স্কুল, ২৪
সুকুমার দত্ত : অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাইপো, রামযশ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল, ৮৯
সুচরিতা দাশ, ৪৯, ২২৮, ২৪৪
সুতীর্থ, ২৪৬, ২৫১, ২৫৯; এবং জীবনানন্দের ছোটগল্প, ১০৫
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : আধুনিক কবিতার ঘোষণাপত্র 'কাব্যের মুক্তি', ১২০; এবং *আধুনিক বাংলা কবিতা,* ৩১৮-১৯; এবং কবি সম্মেলন, ৩১৭; জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব, ১২০-২২; জীবনানন্দের তুলনায়, ১২১; জীবনানন্দের শ্রাদ্ধে অনুপস্থিতি, ১২১; তরুণ কবিদের অনুপ্রেরণা, ১১৯; এবং নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন, ৩১৫; *পরিচয়*-এর সম্পাদক, ১১৯
সুধীরকুমার দত্ত : 'বনলতা সেন'-এর চিত্রকল্প, ১৪২; জীবনানন্দের সহকর্মী ও বন্ধু, ৯০, ১৬১
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : এবং কবি সম্মেলন, ৩১৮; 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' সম্পর্কে, ১৮২-৮৩; জীবনানন্দের শব্দপ্রয়োগ প্রসঙ্গে, ৮১
সুন্দরবন, ১২৮, ১৫২

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুবোধ রায়, ৩০৭
সুভাষচন্দ্র বসু, ২১১; এবং সিটি কলেজের সরস্বতী পূজা, ৮৬
সুভাষ মুখোপাধ্যায় : এবং কবি সম্মেলন, ৩১৭; জীবনানন্দের সঙ্গে তুলনা, ২১৩; এবং *প্রতিরোধ*, ২০৩; এবং ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ২০২; ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের জন্য জীবনানন্দের কাছ থেকে লেখা চাওয়া, ২২০; *বনলতা সেন*-এর (সিগনেট প্রেস সংস্করণ) আলোচনা, ৩১৬; সোমেন চন্দ হত্যার প্রতিবাদ, ২০৩
সুশোভন সরকার : এবং *পরিচয়*, ১১৯
সুহৃদ রুদ্র : *দ্বন্দ্ব* পত্রিকার সহপ্রতিষ্ঠাতা, ২৯৯
সোভিয়েত বিপ্লব, ১৯৯, ২১২
সোমেন চন্দ, ২০২, ২০৩
স্তালিনবাদ, ২২০, ২২৯
স্তালিনীয় অসুস্থতা : এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ২১৯-২০, ২৯৩
স্পেন্সরীয় স্তবক বিন্যাস, ১৩৭
স্বদেশী আন্দোলন, ২৮
স্বরাজ, ২২৯, ২৬৭, ২৮১; জীবনানন্দের পূজা সংখ্যা সম্পাদনা, ২৪২; প্রকাশনার ইতিহাস, ২৪১

হরপ্রসাদ মিত্র : শিক্ষকতার চাকরির জন্য জীবনানন্দের চিঠি, ৩০৫, ৩০৬
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ৩৫
হাওড়া গার্লস কলেজ : জীবনানন্দকে উৎসর্গীকৃত ম্যাগাজিন, ৩৩০; শিক্ষকমণ্ডলীতে জীবনানন্দ, ৩০৯
হাংরি জেনারেশন, ৩৩৫; জীবনানন্দের প্রতি সম্মান, ৩৩৬-৩৭
হায়াৎ মামুদ : সম্ভ্রান্ত সাহিত্যিক মহলে জীবনানন্দের অগ্রহণযোগ্যতা, ১২০
হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, ৫৩, ৮৪, ২২৯-৩০, ২৯৭; জীবনানন্দের উপন্যাসে, ২৬০, ২৬৫-৬৭
হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায় : *মহাপৃথিবী* প্রসঙ্গে, ২২৫
হিরণকুমার সান্যাল : *পরিচয়*-এর যৌথ সম্পাদনা, ১১৯; এবং ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ২০২
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : এবং *পরিচয়*, ১২৭
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : *আধুনিক বাংলা কবিতার* সহসম্পাদক, ৩১৮
হুমায়ুন কবির : এবং *চতুরঙ্গ*, ২৯৮, ৩১১; শিক্ষকতার চাকরির জন্য জীবনানন্দের অনুরোধ, ৩১১; *সাতটি তারার তিমির* উৎসর্গ, ২৮১
হেরম্ব চক্রবর্তী : জীবনানন্দ প্রসঙ্গে, ১৮০, ২২৮
হেরম্বচন্দ্র মৈত্র : এবং ব্রাহ্ম নীতিবোধ, ৮৪, ৮৮; এবং সিটি কলেজ, ৪৯, ৮৫; এবং সিটি কলেজ থেকে জীবনানন্দের চাকরিচ্যুতি, ৮৯
হৈমন্তিকা, ২৮৩-৮৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও